বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ

হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত

বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ

সনৎকুমার সাহা সম্মাননা গ্রন্থ



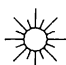
সম্পাদক
হাসান আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

সময় প্রকাশন

বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ
হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১২


সময়

সময় ৮৩৮

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

শব্দবিন্যাস
কঙ্কা কম্পিউটার, ৫২৪ কাজলা, রাজশাহী

কম্পিউটার
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

মূল্যঃ ৬০০.০০ টাকা মাত্র

Banga Bânglâ Bânglâdesh : Sanatkumâr Sâhâ Sammânanâ grantha [Banga Bengal Bangladesh: Sanatkumar Saha Felicitation Volume] Edited by Hasan Azizul Huq, Associate Editor Swarochish Sarker. First Published: February 2012, by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com

Price: Tk. 600.00 Only

ISBN 978-984-8942-68-0 Code: 609

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমণ্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

সম্পাদকের একান্তে বলা

কবে বেরিয়ে যায় এই বই! শুধু আমার একটু সাহসের অভাবে সেটা হতে পারল না। খুব আফসোস হচ্ছে, অন্তত বছর তিনেক দেরি তো হলোই। যদিও কোনো উপলক্ষের অপেক্ষা আমরা করছিলাম না তবু উপলক্ষ একটা এসেছিল। সনৎ কুমার সাহা-র সত্তরতম জন্মদিন। বোধহয় সেটা পেরিয়ে গেল। অথচ যে সাহসের কথা হচ্ছিল সেটা দিগ্বিজয়ের দুঃসাহস নয়, মহা-পর্বতের মাথায় চড়ার সংকল্পেরও নয়। দরকার ছিল অনেকটা সক্রেটিসের সামনা-সামনি হয়ে কথা চালানোর মতো সাহস আর আত্ম-আস্থা।

ভূমিকায় আর কথা না ফলিয়ে বলেই ফেলি সনৎকুমার সাহার সম্মাননা গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশ নিয়েই কথাগুলো বলা। ভূমিকাটুকু দেখলে সনৎ রাগ করবেন, হয়তো অবাকও একটু হবেন, তবু কথাটা তাই। তাঁর ক্ষীণ এতটুকু একটা শরীর, খুঁটিয়ে দেখলে সুপুরুষ, নইলে একেবারেই সাদাসিধে বাঙালি, ভিড়ে মিশে যাবেন, আলাদা চোখে পড়বেন না। প্যান্ট-শার্ট, পাজামা পাঞ্জাবি যা-ই পরুন, কিছুতেই তাতে বিশেষ কিছু থাকে না। মৃদুভাষী, ধীরভাষী। আগে কথা পরে চিন্তা নয়। আগে চিন্তা। অনেকটা সময় নিয়ে বিবেচনা। অপেক্ষা করতে করতে শ্রোতা যখন প্রায় অতিষ্ঠ, তখনই মোক্ষম কথাটি, সর্বশেষ চূড়ান্ত চিন্তাটি। অনেকটা সময় নিয়ে কথা বলতে গেলে ঠিক শব্দটি, মনোমতো, চিন্তামতো বাক্যটি শ্রোতার কথা না ভেবে খুঁজতে হলে শ্রোতাকে অপেক্ষা তো করতেই হবে। তার ওপর তিনি আবার একটু ভিন্ন ধরনের তোতলা, আপাত লাজুক, উচ্চারণ স্পষ্ট কিন্তু শিশুর মতো আলতো মোলায়েম। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হয় এই মানুষটিকে যে-কোনো কথা শোনানো যায়, মানানো যায়। কিন্তু সে যে কি বিভ্রম! এই মানুষ ভিতরে ঝকঝকে ইস্পাত। যত দিন যাচ্ছে মর্চে ধরার তো কথাই নেই বরং ভিতরের মানুষটি আরও নিদাগ শুদ্ধ হয়ে উঠছে। এমন হবার মন্ত্রগুপ্তি কিছু আছে কি? শেষ পর্যন্ত একটা উত্তর ভেবে উঠেছি: নিক্তি-মাপা একশোভাগ সততা আর ঠিক ওই একই নিক্তি-মাপা খাঁটি একশোভাগ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মোহশূন্যতা। অথচ মানুষটি পুরোপুরি সামাজিক, আর মর্মে জানি পুরোপুরি নাস্তিক প্রচলিত কথায়। তবু তাঁর আস্তিকতা টের পাওয়া যায় মানুষে প্রকৃতিতে মহাজগতে গভীর হ্যাঁ-সূচক এক আস্থায়। সেখানে অবশ্য প্রচুর তর্ক করা যায় তাঁর সঙ্গে।

ভূমিকাতেই বড্ড বেশি জোর পড়ে গেল। হয়ে গেল একটু বেশি ব্যস্ততা দেখানো। মহীরুহকে অধৈর্য হয়ে তড়িঘড়ি চেনানোর মতো। মহীরুহের বিরাটত্ব বিশালত্ব মহত্ত্ব এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা হয়তো করা যায়, ঠিক চেনানো যায় বলে মনে

হয় না। দেখতে হয় যেমন দূর থেকে, যেতে হয় তেমনি খুব কাছে। পুরো অবয়ব একবারে দেখানোর চেয়ে তার খুব কাছে গিয়ে একান্ত নিজের মতো করে তার তলায় বসে শাখা-পল্লব পত্রপুষ্প ছুঁয়ে দেখা ভালো। প্রাচীন বাকলে হাত ছুঁয়ে অনুভব যেমন অভিজ্ঞতা দিতে পারে, তার কচি অবস্থায় নমনীয় চেহারাটা দেখার চেষ্টাটাও তেমনি দরকারি। আমি বরং সেদিকেই যাই, দেখি গোড়া থেকে। দৈনন্দিন দেখার জায়গা থেকে। তাহলে শেষ পর্যন্ত বড়ো মানুষটিকে সাদা চোখে দেখতে পাওয়া যাবে।

সেই সময়, ১৯৫৮ সালে আমি বেশ দুঃস্থ সহায়হীন অবস্থায় দু-বছর অনার্স পাঠের প্রথম বছরটি শেষ করে একরকম বিতাড়িত হয়েই (ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সেই সময়ে খুব সম্ভব ছিল) খুলনার ব্রজলাল কলেজ থেকে রাজশাহী সরকারি কলেজে কোনোমতে ভর্তি হতে পারি। সনৎ-কে তো দেখছি তখন থেকে। কেউ নাম বলে দেয়নি, পরিচয় করিয়েও দেয়নি। বোধহয় মার্চ মাসে রাজশাহী এসেছিলাম। ঊনিশ বছরের তরুণের রোদে-ভরা দিনগুলি যেন তখন তীব্র মদিরা মাখানো। তবে চোখে পড়লো অন্যদের, সনৎ-কে নয়। দেখছি কিন্তু প্রায়ই অন্যদের সঙ্গে। চেহারা পোশাক কোনোকিছুই যে চোখে পড়বার মতো নয়! ধুতির সঙ্গে শার্ট পরতেন, না পাজামার সঙ্গে খেয়াল হচ্ছে না। ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবি তখন কেউ কেউ পরতেন বটে, পোশাক-সচেতনদের পাজামার সঙ্গে পাঞ্জাবি পরার তেমন চল ছিল না। আর ঐ যে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে ভেসে এককেটা ফ্যাশন আসত! সেই সময়টায় চল ছিল আঁটোসাঁটো শার্টের সঙ্গে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট, হাঁটুর খানিকটা নিচে নেমেই আর নেই। পায়ে খাটো মোজার সঙ্গে ভারি জুতো। এই দলটা ভারি মারকুটে ছিল। রাজনীতির কারণে মিটিং মিছিলে মারপিট করতে আমার আপত্তি ছিল না বটে কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল মারকুটে দলের সঙ্গে ভিড়তে আমার রুচি হয়নি। আমার নিজের মুখে তখন দাড়ি, পোশাক দীনহীন, পাজামার সঙ্গে জ্যালজেলে কাপড়ের হাফশার্ট। বেশ গোবেচারাই দেখাত। কিন্তু সনৎ যে নির্বিশেষ সাধারণ, এতই সাধারণ যে তাঁকে সাধারণ বলেও ভাবতে হতো না। বড়োগাছের নিচে গেলে তার ছায়াটা যেমন সাধারণ সবার প্রাপ্য, প্রশ্ন করার কিছু নেই, তেমনি শরীর জুড়নো ছায়াটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা নেই।

খুব বন্ধুত্ব হলো কয়েকজন বাকপটু, কয়েকজন মেধাবী, কয়েকজন হাতাগোটানো শার্ট পরা উজ্জ্বল চোখের হবু কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে। ভিড়ে গেলাম তাদেরই দলে। সেখানেও সনতের দেখা মেলে। তিতু ভাইয়ের চায়ের দোকানে, রেলিং-ঘেরা পুকুরটার রেলিং-এ হেলান দেওয়া ভীষণ আড্ডাবাজ একটা দলের মধ্যে। স্পষ্ট, দ্রুত কথনে পলকে পলকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পটু মিসবাহুল আজীম দলের মধ্যমণি। প্রখর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী রশীদুল্লাহ, গল্পলেখক, সম্পাদক ফজলুল হাসান ইউসুফ, বদমেজাজী মাসুদ এমনি আরও অনেকের সঙ্গে অচ্ছ্যুৎ আমিও এখানে জায়গা পাই। আজীমের অনুজ স্বল্পবাক লুৎফুল্লাহিল মজিদ আর প্রায়-নির্বাক সনৎ-ও এখানকার সদস্য। তবে তানোরের জমিদার বংশের

আজীম দলের মধ্যমণি। প্রখর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী রশীদুল্লাহ, গল্পলেখক, সম্পাদক ফজলুল হাসান ইউসুফ, বদমেজাজী মাসুদ এমনি আরও অনেকের সঙ্গে অচ্ছ্যুৎ আমিও এখানে জায়গা পাই। আজীমের অনুজ স্বল্পবাক লুৎফুল্লাহিল মজিদ আর প্রায়-নির্বাক সনৎ-ও এখানকার সদস্য। তবে তানোরের জমিদার বংশের সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকামোহন মৈত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ঋতেন্দ্র মৈত্র, আমাদের বগাদার এখানে আবির্ভাব ঘটলে মধ্যমণি তখনকার মতো তিনিই। হবেন । ওরকম জমকালো চেহারা। জীবনে সেই প্রথম একজন জ্যান্ত রাজকুমার দেখা গেল। পরনে সূক্ষ্ম শুভ্র শান্তিপুরের ধুতি, তার চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম ধপধপে সিত আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি, ধুতির কোঁচা লুটানো ভুঁয়ে, ব্যাক ব্রাশ করা চকচকে কালো চুল এসে পড়েছে ঘাড়ে, মুখে ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে বগাদা কোথাও বসলে কথা কবিতা সঙ্গীত যেন উপচে পড়ে। এখানেও সনৎ। একই সনৎ। দারুণ পুরুষ বগাদার সামনে আমরা একটু এদিক ওদিক টস্‌কে পড়লেও সনতের কোথাও কোনো ভাবান্তর নেই। মজার কথাই হোক, ভারি জ্ঞানের কথাই হোক, তিনি একটি দুটি কথা বলছেন কি বলছেন না। আমাদের চৌকশ মুখর বন্ধু আজীমও কিছুক্ষণের জন্য মুখ বন্ধ রেখেছে। আবার এই আজীমই, যে নিজেদের ছোট্ট মূল দলে কাউকে ভিড়তে দিত না বেশ খানিকটা বাজিয়ে না নিয়ে; চলতি পৃথিবীর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির হালনাগাদ খবরাখবর রাখে কিনা সে সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হয়ে, দেখতাম সেই আজীমই বিকেলের দিকে পদ্মার পাড়ে দলবল নিয়ে আড্ডা দিতে যাবার সময়ে বড়ো মসজিদের পুব দিকে উঁচু বারান্দাওয়ালা যে বিল্ডিং ছিল, আমাদের দাঁড়াতে বলে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ দোতলা বিল্ডিংটার নিচের তলায় অনেকগুলো ওষুধ-টষুধের দোকান ছিল। সেখানে দুই দোকানের মাঝখানের গলিটার মুখে একটা কাঠের চেয়ারে বা টুলে হয়তো সনৎ বসে আছেন। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি রাস্তায়, আজীম সনতের সঙ্গে কি কথা বলে নিতে গেল। আমি একটু বিরক্তই হতাম। এমন সবজান্তা যুবক আজীম কি আবার জানতে গেল সনতের কাছে? সে ফিরে এলে বিরক্তি জানালে আজীম বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলত, খুব জানাশোনা সনতের। টেস্টে হানিফের রানের শেষ স্কোরটা জেনে এলাম। সব বিষয়ে সেই সময়েই আমরা যে সনতের ছাত্র হবারও যোগ্য নই, তা আর তখন জানবো কি করে?

একটু সাহসের অভাবে যে লেখাটা আজ দুবছর ধরে শুরুই করতে পারিনি, সিধে একটা দিনের পথ ধরাতে ইতিমধ্যেই সনৎ কেমন সহজ হয়ে এলেন আমার কাছে। আসলে তিনি যে ঐরকমই সহজ! জবরজং ডালপালা শাখা প্রশাখা ঝেড়ে ফেলা অর্জুনের শরের মতো সোজা। এখন স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে রাজশাহী ছেড়ে চলে যাবার সময় সনতের কিছুই জানা হয়নি। না জেনেই রাজশাহী ছেড়েছি। তারপর অন্তত দশ বারো বছর ওঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিলো না একটুও।

আমি রাজশাহীতে থাকতে থাকতেই মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম আর জিল্লুর রহমান সিদ্দীকি-র সম্পাদনায় 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা বের হতে শুরু করেছে। ঠিক মনে

পড়ছে না, আমি রাজশাহীতে থাকতে থাকতেই, না রাজশাহী ছেড়ে চলে যাবার পরে রাষ্ট্র দেশ সমাজ সংস্কৃতিকে ঠিক কিভাবে দেখাটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা বলে, সমাজ সত্যকে কিভাবে আয়ত্ত এবং কার্যকরভাবে সংগঠনে আন্দোলনে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট দৃঢ় পাঠ নিয়ে প্রকাশিত হলো বদরুদ্দীন উমরের দীর্ঘ প্রবন্ধ 'সাম্প্রদায়িকতা'। প্রচলিত অর্থে যাকে মার্কসীয় পন্থা-পদ্ধতি বলে এই লেখাটি মোটেই সেরকম ছিলো না। এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সুযোগ এবং প্রয়োজন কোনোটাই এখন নেই। তবে একটু আঁচড়ালেই দেখা যাবে তখন গৎবাঁধা লেখার বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তর্কে-কুতর্কে ভরা, চুষে রসটিকে বের করে নেওয়ার পরে যে ছিবড়ে পড়ে থাকে, তার দিকেই মন গেছে বেশি। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে মার্ক্সিস্ট রচনা বলতে যদি কিছু খুঁজতে যাওয়া যায় তাহলে তাকে প্রকৃত অর্থেই 'আন্ডারগ্রাউন্ড' মাটি-চাপাই বলতে হবে।

ঠিক এইরকম সময় ষাটের দশকের প্রথম দিকেই 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার এই লেখাটি যেন হাতে ধরে, চোখ থেকে রং-চশমা সরিয়ে নিয়ে দেখিয়ে দিল দ্বিজাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণ, ধর্মের নামে উপনিবেশ স্থাপন আর জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ এবং তার ভিতর দিয়েই নির্বিশেষ শোষণ কিভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশকে ফোঁপরা বানিয়ে দিচ্ছিল। বোধহয় আজও আমাদের জানা বাকি যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার বাইরে রাষ্ট্রের গোটা জনসাধারণের কাছে দরকারি শিক্ষাটা নিয়ে যাওয়াই খাঁটি শিক্ষা। বদরুদ্দীন উমরের এই প্রবন্ধ ছিলো জাতির জন্য একটি ধ্রুবপদ। বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নামে আর একটি লেখাও ছিলো এইরকম ধ্রুবপদ। নিজের এই অবস্থান থেকে তিনি আর কখনো সরে যাননি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সব জাতীয় আন্দোলনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর মতো করে সারাজীবন করে এসেছেন। তিন খণ্ডে-রচনা করেছেন অমরগ্রন্থ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তৎকালীন রাজনীতি।

এতটা বিস্তারিত লেখার কারণ হচ্ছে সনৎকুমার সাহা এই সময় থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং কোনো সন্দেহ নেই যে 'পূর্বমেঘ' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আমি তখনো তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনা বটে, তবে বদরুদ্দীন উমর স্যার আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন সনতের অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক দুঃসাহস ছিল; 'কারেজ'—মনে পড়ছে, তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'কোয়ায়েট কারেজ' শব্দ দুটি। ধীর নিম্নকণ্ঠে যে কোনো বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না, দ্বিমত করতে তো নয়ই। আমার নিজেরও ধারণা 'অথরিটি' বলে কোনো শব্দ সনতের মনন-অভিধানে নেই। প্রশ্নই তাঁর জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মূল চালকশক্তি। কোনো প্রলোভনে, কোনো কিছুর বিনিময়ে প্রশ্ন করার অধিকার তিনি ছাড়তে রাজি নন। সে প্রশ্ন কখনো তুচ্ছ, অভিজ্ঞতা-শূন্য, ফলশূন্য কচকচি হয়ে গেলেও নয়। এসব পরে

জেনেছি। আমি ১৯৭৩ সালে ১৬ই মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে যোগ দেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আটত্রিশ বছরে। মাঝখানে যে দশ বারো বছর আমি সনতের সঙ্গে একরকম বিচ্ছিন্নই ছিলাম, তখন যোগাযোগ বলতে শুধুমাত্র 'পূর্বমেঘ'-এ প্রকাশিত তাঁর কিছু প্রবন্ধ এবং দু-একটি গল্প। এইখানে জানিয়ে রাখি সনৎ কিছু গল্পও লিখেছিলেন। কেন তা থেকে সরে গেলেন তা অবশ্য জানি না। এতে থাকলে আমাদের কিছুমাত্র লোকসান হতো না। যে সনৎ-কে আমি ছাত্রজীবনে চিনতাম, 'পূর্বমেঘ'-এ তাঁর দু-একটি লেখা পড়ে আমি খানিকটা শিউরে ও চমকে উঠলাম। এই সনতের সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়নি! অর্থনীতির ছাত্র, অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তা জানতাম। যুক্তরাজ্যে গিয়েছেন, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডিগ্রি করে এসেছেন এই রকম কিছু মামুলি খবর আর দু-একটি বিশ্বাস করে আমোদ পাওয়া যায় এমন খবর : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সনৎকুমার সাহা নামে একজন অধ্যাপক আছেন যিনি দার-পরিগ্রহ করেননি, অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গেই তাঁর পরিণয় হয়ে গেছে এই কথা তাঁর পিতা বলে থাকেন; তিনি রাজশাহীর মাঘমাসের হাড়কাঁপানো শীতে সন্ধেরাতে তাঁদের শহরের ছোট্ট বাড়িটা থেকে পদ্মার পাড় ধরে তিন মাইল হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ক্লাবে আসেন আর রাত সাড়ে নটা দশটার দিকে হেঁটেই শহরে ফিরে যান; তিনি কোনো শীত বস্ত্র ব্যবহার করেন না, কনুই পর্যন্ত হাতা গুটনো শার্টের সঙ্গে প্যান্ট পরেন। এইসব কথা গল্প শুনে মানুষ মজা পায়, শুনতে পছন্দও করে। তবে ষাটের দশকের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দশ বছরে দুএকবার রাজশাহী এসেছি, দেখাও হয়েছে সনতের সঙ্গে, তখন দেখেছি বটে আর তারপরে তিয়াত্তর থেকে কয়েক বছরেও দেখেছি সনৎ শীতকালে জ্যাকেট, পুলওভার, সোয়েটার, চাদর কোনো গরম কাপড়ই পরেন না। সেই প্যান্ট আর শার্ট। আজকাল অবশ্য তাঁকে জাম্পার, সোয়েটার ইত্যাদি বেশ পরতে দেখি। এই এতো ভঙ্গুর দেহের মানুষটি যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দৈহিক কষ্ট সইতে পারেন, তাতে সন্দেহ নেই।

'পূর্বমেঘ'-এর কথা আর একবার তুলি। সনতের দু-একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায় কিন্তু তীব্র নাড়া খেলাম তাঁর অন্তত দুটি প্রবন্ধ পড়ে। একটির নাম 'সাহিত্যের দুই পুরুষ: শ্রীকৃষ্ণ ও ডন জুয়ান' এবং অন্যটির নাম 'কোয়েসলারের দর্শন'। ইনিই সনৎ যিনি রাজশাহী কলেজে আমার এক বা দুই ক্লাশ নিচে পড়তেন, শান্ত নির্বিকার প্রায় নীরব এক তরুণ। এত ব্যাপ্তি এঁর পড়াশোনার! এত নির্লিপ্ত বিশ্লেষণ! চিন্তা ও বোধের এত স্তর পেরিয়ে পৌঁছে যায় খুবই মৌলিক একটা জিজ্ঞাসার জায়গায়! এই সময়ের 'পূর্বমেঘ'-এ নানা বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেন সনৎ। তাঁর কর্ষণের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ত সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে আমার দেরি হয়নি। এই সময়ই খুলনা থেকে 'কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অসিতবরণ মজুমদার ও আমার সম্পাদনায় বের হবার কথা। সনতের কাছে লেখা চাওয়া হলো, আশ্চর্য ব্যাপার কয়েকদিনের মধ্যেই

তিনি লেখা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দুটি সংখ্যার পরে অর্থকষ্টেই 'কথা' বন্ধ হয়ে গেল। সনতের লেখাটা বের করা সেখানে হলো কি হলো না সেটা আর এখন মনে নেই।

তারপর থেকে সনতের সঙ্গেই আছি। আজও আছি। তিয়াত্তর থেকে দুহাজার এগারো, চল্লিশ বছরের কাছাকাছি। তবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখানেই একরকম শেষ। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে সম্মাননা গ্রন্থ বের করার যুক্তি খাড়া করা যায় না। বহু কারণেই কারো প্রতি মুগ্ধতা জন্মাতে পারে, সেটা ব্যক্তির জন্যে যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক, অন্যদের তাতে কি এসে যায়?

রবীন্দ্র-বিরোধিতার একটা অত্যন্ত কঠোর কঠিন সময় এল ষাটের দশকের শেষের দিকে। কণ্ঠনালিতে পড়ল সরাসরি বর্বর পেষণ। সেই সময় আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ'। তাতে সনতের লেখা ছিল। তার আগে সনৎ নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভেবেছেন, বলেছেন, লিখেছেন তবে আমার মনে হয়, আজ যে তিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রধান রবীন্দ্রভাবুক (বিশেষজ্ঞ শব্দটা ব্যবহার করছি না, এ রকম শব্দের ধার পড়ে গেছে বলে) হিশেবে মান্য হচ্ছেন, তার সূত্রপাত সম্ভবত তখন থেকেই। প্রচুর লিখছিলেন তিনি সত্তরের দশকের শুরু থেকেই। তাঁর সত্তায় চিন্তায় অস্তিত্বে বাংলাদেশ এতটাই প্রোথিত ছিল যে পঞ্চাশের দশকে, বিশেষ করে ঐ দশকের শেষের দিকে আইয়ুব খানের মার্শাল ল' আমলে আমাদের অনেকের মতোই তিনি পাকিস্তানের অবস্থান থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন বললেও বোধহয় ভুল কিছু বলা হবে না। এটা ছিল সেই রকম অস্তিত্বে-মেশা আসক্তি ও আনুগত্য যা কখনোই আলাদা ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কণামাত্র দুর্বলতায় মলিন বা মিশ্র ব্যাপার হয়ে যায়নি। পৃথিবী জোড়া অন্ধ অচল সভ্যতা, সংস্কৃতি, ক্ষমতাজালের, রাজনীতি ইত্যাদির ওপর প্রখর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বজায় রেখেছেন, নির্মম কঠিন সমকালিক সমালোচক হিশেবে তৈরি করেছেন নিজেকে, হয়ে উঠেছেন মুক্ত মানুষ, একইসঙ্গে তেমনি অর্জন করে নিয়েছেন এক অটুট মানুষতা, মানুষের প্রতি অনুকম্পায়ী মনোনিবেশ।

আমার মনে হয়েছে সনতের মানসিক গড়নটা খানিকটা মিশ্র, যাকে সৃজনশীল বস্তুবাদী মার্ক্সিস্ট বললে বোধহয় আপত্তি উঠবে না, সঙ্গে আছে রেডিক্যাল মানবতন্ত্র, আদর্শ-আশ্রয়ী কল্যাণ-চেতনা। জীবনের কলরব-কল্লোলমুখর বাস্তবের অভিজ্ঞতার কিছু অভাব তাঁর মিটেছে নিস্পৃহ নিঃশব্দ উত্তুঙ্গ বুদ্ধিভিত্তিক বিচার বিবেচনার উপর আস্থা রেখে। তিনি একালের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক, সবচেয়ে বড় সমালোচনা তাঁর পণ্যনির্ভর ভোগবাদী বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার। নতুন, একেবারে একালের সাহিত্য দর্শন সমাজতত্ত্বগুলিকেও তিনি তেমন অনুমোদন করেন না। তাঁর কাছে ওকামের একালের ত্রি-স্তরীয় ক্ষুর আছে।

ষাটের দশকের শুরু থেকেই লেখালেখি তিনি করতেন বটে, তবে সেটা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি আর একেবারেই বন্ধ করে দেন

গল্প লেখা। সব লেখক ভাবুকের উপরেই বাইরে থেকে লেখার একটা চাপ থাকে। তাতে নিজের লেখাটি কোনোমতেই হতে চায় না। সমাজের রাষ্ট্রের মানুষের দায় এসে ঘাড়ে চাপে। এই দায় সহার অসম্ভব শক্তি দেখেছি সনতের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া বাংলাদেশ বোধহয় তাকে অপরিমেয় উৎসাহ জোগাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রেফ শিক্ষকের কাজটাই তখন অনেক বেড়ে গেল। তাতে আশেপাশের মানুষদের যথেষ্ট পার্থিব উপকার দর্শাচ্ছিল। যে-কোনো বিষয় তাঁর সামনে এলে তিনি নতুন চিন্তার উপলক্ষ পেতেন। তাতে অনেকের বড়ো ডিগ্রি হয়ে যেত। এক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান বড় দিগন্ত খুঁজে পেত। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক খান সারোয়ার মুরশিদ। 'প্রকৃত' কথাটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে বটে তবে তার মধ্যে না গিয়েই বলার ইচ্ছে হয় প্রকৃত উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঐ একবারই পেয়েছিল তাঁর মধ্যে, সম্ভবত আগে নয়, পরে তো নয়ই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার পরিধিটাকে বৈশ্বিক করে তোলার কল্পনা ছিল তাঁর মধ্যে। নতুন প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রতিষ্ঠা হল। সনতের কাজের একটা যোগ্য ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল।

এসবের ফলে নিশ্চয়ই নিজের লেখার সময়টা কম পেতেন। তবে সনতের সবেতেই উদ্বৃত্ত। খরচ করে শেষ হয় না। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে বেরোয় গোলাম মুরশিদের সম্পাদনায় 'বিদ্যাসাগর'–বড় একটা যৌথ উদ্যোগে তৎকালের উপযোগী সুস্থধারার এই বইটি বোরোয় আর মুক্তিযুদ্ধের পরপরই বেরোয় আলী আনোয়ারের সম্পাদনায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে একটি বই–একটি সেমিনারের পঠন-বক্তৃতা-প্রবন্ধের সংগ্রহ হিশেবে। দুটিতেই সনতের তিনটি অসামান্য রচনা ছিলো। চিন্তার সূত্রগুলো আর তিনি ছেড়ে দিতেন না, স্রোত-পূর্ণ বন্ধ গুহামুখ যেন খুলে গেল। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি কতো বিষয়ে যে এই সময় তিনি লিখেছেন তার হিশেব করা যায় না, আর হয়ত কোনোদিনই যাবে না। তার কারণ, দেখা গেল, সনৎ লেখা চাইলেই লেখা দেন, সেখানে কোনো কার্পণ্য নেই, লেখা ছাপা হলো কিনা তার খবর নেন না, ছাপা কপি পান না, চান না, পেলেও কাছে রাখেন না কোনো কপি। কাজেই সনৎ একজন গ্রন্থভুক নিভৃতচারী মানুষ–এই প্রচণ্ড হৈচৈ, রংচং মাখা, ফানুস-ওড়ানো, আবেগসর্বস্ব, পাঁচশ মজার বাংলাদেশে তাঁকে বিশেষ কেউ পড়েননি, তাঁর সম্বন্ধে জানেনও না। সনতের এতটা নিস্পৃহতা ঠিক সমর্থনযোগ্য নয় আর আমাদের অসাড়তা তো প্রায় অপরাধের পর্যায়েই পড়ে। সেই অপরাধের স্খালন হতো না যদি না আনিসুজ্জামান মানিক নামে একজন যুবককে (যুবকটি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) এই সময় পাওয়া যেত যিনি সনতের অন্তত একটি প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ করার সংকল্প করেছিলেন। প্রকাশক একজন পাওয়া গেল কিন্তু পাণ্ডুলিপি কোথায়। তরুণটি আকাশপাতাল খুঁজতে শুরু করলেন। গবেষণা কাজের চেয়ে কম কঠিন ছিলো না এই কাজ। কবে কোথায় কোন দৈনিক পত্রিকায় বা সাহিত্য পত্রিকায় বা অনামা অজানা সাপ্তাহিকে কিংবা স্থানীয় কোনো লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

তাঁর ছোটো বড়ো কোনো লেখা, কোন সূত্র ধরে তা বের করতে পারা যাবে! খুবই কঠিন কাজ। সনতের সহযোগিতা বড়ই সীমিত। এসব লেখা আবার দেখতে তাঁর ভীষণ অনাগ্রহ, স্মৃতিও সাহায্য করে না তেমন, মনে করতে পারেন না, একটুও গুরুত্ব দিতে চান না তাঁর কোনো লেখাকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা যুবকটি পত্রিকা অফিসে, লাইব্রেরিতে মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মজুতে হানা দিতে থাকে। পত্রপত্রিকার ডাঁই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।

শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভব হলো। সনৎকুমার সাহার প্রথম প্রবন্ধসংগ্রহ 'সমাজ সংসার কলরব' প্রকাশিত হলো। তারপর একে একে বের হলো 'আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ', 'কথায় কথার পিঠে', 'অর্থনীতি ভাবনা', 'কবিতা অকবিতা রবীন্দ্রনাথ'। আমি জানি সনতের কত যে প্রবন্ধ ও নানা রচনা, বিশেষ করে ইংরেজিতে লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সনৎ নিজে জানেন না আর আজ সম্ভবত কারো পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। ইংরেজি বাংলা সম্পাদিত বইগুলির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তা নিয়ে এখন আক্ষেপ বৃথা। আনন্দ ও সান্ত্বনার কথা এই যে সনৎ এখন লেখার পরিমাণ বাড়িয়েছেন আর ছাপার কপিগুলো সংগ্রহ করে রাখেন। এতদিন পরে তাঁর লেখার বিষয়ের ব্যাপ্তি, বহুগ্রাহী তীক্ষ্ণধী এক মনীষীর চিন্তাভাবনা বোধ ও উপলব্ধি প্রকাশের বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করছে। সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ এসে এখন উপস্থিত হয়েছে। সব উপলক্ষই তো আর শুধু আনুষ্ঠানিকতা ডেকে আনে না, কিছু কিছু উপলক্ষ আমাদের সৃজনচেতনায় গিয়ে নাড়া দেয়। দু-বছর স্থায়ী রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবার্ষিকী আমাদের রবীন্দ্রচেতনাকেই কেবল উসকে দিচ্ছে তা নয়, রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো শুধু উপলক্ষ থেকে যাচ্ছেন না, তাঁকে ঘিরে জেগে উঠছে আমাদের সমকালীনতার ভাবনা; বর্তমান বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ভয়াবহ বাস্তবের মুখোমুখি হবার বাধ্যতা। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে এসব সামনে আসছে, আগুন থেকে আগুন নেবার মত, চিরকালীনতা থেকে সমকালীনতার বাতিটা জ্বালিয়ে নেবার মত। গত দেড় দুই বছরে সনৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, কথাসাহিত্য, নাটক, সমাজভাবনা, দেশকল্পনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তো লিখছেনই, সাথে সাথে লিখছেন অর্থনীতি বিষয়ে, নিম্নবর্গের ইতিহাসতত্ত্ব নিয়ে, ভারততত্ত্ব নিয়ে, উপনিষদ, ইহলৌকিকতা, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বা অশোক দাশগুপ্তের রচনা নিয়ে।

একটা কথা পাঠকদের বার বার মনে করিয়ে দিতে চাই : আমার এই লেখা অবশ্যই সনৎ-পাঠের বদলি নয়, ভূমিকাও নয়। এই লেখার মধ্য দিয়ে সনৎ-কে ঠিকমত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া তো নয়ই। আমার ঝাল আর কাউকে খেতে বলা আর আমার স্বাদটার অবিকল বিকল্প পাইয়ে দেওয়াও নয়। বরং ঠিক উল্টো। আমার বলার কথা শুধু এই: যাদের সুপরামর্শ ছাড়া আজকের পৃথিবী চলে না, বাংলাদেশ তো বটেই, তিনি তাঁদের দলের কেউ নন, কিন্তু সনতের নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, ব্যাধি-নিরূপণ, নতুন সুস্থতামুখী সাধিতব্য রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য তাঁর চিন্তা অনেকটাই কাজে আসতে পারে। শিল্পে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে তাঁর

বোধের মাত্রা হিশেব কষে ভিতরে নিতে পারলে সমগ্র জনসমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এদের যোগাযোগ কতটা অনিবার্য এবং এরা কেমন করে চিন্তায় ভাবনায় বৈভব সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে আমাদের নজর যাবেই। অন্তত আমার তা গেছে বলতে পারি। মানুষের ধনসম্পদের হিশেবটা আমরা চিরকালই ভুলভাবে করি, একদেশদর্শী হয়ে করি, ক্ষমতার সঙ্গে তা মিশিয়ে ফেলি বা এক করে দেখি, কিন্তু সে হিশেব যে ভিন্নভাবে করা যায় এবং নিজেদের স্বার্থেই তা করা দরকার, তা সনৎ-দের মতো মানুষরাই আমাদের বোঝাতে পারেন।

সনতের চিন্তাপদ্ধতি পরিচিত ও পুরোনো বটে তবে তিনি তা ব্যবহার করেন নিজের মতন নতুন করে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই বটে। এ পদ্ধতি কি শুধু সনতের কাছেই পুরোনো? তিনি কি একাই এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশে তো এটা বাজার-চলতি হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতেই এর চল্ আমাদের অনেক সময় বিরক্তই করছে। হতে পারে এটাই মানুষের চিন্তার মৌলিক ধাঁচ। সক্রেটিস ব্যবহার করেছিলেন কোনোরকম আড়ম্বর ছাড়াই। তিনি যে চিন্তা নিয়ে মহাচিন্তায় আছেন তা মনে হতো না। পদ্ধতি হিশেবে একে একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন হেগেল; ডিমের একদিক ভেঙে সেটাকে খাড়া দাঁড় করানোর কাজ করেছিলেন কার্ল মার্ক্স। সেইজন্যে দ্বান্দ্বিক ভাববাদ এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দুটো কথাই বেশ চলেছিল। এখন অনেকটা মার খেয়ে গেছে ভাববাদী ধারাটা, প্রবল হয়ে উঠেছে বস্তুবাদী ধারা। কিন্তু এ সবই গৎবাঁধা কথা! যিনি এটা সত্যি করে হাতে তুলে নেন, তিনি-ই একে নতুন চেহারা না দিয়ে পারেন না। এটাও বোধ হয় চিন্তার ধাঁচ।

সনতের ভাবনা দেখি সূক্ষ্ম তারের উপর দিয়ে হাঁটে। একটা ভাবনা নিয়ে বসেন তিনি, সেটাকে স্তরে স্তরে পরতে পরতে কেটে যাবার জন্য। যুক্তির পর যুক্তি দিতে থাকেন। যুক্তি দেওয়া শেষ হলে যখন দেখেন সেটা যথেষ্ট মজবুত হয়ে এসেছে, তখন সেটাকে আবার কাটতে থাকেন তৃতীয় অবস্থানে পৌঁছুনোর জন্য। তারপর আবার তাকে নাকচ করতে থাকেন যতক্ষণ না সেটা পুরোপুরি নাকচ হয়। সাধারণভাবে এই পদ্ধতি নিতেই তাঁকে দেখি। তাতে আশা কি এই যে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুনো যাবে যাকে আর নাকচ করা সম্ভব হবে না। হায়, শেষ পর্যন্ত যাত্রা যে অসমাপ্তই থাকে। পৃথিবী দেশ সমাজ রাষ্ট্র মানুষ সংক্রান্ত প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়, কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে থাকে অসংখ্য প্রশ্নের বিষাক্ত সাপের ছানা আর প্রশ্নের প্রতিস্তরে লেগে থাকে খানিকটা করে এগিয়ে যাবার চিহ্ন। সনৎ এমনি করেই চিন্তার শেষে পৌঁছান, উপলব্ধি এবং বোধের অন্তস্তলে চলে যান। চট করে মনে পড়ছে এমন একটা উদাহরণ দিই : রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতা নিয়ে তর্কে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব ছিলেন, শঙ্খ ঘোষ ছিলেন, সনৎ-ও জড়িয়েছেন এতে। কিন্তু তর্কটা কি শেষ হয়ে গিয়েছে? সনৎ তাঁর আলোচনায় চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বোধ ও উপলব্ধিকে দিয়েছেন আরো বেশি, কিন্তু কল্পনার জন্যে তাঁর কাছে জায়গা আছে কম। বুদ্ধি আর বিচারের জন্যে তাঁর রয়েছে আদিগন্ত কর্ষণক্ষেত্র। জীবনের

কোলাহল, সেটা যাপনের কসরত ও প্রসাধনের জন্যে জায়গা রয়েছে কম। প্রকৃতির তাড়নার স্থূলতাকে তিনি স্বচ্ছন্দভাবে নাড়াচাড়া করতে দ্বিধা করেন। তিনি কথাসাহিত্যে থাকেননি বলে আপসোস হয়।

এই বই সনৎকুমার সাহার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন মাত্র! এর প্রসঙ্গ তিনি নন। তাঁর আগ্রহের অসংখ্য ক্ষেত্রগুলিকে সামনে রেখেই এই বইয়ের লেখাগুলি সংগ্রহ করা গেছে। কিছু পুরোনো লেখা আছে, অনেকেই নতুন রচনা লিখে দিয়েছেন। অনেক বিষয়ের জন্য লেখক মেলেনি। আমার নিজের কাছে এই বই অসমাপ্ত তবে গুরুত্বহীন নয়। অনেক অসাধারণ রচনার সন্ধান পাবেন পাঠক এই গ্রন্থে। আমরা লেখকদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অনেক সময় শ্রম মেধা তাঁরা ব্যয় করেছেন আমাদের অনুরোধে। বলাই বাহুল্য, সেটা তাঁরা না করলে এই বই প্রকাশিতই হতো না।

এ বইটি প্রকাশ করার প্রস্তাব প্রথম নিয়ে আসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিক্ষক ফোরামের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসের ও অধ্যাপক এস এম আবুবকর। এঁরা দুজন এসেছিলেন বটে, তবে এঁদের সঙ্গে কাজ করছিলেন অধ্যাপক মলয়কুমার ভৌমিক ও আরো কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষক। মলয়ের ব্যস্ততার জন্য এই প্রকাশনার সঙ্গে তিনি সরাসরি ততোটা যুক্ত হতে পারেননি। তবে অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসের ও অধ্যাপক আবুবকর প্রথম দিকের রচনা সংগ্রহ ও অন্যান্য জরুরি কাজগুলি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। রচনাগুলি নানা জনের কাছ থেকে নানা জনের সহায়তায় আমাদের হাতে এসেছে। প্রায় সব কাজে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সজ্জন সুশীল সাহা অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকজন লেখকের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন।

আমি নামেই সম্পাদক। কাজ যা করবার সবই করেছেন সহযোগী সম্পাদক স্বরোচিষ সরকার। আর আমার অশেষ স্নেহভাজনীয়া দেবী সরকার কম্পোজের কাজ করে দিয়েছেন।

আনিসুজ্জামান মানিক সনৎকুমার সাহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লিখে দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

সবশেষে অত্যন্ত যত্ন ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই বৃহৎ গ্রন্থটি বের করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন সময় প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী জনাব ফরিদ আহমদ।

হাসান আজিজুল হক

উজান ২৬ আগস্ট ২০১১
শুক্রবার দুপুর আড়াইটা

সূচিপত্র

অনুপম সেন

আদি-অন্ত বাঙালি

এক

বাঙালি কে? এই প্রশ্নটি যদি আজ করা হয় তাহলে অনেকেই হয়তো হেসে উঠবেন। কিন্তু প্রশ্নটি নিতান্তই অবান্তর? আমজনতা বলবেন : যিনি বাংলায় কথা বলেন, যাঁর মাতৃভাষা বাংলা—তিনিই তো বাঙালি। তখনই হয়তো প্রশ্ন উঠবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অনেকেই আজ এ-ভাষার দক্ষতা অর্জনে কি গৌরব বোধ করছেন, স্বস্তিবোধ করছেন? আজ থেকে কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের/প্রয়োগের নির্দেশ জারি করে এর অন্যথায় শাস্তির বিধান রাখা হলেও আজ বোধ হয় রাষ্ট্রই সে-ব্যাপারে সবচেয়ে দ্বিধান্বিত। বিশেষত সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষায়-সংস্কৃতিতে অনগ্রসর একটি নব্য ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি-পটু করার এক উদগ্র বাসনা গত দশকে ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাঁরা ভাবছেন, বাংলা ব্রাত্যজনের ভাষা। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানেও বর্তমানে বাংলা প্রায় পরিত্যাজ্য। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ), প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি কিছু কিছু কলেজের কথাও বলা চলে (ইংরেজি-মাধ্যম ব্যয়বহুল স্কুলগুলোর কথা বাদই দিলাম) যেখানে বাংলার প্রবেশাধিকারই নেই। অতিসম্প্রতি শ্রেণীকক্ষে বাংলা বলায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন প্রভাষকের চাকরি যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের উচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ভাষা ইংরেজি; ফলে সাধারণ বিচারপ্রার্থীরা যখন রায় হাতে পান, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন না সেখানে কি লেখা রয়েছে। অনেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিদগ্ধ আইনজীবী মত প্রকাশ করেছেন, উচ্চ আদালতের ভাষা অবিলম্বে বাংলা করা প্রয়োজন, জনগণের স্বার্থে। তাঁরা এও অভিযোগ করেছেন, ইংরেজিতে লেখা বিচারিক রায়ের ভাষা অনেক সময় ভুলে কণ্টকাকীর্ণ থাকে, অধুনা বিচারকদের ইংরেজি-জ্ঞানের অভাবের কারণে। এই অবস্থা যে কেবল বাংলাদেশে বিরাজ করছে তা নয়। বাংলা-ভাষী পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা ব্রাত্যজনের ভাষায় পরিণত হচ্ছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেখানে হিন্দির উৎপাত বেড়েছিল, কিন্তু হিন্দির আক্রমণ বাংলার অগ্রগতি ও বিকাশকে রুদ্ধ বা ব্যাহত করতে পারেনি। মনস্বী ব্যক্তিরা সে সময়ে তাঁদের মনীষার, মননের স্বাক্ষর বাংলায় রাখতে দ্বিধা করেননি। রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য, উপন্যাস ও ছোটগল্প।

কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি কেবল শিক্ষাদীক্ষারই মাধ্যম নয়, উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের জীবনচর্চার বাহনও হয়ে উঠেছে। এর একটা বড় কারণ বিশ্বায়নের ফলে ইংরেজির সর্বভারতীয় ভাষা হয়ে-ওঠা।

বিশ্ব জুড়ে বৃহৎ মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আজ তাদের নানাবিধ পণ্যের বিপণন ও প্রচার-প্রসারের সঙ্গে তার বাহন হিসেবে ইংরেজিকেও ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর প্রভাব ভারতের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রকট হচ্ছে, কারণ বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশটিকে তাদের পণ্যপ্রবাহ ও বিপণনের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে। একইসঙ্গে তাদের সহকারী হিসেবে কিছু ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি বা সংস্থাও গড়ে উঠেছে, এরাও নিজেদের পুঁজি ও পণ্যের বাহন করেছে স্বাভাবিকভাবে ইংরেজিকেই। এরই ক্রমপ্রসারমাণ ফল ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মেরও এক পরম কাঙ্ক্ষিত বা আরাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে ইংরেজি-জানা এবং ইংরেজি-বলা, যা জীবন-ক্ষেত্রে এগোনোর পাথেয় হিসেবেও দেখা দিয়েছে। এই প্রজন্মের কাছে বাংলা মুখের ভাষা হলেও, মাতৃভাষা হলেও, তাকে তারা জীবনের সঙ্গী করতে পারছে না, সেভাবে ভাবছেও না। মৌখিক ইংরেজি চর্চার ফলে একটা কৃত্রিম বা পরজীবী আবহ ধীরে ধীরে তাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। বাংলা ভাষা জীবন চর্চার ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হওয়ায় এ-ভাষায় যে বিরাট ও মহৎ সৃষ্টিসমূহ রয়েছে তার সঙ্গে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অধুনা আমার বেশ কয়েকজন আত্মীয়ের ছেলেমেয়ে যারা স্কুল-কলেজ-জীবনে কৃতি ছাত্রছাত্রীর গৌরব অর্জন করেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর অথবা অন্য কোনো মহৎ বাঙালি লেখকের লেখা তারা পড়েনি; এমনকি, পড়ার কোনো আগ্রহও তাদের নেই। মৌল ইংরেজি নয়, মৌখিক ইংরেজিরই চর্চা করে এরা। তাই কথ্য ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেও ইংরেজি বা বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মহৎ লেখকদের রচনার সঙ্গে তাদের পরিচিতি নেই বললেই চলে। ফল হচ্ছে এই, জীবনের গভীর উপলব্ধির ক্ষেত্রটা তাদের কাছে প্রান্তবর্তী থেকে যাচ্ছে। এখানে এর ভিত্তিটা আরও কিছুটা স্থূল, তা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে পরভৃত ইংরেজি-সংস্কৃতির বাহক হলো নব্য ধনজীবীরা; তাঁরা তাঁদের ধন অর্জন করেছেন অনেকটা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে। এঁদের ধনের বড় একটা অংশ হলো আত্মসাৎকৃত ব্যাংক-ঋণ, অসৎ ব্যবসাও এঁদের ধনের উৎস, (যেমন আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ওভার ইনভয়েসিং, শ্রমিক-শোষণ ইত্যাদি)। এঁরা প্রকৃত অর্থে শিল্পউদ্যোক্তা বা বাণিজ্য-উদ্যোক্তা (entrepreneur) নন। সুমপেটার যাঁকে entrepreneur বলেছেন, এঁরা কখনও তা নন। নিজেদের পুঁজি নিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে এগোননি এঁরা। রাষ্ট্র যে ব্যাংক-ঋণ দিয়েছে পুঁজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য, তারই বিরাট অংশ আত্মসাৎ করে তাঁরা বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও যোগসাজসের মাধ্যমেই তাঁদের এ-বিত্ত অর্জন। এঁদের অনেকেরই শিক্ষা ও

সংস্কৃতির মান ন্যূনতম পর্যায়ের। বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে-বহুবিস্তৃত-শেকড় রয়েছে, তার সঙ্গে এঁদের কোনো আত্মিক যোগ নেই বললেই চলে।

বাংলা ও বাংলা সংস্কৃতির উৎসে যদি আমরা যাই তাহলে দেখব, বাংলা ভাষা প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন। কিন্তু জাতিসত্তা হিসেবে বাঙালির বয়স কয়েক হাজার বছর। এখানে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আগমনের ফলে, নানা বর্ণ ও জাতির মিশ্রণে বাঙালি একটা মিশ্র জাতিসত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ককেশীয়, ভোটচীন, অস্ট্রিক, নিগ্রোইড ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণেই বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে এই ভূখণ্ডে। উভয় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানববসতির প্রমাণ ও উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এসবের বিশদ আলেচনায় না গিয়েও বলা চলে, যখন ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচিত হলো সে সময়েও বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর নামানুসারে বাংলায় বেশকিছু জনপদের পরিচয় আমরা প্রাচীন আর্যগ্রন্থসমূহ, যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য আদিগ্রন্থ যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাচ্ছি। পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, হরিকেল ইত্যাদি নাম যেমন জনপদের তেমনি বিভিন্ন কৌম বা উপজাতির। আজ এসব কৌমের আলাদা পরিচয় আর নেই। এরা সবাই এক হয়ে মিশে গিয়ে বাঙালি নাম নিয়েছে, বাঙালি হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। বাংলা এদের সবার মুখের ভাষা। বাংলা ভাষার আদিরূপ কি ছিল তার পরিচয় আমরা আজ ভাষাবিদদের গবেষণা থেকে জানি। বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে প্রাকৃত, মাগধী-প্রাকৃত ও মাগধী-অপভ্রংশ থেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা ভাষা প্রায় হাজার বছরের। বৌদ্ধ চর্যা ও দোহা তার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রকৃতই প্রাকৃতজনের ভাষা এই ভাষা। নিষাদ, শবর, ডোম, চণ্ডালের জীবনগাঁথাই বারবার ফুটে উঠেছে বাংলা ভাষার এই আদি-রূপে।

প্রাচীন বাংলায়, এমনকি পাল ও সেন আমলে রাজসভার ভাষা বাংলা ছিল না, তা ছিল মুখ্যত সংস্কৃত, পালি এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত। ব্যাখ্যার জন্য বলা যায়, সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা চলে আজকের প্রমিত বাংলার আর সংস্কৃত-প্রাকৃত হতে পারে নোয়াখালী, কুমিল্লা বা ঢাকার কথ্য ভাষা, অভিজাত পুরুষরা সংস্কৃত বললেও অভিজাত মেয়েরা বলতেন প্রাকৃত। সংস্কৃত কেবল যে বাংলার অভিজাতবর্গের বা রাজসভার ভাষা ছিল তা নয়, এটি ছিল অভিজাত শ্রেণীর সর্বভারতীয় ভাষা। যেমন পরবর্তী কালে ফারসিই ছিল সর্বভারতীয় অভিজাত ভাষা। কারণ ফারসি ছিল রাজসভার ভাষা, রাজকার্য পরিচালনার ভাষা। একাদশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের বিদ্বজ্জনের ভাষা ছিল। এখানে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপ জুড়ে বিদ্বজ্জনের ভাষা ছিল লাতিন। ইংল্যান্ডের একজন পণ্ডিত সে সময়ে অনায়াসেই স্পেনের কোনো বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে লাতিনে কথাবার্তা বলতে, ভাব-বিনিময় করতে পারতেন। লাতিন ছিল সর্ব-ইউরোপীয়, জ্ঞানচর্চার বাহন। ইউরোপে বিভিন্ন লৌকিক ভাষার বিকাশ শুরু হয় ভারতীয় উপমহাদেশে লৌকিক ভাষাগুলোর বিকাশের প্রায় সমকালেই, পঞ্চম থেকে দশম শতকে। চতুর্দশ শতকের দান্তে তাঁর ডিভাইন কমেডি রচনা করেন লৌকিক ইতালির ভাষায়। একই লৌকিক ভাষায় চতুর্দশ শতকে সনেট

রচনা করেন পেত্রার্ক। রেনেসাঁসের সময়ে বা ত্রয়োদশ শতক থেকে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশে লৌকিক ভাষা হিসেবে ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজির পরিপূর্ণতা ঘটতে থাকে। এভাবেই ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা এবং পরবর্তীকালে তারই ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্য দিয়ে সেসব দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

বাঙালির যে আদিতম ভাষা বৌদ্ধ চর্যা ও দোহা, তাকে নিজেদের ভাষার আদিতম উৎস হিসেবে দাবি করেছেন অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষাভাষীরাও। এমনকি হিন্দিও চর্যাপদ ও দোহাকে তার পূর্বসূরি হিসেবে দাবি করেছে। এটা হয়তো অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ এদের মধ্যে বেশ কিছু মিলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সুনীতি চ্যাটার্জি প্রমুখ পণ্ডিত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, চর্যাপদগুলো বাঙালিরই সৃষ্টি এবং তা বাংলারই আদিম নিদর্শন। বাংলা ভাষার যে নিজস্ব একটা রূপ ছিল এবং তা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল, তা এমনকি বাংলার রাজসভার রাজকবিদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যে ও লেখায়ও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষায় ছন্দের শক্তি ব্যঞ্জনবর্ণের মিল বা অনুপ্রাসে নিহিত নয়। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ আমরা পদবিন্যাসে যে-ছন্দ পাই, তার একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে :

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
> শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
> যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥

কিন্তু জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' ছন্দের প্রাণই হলো ব্যঞ্জনবর্ণের মিল বা অন্ত-অনুপ্রাস। যেমন,

> চল সখী কুঞ্জম্
> সতিমির পুঞ্জম্।

অথবা,

> বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম
> লুটতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম।

বিভক্তি চিহ্নগুলো বাদ দিলে এই পদগুলোকে অনায়াসে বাংলায় রূপান্তর করা যায়। বস্তুত জয়দেব বাংলার আপন ঘরের ছন্দই নিয়ে গিয়েছিলেন সংস্কৃত ছন্দে, সংস্কৃতের ছন্দ আনেননি 'গীতগোবিন্দে'।[১] আরও যেটা লক্ষণীয়, গীতগোবিন্দ আসলে গান, প্রতিটি পদই রাগরাগিণীতে স্থাপিত। চর্যাপদও গান এবং তাও রাগরাগিণী-আশ্রিত। বাঙালি গানের মধ্যেই তার ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা খুঁজে পেয়েছিল এবং অনুপ্রাসেই তা প্রাণিত-স্পন্দিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের পদগুলোর

---

[১] শশাঙ্কমোহন সেন, "বাংলা ছন্দ," *প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩২১। সুনীতিকুমার সেনের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

মতো প্রায় সব চর্যাপদেই রয়েছে অন্ত্যানুপ্রাস, যেমন—"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল/চঞ্চল চিএ পৈঠ কাল" ইত্যাদি।

বাঙালির ছড়ার ছন্দও বাঙালির মুখের ভাষা। খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদির মধ্যেও আমরা বাঙালির মুখের ভাষার পরিচয় পাই, যদিও এদের বর্তমান রূপটি হল মার্জিত, পরবর্তী কালে পরিমার্জনার সৃষ্টি। বাংলা ভাষার আদি প্রাণস্পন্দন প্রাকৃতজনের মধ্যেই, বাংলার গ্রামের নিভৃত কন্দরেই মূর্ত হয়েছিল।

দুই

৮ম শতকে পাল রাজাদের রাজত্ব শুরুর প্রায় ৩০০-৪০০ বছর আগে থেকেই বর্তমানে যাকে আমরা বঙ্গভূমি বলি (অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, হরিকেল, বঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদি), সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৌম সমাজ ভেঙে গ্রামের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। বিভিন্ন কৌম বা উপজাতি-গোষ্ঠী বনজঙ্গল কেটে স্থায়ীভাবে গ্রামের গোড়াপত্তন ঘটাচ্ছিল। এইসব গ্রাম এবং গ্রামীণ-কৃষিজীবী ও প্রাচীন-কারিগরের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করেই বিশাল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পাল রাজবংশের প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাসে গ্রাম প্রতিষ্ঠা চলেছিল। কেবল বাংলার নয় উত্তর ভারত জুড়ে এভাবে গ্রাম প্রতিষ্ঠার এক অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ আমরা দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বীর ইতিহাস চর্চার মধ্যে পাই। মৌর্য-পূর্ব-যুগে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলায় চলেছে; এমনকি ব্রিটিশ আমলেও প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে গ্রামের প্রতিষ্ঠা চলেছে। পাল শাসনের আগে বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠী বাংলার বিভিন্ন জায়গায় তাদের বসতি স্থাপন করেছিল (আর এদের নামেই এসব জনপদের নামকরণ হয়, এটা আগেই উল্লেখ করেছি যেমন, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় ইত্যাদি)। কালের প্রবাহে অবশ্য তাদের কৌম নাম বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে। এই সব জনপদে সমৃদ্ধ নগরও গড়ে উঠেছিল—মহাস্থানগড়, কর্ণসুবর্ণ, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি, ইতিহাস যার নিদর্শন ও স্মৃতি বহন করছে। এই বক্তব্যও হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পাল-পূর্ব যুগে যেভাবে বিভিন্ন নগর-বিকাশের উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তীকালে তা প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। এর একটি বড় কারণ হলো, পাল-পূর্ব যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে প্রাচীন রোম, গ্রিস, পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বাইজানটিয়াম, মিশর ইত্যাদির যে-বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তার ফলে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে নগর-বিকাশের যে-সূচনা হয়েছিল পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পতনে বাঙালির সেই সমুদ্র-বাণিজ্যের বিকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে, পাল যুগে বাংলাদেশ একটি সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর, প্রায়-বাণিজ্যহীন জনপদে পরিণত হয়। এই জনপদের বৈশিষ্ট্য ছিল নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন (বাংলার বাণিজ্যের বিকাশ অনেক পরে, ষোড়শ শতক থেকে আবার জোরালোভাবে শুরু হয়)।

বাংলার এই গ্রামীণ জনপদের বা গ্রামের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করা যায় : গ্রামের মুখ্য অধিবাসী ছিল কৃষিজীবী ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণী, পাশাপাশি তাদের

সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশার কিছু লোক যেমন, শিক্ষক, পুরোহিত, পণ্ডিত, ঢালী, ঢুলী ইত্যাদি। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল নিজস্ব কারিগরশ্রেণী অর্থাৎ কামার-কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, নাপিত, ধোপা প্রমুখ। কৃষক-গৃহস্থ ও অন্যান্য গৃহস্থের সারা বৎসরের কারুকর্মের চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দা, খন্তা, লাঙল, লাঙলের ফলা, হাঁড়ি-কুড়ি, ঝুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন এরাই মেটাত। প্রতিদানে এরা গ্রাম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এবং কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ পেত। গ্রামগুলোকে নিজের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে সচরাচর বাইরের মুখাপেক্ষী হতে হতো না। লোহা, তামা, সোনা, রুপো ইত্যাদি ধাতু ও লবণই কেবল গ্রামের বাইরে থেকে আসত। স্বনির্ভর এসব গ্রাম প্রায় হাজার বছর ধরে এইভাবে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এইসব গ্রামের নিস্তরঙ্গ প্রবাহ গ্রামীণ কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরকে শান্তিময় জীবন দিয়েছিল, যদিও এই-জীবনে নগর-জীবনের বহুমুখী ব্যঞ্জনা ও উল্লাস ছিল না। গ্রামীণ উৎসব ও বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ছিল নিতান্ত একঘেঁয়ে ও বর্ণহীন। এর মধ্যে নগরের বৈচিত্র্য, বৈভব ও বৈদগ্ধ্যের ছিল একান্ত অভাব। পরবর্তী কালে মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রশক্তিতে যে-পরিবর্তন আসে তার ফলে বাংলার সমাজজীবনের উপরিস্তরে নানাবিধ পরিবর্তন ও রূপান্তর সূচিত হলেও গ্রামীণ লৌকিক স্তরে তার ছোঁয়া লাগেনি। একই ধরনের গ্রাম ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। চার্লস মেটকাফ এই গ্রামগুলোকেই 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র' বা 'Village Republic' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এরই বর্ণনা আমরা পাই মার্ক্সের 'ভারতীয় গ্রামের' বিবরণীতে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' আমরা পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান গ্রামের যে-বর্ণনা পাই আচারগত এবং বর্ণভেদের কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থনীতির মূল-কাঠামো ছিল এই দু-গ্রামে প্রায় একই। এ-থেকে অবশ্য একথা ভাবলে ভুল হবে যে, গত তেরশ/চৌদ্দশ বছরের বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন ছিল পরিবর্তনহীন। এখানে নানা পরিবর্তন ঘটেছে জীবনের বহিরঙ্গনে—পরিধেয় বস্ত্রে, আচার-ব্যবহারে, ভব্যতা ও সম্ভাষণের ক্ষেত্রে, কাব্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জগতে, স্থাপত্য-রীতিতে, এমনকি রন্ধন প্রণালী ও খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে, পিঠা পুলির বৈচিত্র্যে। কিন্তু জীবনের মৌল-অর্থনীতি বা গ্রামীণ-কাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিতে তেমন কোনো বৃহৎ আলোড়ন হয়নি, যে-ধরনের আলোড়ন আমরা পশ্চিম ইউরোপের বিগত এক হাজার বছরের ইতিহাসে দেখতে পাই। এখানে বৃহৎ কোনো সামন্ত-কৃষক বা সামন্ত-ভূমিদাস সংঘাত গ্রামীণ জীবনকে সহিংস, বিক্ষুব্ধ বা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত-আলোড়িত করেনি। এখানে ভূমির উপর কৃষকের মৌলিক অধিকারে সামন্তপ্রভু কখনো তার থাবা বিস্তার করেনি। রাষ্ট্রের বা রাজশক্তির কাছ থেকে যাঁদের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তাঁদের অধিকার খাজনা-আদায়ে বা কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আহরণেই সীমাবদ্ধ ছিল, কৃষককে কখনো তা জমিচ্যুত করেনি। কৃষক সম্প্রদায় বংশানুক্রমে তাদের জমি নিজ-দখলে-রেখে আবাদ করে উৎপাদনের কিছু অংশ রাষ্ট্র বা রাজশক্তিকে খাজনা হিসেবে দিয়ে গেছে।

এই চিত্র উপমহাদেশব্যাপী অনেকটা এক রকমের হলেও লৌকিক বৈচিত্র্য অবশ্যই তার মধ্যে ছিল। পূর্ব ভারতের, যেমন বাংলাদেশ এবং আসামের গ্রামগুলো ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই উত্তর ভারতের গ্রামগুলো থেকে ভিন্ন ছিল। উত্তর ভারতের গ্রামগুলোতে আমরা দেখি কৃষকদের থাকার জায়গাগুলো গুচ্ছবদ্ধ (cluster of homes), অনেকগুলো ঘরের অবস্থিতি একসঙ্গে। অনেক সময়ে ঘরগুলো তৈরি করা হতো এবং এখনো হয় কয়েকটি কুয়ো বা একটি বড় বদ্ধ জলাশয়ের চারপাশে। বসতবাড়িগুলোকেই ঘিরে থাকে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি। একগ্রামের সঙ্গে অন্যগ্রামের ভিন্নতা বা পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। কিন্তু বাংলার গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে বসতবাড়িগুলোর অবস্থান গড়ে উঠেছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রায় সব গৃহস্থের ছিল এবং এখনো অনেকের রয়েছে নিজস্ব পুকুর বা জলাশয়। গ্রামের পাশ দিয়ে, ভেতর দিয়ে বহমান ছিল বহু নদী-নালা-খাল-বিল, যা সংবৎসর কৃষকের, গৃহস্থের আমিষের জোগান দিত। এজন্যই প্রবাদ হয়েছিল 'মাছে-ভাতে-বাঙালি'। (গ্রামের মধ্যে বর্ণ ও পেশাভিত্তিক পাড়া ছিল, কিন্তু তার চরিত্র উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের গ্রামের মতো ছিলো না বা এখনও নয়)।

এটা বললে হয়তো অসঙ্গত হবে না, বাংলার গ্রামই বাঙালির সত্তা, বাঙালির মানস বা বাঙালির পরিচয়কে গড়ে তুলেছে হাজার বছর ধরে। প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি মুখ্যত বাংলার গ্রামেরই সৃষ্টি, গণমানুষের নন্দনতাত্ত্বিক চর্চার ফসল। বাঙালির আদিতম সাহিত্য—চর্যা ও দোহা—যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা রাজসভা থেকে বহুদূরে নিভৃত গ্রামের লোকজ জীবনাচারের কথাই বলেছেন। তাই তাঁদের লেখায় হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, ব্যাধ, শবর-শবরীর কথা, অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষের কথা বাস্তব হয়ে উঠে এসেছে। তাঁরাই বলেছেন, 'ভুসুকু বাঙালি ভৈলি'। প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে লিখেছেন মনের কথা, সংস্কৃতে নয়। উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে, সংস্কৃত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ মূর্ত হয়েছে এ-সব লেখায়। বাংলার ইতিহাসে আমরা দেখি, এইসব মানুষ কখনো কখনো সংঘবদ্ধ হয়ে রাজসিংহাসনও দখল করেছে। পাল-আমলের প্রায় শেষভাগে দিব্যোক ও ভীমের 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

তিন

চতুর্দশ শতকের শেষে বা পঞ্চদশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষা তার প্রায়-বর্তমান রূপ পেয়েছিল। এ সময়ে একদিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হয়েছিল মুখ্যত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে। এই কৃষ্ণ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা বা ভাগবত-এর কৃষ্ণ নন যথার্থ অর্থে। এই কৃষ্ণ একটু স্থূলভাবে বললে বলা যায় একজন প্রেমিক বাঙালি, যার প্রথম অভিনব প্রকাশ আমরা দেখি বাংলা-সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দে'। বড়ু চণ্ডীদাসের আদি-বাংলায় লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে দুজন নর-নারীর দৈহিক প্রেমের কথাই কিছুটা গ্রাম্য স্থূলতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে যদিও মাঝে মাঝে কবিত্বশক্তির কিছু কিছু স্ফূরণ চকিত বিদ্যুতের মতো তাতে মূর্ত। বৈষ্ণব পদাবলীতেই প্রেম এক 'অসাধারণ

[illegible] [illegible] করেছিল, বিশেষভাবে বিদ্যাপতি (ব্রজবুলি), দ্বিজ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের গীতিকবিতায়। রেনেসাঁস কবিদের মতোই দেহাতীত প্রেমের অনন্য কাব্যরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এঁরা। চণ্ডীদাসের 'সখী, বলিতে বিদরে হিয়া/আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া' অথবা 'আমারো পরাণ যেমতি করিছে/তেমতি হউক সে', অথবা 'রামীর প্রেম নিকষিত হেম/কামগন্ধ নাহি তায়' বা বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু/তবু হিয়ে জুড়নো ন গেল' প্রভৃতি চিরায়ত অমর প্রেমের কবিতা। চণ্ডীদাসই অসাধারণ ভাষায় লিখেছিলেন, 'শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে, কি করে এইসব কবিরা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মর্মবাণী : মানুষই সবার উপরে, মানুষই সবকিছুর নিয়ন্তা, পরিমাপক—এই উপলব্ধিতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে বসেই উপনীত হয়েছিলেন। অনস্বীকার্য, এই সময়ে বাংলার এক অপূর্ণ রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল। বৈষ্ণব কবিরা, শ্রীচৈতন্য ও সুফি কবিরা প্রায় সমবেতভাবে এই মানবতাবাদের, বা 'প্রেমই সবকিছুর উপরে', এই বাণী প্রচার করেছিলেন বাংলা-জুড়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, সময়টা ছিল স্বাধীন সুলতানদের আমল। আলাউদ্দিন হোসন শাহ, নসরত শাহ, ছুটি খাঁ, পরগল খাঁ প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা সাহিত্যের বিকাশকে যে অনিরুদ্ধ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওল, দৌলত উজির বহরম খাঁ, সৈয়দ সুলতান, কোরেশী মাগন ঠাকুর প্রমুখ মুসলমান কবির লেখা আখ্যানকাব্য (যেগুলো ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক) এবং মঙ্গলকাব্য এই সময়েই বাংলা সাহিত্যকে নবরূপ দিয়েছিল। মঙ্গলকাব্য অনেকেই লিখেছেন, এঁদের মধ্যে নারায়ণ দত্ত এবং বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মনসামঙ্গল একান্তই গ্রামবাংলার সর্পভীত মানুষের কাব্য, কিন্তু তবুও এতে আমরা চাঁদ সদাগরের মতো এমন একজন অসাধারণ চরিত্রের দেখা পাই, যিনি শত প্রতিকূলতা ও বিপদের মধ্যেও কুটিল কুচক্রী মনসা দেবীর কাছে মাথা নত করেন না। এই অনম্য মেরুদণ্ডী চরিত্র আমাদের প্রমিথিউস বা পরবর্তী কালে মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণকে মনে করিয়ে দেয়। এ-ধরনের দু-একটি চরিত্র (যেমন কালকেতু) মঙ্গলকাব্যে থাকলেও এর পরিমণ্ডল মুখ্যত গ্রামের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। এই কাব্যগুলোতে কোনো বৃহৎ বা মহৎ কথা নেই, অজেয় মানুষের কথা নেই, সমাজের শৃঙ্খল জীর্ণ করার বা ভাঙার কথা নেই যা ইউরোপীয় রেনেসাঁস-সাহিত্যের মুখ্য বাণী। বাঙালি সংস্কৃতি ও কাব্যচেতনা পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে নানাভাবে বিকশিত হলেও তা যে বাঙালিকে তার পল্লীর ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের করে আনতে পারেনি ইউরোপীয় রেনেসাঁস যেভাবে পেরেছিল, তার কারণ এই সমাজের বিকাশের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই দেখা যাবে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস বিকশিত হয়েছিল বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি এবং স্বায়ত্তশাসিত নগর-বিকাশের পটভূমিতে; নব উন্মেষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানের নানা-দিগন্ত উন্মোচনের ফলে। বাঙালির শিক্ষা তখন টোলে-পাঠশালায়, মাদ্রাসা ও মক্তবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ক্ষুদ্রতার বৃত্ত থেকে তা বের হতে পারেনি। বাংলার পাল আমলে ও

তার আগে এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যেসব বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে গড়ে উঠেছিল, বহু আগেই সেগুলোর প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল। ফলে জ্ঞান এবং চিত্ত পল্লীর স্বাভাবিক প্রাণরসে সঞ্জীবিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যেই ঘুরে মরেছে। কিছু কিছু ব্যক্তি তাঁদের ব্যক্তিজীবনের অসাধারণতায় তাকে অতিক্রম করতে পারলেও সাধারণ জনচিত্তে তার কোনো বড় তরঙ্গাভিঘাত ঘটেনি।

চার

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে সপ্তদশ শতক ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলোর সংস্পর্শে এসে বাংলায় অবশ্য এক অভূতপূর্ব বাণিজ্যের উন্মেষ ঘটেছিল। শিল্পবিকাশেরও বৃহৎ সূচনা হয়েছিল।[২] বাংলা ইউরোপের (সুতি ও রেশমি) বস্ত্র আহরণের অন্যতম মুখ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশি-বিদেশি বণিকরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আড়ত বা বস্ত্র আহরণের অনেক কেন্দ্র খোলা শুরু করে। এক পর্যায়ে বস্ত্র-শিল্পী বা শ্রমিকদের একটি আচ্ছাদনের তলায় নিয়ে এসে কারখানার প্রারম্ভও হয়েছিল, যাকে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাক-প্রস্তুতি বলা চলে। কিন্তু তা পূর্ণতা পাওয়ার আগে উপমহাদেশে বাংলাই প্রথম ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ হলো। এ-সময়ে বাংলার মাথাপিছু আয় ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে কম ছিল না (বার্নিয়ের, ট্যাভর্নিয়ার ও মানুচ্চির বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাংলার স্বাধীন সুলতানরা আকবরের কাছে হেরে যাওয়ার ফলে মোঘল শাসনের প্রায়-দ্বিশতাধিক বছরে বাংলাদেশ থেকে বড় ধরনের সম্পদ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয় (অবশ্য তা সত্ত্বেও সুবা বাংলাই ছিল সারা ভারতের সবচেয় ধনী অঞ্চল)। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের অসাধারণ স্ফুরণের ফলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলি, চন্দননগর ইত্যাদি অনেকগুলো শহর ও নগরের বিকাশ হয় বাংলায়। এছাড়া আরো বহু ছোটখাট গঞ্জের পত্তন ঘটেছিল। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহর যে-বিরাট-ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল তা ঔজ্জ্বল্য ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেকালের প্যারিস ও লন্ডনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, একথা ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকরা লিখেছেন। রবার্ট ক্লাইভ নিজেই মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বণিকদের, বিশেষত কয়েকটি পরিবারে এসময় পুঁজির বিশাল সঞ্চয়ও হয়েছিল। এইসব পুঁজির মালিকরা বিভিন্ন ইউরোপী বণিক কোম্পানিকে টাকা ধার দিত, কিন্তু

---

[২] এই সময়ে বাংলা তথা উপমহাদেশে মুদ্রার সঞ্চালনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই মুদ্রার উৎস ছিল দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা থেকে লুণ্ঠিত সোনা ও রুপো; এই সোনা ও রুপো ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করে শিল্প-উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছিল, পুঁজিবাদের সূচনা করেছিল। বাংলার বস্ত্রের বিনিময়ে বাংলায়ও বৃহৎ-পুঁজি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তা পুঁজিবাদের জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, কেবলমাত্র সোনা-রুপোর বৃহৎ-সঞ্চয় কোনো দেশকে ধনী করে না, যদি-না তা দেশের উৎপাদন শক্তিতে পরিণত না হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে স্পেন ও পর্তুগালে সোনা-রুপোর লুণ্ঠিত সঞ্চয় সৃষ্টি হলেও তা এই দুটি দেশকে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করেনি।

তা সত্ত্বেও বাংলায় বা এই উপমহাদেশের কোথাও যথার্থ অর্থে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি; পুঁজিবাদের অনেকগুলো প্রাক-শর্তের বিকাশ সত্ত্বেও।

এই সময়ে সর্বভারতীয় এবং বাংলার রাজভাষা ছিল মুখ্যত ফারসি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের উচ্চশ্রেণী ফারসির চর্চাই করেছেন রাজানুগ্রহ বা রাজচাকরি পাওয়ার জন্য। অবশ্য সাধারণ মানুষের জীবনচর্চার ভাষা ছিল বাংলা, হিন্দু মুসলমান উভয়ের। সন্দ্বীপের মুসলমান কবি তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, বাঙালি-মুসলমান তার মনের ভাব, আকুতি প্রকাশ করবে বাংলাতেই। বাংলাকে উপেক্ষা করে যারা অন্য ভাষার চর্চা করতে চায়, তাদের বাঙালি পরিচয় নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'যেসবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'।

বাংলাদেশের এই সময়ের শহরগুলো এবং তারও আগে পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি নগর প্রশাসনিক-কেন্দ্র বা রাজধানী হিসেবে সমৃদ্ধি অর্জন করলেও প্রকৃত অর্থে লোকজ সংস্কৃতির, লৌকিক বা বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখেনি। পাল, সেন, সুলতানি ও মোঘল আমলের রাজভাষা বা প্রশাসনের ভাষা ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত, পালি ও ফারসি (পরবর্তী ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি)। প্রাকৃতজন, অর্থাৎ বাঙালির মুখের ভাষা কোনো দিন রাজভাষা না হওয়ায় বাংলা সেকালের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি-চর্চার মুখ্য বাহনে বা মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে ভাষাভিত্তিক জাতীয় চৈতন্যের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এখানেই, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক থেকে জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা যে-ভূমিকা নিতে পেরেছিল তার অভাব—বাংলায় এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে—আমরা দেখতে পাই। নরমান বিজয়ের ফলে ইংল্যান্ডের রাজভাষা প্রায় তিনশ বছর ধরে (১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ—১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ) ফরাসি ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকেই ধীরে ধীরে ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজি ইংল্যান্ডের রাজভাষার রূপ নিতে শুরু করে। অবশ্য এর পেছনে বুর্জোয়া বিকাশের একটা বড় ভূমিকা ছিল। জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্পেন ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোয় ভাষাভিত্তিক-জাতীয়তাবাদের-বিকাশেরও প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ধনতন্ত্র; তারই পরোক্ষ ফল হিসেবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর অধিকার আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের বিকাশ জাতীয়তাবাদের উন্মেষে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি, হয়নি বাংলাদেশেও। এর প্রধান কারণ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার গণজীবনে বিচ্ছিন্ন ও প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলোর বিরাট প্রভাব। এই গ্রামগুলো প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবনের নীড় ছিল। এখানে কোনো অধিকার-আন্দোলন জনচিত্তকে বিক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল করে শ্রেণী-অধিকার বা জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায়নি; বর্ণ, কুল ও গ্রামীণ চেতনার বাইরে মানুষের ভাবনা তেমনভাবে প্রসারিত হয়নি, হওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। আমরা আগেই দেখেছি, ভাষা-ভাবনা ছিল, ভাষা নিয়ে এক ধরনের গর্ববোধও বাংলায় ছিল। সেই ভাষায় সাহিত্যচর্চা, মুখ্যত কাব্যচর্চা হয়েছে; সেই কাব্যচেতনায় প্রতিভা ও শিল্পশ্রীর স্ফুরণও দেখা গেছে, কিন্তু তা প্রকৃত

জাতীয়-চৈতন্যে রূপ নেয়নি। ফলে জাতীয়-চৈতন্যের মুখ্য-বাহন গদ্যের বিকাশও তেমনভাবে ঘটেনি।

পাঁচ

বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য ইংরেজি শাসনের অভিঘাতের প্রয়োজন হয়েছিল। ইংরেজ অধিকারে এসেই ইংরেজি ভাষা শিখে, ঔপনিবেশিক-অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়েই বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়। বাঙালির সংস্কৃতি জীবনে আমরা দুটি রেনেসাঁস বা নবজাগরণের দেখা পাই। একটির কেন্দ্র ছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা। এই রেনেসাঁসের বিকাশের সময়কাল প্রায় সাত দশক, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের উজ্জীবনের কেন্দ্র ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঢাকা—এরও সময়কাল প্রায় অর্ধশতাব্দী, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত। প্রথম রেনেসাঁসটি সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে, তাই এর বিশদ আলোচনার এখানে তেমন প্রয়োজন নেই। খালি এ কথাটি মনে রাখা দরকার, এই সময়কালেই বাংলা গদ্যের যথার্থ বিকাশ ঘটেছিল এবং সেই বিকাশে ইংরেজি শাসনের, বিশেষত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একটা অবদান রয়েছে। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতির অপূরণীয় ধ্বংস সাধন করেছে। উত্তর আমেরিকার প্রায় সব উপজাতীয় বা লৌকিক ভাষা (Ethnic Language) বিলুপ্ত হয়েছে। ঐ মহাদেশের মুখ্য ভাষা বর্তমানে ইংরেজি, ফরাসি ও স্পেনীয়। দক্ষিণ আমেরিকারও অনেক লৌকিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, আর তার স্থান নিয়েছে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ। অবশ্য কিছু লৌকিক ভাষা এখনো ঐ মহাদেশে নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম টিকিয়ে রেখেছে।

এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক শোষকরা বিজিত দেশগুলোর ভাষাকে নির্জিত করতে সক্ষম হয়নি। এর কারণ, এইসব দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষার ঐশ্বর্য (সমৃদ্ধ গদ্য না থাকলেও) ইউরোপ থেকে খুব বেশি দীন বা ন্যূন ছিল না। বিভিন্ন ভাষী লোকের সংখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে ছিল বিরাট। তাই উপনিবেশের ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না-করে তাকেই ঔপনিবেশিক শাসকরা শাসন ও শোষণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত-ইংরেজ আমলাদের শিক্ষিত করা) এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে রাজানুগ্রহ এরই ফলশ্রুতি (অবশ্য ১৮৩৭ সালের পর থেকে ফারসির বদলে ইংরেজিই হয়েছিল প্রশাসনের ভাষা) এটা দেখা গেছে, যখনই দুটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত বা মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে, তখন দুটোরই বা কোনো একটির মধ্যে এক ধরনের গতিবেগের সঞ্চার হয়েছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি, বিশেষভাবে ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইংরেজের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক অর্থনীতির যে বিপুল বিকাশ ও সমৃদ্ধি

ঘটেছিল তার সংস্পর্শে এসে বঙালি মধ্যবিত্তের, বিশেষভাবে যাঁরা ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা ঘটে। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এই নবজাগরণবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষের বিশেষত বাঙালির মনুষ্যত্ব ও অধিকারবোধকে নবচেতনায় জাগ্রত করেছিলেন। বাঙালি জাতিয়তাবাদ ছিল এই বোধেই সঞ্জাত।

বাঙালি জনগোষ্ঠী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে নিয়েই গঠিত। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রায় আটশ বছর ধরে এরা পাশাপাশি বাস করে এসেছে বাংলার নিভৃত পল্লীতে। শহর-নগরগুলোতে এরা পরস্পরের প্রতিবেশী ছিল। সেই ষোড়শ শতকেই মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে পাশাপাশি অবস্থিত হিন্দু ও মুসলমান গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান দুটো সমাজই অসংখ্য স্তরে বিভক্ত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তারা নানাভাবে শোষিত ও নিয়ন্ত্রিত। উভয় সম্প্রদায়েরই সবচেয়ে বড় শোষিত গোষ্ঠী হলো সাধারণ কৃষক ও গ্রামীণ কারিগর। এককথায়, শোষিত শ্রেণী হিসেবে বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু কৃষকের মধ্যে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মধ্যে তেমন বড় কোনো পার্থক্য নেই। তবুও, সম্প্রদায়গত রেষারেষি বা দ্বেষ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে communalism একেবারেই ছিল না বলাটা বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে। প্রাচীন বিশ্বে (এমনকি অধুনা জগতেও) আমরা দুটি বড় বিভেদের দেখা পাই। একটি হলো, জাতি উপজাতিগত (tribal) ও বর্ণগত (racial); অন্যটি ধর্মের বিভাজন (communal), এমনকি একই ধর্মের মধ্যে পন্থা বা ফেরকা নিয়েও বিভেদ। এই উপমহাদেশে আর্যদের যখন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তখন অনার্য সম্প্রদায় তাদের দ্বারা বিজিত হয়ে শোষণের শিকার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পণ্ডিতদের অনুমান, সনাতন সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ-বিভাজন বা বর্ণভেদ প্রথা এর থেকেই জাত। অন্যান্য দেশেও আমরা বিজয়ী উপজাতি পুরো বিজিত উপজাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে বা নানাভাবে শোষণ করেছে—তার সংখ্যাতীত উদাহরণ দেখি। আজও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মুখ্য কারণ tribal বা উপজাতীয় সংঘাত। সাম্প্রতিক কালেও সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশ এই ধরনের সংঘাতে বিদীর্ণ। বাংলা যখন তুর্কি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই বিজয়ী জাতি বিজিত স্থানীয়দের উপর কিছুটা হলেও অত্যাচার করেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একসময় এই দেশকেই তারা নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, এই দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করেছে শাসক হিসেবে। বিশেষভাবে সুলতানি আমলে হোসেন শাহ, নসরতশাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খান প্রমুখ নরপতি লৌকিক ভাষা বাংলাকে অভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। এঁদের রাজসভার ভাষা তুর্কি বা ফারসি হলেও এঁরা নিজেরা বলা চলে অনেকটা বাঙালিই হয়ে উঠেছিলেন, বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমে বাঙালির জীবনাচরণকে প্রায় আপন করে নিয়েছিলেন। এরই ফলে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব

বিকাশ হয়েছিল, যাকে আমরা আগেই অপরিণত রেনেসাঁস আখ্যায়িত করেছি। এই সময়েই সারা বাংলায় বৈষ্ণব ও সুফি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য মোগল শাসনাধীন হওয়ার পর বাংলায় শাসক-পরিপোষিত এ ধরনের কোনো দেশজ-সংস্কৃতির বিকাশ বা চর্চা আমরা লক্ষ করি না, এমনকি ঢাকা, মুর্শিদাবাদ বা রাজমহলের মতো প্রশাসন কেন্দ্রগুলোতেও নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে মূলত ইংরেজ প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য যে-নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তা চরিত্রগতভাবে প্রাক-ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রবর্তী অংশই প্রধান ভূমিকা নেয়। এই শ্রেণীটি অতি সহজেই ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ এঁরাই—উড-এর Education Dispatch থেকে জানতে পারি—ইতিপূর্বে ফারসির চর্চা করেছিলেন। উড জানাচ্ছেন, অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের শুরুতে, ফারসি চর্চারত হিন্দুর সংখ্যা ফারসি চর্চারত মুসলমানের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে প্রশাসনের বিভিন্ন পদ, বিশেষত রাজস্ব বিভাগ এঁদেরই করায়ত্ত ছিল। তাই ফারসির বদলে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে এই গোষ্ঠীর তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। প্রশাসনের উচ্চস্তরে (মুখ্যত অবাঙালি) মুসলমানরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনচ্যুত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই শাসক অংশ যাঁরা উত্তর ভারত থেকে আসায় আশরাফ বলে গণ্য হতেন, ইংরেজি শিক্ষাকে প্রথমে গ্রহণ করেননি। পরবর্তী কালে যখন এই অভিজাত মুসলমানরা ইংরেজিকে গ্রহণ করলেন, তখনও তাঁরা বাংলাকে পরিত্যাজ্যই ভাবলেন, অনভিজাতের বা ব্রাত্যজনের ভাষা হওয়ায়। এ কারণেই আবদুল লতিফ বলেছিলেন, মুসলিম উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজি এবং উর্দু, বাংলা বা Vernacular হবে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম।

বলাবাহুল্য, হাজার বছরের বাংলা মুসলমান হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান কি বিরাট ও গভীর। সারা মধ্যযুগে আখ্যায়িকা-কাব্যে মুসলমান কবিরা অফুরন্ত অবদান রেখেছেন। এই কাব্যে তাঁরাই পথিকৃৎ। এই কাব্যধারার বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ও এক ধরনের রোমান্সকাব্য, যেখানে পাত্রপাত্রীর প্রেম-বিরহ-ই কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলার প্রান্তবর্তী সুদূর আরাকান রাজসভায় বসে আলাওল যে-কাব্য রচনা করলেন, তার শৈল্পিক বা সাহিত্যিক অবদান অতুলনীয়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে এবং বাংলাকে অভিজাত শ্রেণী অবহেলা করায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি রেনেসাঁসে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ সেভাবে হলো না।

বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁসের সূচনা হলো, আগেই উল্লেখ করেছি, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, সেও আরেকটি ঔপনিবেশিক আঘাতেরই ফল। এই আঘাত ছিল অত্যন্ত তীব্র। পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী ঘোষণা করেছিল, 'সারা পাকিস্তানে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু', বাংলা

নয়, যদিও বাংলাই ছিল পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের এই বক্তব্যের সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ প্রাক্তন শাসক-শ্রেণী-প্রতিনিধি এবং এদেশীয় কিছু সুবিধাভোগী একাত্মতা জানিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও নব-উন্মেষিত ও বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উর্দুকে বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টা কেবল একটি সাংস্কৃতিক আঘাতই ছিল না, এটি ছিল অর্থনৈতিক আঘাতও। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর মুখের ভাষা ছিল উর্দু। বাংলাদেশের বা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণী অনুভব করেছিল, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে জীবনের সব পেশার ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু-ভাষীরা এগিয়ে যাবে, পিছিয়ে পড়বে বাঙালি; এছাড়াও মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে-আকুতি, সাবলীলতা ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ পায়, অন্যভাষায় তা প্রায় অসম্ভব। ১৯৪৮-এ ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৫২-তে যখন তা চূড়ান্ত পরিণতি পেল এই আন্দোলনে তাই তখন একই সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক আকুতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা। ভাষা আন্দোলনেই বাঙালির স্বাধীনতা-আন্দোলন বা মুক্তি-সংগ্রামের বীজ উপ্ত হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর এই আন্দোলনকে যথাযথভাবেই বলেছেন 'বাঙালির ঘরে ফেরা'।

পঞ্চাশের দশকে বাঙালি-মুসলমান বাংলা উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধে যে-বিপুল সৃষ্টির সম্ভার শুরু করে তা স্বাধীনতা-উত্তরকালে আরো গতিবেগ অর্জন করে পুরো নব্বই দশক পর্যন্ত বহমান রইল। আজ এই সৃষ্টিশীলতার স্রোতে ভাটার লক্ষণ যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রে নানা দৌর্বল্য দেখা দিচ্ছে। পঞ্চাশের দশকে যে-রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল তার প্রবাহে গতিহীনতা বাঙালির মানস-ঐশ্বর্যে এখন দৈন্যের রেখাকেই মূর্ত করে তুলেছে। এর কারণ প্রবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, স্বাধীনতা-উত্তর কালে মধ্যবিত্তের বিরাট বিকাশ হয়েছে সত্যি, কিন্তু অধুনা বিশেষত আশির দশকের শেষার্ধ থেকে মধ্যবিত্ত-সামাজিক-অর্থনীতি বা তৎ-সঞ্জাত ঋদ্ধ মধ্যবিত্ত-সংস্কৃতি বাঙালি সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস নয়। আজ বাংলাদেশের লুটেরা ঋণখেলাপী-সংস্কৃতি-সঞ্জাত এক নব্য-ধনিকশ্রেণী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সহায়তায় সমাজের চালিকাশক্তি হয়েছে। বাংলা ভাষা এবং তার বিরাট সাহিত্য-সম্ভার ও সংস্কৃতি এদের কাছে আদরের বা গর্বের নয়, বরং ব্রাত্য ও পরিত্যাজ্য। এরা তার গভীরে ঢুকতে পারে না, ঢোকার শক্তিও রাখে না। এরা কথ্য ইংরেজির চর্চা করে এবং তার মধ্যেই জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা খোঁজে। ইংরেজি ভাষা বা ইউরোপীয় সাহিত্যের গভীরে বা তার ঐশ্বর্যের মর্মমূলে প্রবেশের জন্য যে-গভীর প্রস্তুতি ও সামর্থ্য জরুরি, এদের তা নেই। কারণ নিজেদের ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরে ঢুকতে যে অসমর্থ বা অপারগ, সেতো অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃত সহমর্মিতা অর্জন করতে পারে না, পারে না তার গভীরে ঢুকতে। তাই আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের এবং

আগেই উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রজন্মের মধ্যে এক উন্মার্গ জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির (rootless culture) সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশজ-সংস্কৃতির শেকড়ছিন্ন এই পরভৃত-সংস্কৃতি-বিকাশে তথাকথিত বিশ্বায়নের প্রভাবও বিরাট। আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই বিশ্বায়নের প্রধান বাহন পরাজাতিক সংস্থাগুলো (transnational corporation)। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন, কোকাকোলা, পেপসি, ইউনিলিভার, শেভরণ, শেল, সনি, টয়োটা, মাইক্রোসফট, আইবিএম, বোয়িং এবং অধুনা টাটা, হুন্দাই ইত্যাদির কাছে সারাবিশ্বই বিচরণক্ষেত্র এবং তার মুখ্য বাহন হলো ইংরেজি। বর্তমানে ইংরেজিই একশো কোটি লোকের কথ্যভাষা, যত বিকৃতই হোক না, Hindish, Banglish প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত; সাম্প্রতিক সময়ে রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনও ভাষা-বিকৃতির এক উল্লেখ্য উদাহরণ। তাই ইংরেজি কথ্য ভাষায় অধিকার অর্জনই আজকের বিশ্বায়ন-বিশ্বে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক উন্নয়নের প্রধান সোপান। এখানে প্রকৃত শিক্ষা বা সংস্কৃতির প্রশ্ন গৌণ। জীবনের গভীর উপলব্ধি বা জীবনকে রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে-সঙ্গীতে-চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যের নান্দনিক আনন্দে ভরে তোলার সব আর্তিই এখানে অনুপস্থিত। আদর্শেরও কোনো স্থান নেই। মানুষের প্রতি মানুষের, বিশেষত বঞ্চিত জনের প্রতি মমত্ববোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য জীবনের কিছুটা সময় দেওয়ার চিন্তাও আজ তাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে নেই। চারিদিকে কেবল কিভাবে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে তারই প্রতিযোগিতা। নব্বইয়ের দশকে সমাজতন্ত্রের পতনের পর থেকে আজকের এককেন্দ্রিক-বিশ্বে জীবনের প্রধান শ্লোগান, 'ব্যষ্টির এগুনোর মধ্য দিয়েই এগুবে সমষ্টি'। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা হতে হবে নিজেকে এগিয়ে নেওয়া, আর তার মধ্য দিয়েই এগুবে দেশ-জাতি-সবাই। এই স্লোগান ব্যক্তি-সর্বস্ব দর্শন, ব্যক্তির মুক্তির দর্শন নয়। এটি স্বার্থপরতার দর্শন, পরার্থপরতা এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

বাংলাদেশে নতুন প্রজন্ম মনে হচ্ছে এ-আত্মঘাতী দর্শনে প্রায়-সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তাই বাঙালি আজ তার বাঙালিত্ব ভুলছে, আবার যথার্থ অর্থে বিশ্ব-নাগরিকও হতে পারছে না, কারণ তার সেই যোগ্যতা নেই, যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টাও নেই। একজন মানুষ নিজের দেশের হয়েই সারাবিশ্বের হয়। নিজ সংস্কৃতির মর্মমূলে পৌঁছতে পারলেই তার পক্ষে বিশ্বের নাগরিক হওয়ার অভিজ্ঞান-অর্জন সম্ভব হয়।

সারাবিশ্বে বাংলা-ভাষী বাঙালির সংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি। মাতৃভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে বিশ্বের পঞ্চম ভাষা বাংলা। এই ভাষার সমৃদ্ধি ও গভীরতা বিরাট ও অতলান্ত। ভাষা নিয়ে দু-তিন দশক আগেও বাঙালির গর্বের সীমা ছিল না। সর্বপ্রথম এই ভাষী জনগোষ্ঠীই প্রাণ দিয়েছে ভাষার জন্য। ভাষা যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম, তা প্রমাণ করেছে। ভাষার জন্য এই আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্ব-সমাজ আজ একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে বিশ্বের সব ভাষার বাঁচার অধিকারকে মেনে নিয়েছে, সব ভাষার অনন্যতা স্বীকার করেছে।

বিশ্বের বহু ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর ভাষাভাষী জনগণ নিজের ভাষায় জীবনচর্চা করছে। প্রায় প্রতিটি আরব-ভাষী দেশ, ইরান, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশের চলমান-জীবন, প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষার ভাষা মাতৃভাষা। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করেই জাপান আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, চীন তৃতীয়। এক্ষেত্রে আমরা কেন দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছি? তা-কি দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরোক্ষ ফল? আমরা কি তার প্রভাব তার hangover এখনো কাটাতে পারলাম না? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একবার, আবার বিশশতকের শেষার্ধে আমাদের যে দুটি নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, যে-গভীর জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তা কি এখনই মেঘাবৃত? বিশ্বায়নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে আবার কি আঁধার নেমে আসছে?

ছয়

বিশ্বায়নের ফলে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সারাবিশ্বই একটি সূত্র বা সুতোয় বাঁধা পড়েছে। এ সূত্রের একপ্রান্তে রয়েছে পরাজাতিক কর্পোরেশনগুলো, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি বিশ্বায়নের প্রবক্তা সংস্থা; অন্যপ্রান্তে সারাবিশ্বের সাধারণ মানুষ, আম জনতা। বিশালকায় পরাজাতিক সংস্থাগুলো গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে যে-অমিত-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, তা অনেকটা তৃতীয় বিশ্বের শোষণের উপরেই গড়া। অবশ্য, উন্নত বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চনাও এ সম্পদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। একারণে প্রায় এক দশক আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিল গেটসের একার সম্পদের পরিমাণ খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দশকোটি নিম্নবিত্তজীবী মানুষের আয়ের সমান। চীন ও ভারত এ-দুটি দেশের জিডিপির প্রায় কাছাকাছি কয়েকটি পরাজাতিক সংস্থার সম্পদের পরিমাণ (এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে লেখকের 'বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ' গ্রন্থে), যদিও ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের হিসেব মতে, দেশদুটি পি.পি.পি. (purchasing power parity) বিচারে বিশ্বে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ ধনী দেশ। তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। ফরচুন ম্যাগাজিনের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বের বৃহত্তম পঞ্চাশটি কর্পোরেশনের আয় যদি যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পদ (assets) এবং ৮০ শতাংশ আয় (শ্রমিকদের আয় শুদ্ধ) এদেরই করায়ত্ত। এ কর্পোরেশনগুলোর অধিকাংশেরই অবস্থান উন্নত বিশ্বে।যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি দেশে। বৃহত্তম কর্পোরেশনগুলোর নামের তালিকায় ইদানীং বিক্ষিপ্তভাবে চীন ও ভারতের কয়েকটি সংস্থার নামও (এদের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র-মালিকানার অন্তর্ভুক্ত) চোখে পড়ে। বিশালাকার এ-মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো তাবৎ দুনিয়ার মুখ্য পণ্যসমূহের নির্মাতা ও বিক্রেতা বা বাজার নিয়ন্তা। এমনকি, ইদানীং এরা ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থাকেও নিজেদের বৃহৎ থাবার নিচে নিয়ে আসছে। বিভিন্ন

শস্যের বীজের উৎপাদনও ক্রমে ক্রমে এই পরাজাতিক সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মুনাফার স্বার্থ মানুষের জীবনের উপরও জয়ী হতে চলেছে। অধিকতর মুনাফার প্রয়োজনে এরা বিশ্বকে খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে উৎপন্ন শস্যকে জৈব-জ্বালানি (bio fuel) বা অন্যান্য শিল্প-সামগ্রীতে রূপান্তর করতে দ্বিধাবোধ করছে না। বিশ্বের অধিকাংশ খনিজ সম্পদের মালিকানাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃহৎ পরাজাতিক সংস্থাগুলোরই নিয়ন্ত্রণে।

নব্য-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে, সারাবিশ্বকে মুক্তবাজার-অর্থনীতি বা এসব বহুজাতিক সংস্থার চারণক্ষেত্রে পরিণত করলেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হবে। গত দেড় দশক ধরে, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এ বক্তব্য এখন যেন একটি ধ্রুব-সত্যে পরিণত হতে চলেছে। প্রচলিত অর্থনীতিতে এর বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য বর্তমানে নেই বললেই চলে। এই মুক্তবাজার-অর্থনীতি, বিশ্বায়ন-অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি সংস্থা।

কিন্তু প্রকৃত সত্য বা বাস্তবতা কি? সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এ প্রসঙ্গে কি বলছে? সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে আমেরিকান-জাপানি ইতিহাসবিদ ফুকায়ামা ঘোষণা করেছিলেন, ধনতন্ত্রের বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই প্রথমে জাপান ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুঁজিবাদ এক বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জাপানের বিপর্যয়টি এসেছিল মুনাফার পেছনে পুঁজির অযৌক্তিকভাবে ধাবমান হবার কারণে। এরই ফলে জাপানের টোকিও শহরের রিয়েল এস্টেটের মূল্য সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেটের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩] মুনাফার লোভে পুঁজির কি বিচিত্র গতি! নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে জাপানের অর্থনীতিতে যে-মন্দা শুরু হয় তা প্রায় দীর্ঘ একদশকের বেশি স্থায়ী হয়েছিল। জাপানকে এই মন্দা থেকে বের করে আনতে জাপান-রাষ্ট্র যে কী-ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিল, বিশ্ব-অর্থনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কাছে তা অবিদিত নেই।

১৯৯৭-এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে (থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে) যে-বৃহৎ মন্দার সূচনা হয়েছিল, তারও উৎসে ছিল পুঁজির অযৌক্তিক মুনাফার সন্ধান। এসব দেশের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে বিশ্ব পুঁজি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কারণ সে সময়ে এ-সব দেশে পণ্য-উৎপাদন-ব্যয় শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে অনেক কম ছিল, শ্রমের মূল্য সস্তা হওয়ায়। জাপানের উদ্বৃত্ত পুঁজির এক বিরাট অংশের পাশাপাশি

---

[৩] "In 1989, the peak year of Japan's property bubble, the value of Tokyo was estimated to be equal to that of the entire United States. The value of that property, particularly in down town commercial districts has now dropped by 80 percent." *Newsweek*, July 27, 1988 (দ্র. লেখকের গ্রন্থ, বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ পৃ. ৯৯–১৫১)।

অন্যান্য উন্নত দেশের পুঁজি এ কারণে এসব দেশের শিল্প ও শেয়ার বাজারে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে বিনিয়োগ হতে থাকে মুনাফার লোভে, যার ফলে প্রতিটি শিল্পে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতা (excess production capacity) সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই অনেক শিল্প তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে অসমর্থ হলে অতি দ্রুত মুনাফালোভী পুঁজি প্রত্যাহৃত হওয়া শুরু হয়। ফল হয়, দেশগুলোর মুদ্রামানের হ্রাস এবং অবিক্রিত পণ্যের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে ওঠা, ধ্বস নামে শেয়ার বাজারে ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে। এই ধ্বসে বা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ভীত হয়ে কেবলমাত্র পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার বিকাশমান বাজার থেকেই নয়, ল্যাটিন আমেরিকার উদীয়মান বাজার থেকেও লগ্নিপুঁজির প্রত্যাহার শুরু হয়। এসব দেশের অর্থনীতি এবং বাজারগুলোকে রক্ষা করতে অনন্যোপায় হয়েই বিশ্ব পুঁজিবাদের অন্যতম খুঁটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফকে এগিয়ে আসতে হয় এবং বিপর্যয়ের প্রথম বছরেই প্রায় দেড়শ বিলিয়ন ডলার তাৎক্ষণিক আপৎকালীন ঋণ হিসেবে এ-সব দেশকে দিতে হয়। এই দেশগুলোর শিল্প-বাণিজ্য-আর্থিক সংস্থাসমূহের ঋণের আয়তন এত বিশাল ছিল যে বেসরকারি বা ব্যক্তি-পুঁজির পক্ষে তার ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব ছিল। ঋণের পরিমাণ কী বিশাল ছিল তা একটি উদাহরণ দিলেই অনুধাবন করা যাবে—হংকংয়ের Deusche Bank-এর হিসেব মতে, এ অঞ্চলের চারটি বিপন্ন অর্থনীতি—থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার গড় ঋণের অনুপাত ছিল দেশজ উৎপাদনের ২৩০ শতাংশ।[8]

পুঁজির মুনাফা অন্বেষণ আজো যে কী বিপুল-লোভাতুর ও কতখানি অযৌক্তিক, তার বড় প্রমাণ বর্তমান বিশ্বে পুঁজির হঠাৎ সংকোচন (Credit Crunch)। এই সংকোচনের উৎস পুঁজিবাদের সর্ববৃহৎ-ক্ষেত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ৯০ দশকের জাপানের মতো আজ (২০০৭–২০০৮ সালে) সেখানে গৃহায়ণ ও নির্মাণ খাতে এত অযৌক্তিক-বেপরোয়াভাবে পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে যে, সেই পুঁজির এক বিরাট অংশ আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতিরিক্ত মুনাফা বা লাভের আশায় বিশাল বিশাল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যাংকগুলো পরস্পরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অসংখ্য ব্যক্তিকে অজস্র ধারায় ঋণ দিয়েছে, ব্যক্তির সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বা সামর্থ্যকে বিবেচনায় না-এনে। ফল হয়েছে, অসংখ্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কয়েকশ বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন ডলার পুঁজি হারিয়েছে। পরিণামে কেবল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো নয়, ইউরোপের অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও বিশাল পুঁজি-ঘাটতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে এক বিরাট ঋণ-সংকট দেখা দিয়েছে (sub-prime credit crunch)। এই ঋণ সংকটের ফলে মার্কিন ও ইউরোপের অর্থনীতিতে যে-মন্দা সৃষ্টি হয়েছে, তা ত্রিশের

---

[8] ১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন্দা ও তা থেকে উত্তরণ বিষয়ে লেখকের 'বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ' গ্রন্থের ৯৯–১৫১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

দশকের মতো মহামন্দায় (great depression) রূপ নেওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

বাঙালির বাঙালি-সত্তা আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতির চলমান গতি প্রবাহের এই আলোচনার উৎসে বা মূলে রয়েছে বাঙালির সত্তার উপর, বাঙালি মানসের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব উপলব্ধি-করা। সারাবিশ্বই আজ বিশ্বায়নের আওতাভুক্ত। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর পুঁজির শাসনাধীন সবাই। কোনো দেশ বা জাতি এদের প্রভাব থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র-সত্তা হিসেবে টিকে থাকতে পারে না, পারছে না। এদের ইচ্ছেয় এবং কখনো কখনো আগ্রাসনে দেশে দেশে রাষ্ট্রশক্তিরও নানা ধরনের বিপর্যয় বা উত্থান পতন ঘটে। জাতির ভাগ্যে নেমে আসে অমানিশা। তাই এসব বিশাল পরাজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশ ও পরিণতি আলোচনা আমাদের জাতিসত্তার আলোচনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বও এদের কাছে অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা, আমরা যদি-না সে সুতোকে ছিঁড়ে ফেলি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পরাজাতিক সংস্থা (এবং তাদের বিশাল পুঁজি) কোথায় যায়, কোথায় যাচ্ছে? আমরা দেখছি, মুনাফার খোঁজে বিশাল পুঁজি বিশ্বজুড়ে বারবার এমন অযৌক্তিকভাবে ছুটছে যে তা নিজেই নিজেকে বিপন্ন করছে। এই বিপন্ন-পুঁজিকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসতে হচ্ছে।[৫] পুঁজি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখনো না-থাকলেও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে না পারলে পুঁজি যে বিপন্ন হবে, এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপন্ন করবে, তা বোঝা প্রয়োজন। পুঁজির ক্রমাগত বৃদ্ধি নির্ভর করে ক্রমবর্ধমান হারে পণ্য-প্রবাহ বাড়ার উপর। এজন্য পণ্য-উৎপাদন ও তার পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনে বিশ্বের নবায়নযোগ্য নয় এমন সব সম্পদ ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হলেও, প্রকৃতির আপন ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার, নিজেকে নবায়ন করার ক্ষমতা নিঃশেষ হলেও কে তার তোয়াক্কা করে? বেপরোয়া মুনাফালোভী বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে পণ্যই পরম আরাধ্য, মুনাফাই মুখ্য, মানুষ নয়। বিশ্ব আজ ভুলতে বসেছে যে পণ্য মানুষের জন্য, মানুষ পণ্যের জন্য নয়। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ যে-বস্তুসমূহ তৈরি করত, তার প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অংশই কেবল পণ্যে পরিণত হত। উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল বস্তু-সৃষ্টি, মানুষের প্রয়োজনে। পুঁজিবাদী সমাজে বা পুঁজিবাদে (এবং এই পরাজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে) উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্যই

---

[৫] বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহু ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সংস্থা ভয়ানকভাবে বিপন্ন হওয়ায় ও অস্তিত্বের সংকটে পড়ায় তাদের রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র-কংগ্রেস সাতশ বিলিয়ন ডলারের রক্ষা-তহবিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই বিশাল রাষ্ট্রীয় তহবিলের, যার মালিক জনগণ, মুখ্য অংশ ব্যয় করা হবে এই সব বিপন্ন-সংস্থার অংশ ক্রয় করতে। এই-ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র বা জনগণ এই সব সংস্থায় মালিকানা অর্জন করছে। অর্থনীতি বিপন্ন হওয়ায় রাষ্ট্রকে এইসব সংস্থাকে এইভাবে আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ (nationalization) করে রক্ষা করতে হচ্ছে।

হলো বাজারে বিক্রির (exchange value) জন্য উৎপাদন। মানুষের প্রয়োজনে বস্তু উৎপাদন নয়, use value সৃষ্টি নয়। পুঁজির লোভ, আমরা বারবার দেখি, তার নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস, বিকৃতি এবং বিলয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজির এই বারবার বিপন্ন হওয়ার মধ্যেই কিন্তু জন্ম নিচ্ছে মানুষের শেষপর্যন্ত বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা, পুঁজির পরাভবের উৎস।

বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোর মধ্যে আমরা এক বিরাট বৈপরীত্য (contradiction) দেখতে পাই। এ বৈপরীত্য হলো, মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার বৈপরীত্য। বিশাল এই কর্পোরেশন বা পরাজাতিক সংস্থাগুলোর শাখা-প্রশাখা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে এক বিরাট কর্মগোষ্ঠী ও কর্পোরেট আমলাতন্ত্র। মালিক এরা নয়, মালিকানা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং (শেয়ারের মাধ্যমে) বহু বিস্তৃত। এসব সংস্থার আমলা-কর্মীগোষ্ঠী ও পরিচালকরা ছোটে মুনাফার পেছনে, কারণ তারা জানে তাদের অর্থনৈতিক সত্তা সংশ্লিষ্ট-সংস্থার সঙ্গেই অভিন্নভাবে যুক্ত। সংস্থার মুনাফার মধ্যেই রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অস্তিত্ব। মুনাফার জন্য কোনোরকম ঝুঁকি নিতে তাই তারা দ্বিধা করে না, মানুষ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

তাই, সমাজ বা রাষ্ট্র যদি এগিয়ে এসে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মালিকানা নিজের কাছে তুলে নেয়, তাহলে কয়জন ধনকুবের আর্থিক ক্ষতির শিকার হলেও মানব-সমাজ, মানব-সভ্যতা, বিশ্ব-প্রকৃতি রক্ষা পাবে। আজকের বিশ্বকে, বিশ্বের মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য এবং সর্বোপরি জীবনকে বাঁচাতে হলে রাষ্ট্র বা সমাজকে এই সহজ কাজটি করতে হবে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সামাজিকীকরণ (socialization) বা রাষ্ট্রীয়করণ (nationalization) আজ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। সব মনুষকে সমাজের সব সম্পত্তির মালিকানা দিতে হবে। তাহলেই ব্যক্তি পুঁজি আর অযৌক্তিক মুনাফার খোঁজে সারাবিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করবে না। বিশ্বপ্রকৃতিকে ও তার সব সম্পদকে বিলয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে না। এই রাষ্ট্রীয়করণ যে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো হতে হবে, তা আবশ্যিক নয়, কারণ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল পুঁজিবাদের অবিকশিত-সামাজিক-সত্তা থেকে। সেহেতু, সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে যে-রাষ্ট্রযন্ত্র পেয়েছিল, লেনিন বলেছিলেন, সেই রাষ্ট্রযন্ত্র (state apparatus/ bureaucratic apparatus) ছিল বিকৃত, ত্রুটিপূর্ণ। লেনিন আরো বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজের প্রকৃত সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে হলে তার বিদ্যমান রাষ্ট্রসত্তার চরিত্র পাল্টাতে হবে; অনেকগুলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে যেতে হবে তার শ্রেণী-রূপের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য। ত্রিশের দশকে যে-বৃহৎ-মহামন্দা ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে নানা-প্রকৃতির নাতি-বৃহৎ-মন্দা দেখা দিয়েছিল, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেখানে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে, উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সচল ও পুনরুজ্জীবিত করতে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির ও কর্পোরেট

আমলার অপরিণামদর্শী ও লোভী-পদক্ষেপের মাশুল গুনতে হয়েছিল পুরো সমাজকে এবং সমাজের প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্রকেই এই অবিমৃশ্যকারিতার পথ থেকে উৎপাদনব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে বারবার সাধারণ জনগোষ্ঠীর, নাগরিকের অর্থকে বিনিয়োগ করতে হয়েছিল; এখনো করতে হচ্ছে বিপুলভাবে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ উৎপাদনকে ব্যাহত করে মর্মে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের যে-বক্তব্য, পুঁজিবাদের বিপন্নতার সময়ে রাষ্ট্রের বারবার এগিয়ে আসাই কি তার অসারতা প্রমাণ করে না? তাই বিশ্বজুড়ে পুঁজির চরম বিপন্নতার সময়ে একদিন সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে সার্বিক উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ন্ত্রণভার নিতে, সমাজকে রক্ষা করতে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমাজ বা দিন খুব দূরবর্তী মনে হলেও একুশ শতক শেষ হওয়ার আগেই তা আসবে, কারণ অন্যথা অযৌক্তিক ও অত্যাধিক মুনাফার স্বার্থে পুঁজিবাদ এই বিশ্বপ্রকৃতিকে, তার অনবায়নযোগ্য ও নবায়নযোগ্য প্রায় সব সম্পদকেই ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে। পুঁজির অন্ধতাড়না ও উন্মাদনার বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীব্যাপী নানা প্রতিবাদে যেমন, গ্রিন মুভমেন্ট, এন্টি গ্লোবালাইজেশন মুভমেন্ট ইত্যাদিতে কি তারই আভাস নেই?

বিশ্ব জুড়ে পুঁজির অবাধ প্রবাহ এবং পরাজাতিক সংস্থাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ও অদম্য আগ্রাসন কেবলমাত্র প্রকৃতি এবং প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদকেই ধ্বংস করছে না, তাবৎ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সমাজ-সভ্যতা ও কৃষ্টিকেও ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে নানাভাবে। প্রতিটি জাতিসত্তার লোকজ সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। বহুজাতিক সংস্থাগুলো কেবল তাদের বিবিধ এবং বিচিত্র পণ্যই বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে না, সেই পণ্যের বাহন এক-মাত্রিক সংস্কৃতিকেও ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক হলো ইংরেজি ভাষা ও এমন এক-একমাত্রিক (one dimensional) সংস্কৃতি যা প্রকৃত ও চিরায়ত ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির গভীরতাকে স্পর্শ করে না। এই সংস্কৃতি ভোগবাদী দর্শনের ধারক ও বাহক, খুব কম ক্ষেত্রেই তা জীবনের গভীরগাহী। দেশে-দেশে অসংখ্য বলিউড, টালিউড, টিভি ও অন্যান্য মাধ্যম এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই লঘু-সংস্কৃতির ধাক্কা থেকে আজ সমাজতান্ত্রিক চীনও রেহাই পাচ্ছে না। বলা প্রয়োজন, লঘু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ আমার নেই, কারুর থাকতেও পারে না। প্রতিটি দেশের সংস্কৃতির একটি লঘু দিক আছে, হালকা হাসি-ঠাট্টা-বিনোদনের দিক আছে। মানুষকে মৃদু আনন্দে ভরিয়ে তোলার দিক আছে। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তার রূপটি হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ লঘু সংস্কৃতিকে ভালবাসতেই পারে। শঙ্কার মুখ্য কারণটি অন্যত্র। আজ বিশ্বজুড়ে যে-লঘু-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো হচ্ছে প্রকৃত অর্থে তা লঘুও নয়, সংস্কৃতিও নয়, তা নিছক বিভিন্ন বিকৃতি-সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তির বা দ্রষ্টার মন জয়ের চেষ্টা। এই বিকৃতিরও, পরাজাতিক সংস্থাগুলোর অবদানে, বিশ্ব জুড়ে এক-বিশেষ-রূপ যে ফুটে উঠেছে, তা কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনে সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো ভালোভাবে লক্ষ করা যায়,

তাহলে বোঝা যাবে এই মাধ্যমগুলোতে যে গান-বাজনা, সঙ্গীত-নাটক, আলাপ-সংলাপ প্রচারিত হয়, তার উদ্দেশ্য দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে একই ধরনের এক মানস-জগৎ, ভোগের স্পৃহার জগৎ সৃষ্টি করা। ব্যক্তি অনেক সময় নিজেই টের পায় না তার মনোজগতের কিভাবে রূপান্তর হচ্ছে, কিভাবে সেখানে দেশজ-সংস্কৃতির আবেদনের বিলয় হচ্ছে। নতুন প্রজন্মসমূহের উপর এর প্রভাব খুব গভীর। সারা বিশ্ব জুড়ে, এইভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলো একমাত্রিক মানুষ গড়ে তুলেছে। এর প্রভাব থেকে পল্লীর সাধারণ মানুষও আজ রক্ষা পাচ্ছে না। এ কারণেই আজ পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, প্রকৃত পল্লীগীতি বা বাউল গানের আবেদন নেই উঠতি প্রজন্মের কাছে।

সুতরাং আমাদের বাঙালি সত্তাকে রক্ষা করতে হলে, আমাদের আদি-অন্তে বাঙালি হতে হলে বিশ্ব পুঁজিবাদের আগ্রাসন বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আমাদের মানস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ঠেকাতে হবে। এদের মূল উদ্দেশ্য জীবনকে পণ্যাশ্রয়ী করা, পণ্যে পরিণত করা; অবশ্য তা-থেকে ফেরার চেষ্টাও চলছে আজ বিশ্বব্যাপী। বারবার পুঁজির বিপন্নতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ নিজেই তার দৌর্বল্যকে বিশ্বের নিপীড়িত, নিগৃহীত মানুষের কাছে তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছে। এরই মধ্য দিয়ে দেশে দেশে এই সত্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে, পণ্য নয়, মানুষের যা প্রয়োজন, মানুষ তা নিজেকে পণ্যে পরিণত করে পাবে না। পণ্যের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। পণ্যকে তার বশে আনতে হবে। Exchange Value-এর পরিবর্তে বস্তুর Use Value-কে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশ্ব প্রকৃতি আমাদের যা দিচ্ছে তাকে নিরবচ্ছিন্ন পণ্যপ্রবাহে রূপান্তর না করে আমাদের জীবনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আর তা করার জন্যই এই পরাজাতিক সংস্থাগুলো এবং তাদের বাহক ও পরিতোষক সংস্কৃতির বিলোপ ঘটাতে হবে। একমাত্রিক যান্ত্রিক (robotized one-dimensional) মানুষের বদলে প্রাণোচ্ছল বহুমাত্রিক সৃজনশীল মানুষের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বাঙালির জীবনে আজ যে-অন্ধকার, যে-দৈন্য তা ক্ষণিকের বলেই আমি বিশ্বাস করি। বাঙালি আবার উঠবে, জাগবে, কারণ তার সংস্কৃতিতে, তার জীবনবোধে সেই গভীর প্রত্যয় রয়েছে। আদি-অন্ত বাঙালি হয়েই বাঙালিকে বিশ্বসভায় তার আত্মশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো নতুন প্রজন্মের কাছে তার হাজার বছরের সংস্কৃতির দিকগুলো, ঐশ্বর্যের দিকগুলো তুলে ধরা, তার উপলব্ধিতে সর্বমানবের মুক্তি-সংগ্রামকে জাগ্রত করা। বাঙালিকে বিশ্বের সব সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে এক হয়েই এগোতে হবে তার বন্ধন-মুক্তির জন্য, তার আত্মসত্তার, বাঙালি-সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য। এর জন্য তার পাথেয়ের অভাব নেই। এই পাথেয় সে অর্জন করেছিল ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রামে। এই সংগ্রাম কেবল বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না, প্রকৃত অর্থই ছিল মুক্তির সংগ্রাম।

সেই-মুক্তির-সংগ্রামের দর্শনকে রূপ দেওয়া হয়েছিল ১৯৭২-এ রচিত সংবিধানে। এই সংবিধান অঙ্গীকার করেছিল একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার। রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শকেও মূর্ত করা হয়েছিল জোরালোভাবে; ঘোষণা করা হয়েছিল, "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ।" আরও বলা হয়েছিল, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যম উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।"

এছাড়াও রাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছিল, "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।"

আজ রাষ্ট্র সংবিধানে প্রদত্ত এসব অঙ্গীকার-পালন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে; বিস্মৃতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই প্রতিশ্রুতিও, "রাষ্ট্র জনগণের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান 'মানবসত্তার-মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার' যে-দৃপ্ত-ঘোষণা দিয়েছিল, আজ থেকে প্রায় অর্ধ-সহস্র বছর আগেই সেই-শ্রদ্ধাবোধ জানিয়ে বাঙালি কবি উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বের সব মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে, 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

এটা অনস্বীকার্য, প্রকৃত-বাঙালি হতে হবে বিশ্ব নাগরিক হয়েই; নিজের মানবসত্তার পূর্ণতা-দেওয়ার-সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মানবসত্তার-পূর্ণতা-দেওয়ার প্রতিজ্ঞা যুক্ত করেই। বাঙালির এই সংগ্রাম এখনো অপূর্ণ, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে তাকে আরো বহু-পথ হাঁটতে হবে। এই পথ চলায় তার

পাথেয় হবে নিজের হাজার বছরের ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য; তার মুক্তি-সংগ্রামের অঙ্গীকার।[৬]

---

[৬] আদি-অন্ত বাঙালি'—এই শিরোনামটির জন্য আমি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ও মহৎ কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের কাছে ঋণী।

আলী আনোয়ার

বাঙালি সংস্কৃতির ভিতর ও বহির

এক

সংস্কৃতির ভিতর ও বাহির বলতে দুটি দিক বোঝানো যায়: একটি মানুষের মানস জীবন—তার ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যাভিমুখিতা, অন্যটি তার সমাজজীবন—কাঠামো বিন্যাস, ঘটপট-স্থাপত্য-প্রযুক্তি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই দুটি মিলিয়েই তার অস্তিত্ব, তার পরিচয়, তার আত্মচেতনা ও গোষ্ঠীচেতনা। সব মিলিয়েই মানুষের সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির বাইরে কোন মানুষ নেই। মানুষ একটি সাংস্কৃতিক প্রাণী। কথাটি যেমন সরলভাবে বলা গেল, ব্যাপারটি মোটেও তেমন সরল নয়। কারণ সংস্কৃতির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বলেও দুটি দিক আছে : জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণী-নির্যাতন, নারী-শিশু-দুর্বল মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা সেই অপ্রকাশ্য দিক। অপ্রকাশ্য বলে তা গোপনে চিরবহমান কিন্তু সহজ ব্যাখ্যাধিগম্য নয়। পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি একদিন স্কুল থেকে এসে যখন বলে : 'জানো আব্বা বাসুদেব কাকারা না কি হিন্দু, আর আমরা মুসলমান!' তখন লক্ষ করি না যে, সংস্কৃতি ঐ বিভাজনটি সম্পর্কে আমার মেয়েকে সচেতন করে তুলেছে। সংস্কৃতিই আমাদেরকে আপন-পর, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ছোটলোক-বড়লোক, চাষাভুষো, গ্রামীণ-নাগরিক, স্ত্রী-পুরুষ, নানা আরোপিত, অস্বাভাবিক, অন্যায় নির্যাতনমূলক, ও অসম্মানসূচক বিভাজন সম্পর্কে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে, আমাদের অবহিত করে। শুধু অবহিতই করে না, তা আমাদের মনোভঙ্গি ও ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণ করে। এতটাই করে যে, আমরা ঐসব বিভাজনকে চিরন্তন প্রকৃতিদত্ত, স্বাভাবিক ও বৈধ বলে ধরে নিই। তাই যখন গল্পের সেই ছোট্ট মেয়েটি ধৃত চোরকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, 'ও চোর কোথায়, ওতো মানুষ!' তখন আমাদের অভ্যস্ত চিন্তা হঠাৎ ধাক্কা খায়। লালন এই চিন্তাটিকেই কি প্রকাশ করেননি তার গানে : 'লোকে বলে, লালন কি জাত সংসারে'? লালন প্রশ্নটি করেছেন বলেই সেটি আর শিশু-সুলভ প্রশ্ন থাকে না, তা সামাজিক অস্বাভাবিক বিভাজনসমূহের তীব্র সমালোচনাও হয়ে ওঠে। কাজেই সংস্কৃতির ব্যাপারটি মোটেও সরল নয়।

আমরা অন্যকে দেখতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখতে পাই না। তার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়। সমাজও হচ্ছে দর্পণ। সমাজ মানে অন্যলোক: অন্যেরই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে। অন্যের ভালোবাসায় বা উপেক্ষায়, ঘৃণায় বা ভ্রূকুটিতে, স্বীকৃতিতে বা অবজ্ঞায় আমার প্রতি অন্যের যে মনোভঙ্গি

প্রতিফলিত হয়, তাই দিয়ে নিজের মূল্যায়ন করি। ঐ সমাজ দর্পণে বিম্বিত আমির সঙ্গে আমার একান্ত দর্পণে বিম্বিত আমিকে মেলাই এবং তদনুযায়ী আনন্দিত বা বিষণ্ন হই; সার্থকতার বোধ দ্বারা উজ্জীবিত হই বা ব্যর্থতার বোধ দ্বারা আক্রান্ত। যে মূল্যমানে নিজেকে বিচার করি তাও সমাজ থেকে গৃহীত, অন্যকে যে বিচার করি তাও ঐ সমাজ থেকেই গৃহীত। কবে গ্রহণ করলাম জানি না তা। বস্তুত ঐ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি শৈশব কাল থেকেই চলতে থাকে এবং তার অনেকটাই অসচেতন। বড়ো আগ্রহের সঙ্গে ঐ মূল্যমান গ্রহণ করি কারণ আমি সমাজের স্বীকৃতি চাই, সমাজ আমাকে আপন বলে গ্রহণ করুক এমনটি চাই। সমাজে আমার ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে চাই তথা ক্ষমতার সাথে সংলগ্ন থাকতে চাই।

এই মূল্যমান অবশ্য বায়ুভূত নির্দেশমালা নয়, ঐ মূল্যমান জীবনের অর্থবিন্যাসেরই নর্ম্যাটিভ নিদান স্বরূপ। ঐ অর্থারোপকেই বলে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানেই সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা। ঐ অর্থারোপিত হয় জীবনের সমস্ত দিকের ওপরই। সমস্ত দিক বলতে আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস, নান্দনিক বোধ, নৈতিকতা সব কিছুই। আমাদের চারপাশের যে জগৎ তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত প্রপঞ্চ, বস্তু ও নির্বস্তু কল্পনা ও যুক্তি, বাসনা ও বিভ্রম সবই সংস্কৃতি কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যাত হয়। ঐ ব্যাখ্যাই আমাদের জীবনের ব্যাখ্যা। ঐ ব্যাখ্যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আমরা সকলেই মাথায় ঐ অর্থবিন্যাস বহন করি। তবে ঐ অর্থ সমুচ্চয় সর্বতো সমসত্ত্ব নয়। স্থান ও কালভেদে, শ্রেণী ও স্তরভেদে, গোত্র ও গোষ্ঠী ভেদে তা কিছুটা আলাদা হয়েই যায়। তবে কেবল মাত্র শ্রেণীদূরত্ব বা গোত্র বিচ্ছিন্নতাই কেবল লোকের চিন্তার জগৎটি বিচ্ছিন্ন করে দেয় তা নয়, আমাদের একই ধর্ম, শ্রেণী বা সমাজভুক্ত ব্যক্তির মাথাতেও ঐ পরিবাহিত অর্থসমুদয়ের সীমা ও প্রকরণ এক থাকে না, এমনকি সব সময় সমন্বিতও থাকে না। নানা বিরোধী ভাবনা বহন করেই আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করি। ঐ স্ববিরোধ সম্পর্কে আমরা সচেতনও থাকি না।

চিরকাল অবশ্য এমনটি ছিল না। মানব সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের একটা দীর্ঘ পর্যায় ছিল যখন ধর্মই ছিল সকল অর্থের উৎস। মানুষের সব ভাবনা ও চিন্তাকে ধারণ করতো ধর্ম। সমাজের সকলেই ছিল ঐ ধর্ম অনুশাসিত ব্যাখ্যার অনুসারী। ঐ ভূয়োদর্শনের ছিল একটা সমগ্রতা ও সমন্বিত রূপ। ব্যক্তি ছিল ঐ সমগ্রের অংশ। তার একক অস্তিত্ব বা ভাবনা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু সমাজ বদলাচ্ছিল, বদলাচ্ছিল পৃথিবীর ভূগোল, অভিজ্ঞতার আধার ও উপাত্ত, বদলাচ্ছিল চিন্তার আদল। ঐ অদৃষ্টপূর্ব অভিজ্ঞতা ও উপাত্ত যেসব প্রশ্নের অবতারণা করল সনাতন ভাবনা ও বিশ্বাসে তার যথাযথ উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসটি নানা কারণে আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রশ্নবোধকতা ও সংশয় ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছিল। ফলত বিশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে বিশ্লেষণের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হতে লাগল। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপে একটি ভাববিপ্লবের সূচনা হল যার চূড়ান্ত ফল আজকের আধুনিকতা। গ্যালিলিও ও নিউটন, দেকার্তে ও কান্ট, হব্‌স

[illegible]শো, ডারউইন ও হেগেল, মার্কস ও ফ্রয়েড জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তত্ত্বসমূহের অবতারণা করলেন তাতে ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে ধর্মের [তথা খ্রিস্টধর্মের] অসাপত্ন্য প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবলোকনের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম রহস্যও উন্মোচিত এমন একটি প্রত্যয় দেকার্তে থেকে লাপ্লাস পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল দেখতে পাই। নেপোলিয়নকে লাপ্লাস তাঁর গ্রন্থ 'এসেজ অন প্রবাবিলিটি' দিয়ে এলে নেপোলিয়ন প্রশ্ন করেছিলেন আপনার গ্রন্থে ভগবানের কোন উল্লেখ নেই কেন? লাপ্লাস উত্তরে বলেছিলেন: 'I have no need for that hypothesis'। এর ফলে শিক্ষিত জনের মধ্যে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল আজো তার নিরসন হলো না। গভীর ধর্মবিশ্বাসী মিল্টন সংশয় তাড়িত হয়ে গ্যালিলিওর সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর ওপর নির্ভর করে 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক মহাকাব্য রচনা করলেন যার নায়ক প্রথম মানুষ আদম। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এসে সেই 'হৃত-স্বর্গের' স্বপ্ন আর ত্যাগের মত প্রতিষ্ঠা পেল না। বরং শেলীর দেবদ্রোহী প্রমিথিউস ও গ্যেটের কালাপাহাড়ি ড. ফস্টাস ঊনবিংশ শতকের মনোভূমি যেন দখল করে নিল। বহমান চিন্তার অভিঘাতে ধর্মাশ্রয়ী জ্ঞানের সমগ্রতা ও সমন্বিত রূপটি যেমন গেল চূর্ণ হয়ে, তেমনি সংশয় আক্রান্ত মন ধর্মীয় ট্রান্সডেন্টালিজম থেকে আশ্রয়চ্যুত, নির্বাসিত বোধ করতে লাগল। অনিশ্চয়তা ভারাক্রান্ত বুদ্ধিজীবীরা বিকল্প ভাবাদর্শের সমগ্রতার সন্ধানে আশ্রয় ও সান্ত্বনা খুঁজল সংস্কৃতির বিশাল পাতালে। লুকাচ বললেন, ঊনবিংশ শতকে যে উপন্যাসের বিকাশ ও জনপ্রিয়তা তা ঐ অর্থানুসন্ধানেরই পরোক্ষ প্রকাশ, 'Transcendental homelessness'-এর আকুতি দ্বারা প্ররোচিত। ম্যাথু আর্নল্ড বললেন, বিশ্বাসরিক্ত পৃথিবীতে কবিতাই ধর্মের স্থান দখল করবে একদিন এবং সংঘাত মুখর রক্তলাঞ্ছিত মানব সমাজে যেখানে মানুষ, 'Swept with confused alarms of struggle and flight/where ignorant armies clash by night.' সেখানে সংস্কৃতিই আনবে শান্তির উপাচার।

ম্যাথু আর্নল্ড স্বদেশীয় শ্রমিক বিদ্রোহ রাজনৈতিক সংঘাত ও সামাজিক বিপর্যয়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সম্ভাব্য প্রতিষেধক হিসেবে সংস্কৃতি বিচারকে এনেছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। তাঁর গ্রন্থটির নামকরণই করেছিলেন 'সংস্কৃতি ও নৈরাজ্য' (১৮৬৮)। তিনি সংস্কৃতিকে স্থাপন করেছিলেন সামাজিক নির্বেদ ও নৈরাজ্যের বিপরীত কোটিতে। সংস্কৃতিকে ধরেছিলেন সৌষম্য ও বৈদগ্ধের মানবিক মাধুর্য ও মননের প্রকাশ রূপে। মানুষের পাশবিকতাকে প্রশমিত করতে হবে। ব্যাপক নৈরাজ্যের কারণ প্রচলিত সমাজ ও সভ্যতার সীমাবদ্ধতা : 'Men of culture and poetry are again and again failing, failing conspicuously, in the necessary first stage to a harmonious perfection, in the subduing of the great obvious faults of our animality.' মৌলবাদী পিউরিটানরা অতীতে সে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের অসহিষ্ণুতায় তাঁরা মানব মাধুর্যের ও মননের 'আলো'র দিকটি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

আর্নল্ড চান সমাজের সকল স্তরে ঐ 'মাধুর্য ও মননে'র চর্চা। কিভাবে সেটি হতে পারে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এর পর থেকে একশ বছর ধরে যে সংস্কৃতির প্রশ্নটি নিয়েই নিরন্তর আলোচনা চলে আসছে তার কারণ আর কোন প্যারাডাইম নেই জ্ঞানের সমগ্রতাকে ধরার। এরিক কাহ্‌লার, ওর্তেগা ই. গাসেত, আন্তনিয় গ্রামসি, টি. এস. এলিয়ট, সি. পি. স্নো, এফ. আর. লিভিস, জর্জ স্টাইনার, রেমন্ড উইলিয়াম্‌স, অ্যালান বস্লুম, আর্নেস্ট গেলনার, এডওয়ার্ড সাঈদ, ফ্রানৎস ফানন, অমর্ত্য সেন প্রমুখ চিন্তাবিদ নানা দিক থেকে আজকের সমাজে সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরা সকলেই আপন আপন দেশ ও সমাজের সমস্যা ও সঙ্কটের প্রেক্ষিত থেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি, তার শক্তি ও সামর্থ্য, হতাশা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউই 'ভিক্টোরীয় লিবারাল স্বপ্নের কাল্পনিক বাগানে' আবদ্ধ থাকেননি। বরং কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সুপরিকল্পিত মারণ-যজ্ঞে তিন কোটি লোকের মৃত্যু, বিশেষ করে খ্রিস্টান নাৎসিদের দ্বারা ত্রিশ লক্ষ ইহুদিদের গ্যাস চুল্লিতে পুড়িয়ে মারার বীভৎসতা, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক হিরোশিমা ও নাগাসাকির দশ লক্ষ বেসামরিক নাগরিককে একেবারে অকারণে পারমাণবিক বোমার বর্ষণে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার বর্বরতা, গ্যের্নিকার গণহত্যা তাঁদের চিন্তার ও নৈতিক বোধের মর্মমূলে আঘাত করলো। কি করে এসব ঘটতে পারলো? আর্নল্ড যে মানবিক মাধুর্য ও পরিশীলনের কথা বলেছিলেন তা কি নিতান্তই অবাস্তব ইচ্ছাপূরণ? না কি নৈতিক নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের মধ্যে যে অসীম ক্ষমতার প্রলোভন নিহিত আছে তাই ঐ নিষ্ঠুর বর্বরতার জন্য দায়ী? —এসব প্রশ্ন ও আরো সব প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সব নিয়ে আলোচনায় যাব না। শুধুমাত্র এইটুকু বলব যে, ঐ সব আলোচনা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির মূল্যায়নেও প্রাসঙ্গিক হবে।

দুই

বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। এই তিনটি পর্যায়ই বহিরাগত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আগ্রাসন ও বিচ্ছিন্নতা দ্বারা চিহ্নিত। তবে সংস্কৃতি যেহেতু রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না তাই বাঙালি সংস্কৃতির একটি আবহমানতা অব্যাহত ছিল যদিও বহিরাগত জনগোষ্ঠী বাহিত নতুন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মিথ, আচার ও সমাজ কাঠামো প্রভৃতি গভীর প্রভাব ফেলেছে। কালে তার অনেক কিছুই বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে, স্থাননাম, লোকাচারে ও দেবদবী কল্পনায়, জন্ম, বিবাহ, বধূবরণ অনুষ্ঠানে, উপাচারে তার চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়ে আছে। ঐ সংশ্লেষণ একদিনে হয়নি, কোন অনুশাসন বা ঘোষণা দ্বারাও তা প্রচলিত হয়নি। সংস্কৃতির বিরোধ বা সংঘাতও যে ছিল না তাও নয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা নিরন্তর উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়, সে উৎকণ্ঠা এখনও আছে। উৎকণ্ঠা আত্মপরিচয় থেকে, ঐতিহ্য থেকে, উৎসাদিত হওয়ার।

বাঙালি সংস্কৃতির আধুনিক পর্যায়ের গণ্ডীরেখা অঙ্কিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক পরাধীনতা-নিয়ন্ত্রিত অবস্থান দ্বারা। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রবেশ করেছিল বণিকতন্ত্ররূপে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল সামরিক প্রযুক্তি দ্বারা। একই সঙ্গে বহন করেছিল আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি-সঞ্জাত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, যা আমাদের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবমূল্যায়িত করে আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতাকে মানসিক অধস্তনতায় পর্যবসিত করেছিল। প্রবর্তন করেছিল প্রাযুক্তিক জ্ঞানের নতুন প্যারাডাইম তাদের বিজয়কে বৈধ ও স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত করতে। আমাদের জন্যও ঐ পাশ্চাত্য জ্ঞানেই মুক্তি ও উন্নয়ন এমন একটি প্রতিশ্রুতির আবহও তৈরি করেছিল শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচারিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পুঁজিতন্ত্রের অমানবিক দাপটে সেটি হওয়ার উপায় ছিল না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে সর্বজনীন নয়, ক্ষমতা নিরপেক্ষ নয় এই সত্য ক্রমেই প্রকটিত হতে লাগল। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানি কর্মকর্তারা বিলেতে বসে নির্ধারণ করেছেন 'a limited science' বিতরিত করাই হবে সুবিবেচনার কাজ। 'a good policy' সম্পর্কে স্পিভাক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর 'A Critique of Post Colonial Reason' (২০০৩) গ্রন্থে। পাশ্চাত্যের 'লিবারাল জ্ঞান', যুক্তি ও প্রযুক্তির প্রতারণা ধরা পড়ল, যখন দেখা গেল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় উচ্চবর্গের ব্যক্তিরাও ক্ষমতায় অধিকার পেলেন না এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের উষরতায় মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এবং তার বদলে পাওয়া গেল মন্বন্তর, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি নিরন্তর বিক্ষোভ ও সংঘাত। ঐ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে আমরাও সংস্কৃতির আবিষ্কার ও আলোচনায় প্রবেশ করলাম। আলোচনার সূত্রপাত করলেন নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এটিকে তারা দেখলেন তাদের আবিষ্কারের প্রশ্ন হিসেবে। ঐ শ্রেণী ও বিষয় দুইই নতুন প্রপঞ্চ। দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য বিকল্প ভাবনার অন্বেষণে আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নে ব্যাপৃত হলেন। শিক্ষার মিলন ও বিরোধ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা হল।

পাশ্চাত্যের পজিটিভিজম ঋদ্ধ নতুন জ্ঞান এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম অনুসারী বহিরাগত প্রশাসক ও শিক্ষকবৃন্দ নতুন চিন্তার, বিতর্কের, বিশ্লেষণের যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন, তার কোন প্রভাবই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় পড়ল না, ভাবলে অবশ্য ভুল ভাবা হবে। তাঁদের একাংশের চিন্তার জগতে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। আলোড়ন দেখা দিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত অন্য অংশেও। প্রথম আলোড়নটি ইতিবাচক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংশ্লেষণ অভিমুখী। দ্বিতীয়টি নেতিবাচক, পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা সূচক।

প্রথম ধারার বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্যজ্ঞানের আধুনিকতা-প্রবণ দিকগুলির আত্মস্থকরণ, দেশীয় ঐতিহ্যের নির্মোহ পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার-এর পক্ষে জনমত গঠনে তাদের প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগ

নিয়োজিত করলেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুগন্ধর ব্যক্তিবর্গ ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নতুন ধরনের কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনেরও আবির্ভাব হয় এই সময়ে, যাদের সদস্যরা নতুন জ্ঞানের সব বিষয় ও বিতর্ককে পাবলিক ডিসকোর্স করে তোলেন। ইয়াং বেঙ্গল গোষ্ঠী, যাঁরা প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্র—যথা রামকমল সেন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রসময় দত্ত প্রমুখ ঐ নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। এ ছাড়াও সোসাইটি ফর একুইজিশন অব জেনারেল নলেজের মত প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানান্বেষণের মত পত্রিকাও এর আগে কেউ ভাবেনি বা দেখেনি। নতুন ধরনের সাহিত্যও রচিত হল যার সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোনই মিল ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন লেখকদের উদাহরণ। এ ছাড়াও কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজি কবিতা লিখেছেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস লিখেছেন ইংরাজি ভাষায়—'Rajmohan's wife', সাগরপারের পাঠকদের মনে রেখে। হোমি ভাবা তাঁর 'Location of Culture' গ্রন্থে কলোনিয়াল সংস্কৃতির এই পর্যায়কে বলেছেন হাইব্রিডিটির পর্যায় বা সংকর সাহিত্য। আমাদের ঐতিহাসিকরা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুকরণে একে বর্ণনা করেছেন বাংলার রেনেসাঁস বলে। কিন্তু ঔপনিবেশিক গণ্ডীর কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন বিকশিত হল না, দেশের মনোজগতেও তেমনি রেনেসাঁস ঠিক বিকশিত হল না। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশকে নতুন ও আধুনিক ভাবনা উদ্বেলিত করলেও, অন্য বৃহত্তর অংশে বর্ণ-বর্গ-ক্ষমতা বিভক্ত হিন্দু সমাজ কাঠামোর পিছুটান, সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের বিরোধ, ইন্দ্রজাল ও রহস্য উৎসাদনকারী যুক্তি-নির্ভর ভাবাদর্শের সর্বগ্রাসিতা এক অব্যবস্থচিত্ততার জন্ম দিল যার অন্তরতলে ছিল আধুনিক প্যারাডাইম সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ও ভয়। তার সঙ্গে যুক্ত হল রাধাকান্তদেবের মত বিত্তবান ক্ষমতাশালী সমাজপতিদের সনাতন ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও আচার অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণাতীত পুনর্বাসনের প্রয়াস, এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের ক্যারিসমাটিক উপস্থিতি। ফলত রেনেসাঁস আর জনগণের মন স্পর্শ করল না। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগণের কাছে রেনেসাঁসের ভাবনাসমূহ দূরাগত গুঞ্জনের মতো শোনাল, অস্পষ্ট, অপরিচিত বিপজ্জনক সমাজ সংস্কার পরিচিত ভাবনার অভ্যস্ত পোতাশ্রয়ের নিরাপত্তা ছেড়ে অনিশ্চিত সমুদ্রে ভেসে পড়া তাঁরা মূর্খতা বলেই জ্ঞান করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের সংস্কার প্রয়াস কার্যত ব্যর্থই ছিল।

এই দুই বিরোধী প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী একটি তৃতীয় অবস্থানে স্থিত গোষ্ঠীর কথাও বলতে হয় : যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষিত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, যাঁরা স্বাজাত্যাভিমানী কিন্তু ধর্ম ও সমাজের নবায়নে আগ্রহী, যাঁরা পাশ্চাত্যের ভাবনা ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু নিজস্ব মূল্যমানে জাতীয়তাবাদ, সাম্য ও নারীমুক্তির ধারণা গ্রহণে ইচ্ছুক তাতে যতটা আবেগাচ্ছন্নতা ছিল ততটা চিন্তা ও বিশ্লেষণ ছিল না।

এঁরা যতটা স্বাধীনতা ও আপোসপ্রবণ ততটা সাহসী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু এই গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধী ভাবনা এদের মস্তিষ্কে অসমন্বিত সহাবস্থানরূপে থেকে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসুকে এই গোষ্ঠীভুক্ত ধরা যায়। এই মিশ্রিত ভাবনাটাই শেষ পর্যন্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্বশীল ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রাধান্য পেলেন তা অবশ্য শুধুমাত্র তাঁদের অসামান্য সংবেদন মননের জন্য নয়, তাঁরা তাদের লেখার মাধ্যমে যে সমাজ বক্তব্য হাজির করছিলেন তারও জন্য। এদের বক্তব্য উৎকণ্ঠিত হিন্দু পাঠকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল ও সান্ত্বনাদায়ক। এঁদের পাঠকরা সমাজ পরিবর্তন ও সংস্কার সম্পর্কে একটা মিশ্র সংকেত পেতে থাকলেন, যাকে তাঁরা নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দুভাবেই ভাবতে পারলেন। এঁদের যুক্তিচয়নকে রক্ষণশীলতার পক্ষে বা পরিবর্তনের অনুকূলে দুভাবেই পাঠ করা যেতে পারে। সনাতন জীবনাচরণ ও ভাবাদর্শ নির্মিত অধিকাংশ পাঠক রক্ষণশীলতার পাঠটিই গ্রহণ করলেন। তাতে মননের চাইতে ভক্তি, বিশ্লেষণের চাইতে বিশ্বাস প্রাধান্য পেল। রেনেসাঁস ততটাই পরাভূত হল। ইউরোপে রেনেসাঁসের ফলে যে 'প্যারাডাইম শিফ্‌ট' বা চিন্তার কাঠামো বদল ঘটেছিল বাংলাদেশে তা হলো না। ইউরোপে রেনেসাঁসের যোগফল ছিল ভবিষ্যৎমুখী যুক্তি-তাড়িত অন্বেষা, আমাদের রেনেসাঁস হলো অতীতমুখী, 'অ্যাটাভিস্টিক' ও বিশ্বাসকাতর। তার মনোভঙ্গি বিদ্রোহের নয়, আপোসের।

এই রেনেসাঁস যে মুসলিম সমাজকে স্পর্শ করল না, এটাও রেনেসাঁসের একটা ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মুসলিম মননের জাড্যতা বা 'পার্ভাসিটির' কারণে নয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি তার কারণ। আমরা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাব না। শুধুমাত্র ফলাফল সম্পর্কে দুটি একটি ছোট মন্তব্য করব। বাংলার রেনেসাঁসকেও যে হিন্দু-মুসলিম দুটি সাম্প্রদায়িক অভিধায় বিভক্ত করতে হল, সেটিই রেনেসাঁস শব্দটির ব্যবহারের যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান করে। বাংলাদেশে মুসলিম জাগরণ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। তবে বিলম্বিত হলেও তা হিন্দু জাগরণের প্যাটার্নটিই অনুসরণ করেছিল। রাধাকান্ত দেবের মতই নওয়াব আব্দুল লতিফ তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গি সত্ত্বেও সমসাময়িক দেলোয়ার হোসেন আহমদের মুক্তমনা সেক্যুলার বিশ্লেষণ ও সংস্কার প্রস্তাবের চাইতে অনেক বেশি প্রাধান্য ও আনুগত্য পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতই হাজি শরীয়তুল্লাহ্ অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির মূল্যবোধের চাইতে। ফরায়েজি ও ওয়াহাবি মৌলবাদ অনেক দ্রুত অনেক বেশি ব্যাপকতা পেয়েছিল। আলেমদের ইসলাম ব্যাখ্যানের প্রকোপে মীর মশাররফ হোসেনের অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি 'বিষাদসিন্ধু' পৌত্তলিকতা-স্পৃষ্ট ও হিন্দু চিত্রকল্পদুষ্ট বলে নিন্দিত হয়েছিল, যা প্রত্যাখ্যানেরই শামিল। সৌভাগ্যক্রমে উপন্যাস-বুভুক্ষু নতুন মুসলমান পাঠক সমাজ ঐ মূল্যায়নকে প্রাসঙ্গিক মনে করেননি। বাঙালি মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে ছিলেন যে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী তার সঙ্গে ঐতিহাসিক

কারণে জনসাধারণের একটা সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হয়েছিল। তাও মুসলিম রেনেসাঁসে জটিলতার কারণ। মুসলিম রাজন্যবর্গ ও ভূম্যধিকারীরা ইংরেজদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হলেও দীর্ঘকাল সেটা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা আশা করেছিলেন ক্ষমতায় তাঁরা পুনর্বাসিত হবেন। আলেমরা দেশে গ্রামে অসহযোগের ফতোয়া দিয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার অনুসারীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিয়েছিলেন। ১৮৫৭-তে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এর কোনটিই সফল হয়নি। সিপাহি বিদ্রোহেও ব্যর্থতা অভিজাত মুসলমানদের হৃতক্ষমতায় পুনর্বাসনের শেষ স্বপ্ন নষ্ট করে দিল এবং ঔপনিবেশিক অধস্তনতার বাস্তবতায় তাঁরাও জাগ্রত হতে লাগলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসৃত হলেও সামাজিক ক্ষমতায় তাঁরা থেকে গেলেন এবং আভিজাত্যের অভিজ্ঞান হিসেবে নিজেদের বিদেশাগত পরিচয়ে তাঁরা এতটাই আত্মমুগ্ধ ছিলেন যে, সেই স্মৃতিকে লালন করেছেন নিত্য জীবনাচরণে। বাঙালি জনসাধারণ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোন আত্মীয়তা বোধ করেননি। ঐ বিচ্ছিন্নতা বাঙালি মুসলমানদের প্রতিও প্রযুক্ত হল। অভিজাতরা বংশ গৌরব, সামাজিক অবস্থান, উর্দু ও ফারসি ভাষা ব্যবহার ও সংস্কৃতি চর্চার অভিমানে স্থানীয় মুসলিম আতরাফ জনসাধারণের সঙ্গে যে স্পর্শ-সম্পর্ক-হীন দূরত্ব রচনা করলেন, তার ফলে সমাজের ভাবনার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগই স্থাপিত হচ্ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিষয় হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পত্র অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উঠলে পরে ফরিদপুরের নওয়াব আব্দুল লতিফ বাংলা মুসলমান ভদ্রজনের ভাষা নয়, ইতর শ্রেণীর ভাষা এবং ভদ্রশ্রেণীর ভাষা উর্দু এই যুক্তিতে শিক্ষায় বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করলেন। নওয়াব আব্দুল লতিফের সামাজিক উচ্চবর্গে অবস্থানের কারণে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে মুসলিম শিক্ষিত মহলে বাংলা যথার্থই মুসলমানের ভাষা কি না এই উদ্ভট অবাস্তব বিতর্ক চলতে লাগল। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক সেখ আব্দুর রহিম স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : 'একটি মাত্র প্রবল চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সেই চিন্তাটি এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তম স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব,—কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পূণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব—এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব।' সেখ আব্দুর রহিম আরো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন: 'কি শোচনীয় দুরবস্থা। ইংরাজি ও বাঙ্গালাও ... কাফের ভাষা হইয়া গিয়াছে।' একাধিক লেখকের লেখায় ঐ মনোভাব প্রকাশিত হল।

ভূম্যধিকারী অভিজাতদের একটি বড় অংশই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহান্বিত হলেন না বটে তবে এবার ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করলেন, কারণ, এতো সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ নয়, ক্ষমতার সঙ্গেও সেতু রচনা করা। স্যার সৈয়দ

আহমদের লেখায় ঐ নতুন উপলব্ধি ও আপোসের মনোভাব দেখা গেল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিচিত বাংলায় অভিজাত পরিবার সমূহের মধ্যে নওয়াব আব্দুল জব্বার, নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার আব্দুর রহিম, স্যার আমীর আলী, হুগলীর আব্দুস সোবহান, ওয়াজেদ আলী খান পন্নি ও গজনভি পরিবার—এঁদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয়। এঁরা আধুনিকত্বের সংস্পর্শে এলেন, কিন্তু বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারলেন না। ফলত মুসলিম রেনেসাঁসের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে তাঁরা ছিলেন অনুপস্থিত। যিনি মুসলিম চিন্তার ও সংস্কৃতির আধুনিকায়নে যথার্থই নেতৃত্ব দিতে পারতেন সেই সৈয়দ আমীর আলী সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি ও ভাবনার নবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বদেশীয়দের উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য না রেখে, ইসলাম ধর্মের ভাষ্য ও মুসলিম ইতিহাসের গৌরবের বয়ান লিখলেন ইংরাজি ভাষায়, পাশ্চাত্য পাঠকমণ্ডলীকে সামনে রেখে যেন বা তাঁদের অনুমোদন প্রত্যাশায়। ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে, তাতে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রকল্পে মুসলমানদের স্থান সম্পর্কে যে সমালোচনামূলক বীক্ষার [Critical discourse] সুযোগ তার ছিল এবং প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি পালন করলেন না। তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি এই যে, তিনিও শেষে স্বদেশ পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে গেলেন বিলেতে, নিজের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, তমসাচ্ছন্ন, সংস্কৃতি-বিমুখ সমাজকে ফেলে রেখে—এক পরাভূত এক্সাইল।

হতে পারে, সামাজিক নেতৃত্বে আরূঢ় ভূম্যধিকারী শ্রেণীটি তাঁদের সুরক্ষিত সুযোগ পরিপোষিত অবস্থান থেকে স্বতই রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে থাকেন। চিত্ত মুক্তির নামে কোনরূপ সামাজিক কাঠামোগত বা ভাবগত মৌলিক রূপান্তরে উৎসাহ বোধ করেন না। যে কোন সামাজিক সংকট, বিপ্লব, উপপ্লবে তাঁরা রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তনহীনতার পক্ষে তাঁদের বুদ্ধি, চাতুর্য ও শক্তি প্রয়োগ করেন। তিতুমীর, হাজি শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিঞার কৃষক-বিদ্রোহের সময় এবং ওয়াহাবীদের বিপ্লব-গর্ভ 'দারুল হরব' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ যেমন জৌনপুর থেকে মৌলানা কেরামত আলীকে নিয়ে এলেন স্থিতাবস্থার পক্ষে শহরে গ্রামে ওয়াজ করার জন্য। মোহসিন ফান্ডের টাকা কিভাবে খরচ করা হবে তাই নিয়ে যখন বিতর্ক ও মামলা হতে লাগল, তখন নওয়াব আব্দুল লতিফ প্রস্তাব করলেন যে, সব টাকাটাই মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও ধর্মীয় শিক্ষায় খরচ করা হোক, কোন আধুনিক শিক্ষা দানকারী নতুন স্কুলগুলির জন্য নয়। সরকার অবশ্য ঐ প্রস্তাব নাকচ করে অর্ধেক টাকা স্কুলের মুসলমান ছেলেদের বৃত্তির জন্য এবং বাকি অর্ধেক কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেন। অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে রেনেসাঁসের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব যে আসেনি তা বিস্ময়কর নয়। রেনেসাঁস পরিবাহিত আধুনিকতা ইউরোপে এসেছিল পরিবর্তন-প্রয়াসী, উদ্ভাবন-অনুকূল, উদ্যোগী বণিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও কালাপাহাড়ি বুদ্ধিজীবীদের দুঃসাহসী চিন্তার প্রণোদনায়। বাঙালি মুসলিম সমাজে এই দুটি শ্রেণীই অনুপস্থিত ছিল।

বাংলাদেশে মুসলিম বিনিয়োগক্ষম বণিকশ্রেণী (entrepreneurial class) ১৯৭২-এর আগে দেখাই দেয়নি। ১৯০৬ নাগাদ মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হলেও এঁরা প্রায় সবাই আমলা-ফয়লা, পেশাজীবী শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও নিম্নবর্গের কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু সমাজ-চিন্তার নির্মাতা বা নিয়ামক ছিলেন না। মীর মশাররফ হোসেন, সেখ আব্দুর রহিম প্রমুখ দু-একজন করে লেখকের আবির্ভাব ঘটছিল—কিন্তু নগরকেন্দ্রিক আধুনিকতা-প্রাণিত 'ইন্টেলিজেন্সিয়া' শ্রেণী যাঁরা রেনেসাঁসের নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁরা ছিলেন অনুপস্থিত। ফলত একমাত্র বেগম রোকেয়ার লেখায় ছাড়া র‍্যাডিক্যাল নতুন চিন্তার জন্ম হল না সত্য, তবে নানা সূত্রে আধুনিকতার ভাবনাসমূহ পৌঁছে গিয়েছিল বাংলার নগরকেন্দ্রগুলিতে, কিন্তু তার পরিপোষক শক্তিশালী বণিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদ্বয় সেখানে ছিল না। ছিল না বলেই সমাজে পরিবর্তন প্রয়াসী বেগের সঞ্চার হল না। তবে ইউরোপীয় চিন্তাবিপ্লবের উৎকণ্ঠা সমাজকে স্পর্শ করল ঠিকই। সেই উৎকণ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করলেন মৌলবাদী আলেম শ্রেণী। উৎকণ্ঠা প্রশমনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেন তাঁরা। সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের মুসলমানদের সঙ্গে এদের নিত্য ও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল।

উৎকণ্ঠার একটি তুচ্ছ অথচ বিভ্রমকারী কারণও ঘটেছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী কোম্পানির অনুমতি ছাড়াই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আসেন এবং শ্রীরামপুরে খ্রিস্টীয় পুস্তকাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছাপাখানা স্থাপন করেন। এ দেশে হিকিই অবশ্য প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৭৭ সালে, তাঁর নিজের পত্রিকা 'হিকিজ জার্নাল' প্রকাশের জন্য। শ্রীরামপুর থেকে কেরীর তদারকিতে রামরাম বসুর অনুবাদে বাইবেলের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর থেকে বাংলা পত্রিকাও প্রকাশিত হল। সেই হল প্রথম বাংলা পত্রিকা। গ্রামেগঞ্জের হাটে ধর্মপ্রচারক পাঠানো হতে লাগল। লোকজন পাদ্রিদের ভাঙা বাংলায় মথি-লিখিত সুসমাচার শ্রবণ করে কৌতূহল ও কৌতুক দুইই অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু কৌতূহল অচিরাৎ উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হল যখন বর্ণসংস্কার পীড়িত, অধিকার বঞ্চিত, দরিদ্র নিম্নবর্গের হিন্দুজন এবং সমাজের প্রান্তশায়ী উপজাতীয়রা দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে লাগল। উৎকণ্ঠা আতঙ্কে রূপান্তরিত হল যখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লালবিহারী দে, সূর্যগুডিভ চক্রবর্তী, মহেশচন্দ্র ঘোষের মত উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গও হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে লাগলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কেশব সেন প্রমুখের খ্রিস্টধর্ম প্রীতির কথাও উৎকণ্ঠার কম কারণ হয়নি। মেকলে ১৮৩৬ সালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion.' তাই যেন সত্যি হল।

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ প্রভাবিত ডিরোজিও শিষ্যবৃন্দ হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীরা—রামকমল সেন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ হিন্দুধর্মের নানা অসংগতির তীব্র সমালোচনা করে চলেছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর তো

ছিলেনই। হিন্দু সমাজের চারদিকে একটা আতঙ্কের পরিমণ্ডল সৃষ্ট হল। চারদিক থেকেই সংস্কারের কথা উঠছিল। বাইরে থেকে খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসন এবং ভেতর থেকে স্বজাতীয়দের আক্রমণে পাছে হিন্দু সমাজ হীনম্মন্যতায় নির্জিত হয়ে পড়ে, তাই এবার অনেক সংস্কারবাদীও ধর্মরক্ষায় এগিয়ে এলেন এবং তাঁদের সংস্কার প্রকল্প থেকে রক্ষণশীলতার দিকে অনেকটা সরে এলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেন ব্রাহ্ম বিবাহবিধি লংঘন করে সনাতন প্রথায় নিজেদের সন্তানদের বিবাহ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম প্রার্থনা রীতিতেও পরিবর্তন আনেন। তাদের প্রার্থনা সভায় মনন-সংযত ধ্যান ও নীরব উপাসনার জায়গায় বৈষ্ণবীয় উল্ললিত ভক্তি ও উচ্ছ্বসিত আবেগের পুনরাবাহন করলেন। বিদ্রোহীরা সনাতনত্বে প্রত্যাবর্তন করলেন। লিবারাল ও সেক্যুলার রাজনারায়ণ বসু ইসলাম সম্পর্কে কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তিনিও ১৮৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে'র উপর বক্তৃতা দিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাঁর কবিসুলভ কল্পনার চমৎকারিত্বে, অনায়াস উপমার অজস্রতায়, অসাধারণ বাকপটুতায় ভক্তমণ্ডলীকে সম্মোহিত ও আপ্লুত করে ফেললেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে যথেষ্ট পরিচিত নন বলে আপ্লুত দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'মানুষের মন তো সরষের পুটুলি, গিঁট খুলে ছড়িয়ে পড়লেই চিত্তির, আবার খুঁটে খুঁটে জড়ো করাই ভার। মনও যদি সংসারের কাজে কখনও ছড়িয়ে যায় তবে একজায়গায় তাকে গুটিয়ে আনা কঠিন'। ভক্ত জিজ্ঞেস করল : 'ঈশ্বরকে তো দেখতে পাইনে?' রামকৃষ্ণ বললেন : 'পানা সরিয়ে দেখ, তবে তো জল পাবি'। 'নর্তকির মত থাকবি'। রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'পশ্চিমের মেয়েদের দেখিসনি মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবি'। এসব উপমায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। অতীন্দ্রিয় অলৌকিক তাঁর ব্যক্তিসত্তায় লৌকিক রূপ গ্রহণ করেছে এমনই ভাবলেন তাঁরা। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানস্ফীত সংশয়-আক্রান্ত বিদগ্ধজনের অন্তরে রহস্য ও ইন্দ্রজালের পুনর্বাসন ঘটলো। আবার অন্যদিকে যুক্তির পথ অনুসরণ করেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্রের নবব্যাখ্যান রচনা করলেন, বিশ্লেষণপ্রবণ আধুনিকদের কাজে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার দুঃসাধ্য প্রয়াসে। কৃষ্ণ চরিত্রের চারপাশে যে অলৌকিকত্বের ও ইন্দ্রজালের নির্মোক জমেছিল তাকে প্যারাডক্সিক্যাল যুক্তির জারকে কেলাসিত করে কৃষ্ণকে এক মহত্তম লৌকিক ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার অন্বিষ্ট। পাশ্চাত্যে জার্মান গবেষক স্ট্রাউসের খ্রিস্টান চরিত্রের লৌকিকত্ব সংক্রান্ত গবেষণা বা ইংরেজ ঔপন্যাসিক হামফ্রে ওয়ার্ডের 'রবার্ট এলসমিয়র' নামক উপন্যাস হয়তো তাঁকে প্ররোচিত করে থাকবে। হিন্দু গৌরব পুনরাবিষ্কারে ম্যাক্স ম্যুলারের অবদানও কম কার্যকর হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের লোকোত্তর সত্য প্রতিপাদনের জন্য পৃথিবীর পথে পথে বক্তৃতার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। চারিদিকে সনাতন ধর্মের জয়জয়কার পড়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র আরো একধাপ এগিয়ে তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে' হিন্দু মিলেনিয়াল স্বপ্নকে একটি

রাজনৈতিক মাত্রা আরোপ করলেন, হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণ আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হল। নতুন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের ধারণা জনগণকে রাজনীতির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে টেনে নিল, তাদের জীবনে ছিল একটা উদ্দেশ্যপ্রাণতা বর্ণাশ্রমকে পাশ কাটিয়ে।

খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একই উৎকণ্ঠার জন্ম দিল এবং প্রতিক্রিয়াও হিন্দু সংরক্ষণবাদিতার সমান্তরাল পথ অনুসরণ করে মুসলিম জাতীয়তাবাদে উপনীত হতে খুব একটা সময় নিল না। নেতৃত্ব দিলেন 'মুসলমানত্বে'র ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে আলেম শ্রেণী ও পীর সম্প্রদায়। ওয়াহাবি ও ফরায়েজি প্রভৃতি ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলনের নামে বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি ধর্মীয় বিভাজন রেখা টানা জরুরি হয়ে পড়ল। ঐ বিভাজন যে খুব স্পষ্ট হল বা সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রযোজ্য হল তা নয়, তবে রাজনৈতিকভাবে তা কার্যকর হল। আলেম শ্রেণী দেখলেন ঐ ধর্মীয় কার্যক্রমসমূহের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে উপনীত হলেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দেখলেন রাজনীতির ধর্মীয়করণ তাঁদের অতি দ্রুত ক্ষমতার সন্নিকটবর্তী করবে। দুই পক্ষই মুসলিম জাতীয়তাবাদে আশ্রয় খুঁজলেন। সংস্কৃতির ঐ বিভাজন এর যে দূরত্বের সূচক হল, তাই নয়, তা সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও প্ররোচক হল।

হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ দুই ক্ষেত্রেই যেটা ঘটল সেটা হল, 'হিন্দুত্ব' ও 'মুসলমানত্ব' অর্থাৎ ধর্মপরিচয় রাজনীতির নিয়ামক হয়ে উঠল; আবার অন্যভাবে এও বলা যায় যে, রাজনীতি নিজের প্রয়োজনে সংস্কৃতিকে অধিকার ও বিনির্মাণের চেষ্টা করল। অথচ জাতীয়তাবাদও অধিকাংশ রাজনৈতিক ধারণার মতই পাশ্চাত্য থেকে আগত এবং গণতন্ত্র, ব্যক্তির ধারণা, ধনতন্ত্র বা মানবাধিকারের মত একটি সেক্যুলার ধারণা। আসলে পাশ্চাত্য আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ও প্রযুক্তি যে আধুনিকতার সূচনা করল তার প্রবণতা হল সর্বব্যাপী সেক্যুলারাইজেশনের দিকে প্রশাসন, আইন, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বৈধতা সবই সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। ফলত মুসলিম জাতীয়তাবাদ আবির্ভূত হল ভুল সময়ে। এটা যে কতটা সত্য সেটা বোঝা যায় যখন দেখি পাকিস্তানি রাষ্ট্রের প্রথম প্রত্যুষেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে ধর্মীয় ভাবনায় রাজনৈতিকভাবে হিন্দুমুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে নতুন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সদস্য। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তাবাদের অবসান। এ রকম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের সম্ভাবনায় আলেম শ্রেণী ও ধর্মীয় রক্ষণশীল অংশ ক্ষমতার খেলায় ধর্মের অস্ত্র ছেড়ে দিতে মোটেও রাজি ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই একদা পাকিস্তানবিরোধী জামাতে ইসলামী নেতা মওদুদী লাহোরে কাদিয়ানি-বিরোধী গণহত্যা সংগঠিত করে ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের নামে ইসলামকে পাকিস্তানি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করলেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদ মুসলিম মৌলবাদে রূপান্তরিত হল। শুধু তাই নয় মৌলবাদী মৌলানারা হয়ে উঠলেন মুসলিম সমাজের কাছে ইসলামের একচ্ছত্র ব্যাখ্যাতা, আধুনিক-মনা সংস্কারকরা নন। ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলন সংস্কার থেকে মুক্তি নয়, বরং সংস্কারে

অধিকতর নিমজ্জনে পর্যবসিত হল। তবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত ফাঁকি অবশ্য আরো নাটকীয় ও ব্যাপকভাবে দেখা দিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধে—যে বিভাজন ধর্মের নামে প্রশমিত করা গেল না, যে রাষ্ট্রকে নিষ্ঠুরতম গণহত্যা চালিয়েও একত্র রাখা গেল না। অনিবার্য ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সেক্যুলার প্রবণতার বাঙালি অস্তিত্বের ঐতিহ্য-বাহিত সেক্যুলার প্রবণতার সমাপতন ঘটল মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য যেমন কোন প্রচার করতে হয়নি, তার কোনও সুযোগও ছিল না। আমরা আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি এড়াতে পেরেছিল নেতৃত্বের আধুনিকতাস্পৃষ্ট বিশ্লেষণ-প্রবণতার দ্বারা। অবশ্য তাকেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধর্মীয় গোঁড়ামির মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অভাব হয়নি।

তিন

ইউরোপীয় রেনেসাঁস রূপান্তরিত হয়েছিল আধুনিকতায়। বাংলাদেশের খণ্ডিত রেনেসাঁস জন্ম দিল পঙ্গু আধুনিকতার। কলোনিয়াল শিক্ষার মাধ্যমে হলেও প্রাশ্চাত্য আধুনিকতার ভাবাদর্শ যে যুক্তি ও মুক্তির আশা সঞ্চারিত করেছিল, কলোনিয়াল অধস্তনতা সেই মুক্তির সম্ভাবনাকে নস্যাৎও করেছিল। ফলত ঐতিহ্য-আশ্রিত জাতীয়তাবাদে আধুনিকতার এজেন্ডা কোন প্রাধান্য পেল না। ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনই অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল। বরং আধুনিক চিন্তার প্যারাডাইম যে উৎকণ্ঠার অবতারণা করেছিল জাতীয়তাবাদকে সেই উৎকণ্ঠার হাত থেকে অব্যাহতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রায় সকলে। ফলে আধুনিকতা ব্যাহত হল। তবে আধুনিকায়ন ব্যাহত হল না। বিদেশাগত পুঁজি নিজস্ব প্রয়োজনেই রেললাইন, রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, অটোমবিল, শিল্প-কারখানা, নগর, বন্দর, ব্রিজ, খনি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বহুতল ভবন, সিনেমা, বেতার প্রভৃতি প্রকৌশলগত উদ্ভাবনা পাশ্চাত্যে প্রচলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশেও আমদানি করলেন। আমাদের জীবনযাত্রার বহিরঙ্গের রূপটিই পাল্টে গেল। বাহ্যত আমরাও নগরবাসী আধুনিক হয়ে উঠলাম। আধুনিকতার একটি মিথ্যে নির্মোকে আবৃত হয়ে বাস করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের মনোজগৎ দখল করে রাখলো মধ্যযুগীয় ভাবনা বিশ্বাস ও সংস্কার। পানি-পড়া, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, পীর-মুর্শেদ, মাজার-খানকা শরিফ, যাদু টোনা, তাবিজ-কবজ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস থাকলো অবিচল তিনশো বছর আগের মতই। আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের মধ্যে একটা বৈপরীত্য ও বিচ্ছেদ রচিত হল আমাদের মনে। ঐ বিচ্ছেদ-কল্পনা অবশ্য আমাদের মানসিক অব্যবস্থচিত্ততা ও জাড্যতারই উদাহরণ মাত্র। কিন্তু তার চেয়েও যেটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বিব্রতকর সেটি হল, আধুনিকতা সম্পর্কে আমাদের বৈরিতা এবং যে কোন আধুনিক চিন্তার প্রত্যাখ্যান। আমরা প্রযুক্তি গ্রহণ করলাম কিন্তু মনোভঙ্গি গ্রহণ

করলাম না। মৌলবাদীরাও এর ব্যতিক্রম নন। আধুনিকতা অবশ্য সব পেয়েছির দেশ নয়, আধুনিকতা নিয়ে আমাদের শতেক আশাভঙ্গ আছে। কিন্তু সেসব সমালোচনাও আধুনিকতার ভেতর থেকেই উত্থিত হচ্ছে, যুক্তির ব্যবহার করেই বহমান চিন্তার আলোকে, অন্ধ-সংস্কার বা ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নয়। আধুনিকতার বিকাশ এখনো অব্যাহতই আছে—কি চিন্তায়, কি প্রযুক্তিতে। ঊনবিংশ শতক ধরেই পুঁজিতন্ত্রের হাত ধরে আধুনিকতা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিশ্বের অসংখ্য দেশের অসংখ্য সংস্কৃতির ওপর পড়েছে তার প্রভাব। সে প্রক্রিয়া এখনও চলছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির মত তথ্যপ্রযুক্তির জটাজলে পৃথিবী একটি মহাগ্রামে পরিণত হয়েছে। হয়তো এটা একটা অতিশয়োক্তি। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশ ও তার সংস্কৃতিও এখন সেই বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। বাংলাদেশও আধুনিকতার 'দ্বিতীয় বিপ্লবে' প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও কোন মানস উপকরণ নিয়ে? তৃতীয় বিশ্বের একদা উপনিবেশভুক্ত দরিদ্রদেশগুলির সবার জন্যই এই প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ঐতিহ্যের বিচিত্রতা ও মানস-সংশ্লেষণের দার্ঢ্য ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা নিয়ে এই আধুনিকতায় প্রবেশ করতে হবে। অন্যথায় দ্রুতধাবী গোলকায়ন যে আবর্তের মধ্যে নিয়ে আমাদের ফেলবে তার সবটাই আনন্দকর বা কল্যাণকর হবে এমন ভাবনায় সংশয় প্রকাশ করি।

বস্তুতপক্ষে এই বিশ্বায়নের জটিল নির্মম আশ্লেষ ১৯১৪ থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তার আগে এভাবে আমরা অনুভব করিনি। বিশ্বব্যাপী পুঁজিতন্ত্র ও তার সহযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগ্রাসনের ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা পূর্ববর্তী একশো বছর ধরে বিপর্যস্ততা ও পরিবর্তনের মুখে পড়েছিল। কিন্তু এমন মহাযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মারণাস্ত্রের বিবর্তন ও নির্বিচার হত্যার যে বৈনাশিক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হল এবং যে তিন কোটি লোককে হত্যা করা হল তা হঠাৎ বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে, যদিও এর সামাজিক অভিঘাত আমাদের সংস্কৃতি চিন্তায় যথাযথ স্থান পায়নি। তা যে শুধু আমাদের সমাজকে ফেলে দিল তাই নয়, তা আমাদের মনের অগোচরে বদলে দিল আমাদের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনাকেও। যুদ্ধ হয়ে উঠল আবেগহীন নিষ্ঠুরতার প্লাবন ও পরিচয়হীন মৃত্যুর অজস্রতা। যুদ্ধশেষে যাঁরা ফিরে এল নন্দিত হল বীর রূপে, আমাদের সন্তান বা ভাই বা কারো স্বামী, তারাই কিন্তু নিরাবেগ অনুশোচনাহীন নিষ্ঠুর হত্যাকারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন একটি কবিতায় লিখেছিলেন:

> Merry it was to laugh there—
> Where death becomes absurd and life aburder
> For power was on us as we slashed bones bare
> Not to fear sickness or remorse of murder. (1917)

ন্যায় অন্যায়ের বোধ তলিয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণের সঙ্গে উচ্ছ্রিত রক্তের তলায়। আমরা সে মৃত্যু মেনে নিলাম। কারণ সে মৃত্যু ছিল সংবাদপত্র বাহিত পরোক্ষ মৃত্যু মাত্র। তা আমাদের চোখে দেখতে হয়নি।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পায়ে পায়ে এল মন্বন্তর। দশ লক্ষ বিত্তহীন, আশ্রয়হীন, অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খেতে না পেয়ে মারা গেল। নাগরিকদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। অবশ্য এবার মৃত্যু চোখে দেখতে হল, কিন্তু ঐ পরিব্যাপ্ত করুণ মৃত্যু আকীর্ণ রাজপথে চলমান জনস্রোতের মধ্যে ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর উদাসীনতাও সম্ভবত আর কখনো দেখা যায়নি। কখন যে আমাদের নিজেদেরই অগোচরে আমাদের ভাবনায় আমরা নিঃসাড় ও অমানবিক হয়ে পড়েছি আমরা বুঝতেই পারিনি। তবে ঐ মৃত্যুতে আমাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল না। সমগ্র সমাজের হাত প্রতিবেশী হত্যার রক্তে রঞ্জিত হল এর কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরকালের মাথায় কলকাতায় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয়তাবাদী অধিকার সংরক্ষণের নামে। এবার হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই অংশবিশেষ প্রত্যক্ষ উন্মত্ত অগ্নিসংযোগ অবাধ লুণ্ঠন ও নির্মম হত্যায় অংশগ্রহণ করল এবং বৃহত্তর অংশ যারা দর্শক তারাও ঐ বীভৎস হত্যাযজ্ঞে উৎসাহিত সমর্থন জানালেন, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ মনে মনে। নৈতিক অবক্ষয় অমানবিকতা ও পাশবিকতার যে পাতাল-যাত্রায় আমরা দাঙ্গায় লিপ্ত গুণ্ডাদলের মানসিক সহযাত্রী হয়েছিলাম তা কি সত্যিই আমাদের লজ্জিত করে? আমরা কোন অপরাধ বোধ-দ্বারাও বিড়ম্বিত হইনি। কারণ সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে থাকতে চাই, তাদের অনুমোদন অনেক প্রয়োজন। তপন রায় চৌধুরী তার বাঙালনামায় লিখেছেন এই পাশবিক কাজগুলির জন্য যেন আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমাদের কুকর্মের জন্য আমাদের কোন লজ্জাও নেই। আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে উত্তর পুরুষকে তা জানানো প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ ঘটল। তবে ঐতিহাসিক গণবিস্মৃতি (amnesia) যেন মুছে ফেলল ঐ কলঙ্ক। একি তবে গোপন গ্লানি অতিক্রম করার মানসিক প্রতিবর্ত?

এরই পঁচিশ বছর পরে এল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহতম বিনষ্টির ও নৃশংসতম গণহত্যার দশমাস। হাজার হাজার গ্রাম আধুনিক সমর প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুহূর্তে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষাধিক মহিলা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন। আনুমানিক ত্রিশ লক্ষাধিক পুরুষ ও নারী আহত ও নিহত হয়েছিলেন। ধর্মনির্বিশেষ প্রায় এককোটি লোক ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মনুষ্যত্বের এমন ব্যাপক অবমাননা নির্যাতন ও সন্ত্রাস বাংলাদেশে কেউ আগে দেখেনি। এর সবই যে বিজাতীয় বহিরাগত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল তা নয়। আল বদর, আল শাম্‌স, রাজাকার প্রভৃতি নামে সেনাবাহিনীর সহযোগী সন্ত্রাসী বাহিনীর গড়ে তোলা হয়েছিল স্থানীয় ইসলাম ধর্মানুসৃত দলের কর্মীদের নিয়ে। তাদের নামকরণে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িত আলবদর, রাজাকার প্রভৃতি অভিধা

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করে বৈধতা আদায় করার জন্য। গণমৃত্যুর আতঙ্কবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও জনগণকে অবশ্য বিভ্রান্ত করা যায়নি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রাণিত জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই গোপনে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে আগাগোড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে তাদের প্রাণাধিক সন্তানদের। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় প্রকল্প বর্বরোচিত শক্তি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও পরাভূত হল।

পরাভূত হল আত্মগোপন ও সাময়িকভাবে পশ্চাদ্‌গমন করল বটে কিন্তু নিশ্চেষ্ট হল না। তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধের চার নেতার হত্যা—পরবর্তী পর্যায়ে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন আপতিক হতে পারে না। শুধু তো প্রত্যাবর্তনই করল না, সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল তার আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ। পাকিস্তনি ও আফগান মৌলবাদীদের সঙ্গে এদের সংযোগ খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বৈশ্বিক মৌলবাদও যে উৎসমূলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে অন্বিত এসব সযত্নকৃত গোপন তথ্য এখন ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করার স্থান এই নিবন্ধে নেই। শুধু স্মরণ করা যেতে পারে যে আরব অভিযান টি. ই. লবেসের এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ গুপ্তচর হ্যারি ফিলবির শিক্ষাগুরু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড গ্রানভিল ব্রাউন মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনবিরোধী জামাল উদ্দিন আফগানীরও পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক ছিলেন, ঠিক যেমন লর্ড কার্জন ইবনে সাউদকে ব্রিটিশ সহায়তা দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী রশীদ রিয়াদকে ক্ষমতাচ্যুত করে ওয়াহাবী মৌলবাদ প্রতিষ্ঠায় এবং লর্ড ক্রোমার [ইভলিজ বেয়ারিং] পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন অধিকতর মৌলবাদী আব্দুহুর। মৌলবাদের বৈশ্বিক প্রসারও তাই ধর্মীয় চেতনার পুনরাবিষ্কার নয়।

জনগণ যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার প্রধান কারণ এই যে সমাজে আমাদের চেতনা নির্মিত হয় তা কোন একটি ডিসকোর্স দ্বারা পরিচালিত হয় না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই ডিসকোর্সত্রয়ের কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে প্রাধান্য পায় যথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আরো এই কারণে যে, সংস্কৃতির কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী বা সীমারেখা নেই, তা সব সময়েই বাস্তবকে অতিক্রম করে যায়, সংস্কৃতি নিজেই নিজের বাস্তবকে তৈরি করে। জাতীয়তাবাদের একজন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন মনে করেন, জাতীয়তাবাদ একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রয়োজন সৃষ্ট সংস্কৃতি-সঞ্জাত মানস-নির্মাণ। একটি জাতি হচ্ছে একটি 'imagined community'—একটি গোষ্ঠী নিজেকে যেভাবে ভাবতে ভালবাসে এবং তার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও দ্বিধা করে না। তবে তার প্রধান লক্ষ্য স্বাধীনতা হলেও জাতি কোন সমসত্ত্ব সংগঠন নয়। তার সদস্যদের মধ্যে আছে স্তর, অবস্থান, ক্ষমতা, শিক্ষা, বিশ্বাস ও রুচির ভিন্নতা, যাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদের অন্তর্লীন বিরোধ। ভূপৃষ্ঠের শিলাবিন্যাসের মতই সমাজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের Fault-line-গুলিও স্বতই আমাদের চোখে পড়ে না। ভূ-গর্ভের শিলাচ্যুতি যেমন উপরিতলে ভূমিকম্পন হিসেবে দেখা দেয়, তেমনি ক্ষমতার বিন্যাসে স্তরচ্যুতি ও সমাজে উপপ্লব, বিকল্প ভাবনা, নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দেয়। রাষ্ট্র তখন মরিয়া হয়ে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে ঐ উৎকণ্ঠা প্রশমনের জন্য ও বিকল্প ভাবনাসমূহ প্রতিহত করার জন্য। রাষ্ট্রানুমোদিত সংস্কৃতির একটি রচিত ভাষ্য মিডিয়াসমূহের মাধ্যমে, শিক্ষার-পাঠক্রমে, ঐতিহাসিক তথ্য গোপনীয়তার মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে—যাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক বলপ্রয়োগ। তবে বলপ্রয়োগ কেবলই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রক্রিয়াও চালু হয়, যার লক্ষ্য হয় বিরোধী সমালোচনাপ্রবণ বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের কণ্ঠরোধ করা এবং তাতে ব্যর্থ হলে খুন করে ফেলা। বল প্রয়োগ বেশিদিন গোপনও করা যায় না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে 'কোবরা', 'অপারেশন ক্লিন হার্ট', 'র‍্যাব' প্রভৃতি নিষ্ঠুর উৎপীড়নের প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে চলে আসে। মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাদের হত্যা ও নির্যাতনের কার্যক্রমে। একটি নিরোধ, আতঙ্কের ও অসহিষ্ণুতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। বিকল্প ভাবনাকে তাই বলে প্রতিহত করা যায় না, কারণ তা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং জনগণের মধ্যে বিরোধের বিন্দুতে বিকল্প ভাবনার অবস্থান। তা বিলম্বিত হতে পারে, উৎকণ্ঠা জড়িত হতে পারে কিন্তু তার যৌক্তিক অনিবার্যতাকে সাধারণ লোক অস্বীকার করতে পারে না। উৎপীড়নের অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা জনসাধারণের মনে সংস্কৃতির সরকারি ভাষ্যের বৈধতা সম্পর্কেও সংশয়ের জন্ম দেয় এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় বিকল্প ভাবনাকে অনিবার্য করে তোলে। তবে রেনেসাঁস চর্চার সীমাবদ্ধতার কারণে এবং মৌলবাদমুখী সংঘাতপ্রবণ রাজনীতির আগ্রাসনের কারণে মুসলিম সমাজে একটা চিন্তার অনচ্ছতা ও ভয় থেকেই গেছে। তাই ঐ বিকল্প ভাবনা ভবিষ্যতে কতটা গভীরে যাবে, বা কতটা ব্যাপক হবে তা বলা কঠিন। সংস্কৃতির সবটুকু প্রকাশ্য নয় সে কথা আগেই বলেছি।

আধুনিকতার প্রশ্নটি আবার সামনে চলে এসেছে। বিশ্বায়ন ও তথ্য বিপ্লব এর প্রধান কারণ। তথ্য প্রযুক্তি একদিকে যেমন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে বণিক ও প্রশাসককে শক্তিশালী করেছে ঠিক তেমনি সংবাদ ও তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে জনসাধারণকেও চিন্তার দিক থেকে সক্ষম ও শক্তিশালী করেছে। তথ্যের উন্মুক্ত প্রবাহ সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ও চিন্তার নিরোধ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। তবে এর অন্য পিঠও একটা আছে। তথ্যের উন্মুক্ত প্রবাহ নির্বিচার তথ্যের প্লাবনে ভোক্তার আহরণের উত্তেজনায় তার যতটা সময় নিয়ে নিচ্ছে তাকে চিন্তার ও সংশ্লেষণের ততটা সময় দিচ্ছে না। তাছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নব নব শাখায় যে তত্ত্বরাজি সমাহৃত হচ্ছে, যে ডিসকোর্সসমূহ রচিত হচ্ছে তা আমাদের বৌদ্ধিক সংশ্লেষণ ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি। ফলত সংস্কৃতের মাধ্যমে যে সমন্বিত

অর্থায়নের সম্ভাবনার কথা ভাবা হয়েছিল তাই নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এর ফলে বিরোধ ও অসহিষ্ণুতা হয়তো কমবে, কমাই উচিত, কিন্তু উৎকণ্ঠা ও অর্থের বুভুক্ষা প্রশমিত হবে না।

সাধারণ মানুষ এ সমস্ত ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ও আবেগগত আশ্রয় খোঁজে পীর-ফকিরের কাছে, সহজ বোধগম্য সমাধানের আশায়। কিন্তু ভবিষ্যতের তথ্য-সমৃদ্ধ শিক্ষিত সংশয়ী মানুষ তেমন আশ্রয়ে শান্তি পাবে কি? জাতীয়তাবাদের নির্মাণে সর্বত্রই বুদ্ধিজীবীদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। তারাই ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকল্প ভাবনা হিসেবে জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব নির্মাণ করেছিল ও তথ্য সন্নিবেশ করেছিল। তার আগে সাধারণ লোক তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীকে সমসত্ত্ব একক পরিচয়ে দেখতে পায়নি বা ভাবতে পারেনি। ঐ আত্মপরিচয় লাভ তাদের জীবনের একটা নতুন তাৎপর্য দিয়েছিল, সঙ্কট থেকেও মুক্তি। শুধু জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলেই নয়, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা পালন করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবনা জগতের মধ্যে তারা সেতুবন্ধ রচনা করেছিল, তারা ছিলেন পাশ্চাত্য আধুনিকতার ব্যাখ্যাতা ও উপনিবেশের সংশ্লেষক। ভবিষ্যতেও সেই ভূমিকাই তাদের আবার পালন করতে হবে। মার্কস বলেছিলেন পুঁজিবাদ বুদ্ধিজীবীদের ওপর থেকে অতীন্দ্রিয় বিভাব বলয় অপসারিত করে সবাইকেই বৃত্তিজীবীর পার্থিব দৈনন্দিনতায় পর্যবসিত করেছিল। সব মানুষের মনের গভীরেই transcendent halo-এর একটা আকাংক্ষা থেকে যায়। কে বলতে পারে যে ঐ হৃতবিভাব গৌরব বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীরা আবার পুনরুদ্ধার করবেন না?

অরুণ সেন

বাঙালির আত্মপরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতি দীর্ঘ ইতিহাসের প্রান্তে এসে হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রাণশক্তি। কারণ সে-সংস্কৃতিতে অখণ্ডতা ছিল হয়তো কোনো-একরকম, কিন্তু ছিল না বিস্তার ও বৈচিত্র্য, টিকে থাকার জন্য যা খুব জরুরি। উনিশ শতকের জাগরণ যাকে বলি, সেই ঘটনা মুক্তি এনে দিল বাঙালিকে তার সেই বদ্ধতা থেকে। এসে গেল আত্মবিস্তারের ও আত্মবিকাশের সুযোগ। বাঙালি আর শুধুই বাঙালি নয়, সে ভারতবাসী এবং কখনো-কখনো বিশ্ববাসী, আন্তর্জাতিক। রামমোহন রায় পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের বেদান্তের ভারতবর্ষের সঙ্গে, আরবি তর্ক-বিজ্ঞানের সঙ্গে, সুফি প্রেমসাধনা ও খ্রিস্টীয় জীবনতত্ত্বের সঙ্গে। স্পেনের স্বাধীনতালাভে উল্লসিত ও নেপল্‌স্‌-এর পরাধীনতায় মর্মাহত এই মনীষীই দিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম শিক্ষা। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা তো বিস্তারের সেই সীমাকে আরও বাড়িয়েই গেলেন। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে পেলাম সমাজসচেতনতা, যুক্তিবাদ, ক্লাসিক সাহিত্য-প্রীতি ও মানবিক বোধের নতুন-নতুন অনুভব এবং তা ঘটতে পেরেছিল এই নতুন যুগেই। মাইকেল মধুসূদনের কাছ থেকে বাঙালি এপিকের, আধুনিক কাব্যবোধের নতুন সংজ্ঞা। অক্ষয়কুমার দত্ত খুলে দিলেন ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের দরজা। এমনিভাবেই পেলাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত-কে, আরও অনেককেই। সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার ও জাতীয়তার উন্মেষের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম অন্য-এক পরিচয়ে—শুধু বাঙালি-পরিচয় নয়, আরও এক বিস্তারিত ও শক্তিশালী পরিচয়, যার নাম ভারতীয়তা।

এর গৌরব যেমন তেমনি এর ফাঁকিও জানা নেই তা নয়। সমস্তটাই ঘটেছিল বিদেশী এক শক্তির ঔপনিবেশিক শাসনের ছায়াতলে। তার দায় তো থাকবেই। তাছাড়া, যাকে আমরা জাগরণ বলছি, তা অতি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের। তার বাইরে অগণ্য মানুষের কাছে তা নিতান্তই অলীক। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব ক্রমশই পাকিয়ে উঠেছে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার সুবিধা পাওয়া অল্প-কিছু সৌভাগ্যবানদের সঙ্গে বাকি আপামর হতভাগ্য মানুষজনের। উপরন্তু, হয়তো এসব কারণেই, এই জাগরণের নায়ক যারা তাদের মধ্যেও সত্য হয়ে উঠেছে অনেক দ্বিধা, পিছুটান, স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা।

এ সবই আমরা জানি এবং কম-বেশি মানি। কিন্তু আপাতত যেটা ভাববার, তা হল, ভারতীয়তার এই গৌরবময় এবং প্রয়োজনীয় আত্মবিস্তারে কি সে-সময়ে কিছুটা অনিবার্যভাবেই দুর্বল হয়ে গেল না বাঙালি আত্মপরিচয়ের ভিত? সবটা

নিশ্চয়ই নয়। আমাদের মনে আছে : রামমোহন রায় লিখেছিলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', বিদ্যাসাগর তাঁর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে এবং মাইকেল স্বনামে লিখেছিলেন খাঁটি বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির গদ্য এবং প্রহসন। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা, টেকচাঁদ বা হুতোমের গদ্য, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক—এ সবই অল্পবিস্তর আমাদের সংশয়কে দূর করতে পারে হয়তো। তবু, মানতেই হয়, জোরটা পড়েছিল, খুব সংগতভাবে, ভারতীয়তার চর্চার দিকেই। কারণ, আমরা আগেই দেখেছি, আত্মবিস্তারের তাগিদটাই ছিল নব্যশিক্ষিত বাঙালির সময়োচিত অভিজ্ঞতা।

নিকটতর প্রত্যক্ষ বাস্তব বিষয়ে উদাসীনতা বা দ্বৈতের চমৎকার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর চিন্তাজগতে একদা পশ্চিমী হিতবাদী দার্শনিকেরা ছিলেন, শেষ জীবনে সর্বভারতীয় গীতা। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাঙালি পঠককে। তবু 'বঙ্গদেশের কৃষক' বা 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সত্ত্বেও বলতেই হয়, কী উপন্যাসে কী প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ বাস্তবে তাঁর অল্পই মনোযোগ। বরং তাঁকে ঘিরে যে গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মজলিশ', তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ, যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকার বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন অনেক মাটির কাছাকাছি। বঙ্কিমশিষ্য হরপ্রসাদই অকপটে বলেছিলেন, 'তাঁহার [বঙ্কিমচন্দ্রের] কাব্যের গণ্ডী কিন্তু বাংলায় আবদ্ধ নহে ... তাঁহার কাব্যের ক্ষেত্রও ভারতময়। তিনি লিখতেন বাংলায়, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের কবি হইবেন, সব জাতির কবি হইবেন। ... তাঁহার প্রধান চেলা অক্ষয়বাবু কিন্তু বাংলার বাহিরে একেবারে যাইতে চাহিতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে ভালো করিয়া চেনা। তাই তিনি খুঁটিনাটি করিয়া বাংলার সব জিনিশ দেখিতে চাহিতেন। বঙ্কিমবাবু খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। তিনি বড়ো বড়ো জিনিশগুলিই দেখিতেন; ভালো ও বড়ো জিনিশগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরিবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায়, তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার সকল নায়ক-নায়িকারাই বড়োমানুষ।' অনেক-অনেক কাল পরে এ-যুগের ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও ভিন্ন সূত্রে হলেও, অভিযোগ করে বলেন, 'বাংলায় প্রথম ঔপন্যাসিকদের ভিতর ভারতীয় প্রথমে ডেপুটি আই-সি-এস-রা থাকলেও কেন সেই দেশী ডেপুটিগিরি আর আই-সি-এস-গিরি নিয়ে তখন উপন্যাস তাঁরা লেখেননি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অসামান্য প্যাম্ফলেট লেখেন "বঙ্গদেশের কৃষক"। কিন্তু উপন্যাস লেখা হয় না কেন? ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা সেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাস লেখেননি কেন?'

অবশ্য 'বাংলার বাইরে একেবারে যাইতে' না-চাওয়া কিংবা শুধু 'বাংলাকে ভালো করিয়া চেনা' নিশ্চয়ই কোনো কাজের কথা নয়, মুক্তি নয়। কীভাবে নিকট পরিপার্শ্বকে, চেনা বাস্তবকে, রক্তমাংসের সত্যকে না ছেড়েও নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, উত্তীর্ণ হওয়া যায় বৃহত্তর সীমাতিশায়ী কোনো বোধে, তা শুধু তত্ত্বের ব্যাপার নয়। দ্বৈতের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক ঐক্যে পৌঁছোনোই আধুনিকের অন্বিষ্ট।

বাঙালি সত্তাকে অটুট রেখেও কী করে ভারতীয় হওয়া যায়, বিশ্বনাগরিক হওয়া যায়, সেটাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। কিন্তু ইতিহাসে দেখা গেল, বাঙালি-পরিচয়টা যেন একটু আড়ালে চলে যেতে চায় এ-সময়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি রচনার নাম ছিল 'আর্য্যামি ও সাহেবীয়ানা'। বাধাহীন ভারতীয়ত্বের বিলাস এবং বিচারহীন ইংরেজিপনার অন্ধতা, এ দুয়ের বিরুদ্ধেই তিনি *খাঁটি* বাঙালিয়ানার কথা বলেছিলেন। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নায়কেরা অনেকেই যেমন ভারতীয়ত্বের কালোচিত উত্তরণের মুহূর্তেও সমন্বয়ের কথা বিস্মৃত হননি, তেমনি উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে ওই খাঁটি বাঙালিত্বের পক্ষে বলার মতো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাঁরা তাঁদের যোগ্য ভূমিকা নিয়ে তৈরি ছিলেন, সেইসব কুশীলবেরাও মনে রেখেছিলেন তাঁদের অবস্থানের দ্বৈত ও দায়িত্বের কথা।

এই কুশীলবদের প্রধান একজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং যে-প্রতিষ্ঠান সে-সময়ে খাঁটি বাঙালিত্বের ঐতিহাসিক দায়কে গ্রহণ করেছিল তা হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। সময়টিকে আরেক দিক থেকে, হয়তো সম্পূর্ণতর অর্থে, জাগরণের সময়ই বলা যায়। বঙ্কিমের সময় থেকেই এই দায়ের সূত্রপাত, যদিও তাঁর ভূমিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে সে-সময়ের অন্যতর আয়োজন। এটা যে অন্য ধরণের আরেক জাগরণ সে-সচেতনতা সমকালীনদের কারো-কারো ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবু যখন মরেন, তখনও "ভারত ঘুমাইয়া"; কেবলমাত্র জাগরণের উদ্যোগ হইতেছিল।' বলা বাহুল্য, হরপ্রসাদ সে-সময়ে সঠিক জ্ঞানেই বাঙালির জাগরণ ও ভারতীয় জাগরণকে সমার্থক মনে করেছিলেন।

১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠা। প্রায় প্রথম থেকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এর সঙ্গে জড়িয়ে। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহর'-র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী লেখেন, '১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে শাস্ত্রীমশায় সাহিত্য-পরিষদে যোগ দেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে যে গবেষকমণ্ডলী গড়ে ওঠে তাঁরাই বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ধারায় তথ্যভিত্তিক পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন'। এবং 'শাস্ত্রীমশায়ের পক্ষে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক ছিল। ... শুধু কাজের ক্ষেত্র নয়, সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমে তাঁর অস্তিত্বে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল। খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি-সামর্থ্যের যা-কিছু তাঁর দেবার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই উৎসর্গ করে কৃতার্থ বোধ করেছেন।'

বলা বাহুল্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করলেও তিনি ছাড়াও অগণ্য লেখক ও গবেষক এই জাগরণে অংশ নিয়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মুখপত্র যে পরিষৎ-পত্রিকা তার বিষয়সূচি ও লেখকসূচির দিকে তাকালে অনুসন্ধানের বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় বিস্মিত হতে হয়। বাঙালিয়ানার বহু বিচিত্র বিষয়ে বহু পরিচিত স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিত লেখক বছরের পর বছর লিখে গেছেন এই পত্রিকায়—প্রাচীন সাহিত্য ও পুঁথি-বিবরণ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য ও তার আলোচনা, 'গ্রাম্য' সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য, অন্যান্য প্রতিবেশীদের সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে

লেখা প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম বছরেই 'ছেলেভুলানো ছড়া' নিয়ে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এরকমই বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া ও গান ও লোককথা, নিরক্ষর 'গ্রাম্য' কবির কবিতা, ব্রতকথা ইত্যাদি কত যে সংগৃহীত হত তার সীমা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে হয়েছে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের 'গ্রাম্য' শব্দের তালিকা রচনা। পরিভাষা তৈরিও ছিল একটা প্রধান কাজ। বিশেষত বিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা নিয়ে অনেক লেখা ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র কথা বাদ দিয়েও দেখা যায়, এই বঙ্গীয় জাগরণে কোনো না কোনোভাবে যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা বিপুল। একটু এলোমেলোভাবে যদি দেখে যাই, তবে যাঁদের নাম পাব তাঁরা হলেন: দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, বসন্ত রঞ্জন রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, নিখিলনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আবদুল করিমও অংশ নিয়েছিলেন। এই ধারাবাহিকতা চলে এসেছে সাম্প্রতিকতর কালে রমেশ মজুমদার, দীনেশ ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বা সুকুমার সেন পর্যন্ত। নামের তালিকাই হয়ে গেল, লম্বা তালিকা, তবু তা দৃষ্টান্তের বেশি কিছু নয়। যে-সব বাঙালি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তার পরিধি এত বিস্তৃত যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার আভাস দেওয়াও মুশকিল।

এই সব কিছুর পেছনে, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে, যে মনোভাব কমবেশি কাজ করেছে তা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় বলা যেতে পারে : 'বাঙালিয়ানা, বাঙালিত্ব, আমি বাঙালি এই বোধ'। হরপ্রসাদ তাঁর নিজের গবেষণায়, খুঁটিনাটি অজস্র বিষয়ের আলোচনায়, এমনকি উপন্যাস রচনার সময়ও এই খাঁটি বাংলার শিকড় খুঁজে গেছেন আজীবন। বলেছেন, 'বেশি সংস্কৃত পড়িলে লোক ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়, সেটা খাঁটি বাংলার জিনিশ নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশি ইংরাজি পড়িলে কী হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।' তিনি চেয়েছিলেন এর বাইরে *বাংলার* দিকে নজর দিতে, কারণ বাংলায় 'আর্যের মাত্রা বড় কম, দেশীয় মাত্রা অনেক বেশি' এবং 'ইংরাজিতে ভাবিয়া বাংলায় তর্জমা' করায় আর যাই হোক মুক্তি নেই।

পাশাপাশি বিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ থেকে এসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সাংগঠনিক কর্মেই আত্মনিয়োগ করেননি শুধু, লিখে গেছেন 'শব্দকথা' থেকে 'গ্রামদেবতা' পর্যন্ত নানা গ্রন্থ, নানা প্রবন্ধ। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে, বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে সংগ্রহের কাজ করেছেন, মনীষাদীপ্ত লেখা লিখেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ছিল তাঁর প্রাণ। পরিষৎ-এর এগারো বছর পূর্তি উপলক্ষে বলেছিলেন, 'এশিয়াটিক সোসাইটি মুখ্যত ভারতবর্ষের জন্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ মুখ্যত বাঙ্গালার জন্য আপন চেষ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বৃহৎ ব্যাপার; উহাতে হস্তক্ষেপে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নাই। কাজেই সাহিত্য-পরিষদের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকা উচিত মনে করি। আবার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার বৃহৎ কারখানা লইয়াই এত ব্যস্ত যে, ক্ষুদ্র বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার ভাষা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। সাহিত্য-পরিষদের মতো একটা স্বতন্ত্র সমাজ ইহা লইয়া নিযুক্ত থাকুন, ইহা বাঞ্ছনীয়।'

অবশ্যই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গণ্ডিতে শুধু বাঙালি আত্মসন্ধানের সবকিছু ঘটেছিল এমন তো হতেই পারে না। হারপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও অনেক লেখাই পরিষৎ-পত্রিকার বাইরে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক ও উৎসাহব্যঞ্জক যে কোনো নির্দিষ্ট সংগঠন বা পত্রিকার বাইরে এই সচেতনতা ছড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন, শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহন সেনের কাজ। ১৯০৮ সালে তিনি সেখানে এসেছিলেন, আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। অজস্র লেখা তিনি লিখেছেন নানা বিষয়ে—তার মধ্যে প্রধান ছিল বাঙালির সাধনা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তথ্যনির্ভর অনুশীলন। তাঁর একটা বড়ো দায়ই ছিল বাংলার বাউলদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এবং এই কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল বিস্ময়কর। শুধু 'বাংলার বাউল'-ই নয়, তাঁর একের পর এক বই বেরিয়েছে বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে—'বাংলার সাধনা', 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা', চিন্ময় বঙ্গ'। কয়েকটি মূল বিষয় বারবার ঘুরে-ফিরে আসে তাঁর লেখায়, যেগুলোর দিকে তিনি আমাদের চোখ ফেরাতে চেয়েছেন, এমনকি পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও। বিষয়গুলি হচ্ছে : বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎসে অনার্য উপাদানের প্রাধান্য, বাঙালির সঞ্চয়ন-প্রতিভা ও গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে তার হজমশক্তি ও পুষ্টি, অথরিটির বিপক্ষে সর্বধর্মসমন্বয়ী আচারবিরুদ্ধ সহজ-মানবিকতানির্ভর লোকায়ত-ধর্মের কালজয়ী বিস্তৃতি, বাঙালির অস্তিত্বের মূলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, ইত্যাদি। এর অনেকগুলোই সে-সময়ের আরও কারো-কারো চিন্তারই পরিপূরক ও সংলগ্ন। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন তথ্যবিস্তার ও মানবিক-আবেগের সমন্বয়ে ঠিক যেভাবে বলেছেন তা বোধহয় কেউ বলেননি। এরকমই হয়তো ভিন্ন তাৎপর্যে নাম করা যায়, ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনেরও।

যে-কথা আগে বলা হয়েছে, আবারও জোর দিয়ে বলা দরকার : এই বাঙালি-আত্মসন্ধানকে কূপমণ্ডূকতা মনে করলে অন্যায় হবে। যে তিনজন মনীষীর কথা বলা হল, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর ও ক্ষিতিমোহন, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যাপক কাজ ও চিন্তাকে অনুধাবন করলে দেখা যায়, তাঁরা কখনোই ওই চোরাবালিতে পা দেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণার ক্ষেত্র তো প্রথম থেকেই সুবিশাল—ভারতের ইতিহাস ও ভারততত্ত্বের কত বিষয়ে যে তাঁর মৌলিক ভাবনার পরিচয় আছে তার শেষ নেই। সত্যজিৎ চৌধুরীর অসামান্য কীর্তির ফলে আমরা আজ তা পুরোপুরি জানতে পেরেছি (তাঁর সম্পাদিত রচনা-সংগ্রহের চার খণ্ড আপাতত হাতে পেয়েছি, তাতেই মুগ্ধ আমরা)। ১৯০৬-এ 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর,

১৯১২-তে করলেন 'ঐতয়ের ব্রাহ্মণ'-এর অনুবাদ, ১৯২০-তে লিখলেন 'যজ্ঞ-কথা', ১৯২৬-এ 'জগৎ-কথা', ১৯২৮-২৯-এ 'বেদ-কথা'। বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ক অন্য অজস্র লেখার কথা তো বাদই দিলাম। বাংলার বাউলদের সঙ্গে-সঙ্গে কবীর ও দাদু-ও ক্ষিতিমোহনের কাছে সমান আগ্রহের বিষয়। 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা'-ই তিনি অনুসন্ধান করতে চান, কিন্তু বাঙালির সাধনার প্রেক্ষাপট থেকে, সাম্প্রতিকের অভিজ্ঞতায়। হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর বা ক্ষিতিমোহন ছাড়াও আরও অনেক চেষ্টাই যে হয়েছে তা তো আমরা জেনেছিই। মাঝে-মাঝে সেখানে সংকীর্ণতা বা গ্রাম্যতা যে কারো-কারো ক্ষেত্রে মাথা তোলেননি তা নয়, কিন্তু সব-মিলিয়ে বঙ্গচর্চা যে ভারতচর্চারই প্রয়োজনীয় অঙ্গ সে-ব্যাপারে মতি স্থির ছিল।

এর একটা বড়ো কারণই, আমাদের মতে, এই জাগরণের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নেতৃত্ব দিয়েছেন যদি নাও বলি, অন্তত দিকদর্শন বা প্রেরণার কাজ যে করেছিলেন তা তথ্য দিয়েই প্রমাণ করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম দিন থেকেই সক্রিয় যোগাযোগ তো ইতিহাসেরই ঘটনা। পরিষৎ-ভবনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি যে-কথা বলেছিলেন সেটাই তো ওই জাগরণের মর্মকথা : 'বাংলা দেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া' 'বাংলা দেশের আত্মপরিচয়চেষ্টা'-কে রূপ দেওয়া—লক্ষ্য শুধু 'দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণ বিস্তার'।

আমরা জানি, পরিষৎ-এর একটা বড়ো কাজই ছিল : বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে। ১৯০১ সালে পরিষৎ-এর কোনো-এক মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাঠ করেন 'বাংলা ব্যাকরণ'। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শের বাইরে স্বতন্ত্র ভাষা বাংলার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন। বলা বাহুল্য, বিদ্বোৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে তর্ক ওঠে। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদকে সমর্থন করে বললেন, 'বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন?' শুধু সমর্থনই নয়, সে-বছরই আরও দুটি মাসিক অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ পড়ে তিনি তাঁকে আরও মদত দেন। সে-প্রবন্ধের বিষয় ও পদ্ধতিতে হরপ্রসাদকেই প্রশ্রয় ছিল। প্রবন্ধ দুটি : 'বাংলার কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং 'বাংলা ব্যাকরণ'। হরপ্রসাদের প্রতিক্রিয়া সহজেই আন্দাজ করা যায়। তিনি খুশি হয়ে বললেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্বে আমি এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই।' এ-সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন : 'শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান মনীষী সংশোধনের অথবা প্রতিকারের জন্য কলম ধরেননি। এমন-কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন...। ... রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশ অনুধাবন করে বিচারের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পেয়ে এই আন্দোলন যে কতটা শক্তিশালী হয়েছিল তার ভূরি ভূরি এ রকম প্রমাণ আছে।

ক্ষিতিমোহন সেনের তো সব কাজই প্রায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকতায় ও প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ঘটেছিল। তিনি নিজেই তা বারবার স্বীকার করে গেছেন। 'বাংলার সাধনা'-র *নিবেদন* অংশে আছে :

> পরিশেষে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, "ভারতের ইতিহাসের ধারায় তবু কিছু লিখেছি সে-বিষয়ে। ... বাংলার কথাও কিছু লেখা দরকার। কিন্তু এখন অবসর একেবারেই নেই। ... এ-কাজে আপনারা কেউ হাত দিলে ভালো হত।" এই কথা বলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে মনে মনে বড়ই ভয় হল। তবে তিনি কি আমারই কাছে কিছু চান? সংকোচের সহিত আমি বলিলাম, "সে-দৃষ্টি কি আমাদের আছে? আর বাংলাদেশের নানা দিক। তার কতটুকুই বা জানি। এদেশের ধর্ম ও সাধনার কথা নিয়েই কিছু নাড়ানাড়ি করেছি। তাতে কি আর সব দিকের কথা বলা চলে? সাহস পাই নে।" তিনি বললেন, "সেই দিক দিয়েই না-হয় আপনার যা বলবার আছে তা বলে দিন। তারপরে সেই প্রসঙ্গে আর যদি কিছু মনে আসে তবে তাও প্রকাশ করে বলতে পারবেন। ভয় পাবেন না। কাজ করে যান, আমরা সবাই তো চারদিকে আছি। সবাই আপনাকে শক্তি দেব।"' সেই শক্তি নিয়েই ক্ষিতিমোহন সেন 'বাংলাদেশে সাধনার প্রাণবস্তু যা বুঝেছি' তা প্রকাশ করলেন।

বাঙালির স্বকীয়তার স্বরূপ আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথ শুধু পেরণাই দেননি, সেই চর্চা ও সন্ধানকে একটা বড়ো প্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে দিকদর্শনের কাজ করেছেন নানা ভাবে। বঙ্গ, ভারত ও বিশ্ব : এই তিনের প্রকৃত অবস্থান তাঁর দুরন্ত প্রতিভায় ও সৃজনে যে রূপ পাচ্ছিল, বিরোধে ও দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে, তা কোনো না কোনো ভাবে নিশ্চয়ই ভরসার কাজ করেছিল সকলের কাছেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথাই বলেননি, বলেছিলেন, 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনা'-র কথাও, ভারতীয় ইতিহাসের সূত্রে। বলেছিলেন : অনেক সুখদুঃখ ও জীবনের দাবিদাওয়া নিয়ে 'এই সাধনায় চিরদিনই বাংলা সাড়া দিয়েছে।'

বাঙালি ঐতিহ্যের চর্চা তাই কোনো বদ্ধ অভ্যাস বা গোঁড়ামি নয়—সমকালীনতায়, গ্রহণবর্জনের সচেতনতায় ও নিত্য সৃজনশীলতাতেই শুধু তা অর্জিত হতে পারে। যে-কোনো ঐতিহ্যই তা-ই—শুধু অতীতে পড়ে থাকা নয়, দেশ ও কালের বেড়া ডিঙিয়ে চলা, চিরকালীন যা তাকে বেছে নেওয়া। ঐতিহ্যের সঠিক বোধে ও আধুনিকতার পটেই কেবল এই বাঙালিত্বকে চেনা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গদ্যের চালে বলেছিলেন, 'বাঙালিয়ানার অর্থ এই যে, বাংলার যা ভালো তাহা ভালো বলিয়া জানা, আর যাহা মন্দ তাহা মন্দ বলিয়া জানা। ভালো লওয়া ও মন্দ না লওয়া তোমার নিজের কাজ। কিন্তু জানাটা প্রত্যেক বাঙালির দরকারি কাজ। জানিতে হইলে বুদ্ধিপূর্বক বাংলা দেশটা কী দেখিতে হইবে, বাংলায় কে থাকে দেখিতে হইবে, বাংলার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-সংসার, উৎসব-আনন্দ, দুঃখ-শোক, কুস্তি লাঠিখেলা টোল পাঠশালা

দেখিতে হইবে। ইহার গান গীতি পয়ার পাঁচালি নাচ খেমটা কীর্তন ঢপযাত্রা কবি সব দেখিতে হইবে। মনপ্রাণ দিয়া দেখিতে হইবে। আবার এখনকার কালে যাহা বদলাইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, কনসার্ট, থিয়েটার, ইস্কুল, কলেজ, আপিস, আদালত সবই দেখিতে হইবে। বাংলার ও বাঙালি জাতির সমস্ত জীবনটা ভালো করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তুমি বাঙালি হইবে।'

বাঙালিয়ানা অর্জনের এই মুক্তবুদ্ধি কতখানি কাজে লেগেছিল পরবর্তীকালে? অবশ্যই এই অনুসন্ধানের ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো তত্ত্বের গণ্ডিতে বা কেতাবি রাস্তায় কিংবা অতীতচারণার পঙ্কিল ডোবায়—পেতে হবে জীবনের মুক্ত অঙ্গনে, সৃজনশীল মনের চলিষ্ণুতায়। তাই তো দেখতে পাই, কালক্রমে অ্যাকাডেমিক চিন্তাহীন কল্পনাহীন বঙ্গীয় ফোকলোর-চর্চার প্রসার হয়েছে এই-বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু ঐতিহ্যকে চিনে নেওয়ার আধুনিক সচেতনতা অর্জিত হয়নি কিছুই। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, তথ্যের স্তূপ জমেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির হয়নি কখনোই। বই লেখা হয়েছে বিস্তর, নতুন-নতুন চাকুরি তৈরি হয়েছে অনেক, কিন্তু গড়ে ওঠেনি ওই বিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা। তাই সেখান থেকে কিছু প্রত্যাশা না করাই ভালো।

বরং রবীন্দ্রনাথের পরে, চল্লিশের বা পঞ্চাশের দশকে, বামপন্থী সংস্কৃতিচর্চায় সেই ঐতিহ্যবোধের সজ্ঞানতা ও সৃষ্টিশীলতার হদিশ পাওয়া গিয়েছিল অনেকটাই। সে-সময়ের নাচে-গানে-থিয়েটারে, ছবিতে বা ভাস্কর্যে, সাহিত্যে তো বটেই, দায়বদ্ধতার যে টান ছিল তারই অঙ্গাঙ্গিতায় ফিরে তাকিয়েছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা ঐতিহ্যের দিকে, বাঙালি-সত্তার সারমর্ম খুঁজতে। এমনকি এর পেছনে যে মননক্রিয়া ছিল সেখানেও স্বদেশচেতনা এবং সেই সূত্রে বাঙালি-আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই চেতনা ঠিকমতো জমি পাওয়ার আগেই হারিয়ে গেল রাজনীতির বিভেদ ও ক্ষুদ্র-দৃষ্টির চাপে। বারবার এটাই ঘটেছে। স্বদেশের শিকড়-সন্ধান ও আন্তর্জাতিকতার বোধ যে একজায়গায় মিলতে পারে সেই ভারসাম্যের জ্ঞান বামপন্থী সক্রিয়তা ও সচেতনতা থেকে ঝরে গেছে। আঁকড়ে ধরা হয়েছে সুবিধাবাদী নীতিহীন 'কাণ্ডজ্ঞান'। তার অনেক দৃষ্টান্তই চোখের সামনে। বামপন্থী হওয়া যখন জোরালো মনে করেছি, তখনই ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলের প্রসার ও ব্যক্তিগতভাবেও অংশগ্রহণ বেড়েই চলেছে। কিংবা কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, জমায়েতে-জলশায় দো-আঁশলা কালচারের বিস্তার ঘটলেও আমরা চোখ বুঁজে থেকেছি। কিংবা হয়তো নিজেরাই তার শরিক হয়েছি। আর এই ঔদাসীন্য ও আত্মপ্রবঞ্চনার পরিণামে 'আমরা বাঙালি' বা 'জয় বাংলা' জাতীয় বিপজ্জনক ও নির্মমভাবে পরিত্যাজ্য স্লোগান ক্রমশই পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে। এর পালটা স্লোগান—সুস্থ ও প্রকৃত বাঙালিয়ানার চর্চা ও আত্তীকরণের প্রতিজ্ঞা—উচ্চারিত হয়নি, শেষপর্যন্ত গ্রাহ্যও হয়নি বামপন্থী ভাবনায় বা জীবনযাপনে। ব্যতিক্রম হিশেবে রয়ে গেছে কিছু চেষ্টা, কিছু চিন্তা।

পাশাপাশি, আমরা জানি, তবু বাঙালি-আত্মপরিচয় সন্ধানের একটা গৌরবময় অভিযান ঘটে গিয়েছিল পূর্ববঙ্গের এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের জন্মকালীন আত্মসচেতনতার ধরনে। 'পূর্ব-পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক জাগরণ' নামের ছোট্ট প্রবন্ধে অসীম রায় লিখেছিলেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলার মধ্যে আদান-প্রদান দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও যে সামান্য বই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় তাতে নির্দ্বন্দ্বে বলা সম্ভব যে পূর্ব-পাকিস্তান এক সাংস্কৃতিক জাগরণে উদ্ভাসিত যার তুলনা মেলে না বর্তমান পশ্চিমবাংলায়। শুধু ঢাকা নয়—রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ মধ্যবিত্ত এক গভীর আত্মানুসন্ধানে চোখ মেলে চেয়ে আছে তার অতীত-বর্তমানের দিকে। ... এ জাগরণের নায়ক পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ মধ্যবিত্ত, যার ফলে পাণ্ডিত্য এখন আর থিসিস পেপারের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়, অথবা বলা যেতে পারে, মাস্টারমশাইদের থিসিস আজ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের থিসিসে রূপান্তরিত।' কথাগুলো হয়তো আরও জোর পেয়ে যায় পরের যুগের বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের নানা কর্মকাণ্ডে ও সক্রিয়তায়, ভাষা সাহিত্য সংগীত নাটক ও সমাজভাবনার নানা ক্ষেত্রে—যদিও সেই প্রাণশক্তি আর কতদিন টিকে থাকছে বা থাকবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ-কেউ। লক্ষ করবার বিষয়, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের এই জাগরণের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে তা খুঁজে দেখার দরকার পড়ে না। এই কারণেই বিষ্ণু দে একদা বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও তীব্রভাবে ঐকান্তিকভাবে সত্য।'

পূর্ববঙ্গের মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান কী ভূমিকা পালন করেছিল, তার চমৎকার বিবরণী দিয়েছেন ওয়াহিদুল হক তাঁর প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন : 'একদিকে ... বাঙালির আত্মপরিচয়োন্মুখ অন্বেষার বিস্তার অন্যদিকে এই গানের বিপুল প্রসার—দুইয়ে মিলে সামগ্রিক পরিস্থিতি যেন দ্রুত পাকিস্তানের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাদের দিক থেকেও একটা সীমা টানবার ব্যাপার ছিল—এই পর্যন্ত এগিয়েছে, ভালো—আর নয়। যেখানে পর্যন্ত যাওয়া যাবে না সে রবীন্দ্রসংগীত, অর্থাৎ তা বলতে বুঝোয়, সমস্ত। ... যা কোনোমতে যাবার নয়—ভাষা-সংস্কৃতি, মানুষের আপন ঠিকানা—সেই সব দিতে চাইল ভুলিয়ে। তাদের এই জেদ একাত্তুরে গণহত্যা হয়ে প্রকটিত হল, সাতষট্টিতে তার প্রকাশ হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতের শ্বাসরোধ করবার চেষ্টায়।' 'এই ঘোর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ডামাডোলে রবীন্দ্রসংগীত—তার অষ্টাদশ মূর্তি নিয়েই—যেন সংগ্রামের গানে পরিণত। মারমুখী মানুষ, কিন্তু কণ্ঠে তার রবীন্দ্রসংগীত।' এই রবীন্দ্রসংগীতের পথ ধরেই যেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ওয়াহিদুল হক অন্তত তাই বললেন, 'সাতষট্টির আন্দোলনের সবচাইতে স্থায়ী ফসল "আমার সোনার বাংলা" গানটির যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা, প্রথমে বাঙালির হৃদয়ে, পরে তার সংবিধানে।'

অবশ্যই বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের সঙ্গে এপার-বাংলার অভিজ্ঞতা ও লক্ষ্য কখনো এক হতে পারে না। আমরা কখনোই ভুলতে চাই না, ভুলতে পারি

না—ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের অধিবাসী আমরা। তার দায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুদের নেই। আমাদের সবসময় ভাবতে হয় বাঙালি-সত্তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও বিকাশকে অটুট রেখেও তাকে মেলাতে হবে সর্বভারতীয়তার ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে। অবশ্য, জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশের ধরনেরও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আজ এসে পড়েছে হয়তো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ভয়ংকর অভিজ্ঞতায়। মনে হচ্ছে, বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে জাতি-মিলনের কথা বলা হয়েছে বটে এতকাল, কিন্তু সেই অবিচ্ছিন্ন সংজ্ঞা বা আকাঙ্ক্ষার ধরন তো এসেছে উপর থেকে, কেন্দ্রীয়তার পূর্বপরিকল্পিত ধারণা থেকে। দেখা যাচ্ছে, বাস্তবের অনেক জট আছে সেই ধারণায়। প্রত্যেকটি জাতির স্বকীয়তার প্রকৃত উদ্বোধনে ও আত্মসচেতনতায় স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি যদি ঘটে, তবেই সত্যিকারের মিলনের জমি তৈরি হবে। মিলনের তাগিদটা তখন আসবে নীচের থেকে। সুতরাং স্বকীয়তার অর্জনই প্রথম কথা। তারপর হার্মনি বা সুরসংগতির প্রশ্ন—বৈচিত্র্যের মধ্যে যে হার্মনির কথা বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনায়। আর এই সূত্রেই বোধহয় বাঙালি-আত্মপরিচয়ের সন্ধান বৃহত্তর তাৎপর্য ও মাত্রা পেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের উক্তি পেতে পারে তার সত্যিকারের অর্থ।

বছর সতেরো-আঠারো আগে বাঙালির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে যে-কথা বলা সম্ভব হয়েছিল, তা এখন যেন অলীক মনে হয়। তখনও রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ক্ষয়ের মুখোমুখি সেই আত্মপরিচয় হারানোর ভয় বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে, তা নিয়ে শোক করাটাও অবান্তর। এতই স্পষ্ট অবলুপ্তির লক্ষণগুলি। দুই বাংলাতেই।

বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের বিরাট অংশ ইংরেজশাসনের প্রায় পাকাপাকি বন্দোবস্তের সময় থেকেই দ্বিভাষিক। তা নিয়ে খেদ ছিল, কিন্তু পরিত্রাণ ছিল না। তবু, তারই মধ্যে বাঙালিয়ানা চর্চার জগৎ ছিল দৃশ্যমান ও সমুজ্জ্বল। স্বদেশী আন্দোলন থেকে পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্মস্থলেও ছিল বাঙালিপরিচয় প্রতিষ্ঠার দায়বোধ। তাই তো কংগ্রেসের নাটোর-অধিবেশনে বাংলায় ভাষণের জন্য লড়াই করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর দলবল নিয়ে। 'আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়' স্থাপন করা ছিল সে-সময়ে অনেকেরই ব্রত। সে-সব স্কুলেও বাংলার সঙ্গে ইংরেজির দিকে জোর দেওয়া হত সমমর্যাদায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ওই বাংলাচর্চার আবহাওয়াতেই ইংরেজি শেখানোর বই লিখতেন। পরেও দেখেছি, বাংলা-মাধ্যমের স্কুল থেকে ইংরেজির দেদীপ্যমান ছাত্র বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ, বাংলা-মাধ্যমের স্কুলেও ইংরেজির ওপর নজর থাকত, অথচ তার জন্য সাহেব বনবার দরকার হয়নি। ইংরেজি ভাষা ও আদবকায়দা বা জীবনাচরণের দিকে বিত্তবানদের মধ্যে লোভাতুর দৃষ্টি থাকলেও, সাতচল্লিশের আগে পর্যন্ত ভাষাশিক্ষায় ইংরেজি ও বাংলার সহাবস্থানের তবু একটা জায়গা বোধহয় ছিল। ভাষা-শিক্ষা ও মাধ্যমের ব্যাপারটা ঘুলিয়ে যায়নি তখনো। মুসলমানদের মধ্যেও আরবি-ফারসির চর্চা ও বাংলার চর্চা এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সম্ভবত ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনে ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুল অধিক মর্যাদায় থাকবে, ইংরেজি আদবকায়দার চর্চা সম্মানিত হবে, এর একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যায়। যদিও তখনো সমাজসংস্কৃতির বৃহত্তর জমিতে সে-সব একটু আড়ালেই ছিল, ব্যতিক্রমী বলেই গণ্য হত। বাংলামাধ্যমের সরকারি-বেসরকারি স্কুলেরই বরং নামডাক। স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছুকাল সেটাই ছিল কমবেশি। প্রত্যাশিত ছিল, অতঃপর দিনে-দিনে বাংলা ভাষার বা বাঙালি সংস্কৃতির আরো বিস্তার ঘটবে। হয়তো কিছুকাল সেই দিকেই সবকিছু এগোচ্ছে এরকম মনেও হচ্ছিল। অন্তত অনেকের মধ্যে সেই আদর্শই লালিত হত। বা সেই লক্ষ্যই ছিল অনেক প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দলে, এমনকি প্রশাসনিক মহলে। বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চলবে; তার জন্য প্রকরণ ও উপকরণ তৈরি হবে, ইত্যাদি শোনা যেত। হয়তো কিছু-কিছু কাজ সত্যিই হয়েছে। তবে যথোচিত নয় কখনোই। সবচেয়ে বড়ো কথা, অচিরে তা যেন থমকে গেল, পিছুটান দেখা দিল। শৈথিল্য শুধু কর্মদক্ষতার নয়, মানসিক প্রবণতারও।

বাইরে আদর্শ হিশেবে যা-ই বলা হোক, সমান্তরালভাবে কিন্তু ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরাটাও আরো বেশি শুরু হয়েছিল সে-সময় থেকেই। ইংরেজি জানলে বা ইংরেজি কেতায় পটু হলে যে-সুবিধা স্বাধীনতার আগে ছিল, তা পরেও অব্যাহত রইল।

আরেকটা বড়ো ব্যাপার ঘটল স্বাধীনতার পরে। এতকাল পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন, শিক্ষার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতার পর শিক্ষার বিস্তারের নীতি দেশে অনুসৃত হল, তাতে ফাঁক যতই থাকুক। সেখানে, স্কুলছুট ঠেকাতেই হোক, কিংবা প্রথম-প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমানোর জন্যই হোক, সংগতভাবেই ইংরেজিশিক্ষাকে বিলম্বিত বা হালকা করার যে-ব্যবস্থা হল, তার ফল দাঁড়াল বিপরীত। অসম বিকাশের এই দেশে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রত্যাশায় ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। তারই জটিল পরিণামে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল আর গুটিকয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না—ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল সারা দেশে। ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ল আর বাড়তে থাকল। এ তো আমার-তোমারই পাপ। ইংরেজির জন্য বেশি মর্যাদা থাকবে, আর দেশের অধিকাংশ মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হবে, তা কি চলে? অবশ্য যে-শিক্ষার ব্যবস্থা হল, সে-শিক্ষা কতখানি 'শিক্ষা' তার প্রশ্ন তোলার দরকার নেই। এটুকুই বলা যায়, সাহেবিয়ানার নকল শুধু আর শহরের মধ্যেই আটকে থাকার কারণ রইল না।

এই ঝোঁকগুলো বাঙালির স্বভাব ও চালচলনকেও কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা চারপাশে চোখকান খোলা রাখলেই প্রতিনিয়ত টের পাওয়া যাবে। অধিকাংশ শিক্ষিত শহুরে বাঙালি—নবীন প্রবীণ যেই হোক—দৈনিক পথচলার বাক্যবিনিময়ে, পারস্পরিক সম্বোধনে, গণমাধ্যমে ব্যবহৃত বাচনে—চোস্ত ইংরেজিতে কিংবা অশুদ্ধ বিকৃত ইংরেজিতে, কিংবা, সবচেয়ে বেশি, ইংরেজি-বাংলা মেশানো দো-আঁশলা ভাষায় ছাড়া কথা বলতে পারে না। পোশাক-

আশাকের মতোই নিছক বাংলায় কথা বলা বা বাঙালিসুলভ ভদ্র আচরণ প্রায় জাদুঘরের সামগ্রী। একনাগাড়ে শুধুই বাংলায় কথা বলা (তা সে বক্তৃতাতেই হোক কিংবা গোষ্ঠী-আলাপে বা কথোপকথনে) অথবা বাঙালি বলে চেনা যায় এমন পোশাক পরা বা আচারব্যবহার মেনে চলা—চোখের সামনে দেখলে অনেকেই বিস্ময়ে হতবাক হন। বদলটা কতখানি তা ঠাহর করা যাবে, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে ঘরোয়া গল্পের কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, তাতে কথোপকথনে বাংলার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের 'অপরাধে' নাকি জরিমানা দিতে হত, খেলাচ্ছলে হলেও। ঠাকুবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়েছেন শাড়ি পরেই। এখন নব্যযুবতী বা তরুণীরা শাড়ি পরা যে অসুবিধাজনক তা নিয়ে নিশ্চিত, দরকার হলে 'আন্দোলনে'ও শামিল।

তা বলে শুদ্ধ বাংলায় 'অম্লাজান' লেখার দলে নাম লেখাবারও দরকার নেই—ইংরেজি বা আরবি-ফারসি যা ভাষায় ঢুকে গেছে, তা আমাদের কাছে বাংলাই। কিংবা মান্যভাষার যে গড়ন উঠে এসেছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, দুই বাংলাতেই, তাকে সরিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকে জবরদস্তি করে নিয়ে আসার গোলমালে জড়িয়ে পড়াটাও স্বাভাবিক লাগে না। শুনেছি সেই 'আন্দোলন'ও নাকি জোরালো হতে চাইছে বাংলাদেশে। আসল যে-সমস্যা তার মোকাবিলা না করে এরকম বিভ্রান্তিকর 'স্বাদেশিকতা' আনতে চাওয়ায় কোনো পরিত্রাণই নেই।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পালাবদল এবং বিশ্বায়নের ধাক্কায় এইসব সমস্যা ও প্রশ্নগুলি অন্য মাত্রা পেয়ে গেল। এতকাল বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানা চর্চার মধ্যে যে স্বদেশী বোধের আদর্শকে লালন করা হয়েছে, অর্থনীতি ও রাজনীতি বা সংস্কৃতির স্বাবলম্বন ও আত্মতা অর্জনের যে-স্বপ্ন ও অভিযানের সঙ্গে নিজের জমিতে শিকড় সন্ধানের কথা ভাবা হয়েছে—সেই ভাবনা বা স্বপ্ন যেন বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে এর ফলে। সাম্যবাদের রাজনীতি যে চিত্তের মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল, তার পতন বা ক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ভোগবাদী চাওয়া-পাওয়ার প্রসার সমস্ত আদর্শবাদকেই ঠুনকো করে দিল। তা কুরে-কুরে খাচ্ছে এমনকি আদর্শবাদী গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানেরও একেবারে মূলে। না হলে কি বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলেও বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর জন্য পৃথক ক্লাস খোলার কথা প্রস্তাবিত হয়? মহাচীনেও নাকি শহুরে উন্নতিকামী ছাত্র প্রায় প্রত্যেকে ইংরেজি শেখার উদগ্র আগ্রহে, সাহেব হওয়ার বাসনায়, নিজের চৈনিক নামের একটি বিকল্প পশ্চিমি নামকরণ করতে চাইছে! এভাবেই গোটা বিশ্বের ঘটনাবলিই পাকড়ে ধরতে চায় প্রত্যেকটি দেশের স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতিকে। এ অবস্থায় বাংলা ও বাঙালিয়ানা নিজেকে বাঁচাবে কী করে!

মানুষ যখন বিপন্ন হয়, তখন একটা বিকল্প খোঁজে, স্বপ্নতাড়িত হয়েই। বাংলা ভাষা ও বাঙালি আত্মপরিচয় তো বিপন্ন অনেককাল থেকেই। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের বাংলার সাংস্কৃতিক দুর্বিপাকে অনেকেই আস্থা খোঁজেন বাংলাদেশের বাংলার ও বাঙালির গৌরবময় ভূমিকার মধ্যে। সত্যি-সত্যিই পূর্ববঙ্গের বাঙালির বাংলাচর্চায় বা আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় অনেক কিছুই হয়েছিল গর্ব করার মতো।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন তো সেখানেই। একাত্তরের স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সেখানে পা দিয়ে দেখত সাইনবোর্ডে, গাড়ির নেমপ্লেটে, আপিসে-দপ্তরে, কথায়বার্তায়, লেখায় বা গবেষণায় বাংলা ব্যবহারের সাহস ও আত্মবিশ্বাস। যেটুকু হচ্ছিল তা-ও তো অনেক। কিন্তু সেখানেও আজ উলটো হাওয়া। অথচ এখানে অনেকের মনে এখনও বদ্ধমূল যে বাংলাদেশে ওই বাঙালিয়ানা অটুট রয়ে গেছে। তা কি সম্ভব? যে-অসুখে আমরা ভুগছি, সেই অসুখ থেকে তারাই বা রেহাই পাবে কী করে? তার স্বতন্ত্র ইতিহাসে হয়তো ভিন্ন-ভিন্ন উপসর্গ আছে, স্খলনের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্র আছে, কিন্তু বাঙালিত্বের আত্মপ্রকাশের সমস্যা বা অবনয়ন বা বিলুপ্তির দিকে যাত্রাপথ একই। উদ্ধার বা মুক্তি, যদি থেকে থাকে, তা-ও একইভাবে আসবে কিনা কে বলবে?

পবিত্র সরকার

বাঙালি কে?

একটা মানুষকে আমরা প্রথম চোখে দেখি, বাঙালিদেরও প্রথম অন্যদের চোখে পড়বে, অর্থাৎ বাঙালি একটি দৃশ্য হিসেবে সকলের কাছে প্রতিভাত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চোখে দেখে বাঙালিকে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা করা খুব মুশকিল। এক সময় উত্তর ভারত অঞ্চলে এমন ছড়া শোনা যেত—'ধোতী ঢিলী-ঢালী, ভাত খাউয়া বাঙালী।' এর প্রথম অঙশটা বাঙালিকে দৃশ্য হিসেবেই দেখেছে। কিন্তু এ দৃশ্য আজকাল বদলেছে। এখন বাঙালিরাও প্যান্ট-শার্ট পরেন, গ্রামের চাষিরাও পরেন। কেবল আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ্যে নানা জেল্লাদার ধুতির চলন দেখা যায়, তাও আজকাল চুড়িদার এসে ধুতিকে হটিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, জ্যোতিবাবু থেকে আরম্ভ করে বাংলার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ধুতি পরেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালিকে এখন আর তার পোশাক থেকে চেনা যায় না। মুখ খোলার আগে বোঝাই যায় না কে বাঙালি আর কে বাঙালি নয়।

পোশাক বাদ দিয়ে চেহারা? তা থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভারতের সবরকম নৃগোষ্ঠীগত উপাদান—ককেশীয়, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মোঙ্গোলয়েড অস্ট্রো-এশিয়াটিক—সব ধরনের রক্ত আর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাঙালির মধ্যে আছে, কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গিয়ে একটা সাধারণ চেহারা দাঁড়িয়েছে, যা মোটামুটি পাতে দেবার মতো। এতে অবশ্যই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ শ্রেণির সমাজের তথাকথিত অন্তেবাসী ডোম, বাগদি, বা প্রত্যন্তের লোধা টোটোদের চেহারার কিছুটা তফাত আছে। নৃবিজ্ঞানীরা তা আমাদের বলেছেন। এ কথা এজন্যই বলা যে, বাঙালি মানেই 'বাঙালি ভদ্রলোক'—এ ভাবনা আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। চেহারা যাই হোক।

মুখ খুললেই বোঝা যায়, কে বাঙালি আর কে বাঙালি নয়। অবশ্যই আছে এর কিছু প্রান্তীয় সমস্যা। মেদিনীপুরের কাঁথি-দীঘা সড়কের পশ্চিমদিকে কম-বেশি দূরে শুরু হয়েছে ওড়িশার সীমান্ত। এই সীমান্তের দু-ধারে কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীরা একই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যার মধ্যে বাংলা আর ওড়িয়া—দু-ভাষারই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। যদি প্রশ্ন ওঠে কার কোন্ ভাষা, তাহলে রাজনৈতিক সীমানার এদিকের লোকেরা হয়তো বলবেন 'আমরা

বাংলা বলি,' আর ওধারের লোকেরা বলবেন, 'আমরা বলি এ অঞ্চলের ওড়িয়া ভাষা'। রাজনৈতিক সীমারেখা ভাষার পরিচয়কে নিয়ন্ত্রণ করে, ভাষা আবার নিয়ন্ত্রণ করে জাতিসত্তার পরিচয়। ফলে ওই সীমানার এদিকের লোকেরা নিজেদের বাঙালি বলেই চিহ্নিত করবেন, ওদিকের মানুষেরা বলবেন, 'আমরা ওড়িয়া'। কেউ কেউ আবার, আগে আমরা যেমন বলেছি, নিজেদের ভাষায় পরিচিত নামটা জানেন না, জানেন হয়তো মাল, লোধা বা রাজবংশী ভাষা বলে। প্রশ্নটা হল, তাঁদের ভাষার পরিচয় তাঁদের কাছে কী? তারপর ওই ভাষার পরিচয়ই বলে দেবে তাঁদের জাতিসত্তার পরিচয় কী। সোজা কথায় এবং প্রাথমিকভাবে, যারা বাংলাভাষাকে বাংলাভাষা হিসেবে জেনে তা বলেন তারা বাঙালি।[৭] বলেন মানে জন্মগতভাবে বলেন, মাতৃভাষা হিসেবে তুলে নেন এবং সাধারণভাবে পরিবারের মধ্যে, নিজের অঞ্চলে দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা বাঙালি। তাঁদের কেউ কেউ পোষা কুকুরের সঙ্গে বা ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়া নিজের সন্তানটির সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতেই পারেন। কিন্তু ধরে নেওয়া যায় যে মা-বাবার সঙ্গে কথা বা বউ বাঙালি হলে তার সঙ্গে প্রেমের কথা বলার সময় বাংলাই বলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার গৌরবময় বাংলা, চট্টগ্রাম-পুরুলিয়ার আঞ্চলিক বাংলা, ত্রিপুরার বাংলা, কাছাড়ের বাংলা, ঝাড়খণ্ডের বাংলা, আসামের বাংলা, বিহারের বাংলা, ওড়িশার কটক-ভুবনেশ্বরের কেরা বাংলা, ইয়োরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে থাকা বিশাল বাঙালি প্রবাসী জনগোষ্ঠীর বাংলা—বাংলা ভাষার কত বৈচিত্র্য। যারা মনে করে, আমরা যে ভাষাটা বলছি সেটা বাংলা, সেটা আমার একটা পরিচয়, তারাই বাঙালি। কেউ কেউ 'বাংলা' নামটা জানেন না, কিন্তু তাঁদের ভাষা যদি পণ্ডিতদের বিচারে ব্যাপক বাংলার অন্তর্গত হয়, তাঁরাও অবশ্যই বাঙালি।

এটাই অবশ্য শেষ কথা নয়। যে বাংলা-বলা ঘরে জন্মাল না সে যে বাঙালি হতে পারে না, তা মোটেই নয়। বাংলাভাষী অঞ্চলে বহু বিদেশি এসেছে বহুদিন ধরে, তারা কালক্রমে বাঙালি বনে গেছে। সেই দ্বাদশ শতকে কর্ণাটক থেকে

---

[৭] অবশ্যই এমন কিছু গোষ্ঠী আছেন যাঁরা তাঁরা যে-ভাষা বলেন সেটা যে বাংলা, তা জানেন না। আগেই দেখেছি, তাঁরা তাঁদের ভাষার নাম দেন 'পলিয়া', 'মাল', 'রাজবংশী' ইত্যাদি। আবার কিছু গোষ্ঠী আছেন যাঁরা এটা মানেন না—যেমন তথাকথিত কামতাপুরী গোষ্ঠী। না মানার পিছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই, রাজনীতির লক্ষ্য আছে।

এর আর-একটা মাত্রা সম্প্রতি তৈরি হয়েছে বিহার ঝাড়খণ্ডি অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে। তাঁরা অনেকে মনে করছেন, 'বাঙালি' নাম নিলে তাঁদের অসুবিধে হবে, বরং তাঁরা 'বঙ্গভাষী বিহারী' বা 'বঙ্গভাষী ঝাড়খণ্ডি' বা 'বঙ্গভাষী অসমিয়া'।

আমি মনে কির এই আত্মপরিচয়ের পুনর্বিন্যাস অপ্রয়োজন। বাঙালি যদি ভিন্ন রাষ্ট্রে থাকতে পারে, তাহলে 'ঝাড়খণ্ডি বাঙালি', 'বিহারী বাঙালি', 'অসমিয়া বাঙালি' হতে অসুবিধে কীসের? 'বাঙালি' মানেই বঙ্গভাষী—সে কোথাকার নাগরিক সেটা গৌণ।

এসেছিল ব্রাহ্মণ (কিন্তু বৃত্তির দিক থেকে ক্ষত্রিয়) সেন রাজবংশ। তারা প্রথমে নিশ্চয়ই বাংলা বলত না। কিন্তু তারা, তাদের সৈন্য-সামন্তরা—সব মিশে গেছে বাংলার জনস্রোতে, এখন তাদের আলাদা করে চেনাই যাবে না। মিশে গেছে আদিশূরের কনৌজি ব্রাহ্মণেরা আর কায়স্থের দল। এসেছিল বখ্‌তিয়ার খিলজির সঙ্গে অজস্র পাঠান সৈন্য, ষোড়শ শতাব্দীতে মুগলদের সঙ্গেও—তারাই বা কোথায় গেল? তারা কেউ কেউ নিজেদের 'আশরাফ' বলে মুখে উর্দু ভাষার প্রলেপ লাগিয়ে, 'আতরাফ' বাঙালিদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। তারপর স্বদেশি আন্দোলন আর বাংলাদেশ এসে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আবেগের ও আত্মপরিচয়ের সেই জাতিভেদ মুছে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদে নবাবি আমলে রাজস্থান থেকে প্রচুর মানুষ এসে ভূস্বামী হয়ে বসেছিলেন। লালগোলা আর ঝাড়গ্রামের রাজবংশ এসেছিলেন, যতদূর শুনেছি, যোধপুর থেকে। তাঁরা একসময় উৎসব অনুষ্ঠানে রাজপুত সাজ পরে, মাথায় উষ্ণীষ লাগিয়ে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে খাড়া হয়ে যেতেন। তাঁরা এখন কতটা রাজপুত আছেন? লালগোলায় রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক, তাঁর চমৎকার সব শিকার-কাহিনি আমরা ছেলেবেলায় পূজোবার্ষিকীগুলিতে নিয়মিত পড়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও অন্যত্র তাঁর দানের কথা বহুবিদিত। তাঁকে বাঙালি বলব না তো কাকে বলব? কলকাতাতে এখনই আছেন প্রচুর উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কেরলা, তামিলনাড়ু থেকে আসা অ-বাঙালি, তাঁরা চমৎকার বাংলা শিখেছেন, কলকাতাতেই গড়ে তুলেছেন নানা প্রতিষ্ঠান—তাঁরাও এসে গেছেন বাঙালিত্বের এলাকার খুব কাছাকাছি।

আমরা বলতে চাইছি যে, বাঙালিত্বের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ধারণার মধ্যে একটা যেমন কেন্দ্রীয় জায়গা আছে, তেমনই একটা প্রান্তীয় জায়গাও আছে। কেন্দ্রীয় ভূগোলে যারা আছে তারা বাংলাভাষী এক ব্যাপক অঞ্চলে ঘনীভূত—ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলা আর স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ, সেই সঙ্গে আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাঞ্চল, ওড়িশার কিছু অংশে তাদের বাসস্থান। এদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ বাঙালি হয়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির (এই সংস্কৃতি কে কতটা পায় সে সম্বন্ধে আমরা পরে বলছি) মধ্যে জন্মায় এবং তাতেই মৃত্যুও পায়। তা ছাড়াও পৃথিবীর নানা অংশে প্রবাসী বাঙালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারা চলে গেছে ভৌগোলিক প্রান্তীয়তায়, হয়তো তা থেকে তাদের কেউ কেউ সাংস্কৃতিক প্রান্তীয়তার চলে যাবে এবং এক সময় আর বাঙালি থাকবে না। প্রবাসের সমাজের সঙ্গে মিশে যাবে। এরকম প্রায়ই ঘটে। বিদেশে গিয়ে বিদেশিনি গৃহিণী নিয়ে, সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করে, সেখানে সন্তানের পিতা হয়ে, সন্তানদের সেখানে শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদি ঘটনায় বাঙালি কেবল নামমাত্র বাঙালি থাকে, পরে একসময় তাও থাকে না। অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক

যোগাযোগের পটভূমিকায় বাঙালি বাঙালিত্ব হারাতেও পারে। তার ভিতরে কি কিছু থেকে যায় বাঙালিত্ব? সে সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি অভিজ্ঞতা বলি।

সেটা উনিশ শো সত্তর সাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা শিকাগোতে বসে দুই বাংলার কিছু মানুষ সেই যুদ্ধের সহায়তার জন্য একটা সংগঠন করে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছি। এর নেতৃত্বে ছিলেন বন্ধু শামসুল বারি, যিনি তখন শিকগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন, আর ছিলেন স্বনামধন্য স্থপতি ফজলুর রহমান—যিনি তখন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার নির্মাণ করেছিলেন।

প্রথম অভিজ্ঞতাটা এই ফজলুর রহমান সাহেবকে নিয়ে। সাহেব বলাটা উচিত হল না। কেন হল না তাই বলছি। ফজলুরের জার্মান স্ত্রী, অসাধারণ সুন্দরী। ওঁদের বছর বারোর একটি মেয়ে সেও ছোট্ট রাজকন্যার মতো দেখতে। তখন বোধহয় কুড়ি বছর হয়ে গেছে শিবপুর বি ই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ফজলুর দেশের বাইরে আছেন, দু-বার মার্কিন দেশে 'কনস্ট্রাকশন ম্যান অব দ্য ইয়ার' হিসেবে সম্মান পেয়েছেন—নির্মাণ-স্থপতিদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। তাঁর বাড়িতেও পুরোদস্তুর বিদেশি পরিবেশ। কিন্তু সেই বাড়িতেই আমাদের প্রচুর আড্ডা বসত। আমরা বাঙালিরা, বিশেষ করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আর তার আশেপাশে যারা ছিলাম তারা যেতাম, আর বাংলাদেশ স্বাধীনতা-যুদ্ধের সহায়ক সংগঠনের লোকেরা তো বটেই। গানটান হত খুব, যেমন হয়। কিন্তু দেখা যেত, ফজলুর নিজেই শেষে বার করতেন একটা ছেঁড়াখোঁড়া *গীতবিতান* এবং নিজেই ফিরে যেতেন তাঁর সময়কার পঙ্কজ মল্লিকের সেই সব অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রসংগীত—'তুমি কি কেবলই ছবি', 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়', 'এমন দিনে তারে বলা যায়', 'আমি কান পেতে রই'—আরও কত গানে। গাইতে গাইতে ভিজে আসত তাঁর চোখের পাতা। আমরা দেখতাম, ঘর আর পারের মাঝখানে বসে আছে এক বাঙালি, যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বিস্মৃতির অতলতা থেকে তুলে আনতে। শিকাগো থেকে আসার পর আর ফজলুরের সঙ্গে দেখা হয়নি। পরে এক মর্মান্তিক খবর পেয়েছি যে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো এক বিমানবন্দরে হঠাৎ তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

ফজলুর অন্তত তাঁর একার অস্তিত্বে তাঁর বাঙালিত্বের ইতিহাসকে বহন করতে পেরেছিলেন। অমর চক্রবর্তী হয়তো তাও পারেননি। অমর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অ্যান আরবর, মিশিগানে। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আমরা একটি চাঁদা তোলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, নৃত্যনাট্য, নাটক গান, আবৃত্তি করে যদি কিছু টাকা তোলা যায়, ওই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধেরই জন্য। টিকিট বিক্রি করে শো। শিকাগো আর তার আশপাশ থেকে যারা গাইতে বা নাচতে পারে সমস্ত বাঙালি যোগ দিয়েছিলেন। আসলে হয়তো মূল লক্ষ্যটার

জন্যই, কিংবা সবাই দেশ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে আছে এজন্যই—সেদিন অনুষ্ঠানে এমন একটা আবেগ তৈরি হয়েছিল যে, ভরভরতি হলের নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও সেটা অনুভব করছিলাম। অনুষ্ঠানও সেই কারণেই চমৎকার উৎরে গেল। শেষ হল সমবেত কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি দিয়ে।

শেষ করে আমরা বেরিয়ে এসেছি, তখনও সন্ধ্যা নামেনি। ছোট্টখাট্ট এক ভদ্রলোক এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর বয়স সত্তর-পঁচাত্তর হবে। ১৯১৫ নাগাদ ভারতীয় বিপ্লবী দলের সঙ্গে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসেন, তারপর ডিট্রয়েটের মোটর কারখানায় কাজ নেন। বিয়ে করেছেন মার্কিনি, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বেশ দশাসই চেহারার ভদ্রমহিলা, মুখে সুস্মিত সৌজন্য। সঙ্গে এসেছে ছেলে ফ্রাংক, তার বয়েসও পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু চেহারায় বাঙালিত্বের কোনো চিহ্ন নেই, বাংলা জনেও না। ফ্রাঙ্কের স্ত্রীও এসেছে। ডরোথি, পুরোদস্তুর মার্কিনি মেয়ে, তারও বাংলা জানার কথা নয়।

ওই ছোট্ট দেখতে রীতিমতো কৃষ্ণকায় মানুষটি অমর চক্রবর্তী, হঠাৎ এসে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন। একটু চুপ করে থেকে প্রবল উচ্ছ্বাসে বারবার বলতে লাগলেন, 'আজ আপনারা যে কী জিনিস আমাকে উপহার দিলেন, সে আমি জীবনে ভুলব না। বোধহয় এর জন্যেই এতদিন বেঁচে ছিলাম।' তারপর নিজের ছেলেকে, বউমাকে ইংরেজিতে বললেন, 'সি ফ্রাংক, সি ডরোথি, এই হল আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার কালচার। তোমরা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছ, অনেকটাই হয়তো ধরতে পারছ না। কিন্তু আমি একেবারে তোলপাড় হয়ে গেছি।' বলে আমার হাত বুকের কাছে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন সেই বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এসে সস্নেহে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বলেন, 'ইজি, অমর ইজি! প্লিজ কাম ইয়োরসেল্‌ফ। উই আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইয়ু ফিল। প্লিজ!'

অমর চক্রবর্তী অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে, আর একবার আমার হাতে নিংড়ে বললেন, 'কী বলে যে আমার মনের অবস্থাটা বোঝাব জানি না। সত্যি বড়ো আনন্দ দিলেন।' বলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন।

এই বাঙালিও, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য, উদ্ধার করে এনেছিলেন তার জন্মগত বাঙালিত্বকে। ইনি যখন থাকবেন না, তাঁর সেই সাত-আট দশকের জীবন্ত সাংস্কৃতিক সত্ত্বাও থাকবে না। তাঁর সন্তানেরা বাঙালি হয়নি, হবে না।

এই রকমই অবস্থা হবে হয়তো ছ-বছরের 'রেমন্ড' বা রহমানের। রেমন্ড নামেই তার মা তাকে ডাকেন। তার মা-বাবা বাংলাদেশি দম্পতি, বেশ কয়েক বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। আমরা তখন ওই দেশের মিনিয়াপোলিসে থাকি। বন্ধুবর বাংলাদেশের গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বন্ধু তাঁরা। জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী

পুত্রবধূ আর এঁরা সকলে মিলে মিনিয়াপোলিসে আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। কোনো একটা লম্বা সপ্তাহান্ত বা 'লং উইকএন্ড' ছিল। ফলে কদিন খুব আড্ডা দিয়ে হইহই করে সময় কাটতে লাগল। রোজই আমরা রাত দেড়টা দুটোর আগে ঘুমোতে যাই না এবং পরদিন ছুটির দিন বলে আটটা-ন-টার আগে উঠি না। কিন্তু আমার দেড় বছরের মেয়ে আর রেমন্ড সকাল সকাল ঘুমোয় বলে দু-জনেই পাঁচটা নাগাদ উঠে যায়, এবং আমার মেয়ের খেলনাগুলো নিয়ে দু-জনে খেলতে বসে। আমার মেয়ে তখন 'ডায়াপার' বা 'ন্যাপি' পরে অন্য সব বাচ্চাদের মতোই, দুটি একটি শব্দ বলে মাত্র। কিন্তু সে তার নতুন দাদা 'রেমান্ডকে তার নানা খেলনা —গানের কল, হাত-পা নাড়া ভালুক নানা রকম জিনিস তৈরির রঙিন ব্লক—এসব বার করে দেয় পরম উৎসাহে। দেখিয়ে দেয় কোনটা কীভাবে চালু করতে হয়। এইরকম অবস্থায় একদিন সকাল সাড়ে পাঁচটার সময়—আমার কাছে সেটা তখন মধ্যরাত—রেমন্ড এসে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করল। তারপর সে ইংরেজিতে ফিসফিস করে যা বলল তার আমি 'আংকল্ আংকল্' অংশটা ছাড়া আর কিছুই প্রথমে ধরতে পারিনি। বললাম, 'হোয়াট্স দ্যাট? হোয়াট ইউ সে?' সে এবার আর একবার বলল, 'শি ডিড সাম 'হাগা'!' অর্থাৎ আমার মেয়ে তার সকালবেলার একটা প্রাকৃতিক কাজ সেরে ফেলেছে, তার সুগন্ধে রেমন্ড টিকতে না পেরে ছুটে এসে অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে জাগিয়েছে এবং সংবাদটি নিবেদন করেছে। আমি তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মেয়ের ডায়াপার খুলে তাকে পরিষ্কার-টরিষ্কার করে নতুন ডায়াপার পরিয়ে দিলাম এবং ফিরে এসে রেমন্ড ব্যবহৃত ভাষার কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভাবছিলাম, সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষার রক্ষণ (maintenance) এবং বিসরণ (shift) বলে যে ঘটনার কথা বলা হয়, রেমন্ড তাতে রক্ষণ থেকে বিসরণের একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, একটি-দুটি শব্দ সে রক্ষণ করেছে মাত্র। রেমন্ড নিশ্চয়ই ওদেশের নাগরিক হবে। যদি এর মধ্যে তার অন্য কোনো আত্মপরিচয় না গড়ে ওঠে, দেশীয় সূত্র যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে সে বাঙালিত্বের প্রান্তীয় গণ্ডি পার হয়ে বেরিয়ে যাবে। যে বাংলা শব্দটা সে এখনও ছাড়তে পারেনি, সেটাও সে ভুলে যাবে।

বেশ কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা ঘটবে। তা নিয়ে হাহাকার করার কিছু নেই। আবার হয়তো উলটো ঘটনাও ঘটবে। কিছু মানুষ অন্য ভাষা অন্য সংস্কৃতি থেকে এসে বাঙালি হয়ে যাবে। যেমন আমার বন্ধু ও সহপাঠী অরুণ সোম বেশ কিছুদিন মস্কোতে ছিল, সেখানকার বিখ্যাত সরকারি প্রকাশন সংস্থায় কাজ করেছে, তার রুশি স্ত্রী রুশ ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষাই জানে না। অরুণের দুটি মেয়ে রিতা আর স্মিতা। মস্কোতে তারা যখন বড়ো হচ্ছিল, তখন তাদের মাতৃভাষা রুশি। পরিবারে অরুণ সংখ্যালঘু। মেয়েরা মায়ের সঙ্গে অনর্গল রুশভাষা বলে বড়ো

হচ্ছে। তারা বাবার সঙ্গেও রুশিতে কথা বলে। অরুণ একদিন বলল, তারা যদি বাংলা না শেখে তাহলে তারা বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। সে তাদের সঙ্গে শুধু বাংলাতেই কথা বলতে শুরু করল। জানি না এটা অন্যায়, বা শিশুর অধিকারে এ এক ধরনের হস্তক্ষেপ কিনা, কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে এই দাঁড়াল যে, তারা দিব্যি বাংলা বলতে শিখে গেল। এবং এখন গড়িয়ার এক পাড়ায় যখন পুরোপুরি মেমসাহেব দেখতে, সোনালি চুলের রিতা-স্মিতা দুই বোন স্বাভাবিক বাংলা বলতে বলতে পথ দিয়ে যায় তখন লোকে অবাক হয়ে দেখে আর শোনে। বাংলা ভাষার সমস্ত বাগ্‌ধারা তাদের আয়ত্তে। এরা আবার বাঙালিদের সংখ্যা বাড়াল, অন্য সংস্কৃতির প্রান্তীয় অবস্থান থেকে বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে আপাতত ঢুকে পড়ল।

কিংবা, একটু বিপ্রতীপ দৃষ্টান্ত ধরা যাক বব্ আর শিখা ইভান্‌সের সন্তানদের কথা। শিখা একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে, গড়িয়াতে আমরা যে বাড়িতে আগে ভাড়া থাকতাম, ওরা থাকত তার নীচের তলায়। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় দেখতে বেশ লম্বা আর সুন্দরী। আর বব্ ইভান্‌স হল খাঁটি আমেরিকান ছাত্র, আমেরিকান ইন্‌স্টিট্যুটের বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় বাংলা পড়তে এসেছিল। সে প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা। আমার স্ত্রী তখন ওই ইন্‌স্টিট্যুটে মার্কিনিদের বাংলা পড়াতেন। বব্ তাঁর কাছে বাড়িতেও এসে পড়ত। তার সুবিধের জন্য আমরা তাকে আমাদের পাড়াতেই একটা ঘর ঠিক করে দিয়েছিলাম। সে ওখানে থাকত আর আমাদের সঙ্গে দুবেলা মাছ-ভাত-ডাল খেত। সে একসময়ে 'হরেকৃষ্ণ', ছিল, অর্থাৎ ইস্‌কন্-এর শিষ্য ছিল। প্রথমে মাছ-মাংস কিছুই খেত না। আমার স্ত্রী যখন তাকে ভয় দেখালেন যে, মাংস না খাও তো না খাও, কিন্তু মাছ না খেলে কলকাতায় তুমি বাঁচতে পারবে না, আর বাংলাটাকেও তেমন ভালো শিখতে পারবে না, তখন সে বাধ্য ছেলের মতো তাঁর কথা মেনে নিল। তার বাংলা এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রচুর মজার গল্প আছে—কিন্তু এখানে তার জায়গা নয়। পরে সে বাংলা বেশ ভালোই শিখেছিল। কারণ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের লরিতে চড়িয়ে দিয়েছিলাম একবার, সেবার পাড়ার বিসর্জনের দলের সঙ্গে সে পুরো বিসর্জন-প্রক্রিয়াটাই দেখে এসেছিল।

আমরাই শিখার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম ববের। ফল যা হল তা হল। তারা প্রেমে পড়ল, এবং একদিন মোটামুটি ঘটা করে বিয়েও হয়ে গেল দু-জনের। বব শিখার ফটো পাঠিয়ে ইলিনয়ে তার বাবা-মার সম্মতি জোগাড় করেছিল তার আগেই। তারপরে তারা মার্কিনদেশে চলে গেল। কচিৎ-কখনও দেশে আসে, আমাদের সঙ্গে দেখা হয় বা হয় না। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তারা আমেরিকায় আছে। বব-এর দেশ সেটা, তাই তো হওয়ার কথা। তবে বব্ বাংলা পড়া আর চালায়নি, যদিও বাংলা সে বলতে আর লিখতে পারে।

তাদের ছেলেদের বাংলা শেখার কোনো সম্ভাবনা আছে এমন মনে ভাবিনি। কারণ শিখা ইংরেজি বলতে পারে। বব্-ই বা কেন নিজের দেশে নিজের ভাষা ছেড়ে বাংলা বলতে যাবে। বিশেষত সক্রিয় পড়াশোনা সে যখন ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ওরা দেশে আসায় এইটে জানলাম যে শিখা তার দুই ছেলের সঙ্গে বাংলাই বলে, ফলে দুই ছেলেই বাংলা বুঝতে শিখেছে। বড়ো ছেলে তো বলতেও পারে। অর্থাৎ বাঙালি মা তার মার্কিনি সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে বাঙালিত্বের একটি উপাদান, তার ভাষা।

জানি না এ উপাদানও তাদের মধ্যে স্থায়ী হবে কি না। কিন্তু যে-বিষয়টা বোঝানোর জন্য এই এতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা এই যে, একটা স্তরে বাঙালিত্ব একটা সচল পরিচয়, তাতে যাতায়তের পথ খোলা আছে। সেটা বাঙালিত্বের যে বৃত্ত, তার একেবারে প্রান্তরেখায়। সেখান থেকে কে কতটা বৃত্তের ভিতরে ঢুকবে আর কে বৃত্তের বাইরে যাবে, তা তাদের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাসের উপর নির্ভর করবে। ওই প্রান্তক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

২

কিন্তু আগেই বলেছি, এই বৃত্তের একটা ভিতরকার অংশও আছে, যেখানে বাঙালিত্ব মোটামুটি স্থায়ী ও অবিচল। এখানে থেকেই বেশ কয়েকশ কোটি লোক বাঙালি এই পরিচয় নিয়ে জন্মায় ও মরে। তাদের ওই বৃত্তের বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজন বা সুযোগ ঘটে না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, এই ছোটো মধ্যবর্তী বৃত্তের মধ্যে আমরা যারা আছি তারাও কি সব্বাই সমান বাঙালি? কিংবা আর একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি—সব্বাই কি একরকমের বাঙালি? মোটেই তা নয়। যে-বাঙালি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর নিরক্ষর যে-বাঙালি বর্ধমানের গ্রামে বীজতলায় কাদা করে বীজ ধান লাগায় এ দু-জন এক ধরনের বাঙালি নয়। এ দু-জনের ভাষা হয়তো কম বেশি এক—উপভাষার পার্থক্য তাদের বাঙালিত্বের অংশীদার হওয়ার প্রতিবন্ধক নয় তা আমরা দেখেছি—কিন্তু এরা দু-জন এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে না। আজকালকার ভাষায় বলি, তাদের 'স্মৃতি' এক নয়। অধ্যাপক বাঙালির স্মৃতিতে আছে হয়তো সারা পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস, নানা দেশের নানা সাংস্কৃতিক কীর্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপভোগ, আছে নিজের দেশের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞান, আর আছে হাজার বছরের বাঙালির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বোধ। সে চর্যাপদের খবর রাখে, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি, মৈমনসিংহ গীতিকা, ভারতচন্দ্র হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের উজ্জ্বল স্মৃতিভাণ্ডারে পৌঁছায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর হয়ে অমর্ত্য সেন পর্যন্ত বাঙালির বিপুল মননসম্পদ আর অন্যদিকে মধুসূদন হয়ে মন্দাক্রান্তা সেন পর্যন্ত

তার অমিতবিত্ত কল্পনাপ্রকাশ, তার শিল্পকলা বিজ্ঞানসাধনা রাজনীতিচর্চা—সবই অধ্যাপকটির স্মৃতিকক্ষে নিহিত আছে। আর ইনি যদি একটু বেশি সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক হন, তবে রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর স্মৃতি ও আচরণের এক সদাসংসক্ত উপাদান।

বর্ধমানের ওই নিরক্ষর ভাগচাষিটির স্মৃতিতে এসব কিছুই প্রায় নেই। তার স্মৃতিতে যেটুকু ইতিহাস আছে সেটুকু কাল এবং স্থান দু-য়ের দিক থেকেই অত্যন্ত সংকীর্ণ। তিন পুরুষের স্মৃতিও তার মাথায় আছে কি না সন্দেহ, আর তার গ্রামের বাইরে এখন বাস-টাস হওয়ায় সে হয়তো কিছুটা ঘুরে দেখে এসেছে, কিন্তু সে কি জানে হোয়াইট হাউস ও ওয়াল স্ট্রিট কোথায়—যেখানে তার পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেসব সিদ্ধান্ত এমনকি তার জীবন ও জীবিকাকেও প্রভাবিত করে? ইরাকের যুদ্ধের ফলে যে এদেশে পেট্রোলের টানাটানি পড়ল তা হয়তো সে জানবে না, কিংবা তারই কারণে তার জমির জন্যে কেমিক্যাল সারের যে কিছুটা অকুলান ঘটল তাও তার জানবার কথা নয়। কিন্তু সেটা তার জীবনকে বেশ ভালোরকম বিচলিত করল। আমাদের মনে পড়ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 'সিঁদুরচরণকে' যে তার জীবনে একবার ট্রেনে চেপে বাহাদুরপুর পর্যন্ত গিয়েছিল, তাতে বৃদ্ধ বয়সেও আশেপাশের দশটা গ্রামের চোখে যে এক জীবন্ত বিস্ময় হয়ে ছিল।

বলা বাহুল্য, নিরক্ষর ভাগচাষিটিরও একটি সংস্কৃতি আছে, সাহিত্য আছে। সংস্কৃতি কথাটা আমরা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ধরি, সে অর্থের কাছে আমাদের এই শিক্ষা হয় যে, মানুষমাত্রেরই সংস্কৃতি আছে এবং এই অর্থে সংস্কৃতি মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর আদৌ নেই। নৃবিজ্ঞানী হারস্কোভিট্স বলেন যে, 'সংস্কৃতি হল পৃথিবীতে (বা প্রকৃতিতে) মানব-নির্মিত সমস্ত কিছু—man-made part of the universe, তা আমাদের কাছে সংস্কৃতির সবচেয়ে যোগ্য সংজ্ঞা বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, এই মানব-নির্মিত ব্যাপারগুলির মধ্যে বাড়িঘর যন্ত্রপাতি টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি 'বস্তু' যেমন আছে, তেমনই আছে মানুষের নানা ক্রিয়া আর আচরণ, সেই সঙ্গে আছে তার বিপুল কল্পনাবস্তু—যা সাহিত্য চিত্রকলায় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে সংগীতে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক বাঙালিটির সংস্কৃতিতে—এসব শুধু স্মৃতি হিসেবেই নেই, আছে চিত্রিত মুদ্রিত নাট্যীকৃত, চলচ্চিত্রিত, দূরদর্শিত, নথীকৃত বস্তু হিসেবে। তিনি বারবার সেসবের কাছে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু বর্ধমানের চাষিটির মানসিক পর্যটনের জগৎ তো সে তুলনায় খুবই ছোটো। অধ্যাপকটির জনসংসর্গের পৃথিবীটি নানা স্তরের নানা বিচিত্র মানুষে ভরা, তিনি হয়তো টেলিফোন, ইন্টারনেট বা ই-মেল্-এর সাহায্যে সারা পৃথিবীর সমগোত্রীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু আমাদের বর্ধমানের চাষিটির সমগোত্রীয় ওই অঞ্চলের, হয়তো তার স্বগ্রামের মানুষের সঙ্গে। তার নিজস্ব স্মৃতিতে আছে

বাপ ঠাকুরদার মুখে শোনা কিছু কাহিনি-কিংবদন্তি, তার গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে তুলে নেওয়া কিছু প্রবচন, ছড়া, গান বা যাত্রার সংলাপ। অধ্যাপকের মানসিক বিশ্ব আর এই চাষির মনোবিশ্বে কতই-না তফাত।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এ আবার নতুন কথা কী? প্রতিটি ব্যক্তির মনোবিশ্বই আলাদা, কোনো দুটি লোকের বস্তুবিশ্ব আর মনোবিশ্ব একরকম নয়। আমরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা পরিবেশে বেড়ে উঠি, এমনকি দুই যমজ ভাইয়ের বস্তুপৃথিবী আর মানসপৃথিবী একরকম নয়। যদি ক্লোনিং করে দুটি অভিন্নরূপী পশু বা মানুষের সৃষ্টি করা হয়, তাদের প্রত্যেকের পৃথিবীও হুবহু একরকম হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক আর বর্ধমানের বাঙালি ভাগচাষির মধ্যে নানারকম তফাত তো থাকারই কথা, তা থেকে এমন কোনো আপেক্ষিকতাবাদে কি পৌঁছোতেই হবে যে, বাঙালি বলে আসলে কিছু নেই, আছে কেবল বাংলাভাষা বলা, কিংবা বাংলা বলছি তাই বাঙালি—এই ধারণা পোষণ করা কিছু ব্যক্তি, যাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি? সেই রকমই আছে কংগ্রেস বাঙালি, সিপিএম বাঙালি, গরিব বাঙালি, শহরের বাঙালি, গ্রামের বাঙালি, তৃণমূল বাঙালি, বড়লোক বাঙালি বা প্রবাসী বাঙালি; বাংলাদেশের, ত্রিপুরার, বিহারের, ওড়িশার বাঙালি?

আমরা যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই 'বাঙালি' নামটি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, সমস্ত বিভিন্নতা এবং বিচ্ছেদ সত্ত্বেও একটা ন্যূনতম মাত্রা আছে যাতে ওই ভিতরবৃত্তের বাঙালিদের একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে চেনা যায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে যখন বিদেশি কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ কারো মুখে বাংলা শুনি, তখন তার কাছে ছুটে গিয়ে চাপা বিস্ময়ে উল্লাসে প্রশ্ন করি, 'আপনি বাঙালি!' পোশাক, চেহারা ইত্যাদি কিছুই তখন বড়ো হয়ে ওঠে না পরিচয়াত্মক সূত্র হিসেবে—তখন ওই ভাষাটিই প্রথম এবং একমাত্র সূচক হয়ে দাঁড়ায়। এ ভাষা সিলেটের না পুরুলিয়ার তাও আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত করে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো এই এই একটিমাত্র চিহ্ন—তার ভাষা, পৃথিবীর সমস্ত বাঙালিকে এক বন্ধনে বাঁধে। এই ভাষার বহু রূপ আছে, তবু ওই নানা রূপের মধ্যেও আছে একটি ঐক্য, একটি 'বাংলাত্ব', তেমনই বাঙালি জাতিসত্তারও আছে নানা স্তর, নানা বিভিন্নতা, তা সত্ত্বেও তৈরি হয়ে চলেছে এক ব্যাপক বাঙালিত্বের পরিচিতি। ভাষা তার প্রায় সর্বাঙ্গীণ ভিত্তি।

বলা বাহুল্য, বাঙালিত্বের এই বিবর্তন সহজে হয়নি। কোনো গোষ্ঠীরই হয় না। নানা শ্রেণির বাঙালির ছিল এই ভাষাকে নিয়েই এক সংকট, ভাষাই হয়ে উঠেছিল আজকের পরিভাষায় যাকে বলে কূটস্থান বা 'প্রবলেমেটিক'। সে ইতিহাস বহুকথিত, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস যেমন। ভাষার এই কূটস্থান নিয়ে নানা দ্বিধা এবং সংশয় দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের দুটি পর্বে।

একটি মধ্যযুগে আর একটি আধুনিক যুগে, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তার বিস্তার আরও তীব্র হয় ১৯০৬-এ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর *নবী বংশ*-এ (১৫৮৪) লেখেন 'কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালি উতপন। না বুঝে বাঙালী সবে আরবী বচন।' এই দ্বিধা ও অপরাধবোধ (বাঙালি হওয়াটা অদৃষ্টের দোষ—আরব-জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার অনুশোচনা) দেখি মধ্যযুগেই বিস্তৃত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর আবদুল হাকিমের *নূর নামা*-য়

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়,
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়।

পরবর্তীকালে আরবী-বাংলার দ্বিধার চেহারাও নেয়। তাতে নানা মতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য থেকে খাদেমোল্-এসলাম বঙ্গবাসী *আল্-এস্লাম*-এর কার্তিক ১৩২২ সংখ্যায় 'বাঙ্গালির মাতৃভাষা' নামের রচনায় যে কথাগুলি লেখেন, তা পরবর্তীকালে শক্তি সঞ্চয় করে একটি স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সূত্র হয়ে দাঁড়ায়—

> 'মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালি (নিম্নরেখ আমাদের—প.স.) হইয়া নিজের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিংবা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণির মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়।'

স্থান এবং সময়ের সূত্র ধরে বাঙালির একটা উল্লম্ব এবং অনুভূমিক পরিচয় অবশ্যই খাড়া করা যায়। বাংলাভাষী অঞ্চলের যেটা মূল ভূখণ্ড সেটাতে রাজনৈতিক পরিচয়ের বিচ্ছেদ থাকলেও ভৌগোলিক পরিচয়ের একটা অব্যাহত বিস্তার আছে। কিন্তু ইতিহাসের ধারাক্রমে বাঙালি মূর্তি নির্মাণ খুব সহজ নয়। কারণ বাঙালিকে শাসন করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন দেশের ভিন্নভাষী রাজা বা সুলতানেরা—তাদের ইতিহাস আর বাঙালির ইতিহাস এক নয়। বরং বাঙালির ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার সাংস্কৃতিক নানা নির্মাণে—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, যাত্রা ও লোকনাট্যে, মূর্তিকলায়, মন্দির ও গৃহস্থাপত্যে, নৌকা নির্মাণে ও বাণিজ্যে, তার নানা হস্তশিল্পে, বস্ত্রবয়নে ও সজ্জায় ও তার অলংকরণশিল্পে। বাঙালি অনেকের কাছে রাজনৈতিকবাবে নত হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার দমিত হয়নি, নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নির্মাণেও তার ক্ষান্তি ছিল না। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালির ইতিহাস* গ্রন্থে বাঙালি যে বেতগাছের মতো নুয়ে পড়ে বাইরের উপদ্রবের বিপদ কাটিয়েছে এবং আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন। 'যে আদর্শ, যে ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে,

বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস গাছের মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালিকে বারবার বাঁচাইয়াছে।'[৮]

বাঙালি সংস্কৃতির, তার চিন্তা, আচরণ, প্রকাশ ও সৃষ্টির এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধনাই স্থান পেয়েছে। বাঙালি খ্রিস্টান অবশ্য তার সংখ্যাল্পতার কারণে এই সংস্কৃতিতে এখনও কোনো বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে তার জীবনচর্চা হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপকতার জীবনচর্যায় একটুখানি পার্শ্বিকতায় আচ্ছন্ন। বৌদ্ধদের ভূমিকা সে তুলনায় অনেকটা সুপ্রসর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলে বাঙালি সংস্কৃতির মোজেইকেরই অংশ।

হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম জীবনচর্চা ও তার সৃষ্টি ও বীক্ষাকে পাশাপাশি স্থাপন করে আহমদ শরীফ একটি অখণ্ড বাঙালিত্বের স্বরূপ সন্ধান করেছেন, দীর্ঘস্থায়ী মনোযোগ ও নিষ্ঠা নিয়ে। তাঁর সিদ্ধান্ত বহুলভাবে উদ্ধৃত হওয়ার যোগ্যঃ

> 'আমরা আগে ছিলাম animist, পরে হলাম pagan, তার পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান। আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি, ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজেদের মতো করে রচনা করবার জন্যেই। তার প্রামণ—নির্বাণকামী ও নৈরাত্ম-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল তা নয়, অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়। হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরি করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী।
>
> তার দর্শন সংখ্যা, তার শাস্ত্র যোগ। তাই দেহতত্ত্বই তার সাধ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফীরা এদেশের এ ঐতিহ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। চর্যাপদে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে, বাউল গানে, বৌদ্ধ বজ্র-সহজ-কালচক্র ও যন্ত্রযানে, শৈব-শাক্ত সাহিত্যে, বাউল-সুফী সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রী তত্ত্ব ও সাধনার সংবাদই পাই।
>
> ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে শরীয়তী ইসলাম এখানে তেমন আমল পায়নি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খান্‌কা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্, আর শিরনী পেয়েছেন সত্যপীর-জাফর-ইসমাইল খান জাহান গাজীরা কিংবা বদল-বড়খাঁ

---

[৮] নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৫৬ *বাঙ্গালীর ইতিহাস* আদি পর্ব, কলকাতা, বুক এমপেরিয়াম লিমিটেড, পৃ. ৮৫২।

ও সত্যপীর। এরা কেউ পাপপুণ্য তথা বেহেস্ত-দোজখের মালিক নন, তাহলে এঁদের খাতির কেন? সে কি পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার জন্যে নয়?'[৯]

তবু আমাদের ধারণা, বাঙালিত্বের সম্পূর্ণ নির্মাণ এখনও সমাপ্ত হয়নি। কখনও সমাপ্ত হয় না, কারণ বাঙালিত্ব একটি স্থাণু ধারণা নয়, সচল ধারণা। তবে তার একটা স্থির বৃহৎ স্মৃতি তৈরি হয়ে আছে, যে-স্মৃতি তার বন্ধন, তার সত্তা, এবং তার ভবিষ্যতেরও কিছুটা দখলদার। যতদিন তথাকথিত ভদ্রলোক বাঙালি আর অন্য বাঙালিতে শিক্ষা সংস্কৃতি ও অন্যান্য নানা প্রাপ্তির বিচ্ছেদ থাকবে, চেতনার বৈষম্য থাকবে, ততদিন বাঙালিত্বের ভিত্তি শক্ত হবে না। যতদিন আমরা 'বাঙালি' বলতে শুধু বাংলাভাষী 'ভদ্রলোক'দেরই বোঝাব ততদিন আমাদের বাঙালিত্বের নির্মাণ বাধাগ্রস্ত থাকবে। আমরা আগেই বলেছি, ভাষা দিয়েই আমাদের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়, ভাষাই যুক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর বর্ধমানের ভাগচাষিটিকে। কিন্তু ভাষা খুব সবল বন্ধন সবসময় নয়। যদি ভাষা তার প্রতিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়, তাকে এসে নিমজ্জিত করে বিদেশের অন্য ভাষা, যদি ভাষা আর নাগরিক পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে নিই, আমরা কিংবা ধর্মের কোনো শাসন চেপে বসে তার উপর—তবে সে বন্ধন মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যেতেই পারে। সংস্কৃতির সামগ্রিক বন্ধন সে কারণে অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এই সংস্কৃতির বন্ধনের মধ্যে কাজ, আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, ও চেতনাগত সমতা অর্জিত না হলে অখণ্ড বাঙালিত্বের মূর্তি সমাপ্ত হবে না। অর্থাৎ 'শিক্ষিত' বাঙালি সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে গিয়ে ছুঁতে হবে আপামর বাঙালি সাধারণকে, শিক্ষিত বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হয়ে উঠবে সমস্ত বাঙালির উত্তরাধিকার, আবার 'লোক-বাঙালি'র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি জানবে, বুঝবে গ্রহণ করবে 'শিক্ষিত' বাঙালি—তাহলেই বাঙালিত্ব তার সম্পূর্ণ অবয়ব লাভ করবে। এ বড়ো কঠিন প্রকল্প, এতে শুধু রাষ্ট্র নয়, ওই 'শিক্ষিত' নাগরিক মধ্যবিত্তের দায়ও আছে, সম্ভবত তারই দায় সবচেয়ে বেশি। তবে সে দায় সম্বন্ধে তার বৃহত্তর অংশ সচেতন বলে মনে হয় না।

---

[৯] আহমদ শরীফ, 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি', *বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব*।

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা সাহিত্য : ভবিষ্যতের ভাবনা

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সব সময়ে চেয়েছিল তাদের শাসনাধীন উপনিবেশগুলির মানুষেরা তাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভুলে যাক। যে-সব দেশের মানুষ নিজেদের ভাষা ও পরম্পরা তথা আত্মপরিচয় ভুলে যায়, তাদের শাসন করা সহজ হয়। ইংরেজের দাপটে ও ইংরেজির প্রভাবে আয়ারল্যান্ডের মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ তাদের নিজস্ব ভাষা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। একই পরিস্থিতি হয়েছিল পরবর্তী কালে লেবানন, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, সেনেগাল, মরক্কোর। আফ্রিকার অধিকাংশ মৌখিক ভাষার যেহেতু কোনো লিপি ছিল না, ছিল না কোনো লিখিত সাহিত্য, সেই কারণে এইসব লিপিহীন ভাষাগুলিকে ধ্বস্ত করা, ধর্ষণ করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। সেইসব দেশের শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে গিয়েছিল আধিপত্যকারী প্রভুদের ভাষা—ইংরেজি, ফরাসি অথবা জার্মান। দীর্ঘ দিনের Great Tradition ও Little Tradition-এ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের এই উদ্যোগ সফল হয়নি, মেকলেদের আগ্রহ ও উদ্যোগ সত্ত্বেও। ইংরেজি ভাষার প্রসারকে উপনিবেশ-বিস্তারের দিনগুলিতে মনে করা হয়েছিল সভ্যতারই বিস্তার। ভারতবর্ষে ইংরেজিশিক্ষিত মানুষ কিন্তু এই চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন। ১৮৩৮ সালের জুন মাসে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় উদয়চন্দ্র আঢ্য বলেন, 'মনুষ্যের কর্মদক্ষতাই প্রধান্যের কারণ...এমত জানিবেন যে, দেশের মনুষ্য সেই দেশের ভাষায় কর্মদক্ষ হইলে পরাধীন দাসত্বের কারণচ্যুত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইতে পারেন...।' রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে ভাষার স্বাধিকার অর্জন যে সম্পর্কান্বিত, এইকথা উদয়চন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন; বুঝেছিলেন ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও এক রাজনৈতিক সংগ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষাসাহিত্য বাঁচানোর ও তার শ্রীবৃদ্ধির আন্দোলন ছিল স্বাজাত্যবোধের আন্দোলনের অংশ। তারই প্রেরণায় মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি বর্জন করে বাংলায় সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। সেই আন্দোলনেরই পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বাঙালির বাঙালিত্বের প্রধান উপাদান বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নানা খণ্ডতার মধ্যেও বাংলার ইতিহাসে যে 'এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।' তার ভাষা দিয়েই তো গড়া হয় সাহিত্য। সেই বাঙালির ভাষা তথা তার সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু উদ্বেগের কারণ আমাদের মনে ইদানীং জন্মেছে।

বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে-সব বাঙালি বাস করতেন তাঁদের প্রবাসী বাঙালি বলা হতো। বিহারে, ওড়িশায়, উত্তরপ্রদেশে, দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল। উত্তর প্রদেশের বিহারের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে, কিন্তু এখন নামমাত্র আছে। বিভাগগুলি এখন আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায় না, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য পায় না। ছাত্ররাও বাংলা পড়তে আসছে না। ওইসব রাজ্যে জীবিকার ক্ষেত্রে বাংলা কোনো কাজে লাগে না। হিন্দিবলয়ে জীবিকার প্রয়োজনে বাঙালি হয় হিন্দিতে অথবা ইংরেজিতে পড়াশুনা করে। বিহারে বাংলার প্রচলন আজ স্তিমিত। পাটনাতে, দিল্লিতে বাংলা মাধ্যম বেশকিছু মাধ্যমিক স্কুল বাঙালিরা এক সময়ে গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু এখন সেইসব শহরে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় একটাও নেই। ঝাড়খণ্ডে সম্প্রতি বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির কথা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব এখনও বিধানসভায় অনুমোদিত হয়নি। আর উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সেই সদিচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করা কঠিন হতে পারে। অন্যদিকে রাঁচি, চাইবাসা, হাজারিবাগের পুরোনো পাঁচটি বাঙালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে জেরবার। এইভাবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, দিল্লিতে যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি বাস করেন, তাঁরা ভাষাগত পরিবেশের কারণে, বাড়িতে ভাষা বাংলা বললেও, কার্যত হিন্দিভাষী হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বর্তমান প্রজন্মের মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, অভিনেতা রাহুল বসুর মতো, বাংলা বলতে পারলেও বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না। বাংলা ভাষা যেহেতু তারা পড়তেই পারে না, সেই কারণে বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাদের শিরঃপীড়া নেই।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বহু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বাঙালিকে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মানুষগুলি হতে পারতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৯শে মার্চ তারিখের 'লোকসেবক' পত্রিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে যে-কথা বলা হয়েছিল; এইসব ছিন্নমূল মানুষকে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে পুনর্বাসন দিলে 'ক্রমে ইহারা বাংলা ভাষাও ভুলিয়া যাইবে', এই কথাটাই সত্য হয়ে গেল। ছত্তিশগড়ে, ওড়িশায়, বিহারে, উত্তরাঞ্চলে যাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছিল, ভাষাগত পরিবেশের বিরুদ্ধতায় তাদের উত্তরপুরুষেরা বাংলা ভাষা ভুলে যেতে বসেছে। আন্দামানে পুনর্বাসিত বাঙালির আগামী প্রজন্মের বড়ো অংশই মাতৃভাষা হারিয়ে আত্মপরিচয়হীন, যেন অনিকেত জাতিতে পরিণত হতে পারে। যদি দেশভাগ না হতো, এইসব বাঙালি যদি থেকে যেতে পারত পূর্ব বাংলার নিজস্ব ভিটেমাটিতে, তাহলে তারা থেকে যেতো বাংলা ভাষার মানচিত্রের মধ্যে। তারা হয়ে উঠতো একদিন বাংলা সাহিত্যের পাঠক, দু-চারজন হয়তো বাংলা সাহিত্যের লেখক। কিন্তু দেশভাগের ফলে তারা শুধু বাস্তুভিটে হারালো না, হারালো না শুধু তাদের নদী-নৌকা-ধানখেতের দৃশ্যপট, হারালো তাদের মাতৃভাষাও। বাংলা সাহিত্য এই বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে তার পাঠক হিসেবে পেল না।

পশ্চিম বাংলায় এখন প্রায় শতকরা সত্তরজন সাক্ষর। স্বাধীনতার সময় এই সাক্ষরের সংখ্যা ছিল চারভাগের এক ভাগ। চারগুণ সাক্ষর বেড়ে যাওয়ায়, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাশিত ছিল বই পড়ুয়ার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সাক্ষর বা তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও বই পড়ুয়ার সংখ্যা যে সমান তালে বাড়েনি তার প্রমাণ প্রকাশকদের অভিজ্ঞতা। আর বই বিক্রি কম বলে বইয়ের দাম বাড়ে। আবার বইয়ের দাম বাড়ে বলে বইয়ের বিক্রি কমে। বইকে এমন অপরিহার্য বস্তু মনে করা হয় না যে, অন্য খরচ কমিয়ে বই কেনা হবে। ফোটোকপির দৌলতে বই না কিনলেও কাজ চলে যায়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে সংগতভাবে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রথম প্রজন্মের বিদ্যার্থীরা। যে মান্য-বাংলায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় তাদের কাছে সেই বাংলাভাষা এক দ্বিতীয় ভাষা। তাদের মুখের আঞ্চলিক বাংলায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় না বলে, সেই সাহিত্যের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে না। পূর্ব বাংলায় একসময় ঢাকাই বাংলায় সাহিত্য রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্যোগ সফল হয়নি, সেই প্রচেষ্টাকে অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাতুলতা বলেছিলেন। পশ্চিম বাংলাতেও যে-সব অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহারকারী ছেলেমেয়ে এখন মান্য-বাংলায় পড়াশুনা করছে তারাও কালে-কালে বাংলা সাহিত্যের পাঠক, একদিন হয়তো বাংলা সাহিত্যের লেখক হয়ে উঠবে। মান্য-বাংলা আত্মস্থ করবার জন্যে, মান্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হওয়ার জন্যে তাদের আরও অনেক সময় দিতে হবে। অন্যদিকে দেখছি, আঞ্চলিক বাংলায় কথা-বলা কোনো-কোনো জনগোষ্ঠী দাবি করছেন তাঁদের ভাষা আদৌ বাংলা নয়। তাঁরা বাংলা ভাষার মানচিত্র থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছেন।

অন্যদিকে যাঁরাও-বা বাংলা সাহিত্যের পাঠক ছিলেন তাঁরাও আর বাংলা সাহিত্যের পাঠক থাকছেন না। স্বাধীনতার আগে অবসর যাপনের একমাত্র উপায় ছিল বইপড়া। মহিলারা বিশেষ করে, দুপুবেলায় সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে বিশ্রামের সময় যাপন করতেন বই পড়ে। আমার মায়ের মৃত্যু হয় ৯২ বছর বয়সে, নব্বুই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা বইয়ের এক নিষ্ঠাবতী পাঠক। প্রতিমা ঘোষ তাঁর 'মাতৃমঙ্গল' নামের স্মৃতিকথায় তাঁর নিজের মা ও শাশুড়ি-মায়ের বইয়ের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মা আনোয়ারা বেগমও ছিলেন একাগ্র বইপড়ুয়া। এইসব মহিলা কিন্তু সমাজে ব্যতিক্রম ছিলেন না, তাঁদের ঘরে-ঘরে দেখা যেতো। তাঁরা হয়তো স্কুল-কলেজে পড়েননি, কিন্তু বই পড়ায় তাঁদের আগ্রহ ছিল গভীর। তারপরে বইপড়ার ঘণ্টাগুলিতে ভাগ বসালো বেতারযন্ত্র, তার অনুরোধের আসর নিয়ে, বেতার নাটক নিয়ে। কিন্তু গোড়ায় রেডিও ছিল অত্যন্ত বিরল ব্যাপার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' কবিতায় পড়েছি কতোটা দুর্লভ ছিল রেডিও ব্যাপারটা। পরে রেডিও ছড়িয়ে পড়েছিল, ট্রানজিস্টারের দৌলতে ঘুরছিল হাতে-হাতে। বইপড়ার সময় কমে গেল। আর এখন গৃহস্থ বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার বাসিন্দা টিভি। তার নিষ্ক্রিয় বিনোদন কেড়ে নিল বইপড়ার সময়। গৃহিণীরা আর দুপুরবেলায় বইপড়ার সময় পান না। আগে

লোকাল ট্রেনে, বাসে, ট্রামে আকচার মানুষ দেখা যেতো নিবিষ্ট মনে বই পড়তে-পড়তে গন্তব্যের দিকে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমার এক তরুণ আত্মীয় বই পড়তে-পড়তে কলকাতায় মেট্রোয় অফিসে যায় এবং অফিস থেকে ফেরে। সে বই পড়ছে দেখে একদিন ধুতিপানজাবিপরা এক মাঝবয়সী মানুষ উত্তেজিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। এবং জানতে চান কী বই সে পড়ছে। সৈয়দ মুজতবা আলির *দেশে-বিদেশে* পড়ছে জেনে তিনি জানতে চান, প্রথমবার সে এই বই পড়ছে কি না এবং ইতিমধ্যে ওই-ওই সরস জায়গাগুলি সে পড়ে ফেলেছে কী না। এবং তিনি নিজের কথা বলতে থাকেন। শ্যামবাজার এলাকার একটি ছোটো দোকানের মালিক তিনি। ইংরেজি বই পড়তে পারেন না, কিন্তু বাংলা বই প্রচুর পড়েন। ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন এবং বিভূতিভূষণের স্মৃতিজড়িত জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। আমার তরুণ আত্মীয়কে সেই সহযাত্রী পরামর্শ দিলেন *গীতবিতান* মাথার কাছে রাখার, গভীর অনুভূতির মুহূর্তে এমন পরম আশ্রয় আর হয় না। ইতিমধ্যে পাতালরেল তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ায় তিনি নাটকীয়ভাবে আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নেন। মাথা নত করে কুর্নিশ করেন তিনি আর বলেন, 'খুদা হাফেজ, আমরা তো মাইনরিটি!'

বইপড়ুয়ারা আজ যে মাইনরিটি তার অনেক কারণ। স্কুল-কলেজের পড়াশুনায় সাহিত্য অধ্যয়ন এখন গুরুত্ব হারিয়েছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে এখন জোরটা বিজ্ঞানশিক্ষার উপর। বিজ্ঞান পড়ায় জোর দেওয়া হয় যাতে সে প্রযুক্তিবিদ হয়ে উঠতে পারে এবং অচিরেই বড়ো বেতনের চাকরি বগলদাবা করতে পারে। তাই এখন দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য অধ্যয়নে উৎসাহী হয় না উজ্জ্বল ছাত্রেরা। ফলে ওইসব বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব আজ কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওইসব বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিম্নমেধার লীলাক্ষেত্র। আমাদের সময়ে বিজ্ঞানের ছাত্রও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য সমানভাবে পড়তো। Rime of the Ancient Mariner, Lord of Chateau Noir, Riders to the Sea-এর মতো উচ্চমানের রচনা পড়তে পড়তে বিজ্ঞানের ছাত্রের মনেও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে যেত। তাই পদার্থবিজ্ঞানের নামজাদা ছাত্র মনোজ পাল, অমৃতাভ দাশগুপ্ত, চঞ্চল মজুমদারেরা সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ। স্বাধীনতার পর পর উন্নয়নের লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়াররা হয়ে উঠেছিলেন যেন নতুন ভারতবর্ষ নির্মাণের স্বপ্নের প্রতীক। সেই উদ্দীপনায় এবং দ্রুত চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলেও, ওই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সাহিত্যপাঠের প্রেরণায় তাদের অনেকের মনেই থেকে গিয়েছিল সাহিত্যানুরাগ। সেই অনুরাগ মনের মধ্যে ছিল বলেই মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার সরোদশিল্পী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত লিখে ফেলতে পারেন 'বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ' নামের চমৎকার সরস স্মৃতিকথা, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র বিনয় মজুমদার হয়ে উঠতে পারেন বাংলার এক অগ্রণী কবি, ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল ধর হয়ে উঠতে পারেন লেখক অতীন্দ্রিয় পাঠক। 'পাঠসংকলন'-এ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নির্বাচিত অংশ পড়ে এমনই ভালো লেগে যায় যে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কিনে ফেলেন সমগ্র

'মেঘনাদবধকাব্য' বইটি। আর অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ছাত্রের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে, টাকা ফেরত না নিয়ে বুদ্ধদেবকে উপহার দিয়ে দেন বইটি। কলেজের পরিবেশ ও পাঠক্রম এখন সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা জাগায় না। বাড়ির পরিবেশও বিরুদ্ধে। অভিভাবকেরা আজ চান না ছেলেমেয়ে বাইরের বই পড়ুক। নম্বরের তীব্র দৌড়-প্রতিযোগিতায় তেমন পড়ার অর্থ সময়ের অপচয় করা। সাত-আটজন শিক্ষকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে কোচিং নিতে নিতে তেমন বাইরের বই পড়ার সময়ও থাকে না। যেটুকু সময় থাকে সেই সময়টা ক্লান্ত তরুণের মন আত্মসমর্পণ করে টিভি আর মিউজিক সিস্টেমের নিষ্ক্রিয় প্রমোদের কাছে।

বাংলা ভাষা আর সাহিত্য আজ আক্রান্ত অন্য এক পরাক্রমশালীর আক্রমণে। আজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু—('বন্দীর বন্দনা' থেকে 'মহাভারতের কথা'-য় অক্লান্ত) নিজের দুই মেয়েকে তিনি বাংলা মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের অসামান্য লেখাগুলি ইংরেজিনবিশ নাতনি পড়ছে কিনা তাই নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর গভীর উদ্বেগ। তাঁর কোনো নাতনি আজ বাঙালির সঙ্গে কথা বলতে, বা বাঙালিকে চিঠি লিখতে ইংরেজিই ব্যবহার করে জেনে তিনি বিমূঢ়। তিনি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার নাতনিরা সবাই ইন্দো-অ্যাংলিয়ান হয়ে যায় এই আমার এক দুশ্চিন্তা... ।' আমাদেরও ঘরে ঘরে আজ এই সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে ভার্যা বাংলা বই পড়ায় ইংরেজিতে-অনন্যমনা উচ্চশিক্ষিত বাঙালি স্বামী বউকে তিরস্কার করে বলেছিল, "ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড়ো কেন?" বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইংরেজি-শিক্ষিতের মতে, বাঙ্গলা-ফাঙলা পড়ে নিতান্ত ছোটোলোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজিনবিশ বাঙালি সাহেবদের ডেকে বলেছিল, "আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব।" এই মহান লেখক তাঁর ঋষিদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, 'অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।' ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন এই ইংরেজিয়ানার হ্যাংলামি ছিল, তেমনি ছিল স্বাদেশিকতা-উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ। তাঁদের মনে আন্তর্জাতিকতা ও স্বাদেশিকতা মিলে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক হতে গিয়ে তাঁরা স্বাদেশিক সত্তাকে বিস্মৃত হননি। তাঁদের প্রতিরোধের ফলে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে যা হতে পারেনি, Globalisation-এর দৌলতে আজ তাই হচ্ছে। প্রথমে, সূর্যাস্ত-হয়-না এমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণে, পরে মার্কিন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দাপটে ইংরেজি যেন একচ্ছত্র ভাষা হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, রাজনীতি, গণমাধ্যম, সংযোগব্যবস্থায় ইংরেজির অপ্রতিহত প্রভাব। ক্যানাডিয়ান ইংরেজি, অস্ট্রেলীয় ইংরেজি, ভারতীয় ইংরেজি, ক্যারেবিয়ান দ্বীপসমূহের ইংরেজি—এইসব স্থানিক তারতম্য নিয়ে ইংরেজিও হয়ে উঠতে চলেছে যেন দুনিয়ার একমাত্র ভাষা।

এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান গড়তে গেলে শাদা চামড়ার ভাষা ইংরেজি চাই-ই চাই। ইংরেজি এখন 'part of the identity of a new Asian middle class'। আমাদের সন্তানেরাও এই এশীয়

মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত। তারা মনে করে আধুনিক বিশ্বে তাদের উচ্চাশা পূরণের উপায় ইংরেজিতে সাবলীল হওয়া। চিনেদের ইংরেজি শেখানোর ব্যবসায়ে প্রধান উদ্যোগপতি লি ইয়াং বলেন, চিনেরা দলে দলে ইংরেজি শিখছে, কারণ "Coca-cola and Microsoft rule the world"। ২০০৮ সালে বেজিঙে অলিম্পিকের আসর বসার আগে সরকারিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই নগরের নাগরিকদের ইংরেজিতে সড়গড় হতে হবে "if they wanted to keep their jobs"। জোহানেসবার্গের এক ট্যাক্সিচালকের কথা পড়েছি। সে নিজের দেশের এগারোটি ভাষা কাজ-চালানোর মতো জানে, কিন্তু তার উৎকণ্ঠা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সে এতো বেশি অর্জন করতে চায় যাতে তার সব সন্তান ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারে এবং তার জোরে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার ধনাঢ্য মানুষেরা নাকি সন্তানদের প্ল্যাস্টিক সার্জনদের হাতে সঁপে দেয় তাদের জিভ লম্বা করার জন্য, যাতে তারা সাবলীলভাবে ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারে। রুটির কোনদিকে মাখন মাখানো তা বুঝতে পারায় ক্ষমতার ভাষা ইংরেজির অনুশীলন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে অনেক বেড়ে গেছে। শহরে বাংলা-মাধ্যম সরকারি/আধা-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রের অভাবে উঠে যাচ্ছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা তো বটেই, উচ্চাশী মধ্যবিত্তের সন্তানেরাও আজ ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে। দু-তিন বছর আগেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলসমূহের দশ ক্লাস বারো ক্লাসের সর্বভারতীয় ফলাফল নিয়ে তেমন হইচই হতো না। ইদানীং হচ্ছে। বারো ক্লাসের শেষে এখন অধিকাংশ উজ্জ্বল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করে Electronics, Computer, Tele-Communication, Management ইত্যাদি বিষয়ে এবং এইসব উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষান্তে হারিয়ে যায় দুনিয়া-জোড়া MNC-র গোলকধাঁধায়। তারা বড়জোর *Time* অথবা *Newsweek* পত্রিকার পাতা ওলটায়, খুব বেশি হলে *The Vinci Code*-এর মতো কোনো bestseller পড়ে। সাহিত্য তাদের আগ্রহের বিষয় নয়, বাংলা সাহিত্য আদৌ নয়। কোনো কাজে লাগে না বলে হয়তো সাহিত্য পড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে অচির ভবিষ্যতে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন খানিকটা টিকে থাকবে, ক্ষমতার ও উন্নয়নের ভাষা যেহেতু ইংরেজি। কাজের বিদ্যা, উপার্জনের বিদ্যালাভের পথ করে দিতে হবে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এখন সরে যাচ্ছে Management, Turism, Journalism & Mass Communication, IT ইত্যাদি শেখানোর দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাচ্ছে গৌরবান্বিত Vocational Training Centre।

ইংরেজির এই দাপটের দরুন ইংরেজি ভাষায় লেখেন যে ভারতীয় লেখকেরা আজ তাদেরই রমরমা। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্, সদ্যপ্রয়াত রাজা রাও, আর. কে. নারায়ণরা ভারতীয় ভাষার লেখকদের প্রতাপে আড়ালেই থাকতেন খানিকটা। এখন অবস্থা বদলে গেছে। এখন ইংরেজিতে লেখা ভারতীয় সাহিত্যই একমাত্র ভারতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হয়। এখন অনিতা দেশাই, বিক্রম শেঠ, ভারতী মুখার্জি, অমিতাভ ঘোষ, গীতা হরিহরণ, অরুন্ধতী রায়, ঝুম্পা লাহিড়ি, মনিকা আলি, কিরণ দেশাই দক্ষিণ এশীয় সাহিত্যের নক্ষত্র। তাঁদের ইংরেজিতে সাহিত্য

রচনার যুক্তি আমরা পেয়ে যাব কবি কমলা দাসের কবিতায়। এই ভাষা এমনই তাঁদের আয়ত্ত হয়েছে যে, এই ভাষাতেই তাঁরা তাঁদের joys, longings এবং hopes প্রকাশ করেন। কাকের পক্ষে কা-কা ডাক যেমন, সিংহের পক্ষে গর্জন যেমন, স্বাভাবিক, তেমনি ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশও নাকি তাঁদের পক্ষে তেমন স্বাভাবিক। হতে পারে এই ভাষায় 'distortions' আছে, 'queerness' আছে, তবু এই আধা-ইংরেজি আধা-ভারতীয় ইংরেজি ভাষাই তাঁর নিজস্ব। তাই এই ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা না হলেও এই ভাষাতেই তিনি লিখবেন, বারণ শুনবেন না কোনো 'critics, friends, visiting cousins'-এর। এই যুক্তিতে, আর হয়তো বাজারের হাতছানিতে বহু ভারতীয় আজ ইংরেজিতে সাহিত্য রচনায় ধাবমান। দক্ষিণ এশিয়ার ভাষায় যাঁরা লেখেন সেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়দের, নীলমণি ফুকন, হীরেন ভট্টাচার্যদের, নির্মল বর্মা, দিলীপ চিত্রে, অজিত কৌর, অশোক মিত্রদের, আল মাহমুদ, হাসান আজিজুল হকদের, অমর মিত্র, জয় গোস্বামীদের খবর কে রাখে? ইংরেজিতে লেখা জনৈক ভারতীয়ের বই রিভিয়ু করতে গিয়ে সম্প্রতি অশোক মিত্র লিখেছেন, 'গত এক দুই দশকে, ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়, সম-উৎকর্ষের সম-গুণসম্পন্ন সম-ধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; যেহেতু সে-সব গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা নয়, প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ তাদের ঘটেনি, তাদের নিয়ে আগ্রহ আলোচনাও, মরুপথে-গতি-হারানো নদীর মতো, দ্রুত সমাপ্ত।' প্রাদেশিক ভাষায় লেখা সম 'আকর্ষক যে-সব গ্রন্থ খ্যাতির মুখ দেখলো না' তাদের জন্য অশোক মিত্র দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। এইসব বই ইংরেজিতে অনূদিত হলে তবু খানিকটা নজর কাড়ে।

সর্বত্র এখন আওয়াজ শুনতে পাই—উন্নয়ন, উন্নয়ন। আমাদের উন্নয়ন করতে হবে, উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, উন্নয়ন বিনে গতি নেই। যে-পত্রিকায় লেখা ছাপা না হলে নাকি বাঙালি লেখকের স্বীকৃতিই মেলে না, সেই পত্রিকায় বছর চারেক আগে লেখা হয়েছিল, 'দরকার হলে বাঙালি তার বাঙালিত্ব ঘুচিয়েই এগিয়ে যাবে।' প্রায় যেন এগিয়ে যাওয়ার শর্তই হচ্ছে বাঙালিত্ব ভুলে যাওয়া। আচার্য সুকুমার সেন বলেছিলেন, 'বাঙালির বাঙালিত্ব কখনও লুপ্ত হবে না।' আর, এখন বলা হচ্ছে বাঙালি বাঙালিত্ব ঘুচিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। জনপ্রিয় হিন্দি চলচ্চিত্রের গান শুনি, মুঝ্‌কো ভি থোড়া লিফ্‌ট করা দে...। হিন্দি গানের মধ্যে এই ইংরেজি লিফ্‌ট কথাটা খেয়াল করবেন। লিফ্‌ট বা উন্নয়ন মানেই ইংরেজি। এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাবিষ্যৎ নিয়ে যখন ভাবি, তখন উন্নয়নের আক্রমণ নিয়ে না ভেবে পারি না। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জোয়ারের ভাষা ইংরেজি; উন্নয়নের আক্রমণ আর ইংরেজির আক্রমণ আজ সমার্থক। সেই আক্রমণ থেকে আমাদের পলিমাটির নরম দেশের অনুন্নত মানুষের ভাষা বাংলা আত্মরক্ষা করতে পারবে তো? যতোদিন গরিব মানুষ আছে ততোদিন বাংলাভাষা থাকবে, কারণ বাংলা এখন গরিব মানুষের ভাষা। আমরা তো উন্নয়ন হোক চাই, মানুষ গরিব থাকুক, বেকার থাকুক এমনটি চাই না। আজ যা অবাস্তব সত্যিই তা যদি বাস্তব হয়ে ওঠে, উন্নত পশ্চিম বাংলায় এবং বাংলাদেশে, যদি গরিবি ঘুচে

যায়, যদি না থাকে বেকার, অর্ধবেকার, তাহলে লিটল ম্যাগাজিন কে করবে? বাংলায় এতো কবি কি কবিতা লিখবে বাংলা ভাষায়? খুচরো ব্যবসায় MNC ঢুকলে যেমন ঝাঁচকচকে মল্ বা মার্ট গড়ে উঠবে, পাড়ার মলিন ছোটো ছোটো দোকানগুলি উঠে যাবে, তেমন হবে কি বাংলা ভাষার অবস্থা! অনেক বাড়িতে এখনও বাইরের ঘরে মান্য-বাংলায় কথা বলে এসে ভিতরের ঘরে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলা হয়। তেমনি আমরা বহির্জগতের যাবতীয় কাজকর্ম করবো ইংরেজিতে, বড়জোর বাড়িতে কথা বলবো বাংলায়। বাংলা পড়া বা লেখার ভাষা থাকবে না, হয়ে যাবে কথা বলবার ভাষা মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার দরজা খুলে দেবার জন্য। কারণ তিনি জানতেন, দেশের উচ্চ আর নিম্নশ্রেণির মধ্যে যদি ভাষাগত ভেদ থাকে তাহলে দুই শ্রেণিতে সহৃদয়তা জন্মাবে না। সেই কারণে তিনি জানিয়েছিলেন, 'we ought to disanglicise ourselves'। ইংরেজি-জানা আর না-জানা মানুষের মধ্যে ভেদকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অনুরূপ ভাবনার অংশীদার ছিলেন। অথচ উদারীকরণ, ভুবনায়নের দৌলতে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেছে ইংরেজি-জানা আর না-জানা মানুষের মধ্যে দূরত্ব। ইংরেজি ফরফরিয়ে বলতে না-পারা মানুষ আজ হীনম্মন্যতায়, ব্যর্থতাবোধে ভোগে।

স্বাধীনতার পর সভায়-সমিতিতে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কাজকর্ম বাংলাভাষায় করার আইন প্রবর্তিত হয়। যে ভাষায় রাজ্যের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ কথা বলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই ভাষাকেই তো সরকারি কাজকর্মের ভাষা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও বহু সরকারি দপ্তর এই রাজ্যে মিলবে যেখানে দপ্তরের নাম পর্যন্ত বাংলায় লেখা হয় না, কাজকর্ম তো হয়ই না। পরিস্থিতি আজ এমনই যে বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষাকে সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি কাজকর্মে বাংলাভাষা চালু করবার বাৎসরিক সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়। বক্তা-শ্রোতা দুই পক্ষই জানে, এসব কথার-কথা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ আজ যখন সালিম, মিতশুবিশি, টাটা, আম্বানিদের হাত ধরে উন্নয়নের দিকে ধাবমান, তখন অনুন্নয়নের ভাষা বাংলা সত্যিকারের সরকারি ভাষা হয়ে উঠবে এই কথা ভাবা কঠিন। তাঁর গবেষণা উচ্চমানের হলেও ইতিহাসের অধ্যাপকের পক্ষে প্রফেসরপদে উন্নীত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু তাঁর ইতিহাস গবেষণার গ্রন্থগুলি বাংলায় লেখা। বাংলাভাষায় মাত্র কথা বলতে পারেন যাঁরা তাঁরা বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকারও আজ হারিয়েছেন। তাই অনর্গল ইংরেজি বলিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি ও বৃন্দা কারাতকে রাজ্যসভায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবস্থা বাংলাদেশে তুলনায় অনেক ভালো। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সত্যিই বাংলা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে থানার দারোগা, উচ্চারণ আঞ্চলিক

হতেও পারে, কিন্তু মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের এই কাজটা পারেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। কিন্তু সেই বাংলাদেশেও আজ উন্নয়নের আক্রমণে বাংলা ভাষা আক্রান্ত। আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছিলেন, বাংলা কার্যত 'বুয়া' বা পরিচারিকার ভাষায় পর্যবসিত। যেমন ছিল রুশ ভাষা নভেম্বর বিপ্লবের আগে। অভিজাতেরা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন ফরাসিতে, তাঁরা অনুগ্রহ করে মাতৃভাষা রুশভাষায় কথা বলতেন দাস-চাকরদের সঙ্গে, ফরাসি-না-জানা ঠাকুমা-দিদিমাদের সঙ্গে। ইংরেজি ভাষার রমরমা আজ বাংলাদেশেও। 'Asian middle class'-এর অন্তর্গত বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণির হাজার হাজার সন্তান এখন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি-মাধ্যমে লেখাপড়া করতে দেশের বাইরেও দেরাদুনে, দার্জিলিং, কার্শিয়াঙে, কালিম্পঙে ভিড় করে। তাই তুলনায় বাংলা ভাষা এখনও বাংলাদেশে খানিকটা সুখে আছে বটে, কিন্তু সেই সুখ তার কপালে কতদিন সইবে তা জানি না।

রঙ্গলাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বাঙালি লেখকেরা ছিলেন ইংরেজি-জানা মানুষ। তাঁরা 'ইংলন্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালী'-তে সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। মধুসূদনের সামনে ঘোষিতভাবে আদর্শ ছিল মিলটনের, বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে হয়তো অঘোষিতভাবে আদর্শ ছিল স্কটের। নাট্যকারেরা দীর্ঘ দিন শেক্সপীয়রকে সামনে নজির হিসেবে রেখে নাটক রচনা করতেন। যেমন গিরিশচন্দ্র, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল। এইসব বিদেশাগত মডেল অনেকটাই অবশ্য রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল চিরাগত দেশজ নিজস্ব ঐতিহ্যের রসায়নে। কবিতার ক্ষেত্রেও আমাদের কবিরা এই সেদিন পর্যন্ত মুখাপেক্ষী থেকেছেন বোদলেয়ার, এলিয়ট, মায়াকোভস্কি, এলুয়ারের। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বদল শুরু হয়েছিল পরিস্থিতির, প্রেরণা ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বের। আগেই বলেছি, আমাদের সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ছিল উপেক্ষিত, প্রধান জোর ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর। সেই অধ্যয়ন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও রুচি তৈরি করে দিত। এখন বাংলা-স্কুলে ইংরেজি পড়ানোর সময় তাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখানো হয়, জোর দেওয়া হয় না সাহিত্যরুচি গড়ার দিকে। এখন বাংলা বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা মাধ্যমিকের শেষে স্বাবলম্বীভাবে কোনো ইংরেজি বই পড়তে পারে না। তাছাড়া বাংলা স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলে কিনতে পারে না ইংরেজি বই। সুতরাং তাদের পক্ষে ইংরেজি বই পড়ে বা ইংরেজি তর্জমার মাধ্যমে অন্য বিদেশি বই পড়ে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় সাহিত্য রচনা আজ আর সম্ভব নয়। আর যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে তাদের শতকরা নব্বুই জন বাংলা বই ছুঁয়ে দেখে না। বাংলায় তো লেখে না কখনোই।

তাই একসময় মনে হয়েছিল ইংরেজি না-জানাদের হাতে বিদেশি প্রভাবমুক্ত এক সাবলম্বী বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়। মনে হয়েছিল, চণ্ডীদাস যেমন ইংরেজি না জেনে বাংলায় অমর পদাবলী লিখেছিলেন, তেমনি লিখবেন এখন থেকে ভারতের আর বাংলাদেশের বাংলাভাষী যুবক-

যুবতীরা। মনে হয়েছিল এখন থেকে হয়তো মফস্বলের গ্রামাঞ্চলে গঞ্জে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষ, অসচ্ছল মানুষের ইংরেজি না-জানা ছেলেমেয়েরা গড়ে তুলবে এক বিদেশিপ্রভাবমুক্ত নিজের-পায়ে-দাঁড়ানো বাংলা সাহিত্য। মধ্যবর্তী সময়ের পশ্চিম অনুসরণের দিনগুলির তোয়াক্কা না করে উত্তর-ঔপনিবেশিক সেই সাহিত্য হাত ধরবে রামপ্রসাদের, লালন ফকিরের অথবা নিধুবাবুর। ইংরেজি-জানাদের হাতে ক্ষমতা; ভেবেছিলাম, এখন থেকে ইংরেজি-না-জানাদের দায় হবে ক্ষমতাহীনের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র বাংলা সাহিত্যের পতাকা সুপবনে উড়িয়ে দেবার। ইসলামের অভিঘাতে ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-রেনেসাঁস, ইংরেজের অভিঘাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁস। স্বাধীনতার কিছু পরে মনে হয়েছিল আমরা এক নতুন আরম্ভের দিকে এগিয়ে চলেছি, আমরা বুঝি এক সাবলম্বী সাহিত্যিক নবজন্মের অপেক্ষায়।

কিন্তু এখন সেই নবজন্মের আশা করতে সাহস করি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষে, একবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষা অনুপ্রাণিত করছে না, বাংলা ভাষাকে সে যেন গ্রাস করতে উদ্যত। ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে যে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য এসেছিল, তাকে বাঙালি যেমন আত্মসাৎ করেছিল, তেমনি তার বিরুদ্ধে, আগেই বলেছি, প্রতিরোধও ছিল। আজ বাজার বিস্তারের দিনে, বিশ্বয়ানের দিনে, নতুন করে যেন উপনিবেশের বিস্তার হচ্ছে। এই নতুন উপনিবেশ বিস্তারের দিনে ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আর নেই, ইংরেজি এখন মালা-চন্দনে অভ্যর্থিত। উন্নত থেকে ক্রমাগত উন্নততর হওয়ার দৌড়পাল্লায় ইংরেজির হাত ধরে এগোন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই, এই সিদ্ধান্ত যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চণ্ডীদাস বেঁচে থাকলে তিনিও হীনম্মন্যতায় ভুগতেন। আর ইংরেজির সর্বগ্রাসী আধিপত্য যে-উন্নয়নের কারণে, সেই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইদানীং জীবনযাপনের ধরন একেবারে পালটে যাচ্ছে। এই জীবন যাপনের ধরন শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করে। অবকাশহীন জীবনে শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ অনেকবার গদ্যে পদ্যে অবসরের গান রচনা করেছেন। জীবন এখন ছুটন্ত, যেহেতু বিনিয়োগকারীরা চায়। আর ছুটন্ত জীবনে দর্শন নেই, আত্মদর্শন নেই। শিল্পসাহিত্যের বেঁচে থাকা কঠিন যখন বেঁচে থাকার জন্য সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা কাজ করতে হয়। আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন আজ ফিকে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। একদিকে বেকার মানুষ হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছে, অন্যদিকে মোটা মাইনের কাজের লোকেরা হন্যে হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মাঝারি বেতনের লোকেরা বাড়তি কাজ করছে উপার্জন বাড়াবার লক্ষ্যে। উপার্জন বাড়াতেই হবে কারণ ভোগ্যপণ্য হাতছানি দিচ্ছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই শুধু কাজ আর উৎপাদন চায় না, সরকারিভাবেও মনে করা হয় ছুটি কমালেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনার মানের উন্নতি হবে। একদিকে ধনার্জনের দস্তুর প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে ক্রমাগত ভোগ। আমরা মানুষ নই, consumer। ভোগের দৌড়ে খেয়াল থাকে না consumption-এর আদি

অর্থ ক্ষয়; consumptive ক্ষয়রোগী। ক্রমাগত ভোগের দিকে এগিয়ে যাওয়া সভ্যতা, এগিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকে। সংযোগব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানবিক সংযোগ কমে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আড়াই জন মানুষ। দুজন কাজে বেরিয়ে যায়। বালক বা বালিকাটি কাজের লোকের হেফাজতে থাকে অথবা স্কুল থেকে এসে ফাঁকা ফ্ল্যাটে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। অকুলান সংসারে কোনো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নেই যে তাকে ভালোবেসে সঙ্গ দিতে পারে, গল্প শোনাতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ যন্ত্র থেকে যন্ত্রে ভেসে বেড়ায়—টিভি খুলে রাখে, গাঁকগাঁক করে মিউজিক সিস্টেম ঘর কাঁপিয়ে দেয়, অনর্গল টেলিফোনে সেলফোনে কথা চালাচালি হয়। প্রত্যেক মানুষ অতীতে অন্তত একটি কারণে লেখার কাজ করতে বাধ্য হতো—প্রত্যেক মানুষই বছরে দু-চারটে চিঠি লিখতো। টেলিফোনের বহুল ব্যবহারে সেই ন্যূনতম লেখবার দায়টুকুও আজ লুপ্ত। এই জীবনযাপনে, মানবিক সম্পর্কহীনতায় সমাজ যেন থেকেও নেই। সমাজ না থাকলে ভাষা আর সাহিত্যের ভিত দুর্বল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা চলবে হয়তো, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বইয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে গবেষকেরা ভিড় জমাতেই থাকবেন, কিন্তু জীবন্ত বাংলা সাহিত্য সেই ভবিষ্যতে রচিত হবে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। মানুষের এই প্রায়-সমাজহীন সমাজে, ইংরেজির উন্নয়নের আক্রমণে আক্রান্ত বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

মনে হতে পারে এইসব দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই এখনও। মনে হতে পারে শহরবাসী মধ্যবিত্তের জগৎটাকেই মাত্র দেখছি বলে এতো দুশ্চিন্তা। শহরের বাইরে বিপুল সংখ্যক গ্রাম ছড়িয়ে আছে, সেইসব গ্রামের দিকে তাকালে দুর্ভাবনার অন্তত আশু কারণ থাকে না। কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত একটি ইস্তেহারের ভবিষ্যৎবাণী। সেই ইস্তেহারে দুই মনীষী বলেছিলেন, "The bourgeoisie has subjected the country to the rule of the towns." উন্নয়নের পরিণামে যদি শহরের শাসন গ্রামাঞ্চলের উপর চেপে বসে তাহলে এই দুর্ভাবনা বোধ হয় অকারণ থাকে না। উন্নয়নের শর্ত হিসাবে পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, গ্রাম শহরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সড়কে সেতুতে, বহুজাতিক পণ্যজাল বদলে দিচ্ছে গ্রামের মানুষেরও চাওয়া ও পাওয়া। যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল মেলে না, সেখানে মিলছে পেপসি ও কোকাকোলা! তাই দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাই না। এই দুর্ভাবনা মিথ্যা প্রমাণ হলে বুক থেকে ভার নেমে যাবে। যতোদিন ভার নেমে না যায়, ততোদিন কষ্টে থাকি। উন্নয়নের মানেই কি বসতি থেকে, রুজিরোজগার থেকে, নিজের জবান থেকে উৎখাত হওয়া? উন্নয়ন = উৎখাত, এই কি এখনকার সমীকরণ? উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের জীবন যাপনের, বসবাসের, মুখের জবানের সামঞ্জস্য করাটাই এখন চ্যালেঞ্জ। সেই উত্তর-আধুনিক চ্যালেঞ্জের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। বিশ্বব্যাপী চলেছে Global দাপটের বিরুদ্ধে Local সত্তার অসম লড়াই। এই লড়াই অসম বলেই বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা মন থেকে সরাতে পারি না।

কেতকী কুশারী ডাইসন

বাংলা সাহিত্যের 'ডায়াস্পোরিক' ভুবন : একটি ভূমিকা, কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ও ভাবনা

এক

১৯৯৯-এর জুনে টেক্সাসে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তারই পরিমার্জনা ও সম্প্রসারণের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ। ঐ সম্মেলনে এমন একটা বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিলো, যে-বিষয়টা আমার জীবনের কেন্দ্রেই অবস্থিত। ফলে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারিনি। এ কথা মানতেই হবে যে গত কুড়ি-তিরিশ বছরে দুই বাংলার বাইরে একটি বৃহৎ বাঙালি সমাজ গড়ে উঠেছে, প্রধানত ইয়োরোপে ও উত্তর আমেরিকায়, মনে হয় কিছু পরিমাণে অস্ট্রেলিয়াতেও। দক্ষিণ আমেরিকার কথা জানি না, তবে অনুমান করি আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে বাঙালিদের দল নিশ্চয়ই আছেন। শুনতে পাই এশিয়াতে কুয়েত বা দুবাই-এর মতো জায়গায় তাঁরা দলে ভারী হয়ে উঠেছেন। ১৯৯৮ সালে বৃটেনেই আমার দেখা হয় সন্দীপ ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে। তিনি থাকেন জাপানের ওসাকায়, সেখানে একটা ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁর লাইব্রেরির জন্য আমার বই কিনে নিয়ে গেলেন। আগেকার দিনে হলে এঁদের সকলের সম্বন্ধে আমরা হয়তো কেবল ঢালাওভাবে 'প্রবাসী' শব্দটাই ব্যবহার করতাম, কিন্তু সঙ্গত কারণেই আজকাল কিছু নতুন শব্দ বা শব্দসমষ্টিও তৈরি হয়ে উঠেছে। যেমন, 'ইমিগ্রান্ট' বোঝাতে মিডিয়াতে 'অভিবাসী' শব্দটা চালু হয়েছে। আমি নিজে এ শব্দটা অনেক ব্যবহার করিনি। আজকাল করি, না করে উপায় নেই। 'প্রবাস'-এর দ্বারা সূচিত হয় কেবল জন্মভূমির বাইরে থাকার ব্যাপারটুকু। 'অভিবাসন'-এর মধ্যে আছে নূতন দেশে শিকড় গাড়ার এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের অন্তর্গত হয়ে ওঠার ব্যঞ্জনা। আগন্তুকদের সন্তানরা যদি নূতন দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাদের আর প্রবাসী বা দেশান্তরিত বলা যায় না, এমনকি তাদের পক্ষে 'অভিবাসী' শব্দটাও অসঙ্গত, কেননা অভিবাসনের বা দেশান্তরগমনের কাজটা তারা করেনি, তাদের বাবা-মায়েরা করেছে। তারা যেখানে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে, শিক্ষা পেয়েছে, সেটাই তাদের প্রথম দেশ। তাই প্রায়ই তাদের বর্ণনা দেওয়া হয় 'দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি' বা ঐ ধরনের শব্দবন্ধে। তখন তাদের প্রাথমিক পরিচয় গড়ে ওঠে নূতন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবেই।

এটা অবধারিত ছিলো যে বাঙালিদের ঢেউ পৃথিবীময় আছড়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের একটা সংস্কৃতিগত জীবনও গড়ে উঠবে। বিভিন্ন স্তরে, জটিলতার বিভিন্ন মাত্রায় তেমন একটা জীবন নিঃসন্দেহে গড়ে উঠেছে ও উঠছে। বাঙালিরা

যেখানেই যায় সেখানেই তাদের নৃত্যগীত আবৃত্তি অভিনয় খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের বাঙালিয়ানা বজায় রাখার একটা ন্যূনতম চেষ্টা করে থাকে। এটা একটা চলমান এবং দৃশ্যমান প্রক্রিয়া।

বৃটেনে দুই বাংলা থেকে আগত বাঙালিদের নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলে—লন্ডন বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার লিভারপুল সান্ডারল্যান্ড ও এবংবিধ বড় বড় শহরে। এই তো, এই প্রবন্ধের ঘষামাজার কাজ চলাকালীন (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) ওয়েলসের সোয়ান্সী শহরে বাঙালিদের একটি বৃহদাকার সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে এলাম। সাধারণভাবে বলা যায়, আজকাল পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। দুই বাংলা থেকে গায়ক ও অভিনেতাদের আনানো হয়। স্থানীয় অভিনয়ের দলও কতগুলি আছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোয়। বাংলায় লেখেন বা বাংলাভাষার ভিত্তিতে সাংবাদিকতা করেন গোলাম মুরশিদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, শামীম আজাদ, শামীম চৌধুরী, ঊর্মি রহমান, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, ফজলুল আলম প্রভৃতি। শেফীল্ডে মেয়েদের লেখালেখির একটি দল আছে দেবযানী চট্টোপাধ্যায় এবং সফুরান আরার নেতৃত্বে। তাঁরা বেশ কয়েকটি বইও বার করেছেন। আমার হাতে কবিতার বই গুঁজে দিয়েছেন লন্ডনের অমলেন্দু বিশ্বাস, কম্পিউটার জগতের লোক, কভেন্ট্রির শেখর বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। পূর্ণ অর্থে অভিবাসী ছাড়াও যাঁরা আসছেন, কিছু দিন থেকে হয়তো আবার চলে যাচ্ছেন তেমন প্রবাসীরাও এই সংস্কৃতিচর্চাকে সব সময়ই পুষ্ট করছেন। সম্প্রতি আমাকে কবিতার বই পাঠিয়েছেন এক তরুণ ডাক্তার, অমিতরঞ্জন বিশ্বাস, যিনি ট্রেনিঙে এসেছেন লন্ডনে। এঁর দ্বিতীয় বইয়ের কবিতাগুলিতে প্রবাস জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। আমারই নাটকে অভিনয় করতে প্রথম বিলেতে এসেছিলেন আরেক তরুণ ডাক্তার, সম্রাট সেনগুপ্ত, বর্তমানে বিলেতের বাংলা নাটকের দলগুলিতে যাঁর রীতিমতো চাহিদা। এই সেদিন লন্ডনে গান পরিবেশন করলেন সাময়িকভাবে লন্ডনপ্রবাসী মৌসুমী ভৌমিক, যিনি নিজে গান বাঁধেন, এবং সুগায়িকা তো বটেই। তাঁদেরও ভুললে চলবে না, যাঁরা নিজেরা বাংলায় লেখেন না, কিন্তু বাংলা থেকে অনুবাদ করেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রচারের প্রতি যাঁদের আনুগত্য নিরলস। এঁদের মধ্যে লন্ডনের রঞ্জনা সিদ্ধান্ত অ্যাশ্ এবং শেফীল্ডের দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতেই হয়। আর লন্ডনের বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে মাতৃভূমির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে চেতনা ও গর্ব সঞ্চারিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে অনেক কাজ করেছেন শ্রদ্ধেয় তাসাদ্দুক আহমেদ। তাঁর কম্যুনিটি সার্ভিসের জন্য বৃটিশ সরকারের খেতাবও পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী, কিন্তু এক সময়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে 'আর্টস অব বেঙ্গল'-এর মতো উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আমাকে দিয়েই সেই প্রদর্শনীর রিভিউ লিখিয়ে নিয়েছিলেন 'গার্ডিয়ান' কাগজের জন্য। 'গার্ডিয়ান' কাগজে সেই আমার প্রথম ও শেষ লেখা। আর কেউ আমাকে দিয়ে ঐ ধরনের কাগজে কোনো দিন কোনো কিছু লিখিয়ে

নেবার কথা ভাবেননি। সেই সময়ে কিছু সাহিত্য সভাও ডেকেছিলেন তিনি; সেখানে কবিতা পড়েছিলাম মনে আছে।

১৯৮৭ সালে সান ফ্রান্‌সিস্কোর রবীন্দ্রবিষয়ক সভায় গিয়ে এবং ১৯৯৩ সালে নিউ জার্সির রবীন্দ্রমেলায় গিয়ে এই ধরনের সংস্কৃতিচর্চার মার্কিন দিকটার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই। '৯৩-তে নিউইয়র্কে এক গেট টুগেদারে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো এবং অনেক পত্রিকা আমাকে পড়তে দেওয়া হয়েছিলো। সব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, পড়েওছিলাম। বাংলাদেশী ডায়াস্পোরার অনেকে ঐ প্রীতি সম্মেলনে ছিলেন। '৯৬ সালে বস্টন থেকে বাংলাদেশে যাবার পথে আমাকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়েছিলেন সাজেদ কামাল। '৯৮ সালে টরেন্টোর মেলায় এসে খবর পেলাম, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে আরেকটু পড়লাম কানাডা থেকে নতুন প্রকাশিত পত্রিকা 'বাংলা জর্নাল'-এ, যেটার প্রথম সংখ্যা ওখান থেকে আমাকে পাঠিয়েছেন ইকবাল করিম হাসনু। উত্তর আমেরিকায় বাস করে বাংলায় লেখেন এমন বেশ কিছু নাম এটির মধ্যে পেলাম। শেখ মিজানের নাম আগেই জেনেছিলাম 'জিজ্ঞাসা'র মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে প্রকাশিত শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসী বাঙালিদের একটা উল্লেখযোগ্য ফোরাম তৈরি হয়েছে। শিবনারায়ণ নিজে দীর্ঘকাল অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী ছিলেন, তাই এ ধরনের ফোরাম তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর একটা প্রকৃত উৎসাহ ছিলো। আমেরিকা থেকে অরবিন্দ ঘোষ, সৌম্য দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা তাঁর পত্রিকায় লেখেন। '৯৩ সালে নিউ ইয়র্কে যে-প্রীতিসম্মেলনে গিয়েছিলাম সেটি 'জিজ্ঞাসা'র গ্রাহকপাঠকদের উৎসাহেই হয়েছিলো মনে পড়ছে। আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন, এবং সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় রসিক মন্তব্য করেছিলেন, 'এখানে আমরা সকলেই জিজ্ঞাসু'। জনপ্রিয়তার স্তরে বেরোয় ডায়াস্পোরার অন্যান্য পত্রিকা—অনেক সময় মেয়েদের উৎসাহে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে বাংলা চর্চাকে চালু রাখতে। সম্পাদিকারা আমার কাছ থেকে যখন লেখা আদায় করে নেন, তখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হই। এইরকম একটি কাগজ ছিলো পূরবী নন্দীর 'সাংবাদিক', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরোতো, এখনও আছে কিনা জানি না। ক্যানাডা থেকে এখন অনুরাধা রায়ের তত্ত্বাবধানে বেরোয় 'আমরা'—বাংলাভাষার প্রতি কাগজটির কমিটমেন্ট সুদৃঢ়। নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' একটি বহু প্রচারিত বড় আকারের খবরের কাগজ। মার্কিন দেশে বাংলা থেকে অনুবাদের কাজ করেছেন গায়ত্রী স্পিভাক, কল্পনা বর্ধন, সাজেদ কামাল এবং আরও কেউ কেউ। তাঁদের ভুলে যাচ্ছি না।

আমার পরিচিত পরিধির ভিতর থেকে কয়েকটি নাম উল্লেখ করলাম মাত্র। আসলে, রীতিমতো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা না করলে এই বিষয়টির উপরে সার্বিকভাবে কোনো প্রতিবেদন রাখা সম্ভব নয়। বৃহত্তর চালচিত্রে বিষয়টির অনুধাবন নৃতাত্ত্বিক আঙ্গিকও দাবি করে, এটি সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজির অনুসন্ধানের বিষয়। বস্তুত, এখানে ডক্টরেট করার মতো ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে। একটা তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত

দরকার। সুইডেনে জার্মানিতে ফ্রান্সে এই ধরনের সংস্কৃতিচর্চা চলছে তা আমরা জানি, সেইসব গ্রুপের সঙ্গে চেনা গ্রুপগুলির তুলনা প্রয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রবাসী-অভিবাসীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তুলনা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বা ছিলেন হিন্দী উপন্যাস 'হবন'-এর লেখিকা সুষম বেদী। বিলেতে আছেন হিন্দীভাষার কবি কীর্তি চৌধুরী, পাঞ্জাবী কবি অমরজিৎ চন্দন। গুজরাটী কবিরাও আছেন। সম্প্রতি বিলেতে পাঞ্জাবী থিয়েটার খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তরুণী গায়িকা সামিয়া মালিক উর্দুতে গান বাঁধেন, সি-ডিও বার করছেন। উর্দু থেকে তর্জমা করেন আমীর হুসেন ও রুক্সানা আহমেদ, তামিল থেকে তর্জমা করেন লক্ষ্মী হোল্মস্ট্রোম। আমি শুধু কয়েকটা নাম তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। এটা কেবল একটা ভূমিকা, একটা স্কেচ। অনেকেই অনেক রকমের কাজে লিপ্ত আছেন। বোঝাতে চাইছি যে এই বড় চালচিত্রটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে।

বাঙালিদের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি, স্বীকার করতেই হবে দেশান্তরিত বাঙালিদের পুঞ্জগুলো এখন এমন একটা আয়তনে পৌঁছেছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় critical mass; এখন আমরা আর যাই করি না কেন, একটা স্বতন্ত্র ভুবন হিসেবে গবেষকদের গবেষণার যোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছি বটে। কিন্তু সেই গবেষণা কারা করবে, আমাদের ইতিহাস কারা লিপিবদ্ধ করবে?

টেক্সাসের সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলাম বাংলা 'ডায়াস্পোরা'র একজন লেখিকার পরিচয়ে। 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি এসেছে গ্রীক থেকে। এর অর্থ: 'যারা ছড়িয়ে পড়েছে, বিকীর্ণ হয়েছে'। প্রথমে ইহুদীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হলেও শব্দটি এখন আর কেবল তাদের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই। যে-কোনো গোষ্ঠীর মানুষ, যারা একটা আদিনিবাস থেকে বেরিয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং একটা critical mass-এ পৌঁছেছে তাদেরই এই নামে অভিহিত করা যায় এবং হচ্ছে। একমুহূর্ত ঐতিহাসিক খাতে চিন্তা করলেই মালুম হয়, মানবসমাজে এই 'ডায়াস্পোরা'র ব্যাপারটা আবহমান কাল ধরেই ঘটছে। আমেরিকা মহাদেশের তথাকথিত ইন্ডিয়ানদের পূর্বপুরুষরা তো কোনো-এক সময়ে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া থেকে আমেরিকার মাটিতে পৌঁছেছিলেন। তেমনি ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীতে যেসব ভাষা আছে তাদের আদিরূপ যাদের মুখের ভাষা তেমন কিছু মানুষ ছড়িয়ে পড়ে থাকবেন ইয়োরোপ থেকে ইরান ও ভারত পর্যন্ত। ভাষা ব্যবহার কোনো রক্তগত বংশপরম্পরার অভ্রান্ত নির্দেশক নয়; একটা বহিরাগত ভাষা নূতন জায়গায় গৃহীত ও ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু কোনো না কোনো দলকে নতুন ভাষাটাকে প্রথমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে আনতে হবে, তবেই অন্যরা তাকে গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। তাই ভাষার প্রসার মানবগোষ্ঠীগুলির গতিশীলতার নির্দেশ দেয়। তেমনি দেয় খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, চালচলন, আসবাব বা তৈজসপত্রের ব্যবহারও। পৃথিবীতে কেবল ইহুদীদের নয়, ডায়াস্পোরা ঘটেছে আরবদের, চীনাদের, জিপসীদের, আফ্রিকার কালো মানুষদের, এবং বলা বাহুল্য ইয়োরোপের মানুষদের। ইয়োরোপ থেকে

তরঙ্গে তরঙ্গে ডায়াস্পোরার স্রোত এসে আছড়ে পড়েছে মার্কিন দেশে, উত্তরে তথা দক্ষিণে। সুদূর অতীতে বঙ্গের বণিকরাও কি তাম্রলিপ্তি থেকে সাগরপাড়ি দেননি, তাঁদের রক্তের উত্তরাধিকার তথা তাঁদের তৎকালীন সংস্কৃতির বীজ অন্য মাটিতে ছড়িয়ে দেননি? যদি নিজেদের আরেকটু দার্শনিক মাত্রায় চিন্তা করতে প্রশ্রয় দিই, তা হলে এটাও মনে রাখতে পারি যে ছড়িয়ে পড়া ব্যাপারটা আদৌ কোরো বিচিত্র ঘটনা নয়: বিশ্বটাই আদতে একটা বিশাল ডায়াস্পোরা, পদার্থের এক সুমহান বিকিরণ; বিকীর্ণ নক্ষত্রধূলি দিয়েই আমরা তৈরি হয়েছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না, কিন্তু ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছি এবং ঘুরছি বটে।

দুই

মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতটা মাথার মধ্যে রেখে ফিরে আসা যাক মাটির পৃথিবীতে। আজকাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের 'ডায়াস্পোরা'র লেখকদের নিয়ে গবেষণানিবন্ধ লেখা হচ্ছে। এর সিংহভাগটাই কিন্তু যাঁরা ইংরেজিতে লেখেন তাঁদের নিয়ে। উপনিবেশ-উত্তর সময়ে ইংরেজি বিভাগগুলিতে 'ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য' একটি স্বতন্ত্র বর্গের মর্যাদা পেয়েছে, এবং তারই অন্তর্গত উপবর্গ হিসেবে দক্ষিণ এশীয় ডায়াস্পোরার যে-সাহিত্য ইংরেজিতে লেখা তা আজকাল বিদ্যাজগতের প্রচুর মনোযোগ পাচ্ছে। এই লেখকবৃন্দের মধ্যে কিছু বঙ্গসন্তানও আছেন। কি পশ্চিমে কি ভারতে মিডিয়ারও এই বিষয়টিতে কৌতূহলের শেষ নেই। বিপরীত কোণে প্রবাসে বসে যাঁরা নিজস্ব ভাষায় লেখালেখি করেন তাঁদের সম্বন্ধে এই স্মার্ট গবেষক ও সাংবাদিকদের কৌতূহল শূন্যের কোঠায়। ধরে নেওয়া যাক যাঁরা পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বা মূলধারার মিডিয়ায় কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশের ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই, সে তাঁরা উপমহাদেশ থেকে আগত হলেও, তাই তাঁরা এ ধরনের কাজে কোনো তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করতে অক্ষম। যেটা আশ্চর্যের, ভারতীয় উপমহাদেশের ভিতর থেকেও তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত নেবার জন্যে কাউকে তেমন এগিয়ে আসতে দেখি না। বাংলার ক্ষেত্রে এই অনীহা আমাকে বিস্মিত করে। কেননা বাংলা লেখায় 'ডায়াস্পোরা'র একটা ধারা বেশ কিছু দিন ধরেই গড়ে উঠেছে। আমেরিকাপ্রবাসী অমিয় চক্রবর্তী তো সাম্প্রতিক অভিবাসনের ঢেউগুলির অনেক আগে থেকেই এই ধারার একজন লেখক ছিলেন।

'অভিবাসন'-এর কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে পুরোনো দিনের 'প্রবাসে'র কথাই মনে আনি যদি, তা হলে প্রবাসের বাংলা সাহিত্যের উৎসসন্ধানে অনেকটা দূরই পিছিয়ে যেতে পারি—একশো বছরেরও বেশি সময়। বাঙালিদের দেশান্তরগমনের সাহিত্যিক ফসলের ইতিহাস স্পষ্টত এক শতাব্দীর চেয়ে দীর্ঘতর, এবং এই ইতিহাসও ঠিক করে লিখতে হলে কিছু গবেষণা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৮৮১ সালে। কৃষ্ণভাবিনী দাস তাঁর স্বামীর সঙ্গে ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে যান এবং তার তিন বছর পরে ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মরণীয় বই 'ইলন্ডে বঙ্গমহিলা'। কৃষ্ণভাবিনী সর্বসমেত আটটি

বছর বিলেতে কাটিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আরও অনেক প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিতে তাঁর প্রবাসজনিত চিন্তার ফলাফল আরও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়। 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' বইটির একটি নতুন সংস্করণ কলকাতা থেকে বেরিয়েছে—সীমন্তী সেনের সম্পাদনায় (স্ত্রী, ১৯৯৬)। মুখবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আশ্চর্যের বিষয়, মুখবন্ধের প্রথম বাক্যেই তিনি লেখেন, 'উনিশ শতকে লেখা বিলেতের ভ্রমণকাহিনী নিয়ে এখনকার বাঙালি পাঠকের মনে খুব বেশি কৌতূহল থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না।' আমাদের যে কৌতূহল থাকতে পারে তার সম্ভাবনাটাকেই তিনি একটা টিনের মধ্যে পুরে চাঁটি মেরে ঢাকনাটা বন্ধ করে দেন। পরের অনুচ্ছেদে তিনি ইঙ্গিত দেন যে 'শক্তিশালী লেখকদের নিজস্ব মনীষার চিহ্ন' এই বইয়ে অনুপস্থিত, 'কৃষ্ণভাবিনীর এই বইটি সেই দিক থেকে আদৌ অসাধারণ কোনো রচনা নয়।' তার পরেই বলেন, 'কিন্তু সেই কারণেই আজ এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বই হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে', অর্থাৎ যেহেতু অসাধারণ নয়, যেহেতু তা 'একান্তভাবেই স্ট্যান্ডার্ড একটি দলিল', সেহেতু তাঁর মতো একজন ইতিহাসবিদের বিচারে, তার একটা উপাদানগত মূল্য আছে। এই মূল্যায়নকে আমার অসাধারণ রকমের উপর-থেকে-নীচে-তাকানো পিঠ-চাপড়ে-দেওয়া প্যাট্রনাইজিং ভঙ্গির মূল্যায়ন মনে হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালি মেয়ে যাত্রী ও বিদেশপ্রবাসী অবস্থায় নিজের কলমে তাঁর যাত্রাপথে এবং সমকালীন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, এবং সে-বিবরণ আজও আমাদের মন কাড়ে। ভিক্টোরীয় লন্ডনের এমন কিছু বর্ণনা তিনি রেখে গেছেন, যেমনটা আমি অন্য কোথাও পাইনি। যেমন লন্ডনের বাতাসের দূষণের, তার ধোঁয়াশার বর্ণনা। আমার তো মনে হয় তিনি এক অসাধারণ বঙ্গনারী। কোথায় আমরা এমন একজন লেখিকাকে নিয়ে গর্ব করবো, তা না করে মাননীয় অধ্যাপক তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন—এবং তাঁরই সম্বন্ধে মুখবন্ধ লিখতে বসে। সাধারণত পুরনো হলে লেখকদের মান মর্যাদা বাড়ে। পুরনো হয়ে কৃষ্ণভাবিনীর যখন এই অবস্থা, তখন আজকের আমরা যারা প্রবাসী বা অভিবাসী বাঙালি লেখকলেখিকা, তারা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কতটুকু মনোযোগই বা প্রত্যাশা করতে পারি?

একটু আগে আমি অমিয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করেছি। তার আগে প্রবাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে মাইকেল মধুসূদনের বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে। প্রবাসের ভূমিকা বর্তমান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শিবনারায়ণ রায়—এঁদের জীবনে। বর্তমান সময়ে লোকনাথ ভট্টাচার্য আছেন ফ্রান্সে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জার্মানিতে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন প্রতিভাশালিনী উপন্যাসকার দিলারা হাশেম। অ্যাকাডেমিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বিলেত প্রবাসী গোলাম মুরশিদ: যেভাবে তিনি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা দেশের ভিতরে থাকলে করতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের মতো লেখক বা গবেষকদের ডায়াস্পোরিক দিক নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা প্রায়ই

হয়ই না। যাঁরা দেশে বসে লিখছেন, আর যাঁরা দেশান্তরিত অবস্থায় লিখছেন, এই দুই দলের লেখার মধ্যে কিছু পার্থক্য ফুটে উঠছে কি? এবং কী সেই পার্থক্য? এগুলি আমার কাছে কৌতূহল-উদ্রেককারী প্রশ্ন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা দেখি না। আমি নিজে লোকনাথের সর্বশেষ কবিতার বইটি নিয়ে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন 'এবং মুশায়েরা'তে আলোচনা লিখেছি। তা ছাড়া ওয়াশিংটনে দিলারা হাশেমের সঙ্গে একত্র অনুষ্ঠানে তাঁর উপরে সংক্ষেপে ভাষণ দিয়েছি, যা ঢাকার কাগজে ছাপা হয়েছে, এবং অনতিকাল আগে তাঁর কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'দেশ' পত্রিকার 'অধিকন্তু' বিভাগেও লিখেছি। দিলারার কাহিনীগুলির পটভূমিকা বাংলাদেশ থেকে মার্কিন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি একাধারে খাঁটি বাঙালি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আন্তঃসাংস্কৃতিক। তাঁর উপন্যাসে ওয়াশিংটনের সেটিং আছে, পশ্চিম ভারতের আওরঙ্গাবাদের সেটিং আছে, অতীতের পশ্চিম পাকিস্তান উঁকি মেরে যায়, আর তাঁর স্বদেশ তো আছেই। যোগ করা উচিত, বর্তমানে তসলিমা নাসরিনও প্রবাসে। তাঁরও দেশে বসে লেখা আর দেশের বাইরে লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য ফুটে উঠছে কি? অপিচ ভুললে চলবে না সদ্যোমৃত নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে। উত্তরজীবনে তিনি বাংলাতেও একটা নাম করে গেছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন তোলা চলে; তাঁর দুই ভাষার লেখার মধ্যে মেজাজের এবং শৈলীর পার্থক্য আছে কিনা সেটাও নিশ্চয়ই একটা অনুধাবনীয় বিষয়।

তিন

ঠিকই বাঙালিদের প্রবাসজীবনের সাহিত্যিক ফসলের ইতিহাস একশো বছরেরও বেশি দীর্ঘ, এবং আশা করা যায় বিষয়টা নিয়ে কোনো না কোনো দিন কেউ পূর্ণাঙ্গ আকারে গবেষণা করবেন। কিন্তু আমরা যারা বর্তমান সময়ে প্রকৃত অর্থে অভিবাসী বা ডায়াস্পোরিক অবস্থান থেকে বাংলায় লিখছি, তাদের পক্ষে আরও বেশি জরুরি আমাদের এই এখনকার অস্তিত্বের সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা। প্রত্যেকের অবস্থানই অন্যদের থেকে একটু আলাদা, তাই বেশ কয়েকজন ডায়াস্পোরিক লেখকলেখিকা যদি তাঁদের নিজস্ব সাক্ষ্য এবং আনুষঙ্গিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে একটা কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র ফুটে উঠতে পারে।

নিজের সম্পর্কে এইটুকু দাবি করতে পারি, বৃটেনে অভিবাসী অবস্থায় যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের মধ্যে সময়ের বিচারে আমি প্রথম তরঙ্গেরই অন্তর্গত। ১৯৬০ সালে কুড়ি বছর বয়সে প্রথম বিলেতে আসি আমি—পড়াশোনা করতে। আমি তখনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক—এমএ নয়, বিএ; এম এ দেবার আগেই বাইরে চলে যাই। বাঙালি হিসেবে আমার আত্মপরিচয় তখনই সুদৃঢ়, এমনকি বাংলা ভাষার একজন উঠতি কবি হিসেবেও চেনাজানা মহলে একটা পরিচয় তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছে—চেনাজানা মানে কলেজের আঙিনায়, এবং বুদ্ধদেব বসু, বিরাম মুখোপাধ্যায় এঁদের কাছে। আমার প্রথম বই 'বল্কল'-এর প্রথমার্ধের কবিতা এই সম্পূর্ণ দেশজ পর্বের। যদি পড়াশোনা শেষ করে

কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী ভিত্তিতে থেকে যেতাম, তা হলে অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনের ঐ প্রথম তিন বছর আমার স্বল্পমেয়াদি প্রবাসের জীবন হিসেবে চিহ্নিত হতো। ঐ তিন বছর কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের রূপ গঠনে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ঐ সময়েই 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে একজন উদীয়মান কবি হিসেবে পাবলিকের কাছে আমার আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'বল্কল'-এর দ্বিতীয়ার্ধের এবং 'সবীজ পৃথিবী'র কিছু কবিতা এই দ্বিতীয় পর্বের। '৬৩ সালে ফিরে গিয়ে দেখি আমার একটা কবি পরিচিতি তৈরি হয়েছে, কলেজ স্ট্রীটের যে-কফিহাউসে বসে আমরা নিজেরা ছাত্রজীবনে কবিতা আলোচনা করেছি, সেখানে আমার কবিতা থেকেও কেউ কেউ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন! এর পর একবছর আমি যাদবপুরে অধ্যাপনা করি এবং কলকাতার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রগুলি আরও শক্ত হয়, সম্পাদকদের তাগাদায় বিভিন্ন পত্রিকায় গদ্য লেখা আরম্ভ করি। এই বছরটিকে আমার সাহিত্যিক জীবনের তৃতীয় পর্ব বলা যায়। তারপর '৬৪ সালে আমি আমার প্রাক্তন সহপাঠী এক ইংরেজকে বিয়ে করে বিলেতে ফিরে আসি, এবং এই সময় থেকে আমার জীবনের প্রকৃত অভিবাসনের পর্ব শুরু হয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকেই আমার দেশান্তরিত সাহিত্যিক জীবন পুরোমাত্রায় আরম্ভ হয়ে যায়, কেবল কবিতা নয়, গদ্যেও। এই পর্যায়ে বছর দেড়েক ক্যানাডাতেও কেটেছে। 'সবীজ পৃথিবী'র বেশ কিছু কবিতা ও 'নারী, নগরী'র গদ্য এই পর্বের। 'শিকড়বাকড়' বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ ষাটের দশকে ডায়াস্পোরিক অবস্থায় লেখা। কিন্তু ডায়াস্পোরার ভারতীয় লেখকদের নিয়ে ইংরেজি ভাষায় যেসব আলোচনা হয় সেসব ডিসকোর্সে কোথাও আমার নামের উল্লেখ পাবেন না, কেননা এই মানচিত্রাঙ্কনে ভারতীয় ভাষার লেখকদের প্রায় কোনো স্থান দেওয়া হয় না। কার্যত এখন আমার দুটো দেশ, কাগজপত্রে না হলেও বাস্তব বিচারে। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীকেই আমার স্বদেশ বলে মনে হয়, এবং আমার ধারণা আমার লেখাতেও তার প্রতিফলন ঘটে। আমি ইংরেজিতেও কিছু কিছু লিখি। কবিতা, প্রবন্ধ গবেষণাগ্রন্থ দুই ভাষাতেই লিখি; দুই ভাষাতেই অনুবাদের কাজও করেছি; কিন্তু এ যাবৎ উপন্যাস, নাটক এবং গল্প লিখেছি কেবল বাংলায়। ইংরেজিতে গল্প-উপন্যাস লেখার কোনো তাগিদ আজ পর্যন্ত অনুভব করিনি।

বাংলা ডায়াস্পোরার লেখিকা হিসেবে আমার প্রায় চার-দশক-ব্যাপী অভিজ্ঞতার যে স্তূপ জমে উঠেছে, একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকদের তার সব কিছুর শরিক করে ফেলা সম্ভব নয়। কয়েকটি সূত্র বেছে নিয়ে আলোচনা করছি—যেগুলি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে তাঁদের জিজ্ঞাসাকেও উসকে দেওয়া হবে, আর যেগুলি নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করলে আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের কিছু দিশাও হয়তো বা পাওয়া যাবে।

প্রথমে আমার সাহিত্যিক জীবনে নারী হিসেবে আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গটিকে ছুঁয়ে যাওয়া দরকার। টরন্টোর সম্মেলনে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছিলাম। সব কিছুর পুনরুক্তি করতে চাই না, কয়েকটি মুখ্য পয়েন্ট ধরিয়ে দিতে চাই। মার্কিন দুনিয়ায় আর বৃটেনে অভিবাসনের অভিজ্ঞতা যেমন ঠিক এক নয়, তেমনি

অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা লিঙ্গনির্বিশেষেও এক নয়। আমার অভিবাসী সাহিত্যিক জীবনের গঠনে আমার লিঙ্গগত পরিচয় একটা বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বৃটেনের সমাজ হয়তো বা মার্কিন সমাজের থেকে বেশি 'হায়ারর্কিকাল' বা সিঁড়ির ধাপে বিন্যস্ত, বিশেষত ষাটের দশকে সত্তরের দশকে আরোই ছিলো ওরকম। সে-আমলে প্রচণ্ড সেক্স ডিসক্রিমিনেশন ছিলো, বৈষম্য ছিলো প্রতি পদক্ষেপে। আমি একদিকে অ্যাকাডেমিক কর্মজীবনের জন্য তৈরি হয়েছিলাম, অন্যদিকে বৃটেনে এসেছিলাম বিয়ের সূত্রে, যাদবপুরের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে। অস্তিত্বের জানলার এই দুই পাল্লার মধ্যে একটা বিরোধ ছিলো। সেটা সেই সময়ে বুঝিনি। ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হয়েছে। এটা একটা সামাজিক তথ্য যে সেকালে বৃটেনের অ্যাকাডেমিক এস্টাব্লিশমেন্ট বিবাহিত মেয়েদের অ্যাকাডেমিক কেরিয়র মোটেই সুনজরে দেখতো না। ভালো রেজাল্ট-করা মেয়ে হলে স্কুলে পড়াও, সেখানে কেরিয়র তৈরি করে নাও, কারও কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁটি গাড়তে হলে অবিবাহিতা এবং নিঃসন্তান থাকাটাই বাঞ্ছনীয়—এটাই ছিলো দৃষ্টিভঙ্গি। অক্সফোর্ডে অবিবাহিতা অধ্যাপিকাদেরই রাজত্ব ছিলো। তাঁরা মনে করতেন, হয় বিবাহ নয় কর্মজীবন দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে, কিন্তু দুই নৌকায় পা দেওয়া চলবে না। স্বনামধন্য অধ্যাপিকা চিরকুমারী ডেইম হেলেন গার্ডনার নিজমুখে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা আজকালকার মেয়েরা দুটোই চাও, ঐখানেই গণ্ডগোল।' সেটা সত্তরের দশক, তখন আমি ডক্টরেট করছি। ডক্টরেট করার পর অ্যাকাডেমিক কর্মজীবনের নৌকো বিলেতের জলে ভাসানো গেলো না। বলাই বাহুল্য, আমি কেবলই লিঙ্গগত বৈষম্যের সম্মুখীন হইনি। শর্টলিস্ট থেকে বাদ পড়েছিলাম লিঙ্গ, বর্ণ, বিবাহিতের স্টেটাস এবং বয়স—এই চার কারণেই। ডক্টরেট শেষ করতে করতে আমি মধ্য তিরিশে পৌঁছে গেছি, কারণ আমাকে দুটি সন্তান মানুষ করার সাথে সাথে ডক্টরেট করতে হয়েছে। চার দফার বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েও চাকরি পাওয়া যেতো—যদি মুরুব্বি জোটানো যেতো। আমি সেই কাজটি করতে পারিনি, অর্থাৎ মুরুব্বি জোটাতে পারিনি। সংক্ষেপে এই প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়েই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আর দেরি না করে পূর্ণকালীন ভিত্তিতেই লেখালেখি করবো। তলে তলে আমি বরাবর লেখিকাই হতে চেয়েছি, আর এই ছিলো আমার সুযোগ। বাধা দেবার কেউ ছিলো না। কলকাতায় থাকলে পারিপার্শ্বিক চাপে আমার মতো একজন 'ভালো-রেজাল্ট-করা' মেয়ের পক্ষে চাকরি ছাড়া নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য হতো।

অবস্থার ন্যায়টা বোঝাতে চাইছি। ডায়াস্পোরার অভিজ্ঞতা এক ধরনের কর্মজীবন কেড়ে নিলো, আরেক ধরনের কর্মজীবনকে সম্ভব করলো। সৃষ্টিশীল লেখা এবং গবেষণাভিত্তিক লেখায় মিলিয়ে লেখাই আমার কর্মজীবন হলো। আমার পাঠকদের কথা দিয়েছিলাম যে প্রবাসে থাকলেও বাংলায় লেখা ছেড়ে দেবো না। সেই প্রতিশ্রুতিকে আমার জীবনের মূলমন্ত্র করলাম। লেখা আমার কর্মজীবন হলো, জীবিকা নয় কিন্তু। দুটোর মধ্যে তফাত আছে। প্রথমত, আমি যে-ধরনের বই লিখি তা থেকে বিরাট রোজগার হয় না। দ্বিতীয়ত, আমার অধিকাংশ বই

ভারতীয় প্রকাশন, সেই ভারতীয় মুদ্রার রোজগারে তো বিলেতে সংসার চলে না। কিন্তু ও দেশে সেই টাকাটা কাজে লাগে, আর নিয়মিত যেতেই তো হয়। আমাকে আপস করতে হয়েছে। রোজগারকে ব্যাক সীট দিতে হয়েছে। পুরো একটা স্যালারি রোজগার করবো সেই জেদ বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বিলাসিতাবর্জিত সংগ্রামী ফ্রীলান্সারের জীবন স্বীকার করে নিতে হয়েছে। অনেক কিছুই নাগালের বাইরে চলে গেছে। বিব্রত হই যখন পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যত্র পত্রিকা-সম্পাদকরা আমাকে দিয়ে অনবরত বিনা পারিশ্রমিকে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা বোধ হয় ভাবেন যে আমার একটা মাসিক বেতন আছে। সেটা ভুল ধারণা। নেই। বাংলা ডায়াস্পোরার লেখিকা হিসাবে যদি কিছু করতে পেরে থাকি তো তার জন্য আমাকে একটা দাম দিতে হয়েছে। রোজগারকে ব্যাকসীট দেওয়া অধিকাংশ অভিবাসী মানুষের জীবনদর্শনের সঙ্গে একদম মেলে না, কিন্তু বাংলাভাষার লেখিকা হবার জন্য ঠিক সেটাই আমাকে করতে হয়ছে। এই ব্যাপারটার মর্ম অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

সম্প্রতি বিদ্যাজগতে ডায়াস্পোরার লেখকদের সম্বন্ধে একটা নূতন অভিধা চালু হয়েছে—axial writers; axial, কেননা আমাদের লেখালেখি চলে একটা axis বা কক্ষপথ ধরে। একটা পথের রেখা ধরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে লেখা যায়, সেখান থেকে ফীডব্যাক আসে। লেখাগুলো যে-দেশে যাচ্ছে তার সাম্প্রতিক হালচাল সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল না থাকলে সেই পাঠকসমাজের জন্য লেখা যাবে না। আবার লেখার মাধ্যমেই দূরস্থিত পাঠকদের মধ্যে চেতনার পরিবর্তন হবে, নূতন খবর ছড়াবে। তবে জটিলতা আছে। আজকাল আমাদের লেখা কেবল একটা লক্ষ্যেই যাচ্ছে না। প্রথমত দেশভাগের কারণে বাংলার এখন দুটো দেশীয় লোকেশন। যা এপার থেকে বেরোচ্ছে তার অন্তত কিছুটা ওপারে পৌঁছচ্ছে, কিছুটা পৌঁছচ্ছে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়া বাঙালিদের মধ্যে। 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা যে-সহজ পথ ধরে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছেছিলো, বাঙালিদের ডায়াস্পোরার ফলে—সেই পথ এখন একটা নেটওয়ার্ক বা জালবন্ধনে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের অবশ্যই উচিত এই জালবন্ধনকে পুরোপুরি কাজে লাগানো।

বৃটেনে একদল গবেষক axial লেখকদের উপরে গবেষণা করছেন। বিভিন্ন কনফারেন্সে তাঁদের প্রচারপত্র দেখে নিজের উদ্যোগে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁদেরই চেষ্টায় সোয়ান্‌সীর সাম্প্রতিক বাংলা সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পাই।

এখানে আজকালকার বহুব্যবহৃত 'কম্যুনিটি'র ধারণাটিকে আমাদের বিবেচনার মধ্যে নিয়ে আসা যাক। একজন ডায়াস্পোরিক লেখকের পক্ষে ধারণাটি রীতিমতো সমস্যাবিজড়িত। গজদন্তমিনারে বসে না থেকে, এলিট শ্রেণীর অন্তর্গত না হয়ে কম্যুনিটির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক যুগের ইস্তাহার। মেনে নিলাম। কিন্তু কারা আমার কম্যুনিটি? আমার বিশ্বাস পুরো পৃথিবীকেই আজ আমাদের আপন কম্যুনিটি করে নেওয়া উচিত, কিন্তু সে-কথা না-হয় আপাতত থাক। ন্যূনতম জরিপেও আমার কম্যুনিটি নানাবিধ। পৃথিবীর যে-কোণটাতে

আমার অধিকাংশ বই বেরোয় এবং পঠিত হয়, আমার কাজের প্রধান মূল্যায়নও যেখানে হয়, অথচ যেখানে আমি এখন টেকনিকাল বিচারে বিদেশী, সেখানে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় আমার এক কম্যুনিটি। আবার যেখানেই বাংলাভাষীরা আমার লেখা পড়ছেন, সেটা আমার পূর্বপুরুষ পূর্বনারীদের দেশ বাংলাদেশেই হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনো কোণে, সেখানেও আমার কম্যুনিটি। দিল্লী থেকে সর্বভারতীয় মার্কেটের জন্য আমার ইংরেজি বই বেরিয়েছে: ভারতীয় উপমহাদেশ অবশ্যই আমার কম্যুনিটি। যেটা আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ, যেখনে নতুন করে শিকড় গেড়েছি, আমার সন্তানদের মানুষ করেছি—যেখানে আমি এখন নাগরিক, সেখানে ইংরেজিভাষী এক কম্যুনিটি। বৃটেন এখন ইয়োরোপীয় দেশসংঘের অন্তর্গত: ইয়োরোপে আরেক বহুভাষী কম্যুনিটি। আবার বৃটেনে ইয়োরোপে দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা অন্য অভিবাসীদের সঙ্গেও আমাকে যুক্ত হতে বলা হয়, বলা হয় ওখানেও আমার এক কম্যুনিটি আছে। এঁদেরই মধ্যে আছেন বাংলা ডায়াস্পোরার অন্যান্য সভ্যরা। এই নানা স্তরের কম্যুনিটির সকলের মন জোগানো একজন লেখকের পক্ষে অসাধ্য। তাঁদের চাহিদা বিভিন্ন।

একজন অভিবাসী লেখকের পক্ষে তাঁর ভাষাভাষী অভিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে জটিল, প্রায়ই কিছুটা দ্বান্দ্বিক। অনেক অভিবাসী মানুষই বিদেশে এসেছেন উন্নততর ঐহিক জীবনের অন্বেষণে। তাঁরা জীবিকার্জন ও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক জীবন হয় ধর্মসম্পৃক্ত—মন্দিরে যাওয়া, কোরানের ক্লাসে যাওয়া, নয় সংস্কৃতিচর্চার নামে মূলত অবসরবিনোদনের একটা সুখকর প্রলেপ—বোম্বাইয়ের সিনেমা, গানবাজনা, পুজো-ঈদের মেলামেশা, কিছু রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলগীতি বা লোকগীতি, ভাঙ্গড়া বা কাওয়ালী বা উপমহাদেশীয় পপ, প্রহসনে নিজেরা অভিনয় করা বা পুরনো দেশটা থেকে তার দল আনানো। যেসব অনুষ্ঠান প্রধানত বিনোদনমূলক, যেখানে হয়তো খাওয়াদাওয়াও চলছে, বাচ্চারাও হট্টগোল করছে, সেখানে দুমদাম নাচগানের এক ফাঁকে দশ-পনেরো মিনিট কবিতা পাঠ করে দেওয়া কবির পক্ষে স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা না-ও হতে পারে। অথচ নিমন্ত্রণ পেলে সাড়া দিতেই হয়, নয়তো লোকে ভাববে আপনি অহংকারী। যাঁরা নিমন্ত্রণ করছেন তাঁদের মধ্যে সাধারণত আন্তরিকতার কোনো অভাব থকে না, কিন্তু মানতেই হবে এ ধরনের অনুষ্ঠানে মননের ভাগ কমই থাকে। আর তার বেশি আশা করাও অবাস্তব হবে। একজন সিরিয়াস লেখকের স্বতন্ত্র সংগ্রাম ও চিন্তন, তাঁর আশানৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, আনন্দ ও যন্ত্রণা, ট্র্যাজেডির বোধ ও আদর্শবাদ, গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে বিযুক্তি, পুরনো ভাষাটার প্রতি আনুগত্য, ভাষাশিল্পর প্রতি অতন্দ্র ফোকস—এগুলি তাঁকে তাঁর কম্যুনিটির অন্য সভ্যদের থেকে একটু আলাদা করে রাখবেই। ঐ যে একটু আগেই বললাম, রোজগারকে ব্যাকসীট দেওয়া অধিকাংশ অভিবাসীর জীবনের ছাঁদ নয়। তাঁরা হিপি বা খ্যাপা বাউলের মতো বাঁচবার জন্য দেশ ছাড়েননি। তাঁরা অভিবাসন বরণ করেছেন কর্মজীবন, উপার্জন আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক মানকে উন্নততর করবার আশাতেই। তাঁরা চান

জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে, পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করে নিতে। এদিকে একজন শিল্পীর মধ্যে কিছুটা নির্জনতাপিয়াসা, কিছুটা পাগলামি, কিছুটা ছন্নছাড়া অগোছালো ভাব থাকবেই, নয়তো তিনি তাঁর স্বধর্ম পালন করতে পারতেন না।

তাই বলতে চাই, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ-গান-প্রহসন হচ্ছে, অভ্যাগতরা আলাপিনা করছেন, পত্রপত্রিকায় বাংলাভিত্তিক সাংবাদিকতা চলছে—এ সমস্ত নিশ্চয়ই সদর্থক, কিন্তু এর মানে এ নয় যে একজন ডায়াস্পোরিক সিরিয়াস লেখকের সমস্যাগুলির কোনো প্রকৃত মোকাবিলা হচ্ছে। যিনি নিজ দেশে আছেন তিনি চারপাশে সহলেখকদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে একাকিত্বের মোকাবিলা করতে পারেন, কিন্তু যিনি ভিনদেশে বসে মাতৃভাষায় লিখে যাচ্ছেন তাঁকে কিছুটা একলা পড়ে যেতেই হয়। তাঁর চারপাশে সমধর্মী ও সহপথিকদের নেটওয়ার্কটা আরও অনেক ছোট। আর আপন গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে ব্যবধান আরও দুস্তর, কেননা তারা অধিকাংশ সময়ই মাতৃভাষা জানে না বা তার চর্চা করে না। আমাকে বাংলাভিত্তিক সমস্ত কাজ এই একাকিত্বের অভ্যন্তরেই করতে হয়। আর আমার কাজের উপর ফীডব্যাকের জন্যও আমাকে প্রধানত দূরের পাঠকদের চিঠিপত্রের উপরই নির্ভর করতে হয়।

আবার এর উল্টোদিকে আমার অভিবাসী জীবনের জটিলতা যখন আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়, তখন সেই নকশার সব খুঁটিনাটি দূরের পাঠকদের কাছে হয়তো চট করে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু এখানে একজন বিবেকী লেখকের জন্যে একটা চ্যালেঞ্জও আছে। একটা অন্য সমাজ, অন্য ল্যান্ডস্কেপ, ঋতুচক্রের অন্য ধরনের পালাবদলকে বাংলাভাষার মাধ্যমে ধরিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ সৃষ্টিশীল আনন্দ আছে। সফল হতে পারলে ভিন্নতার আড়ালে সেই একই মানবহৃদয়, সেই একই মাটির পৃথিবী ফুটে ওঠে। তখন রসগ্রাহী পাঠকরা সাড়া দেন। আমার প্রথম উপন্যাস 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'র ঐরকম একটা অভিঘাত হয়েছিলো, এবং প্রথমে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিলো বলে সেই প্রতিক্রিয়া ঘটেছিলো ব্যাপকভাবে। যাঁরা অল্প বয়সে ধারাবাহিকভাবে পড়েছেন 'লে তার চালচিত্রটা ঠিক ধরতে পারেননি, অথবা তার গঠনের জট ছাড়াতে পারেননি, তাঁরা পরবর্তীকালে দুই কাভারের মধ্যে পড়ে বইটার আরও ভিতরে ঢুকতে পেরেছেন। তেমন একজন গত বছর আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, বইটা শেষ করার পর সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি, কয়েকটা দিন আচ্ছন্নের মতো কেটেছে তাঁর। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পাঠানো দু-চারজন সমঝদারের চিঠি পেলেও মনটা প্লাবিত হয়ে যায়, মনে হয় সব পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার সার্থক হয়েছে। কোনো কোনো নিবেদিত পাঠক কোনো-কিছু বুঝতে না পারলে প্রশ্নও লিখে পাঠান। তেমন চিঠিও পুরস্কার। একজন লেখক নিশ্চয়ই চান যে তাঁর কণ্ঠস্বরের সমস্ত পর্দা অন্তত কিছু পাঠকের কর্ণে প্রবেশ করুক। মধ্যে মধ্যে টের পাই যে সেরকম মনোযোগী পাঠক দু-চারজন জুটেছে। ঐ বইটা সম্বন্ধে আমি আজও চিঠি পাচ্ছি, যদিও দুঃখের বিষয় এই যে যতদূর জানি বইটা বর্তমানে আউট অফ প্রিন্ট। পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে দূর থেকে খুব বেশি তাগাদাও দেওয়া যায় না, কেননা

প্রকাশক মহাশয় আমার পরবর্তী বইগুলো ছাপবেন সেটাই কি আমার কাছে অধিক জরুরি নয়?

দূর থেকে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন পাওয়া ডায়াস্পোরার লেখক হওয়ার একটা মজার দিক। হয়তো নিউ ইয়র্ক থেকে কেউ লিখলেন, আপনার লেখা পড়ে আমি নতুন করে বাংলা শিখছি, বা আমার লেখায় লীক নামক সবজির বর্ণনা পড়ে 'গোবদা গোবদা পেঁয়াজকলি'র সন্ধানে ছুটলেন সুপারমার্কেটে। হয়তো প্যারিসের মানুষ বিশেষ করে অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন সোনালি-সবুজ জলপাইয়ের তেলের কথা বা জানলার তাকে কিভাবে টোমাটোরা রোদ পোহাচ্ছে আর তাদের পাশে একটা বিড়াল ঘুমোচ্ছে তার বর্ণনা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমার লেখা পড়ে খবর পান কে এদিথ পিয়াফ, কাকে বলে বাদামি চিনি, কাকেই বলে আইরিশ কফি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমার 'ভাবনার ভাস্কর্য' বইয়ে 'ভোমা'র আলোচনা পড়ে বাদল সরকার সম্পর্কে প্রথম অবহিত হয়েছেন এমনও হয়েছে!

একজন লেখকের লেখায় বিদেশপর্যটনলব্ধ খুঁটিনাটি আর অভিবাসনলব্ধ খুঁটিনাটি একটু আলাদাভাবে প্রবেশ করে। পর্যটন আমাদের অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা উপহার দেয়, কিন্তু অভিবাসন আমাদের অন্য একটা দেশের জলমাটিতে নতুন করে শিকড় ছড়াতে সাহায্য করে, যদি আমরা সেই সমাজের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবনযাপন করি তাহলে সেই সমাজের জীবনের গভীরেও প্রবেশ করাতে পারে। আমি আমার বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে ইংরেজদের পারিবারিক জীবনের ভিতরে প্রবেশ করেছি। ইংরেজদের বাইরে থেকে দেখার থেকে এ জানা আলাদা। একজন শিল্পীর পক্ষে জানার গভীরতার কোনো বিকল্প নেই। আমার মধ্যে যেমন পঞ্চাশের দশকের কলকাতার উত্তরাধিকার আছে তেমনি ষাট-সত্তরের পাশ্চাত্য দুনিয়ার উত্তরাধিকারও বিনিশ্চায়ক।

আর ডায়াস্পোরার লেখক হওয়ার ঝামেলার দিক এই যে যদিও কিছু সহকর্মী পাঠক আপনার মধ্যে দেশজ আর আন্তর্জাতিক সমন্বয়কে বাহবা দেবে, কিছু দেশজ লোকের কাছে কিন্তু আপনি 'বাইরের লোক' হয়ে যাবেন, তারা সুযোগ পেলেই আপনাকে ছিন্নভিন্ন করবে। আপনি নিজে হয়তো গভীরভাবে অনুভব করেন যে গোটা পৃথিবীটাই আপনার স্বদেশ, কিন্তু যারা নিজেরা কুনো তাদের চোখে আপনি হয়ে যাবেন 'আউটসাইডার'। কেবলই পশ্চিমবঙ্গের কুনোদের কথা বলছি না, এই কুনো মানুষরা লন্ডনেও আছেন। আপনি যাই করবেন তাতেই কেউ না কেউ ঠোঁট বেঁকাবে। তাই নিজেরই কবিতার একটা লাইন উদ্ধার করে বলতে হয়, নাঃ, সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না। একজন আধুনিক শিল্পীর পক্ষে 'কম্যুনিটি'র ধারণাটার মধ্যে এমনিতেই একটা কন্ট্রাডিক্‌শন আছে। একজন ডায়াস্পোরিক শিল্পীর পক্ষে আরোই। শিল্পী স্বভাবতই অন্যদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, সহমর্মী রসিকজন খোঁজেন, কিন্তু একজন বিবেকী শিল্পী স্বতন্ত্রও থাকতে চান, গোষ্ঠীকে সমালোচনা করার স্বাধীনতাটুকু অটুট রাখতে চান, ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরক্তি এবং ঘেন্নাকেও প্রকাশ করার স্বাধীনতাও দাবি করেন। তাঁর কম্যুনিটির কাছে নিজেকে তিনি বিক্রি করতে চান না। এই মূল জায়গাটায়

তিনি আপোসবিরোধী। সুমন যেমন তাঁর গানে বলেন, যদি ভাবো কিনছো আমায়, ভুল বুঝেছো; যদি ভাবো খাচ্ছো আমায়, ভুল বুঝেছো।

আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাকে বলে যে দু-একটা বিশেষ ব্যাপারে বাংলা ডায়াস্পোরার লেখক সহজে আক্রমণীয়, অর্থাৎ vulnerable হয়ে পড়তে পারেন। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁদের পক্ষে সেই ব্যাপারগুলো কী তা সাহস করে বলতে পারি না, যদিও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি—হয়তো ধর্মসংক্রান্ত, হয়তো তা বাংলা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা তাতে অনাস্থা প্রকাশ করা? পশ্চিমবঙ্গ থেকে এলে একজন লেখকের পক্ষে সব থেকে বিপজ্জনক কাজ হচ্ছে কোনোক্রমে দেশের অথবা বিলেতের রাবীন্দ্রিক কুনোদের চটিয়ে দেওয়া! তাহলে আর রক্ষে নেই। আমি যেদিন থেকে রবীন্দ্রচর্চায় প্রবেশ করেছি সেইদিন থেকে এই জায়গাটায় vulnerable হয়ে পড়েছি, কেননা এঁদের চটানো খুব সোজা। আক্রমণের আরেকটা সহজ টার্গেট হলো আপনার ভাষা। ভাষা নিয়ে বহুদিন আমাকে কোনো বিরূপ কথা শুনতে হয়নি। বরং উল্টে সকলে আমার ভাষার প্রশংসাই করতেন। এখনও অনেকেই করেন। কিন্তু যাঁদের বিবেচনায় আপনি এখন 'বাইরের লোক' তাঁরা এ প্রশংসা কত দিন বরদাস্ত করবেন? কোনো না কোনো ছুতোয় একদিন না একদিন কাঁটা বেঁধাতে আরম্ভ করবেনই তাঁরা। এঁরা অভিযোগ আনবেন যে আপনি ঘরকা না ঘাটকা, আপনার ভাষায় বিদেশী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাভাষায় বিশ্লেষণমূলক আধুনিক চিন্তা পরিবেশন করতে গেলে বিশেষভাবেই এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

আমার সব বাংলা বই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রের লেখালেখিও প্রধানত ওখানেই। সকলেই জানেন, কাজকর্মের সমস্ত খাতেই পলিটিক্স থাকে, গ্রুপিজ্‌ম্‌ বা যূথবদ্ধ স্বার্থরক্ষার ব্যাপার থাকে। দূর থেকে সেসব সামলিয়ে কোনো মতে নিজের জন্য একটা সরু চলার পথ করে নেওয়া যায় মাত্র। সম্পাদক প্রকাশকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা যদি বা করে নেওয়া যায়, ক্রিটিকদের সমালোচনা দেবতাদেরও অসাধ্য। তাছাড়া গণমাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে আজকাল প্রায়শ কাগজের কাটতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য ফালতু তর্কাতর্কিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। এতে করে অনর্থক সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়। বিতর্কের জন্যই বিতর্ক চলতে থাকে, যুক্তির ধার ধারে না এমন সব আক্রমণাত্মক চিঠিপত্রও ছাপা হয়—বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে এবং তর্ককে জ্বালিয়ে রাখার জন্য। কিছু জবাব না দিয়েও পারা যায় না, কেননা নিজের আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে। আপনার সপক্ষে লেখা অন্যদের চিঠিগুলো যদি না বোরোয়, আপনি আর কী-ই বা করতে পারেন। আজকালকার লেখকজীবনের এই দিকটা আমি একদম পছন্দ করি না, তবে মানুষের স্বভাব যেমন, মনে হয় কোনো না কোনো আকারে এইসব সমস্যা বরাবরই ছিলো।

কিছু ছিদ্রান্বেষী থাকবেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব এদের হাত থেকে নিস্তার পাননি। ক্ষতিপূরণও আছে। ডায়াস্পোরিক কবি হিসেবে আমি যে-ব্যাপারে একটা বিশেষ আনন্দের অধিকারিণী সেটা একটু বলি। আমি যেহেতু

ইংরেজি-বাংলা দুটো ভাষাতেই কবিতা লিখি সেহেতু দুটো আলাদা জগতের লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা বার করতে পারি, আর যেহেতু লোকে বলে আমি কবিতা পাঠটা ভালোই করি, তাই চেষ্টা করে ফল লাভ করেছি, অর্থাৎ দেখেছি যে পাঠের মাধ্যমে প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই জগতের পাঠকগোষ্ঠীর সামনেই কবিতা পড়ে তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারি। একটা সংস্কৃতির লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই পাওয়া যায় তার কবিতার খাঁটি হৃৎস্পন্দন, তাই দুটি পৃথক কালচারের ম্যাগাজিনে দুটি আলাদা ভাষায় মৌলিক কবিতা প্রকাশ করতে পারা একটা প্রিভিলেজ বিশেষাধিকার। তেমনি আজকের এই বাজারশাসিত যুগে যাঁরা স্বেচ্ছায় কবিতার আসরে আসেন তাঁরা ভালবেসে আসেন, তাঁরা কোনো মতলব নিয়ে আসেন না। নাটকের জগৎটা একটু আলাদা। সেখানে দলবাজি প্রবলতর। যাঁরা নাটক দেখতে আসেন তাঁরা অনেক সময় মতলব নিয়েও আসেন। 'আওয়াজ' দেবার মতলব, বা 'কুচিকুচি করে কাটা'র মতলব। কিন্তু কবিতার আসর—প্রকৃত কবিতার আসর—একটা অন্তরঙ্গ ব্যাপার। কবিরা সাধারণত মিশ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা 'ভ্যারাইটি শো'-এর দশ মিনিটের খোপে কবিতা পড়ার চাইতে প্রকৃত 'পোয়েট্রি রীডিং' অনুষ্ঠানে কবিতা পড়াই ঢের বেশি পছন্দ করেন। এখানে আওয়াজ দিলে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হবে, শুনতে না চাইলে উঠে যান, আর ফিরে গিয়ে রিভিউ লিখতে হবে না, কাউকে কুচিকুচি করে কাটার দরকার নেই, অতএব শ্রবণের অভিজ্ঞতাটার কাছে শান্তমনে আত্মসমর্পণ করা যায়। কবিতার দুনিয়ায় এই শ্রোতারা তৃণমূল। এই কবিতাপ্রেমিকদের কাছে নিজের গলায় কবিতা পৌঁছে দিতে পারা একটা আনন্দময় কাজ। এই কাজ আমি করতে পেরেছি কলকাতায় বর্ধমানে শান্তিনিকেতনে উত্তরবঙ্গে আমেদাবাদে, লন্ডনে অক্সফোর্ডে সান্ডারল্যান্ডে সোয়ান্‌সীতে, প্যারিসে হাইডেলবার্গে, নিউইয়র্কে মেরিল্যান্ডে, এমন কি বুয়েনোস আইরেসে। এইরকম সময় মনে হয় আমি একটা জীবন্ত সেতু, দুটো কূল ছুঁয়ে আছি। জীবন্ত সেতু হওয়ার কিছু জ্বালাযন্ত্রণা আছে, যে-কথা তো আগেই বললাম। কিন্তু একটা বিরল আনন্দও আছে, দূরকে নিকট করার, পরকে স্বজন করার অনাবিল আনন্দ। সেটা পাওয়া যায় পোয়েট্রি রীডিং অনুষ্ঠানে।

ডায়াস্পোরিক কবিতার প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি। আমার বরাবর মনে হয়েছে, একজন ডায়স্পোরিক কবির কবিতায় বিদেশের নিসর্গ কিভাবে প্রবেশ করে, একটা ভিন্ন জলবায়ুর আবহ ও মুডকে তিনি কিভাবে তাঁর মাতৃভাষায় বন্দী করেন, কিভাবে খুঁটিনাটির বর্ণনা দেন, যেখানে সমস্যা দেখা দেয় কী করে তার মোকাবিলা করেন—এগুলো অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। কথাটা লেখালেখির সব জাঁরেই কমবেশি প্রযোজ্য, তবে বিশেষ করে কবিতার বেলায় প্রযোজ্য, আর যাঁরা ভিতরে ভিতরে মূলত কবি তাঁদের গদ্যের বেলাতেও প্রযোজ্য। এটা এক জাতের অনুবাদের চ্যালেঞ্জ। একটু উদাহরণ দিই।

যদি ইংরেজিতে লিখি 'the june sun', উত্তরের দেশের লোকেরা সহজেই বুঝে নেবেন মুডটা। কিন্তু বাংলায় 'জুনের সূর্য' বা 'জুনের রোদ' বলা অনেক বেশি গোলমেলে ব্যাপার। বাংলায় 'জুন' নামটার নিজস্ব, দিশি অনুষঙ্গ নেই। বাংলা

হিসেব অনুযায়ী জুনের কিছুটা ভরা জ্যৈষ্ঠের গরম, তারপর আষাঢ়ের বর্ষা সমাগম। চালচিত্রটা একেবারে আলাদা। তাই আমি যদি বিলেতের জুনের রমণীয় লম্বা দিনের কথা বাংলাতে বলতে চাই, আমাকে অন্য একধরনের চেষ্টা করতে হবে, একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। ষাটের দশকের একটি কবিতায় লিখেছিলাম: 'নম্র জুনের অমর্ত্য গোধূলিতে', তার কয়েক লাইন পরে: 'আহা কি রম্য আলোকদীর্ঘ দিন!' এই জুন যে আমাদের পরিচিত রুদ্র জুন নয়, নম্র জুন, তা জানাতে হলো; আবার এই নম্রতা যে জলভরা মেঘের নয়, দীর্ঘায়িত গোধূলির আলোর, তারও আভাস দিতে হলো। অনেক পরে লেখা একটা কবিতায় লিখেছি 'জুনের ভরা বিকেলে'—এখানেও সেই আলোর ভরা দীর্ঘস্থায়ী বিকেলের কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রীষ্মমণ্ডলে অপ্রাপণীয়। 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'তে এক জায়গায় লিখেছি : 'আলোয় উজ্জ্বল জুন মাসের দিনটা; চাইকভ্স্কির সংগীতের মত আহ্লাদিত রোদ।' আমার এক পাঠক বললে, 'আপনি ছাড়া আর কে এই রকম লাইন লিখবে। পড়লেই বোঝা যায় কেতকী লিখেছে।' ভক্তের যা পছন্দ সেটিকেই হয়তো কোনো অমিত্রভাবাপন্নের বিদেশগন্ধী ইংরেজিগন্ধী মনে হবে। বিদেশের প্রকৃতির বা ঋতুর মেজাজের যথাযথ বর্ণনা দিতে হলে বিদেশের এবং তার ভাষার একটা ছ্যাঁকছোঁক গন্ধ যে রাখতেই হবে সেই মৌল ব্যাপারটাই কুনো সংবেদনের গণ্ডীর বাইরে।

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারের মাস-নামগুলির মধ্যে অন্য একটা জলবায়ুমণ্ডলের ভাবানুষঙ্গ খোদাই হয়ে আছে। ইয়োরোপীয় দেশগুলির কবিতায় এইসব নাম একেবারে সংকেতের মতো কাজ করে। নাম বললেই আর কিছু বলতে হয় না। অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা চিলে প্রভৃতি দক্ষিণ গোলার্ধের কবিদের তৈরি করে নিতে হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক ভাবমণ্ডল, যেখানে ডিসেম্বরের অর্থ গ্রীষ্ম আর জুনের অর্থ শীত। বাংলা কবিতা পুষ্ট হয়েছে বৈশাখজ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি নামের সাংকেতিকতা দ্বারা। সেখানে অন্য নামগুলো দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে ক্রমে ক্রমে ঢুকে পড়েছে এবং কবিতায় এক বিবাদী আধুনিক স্বর যোগ করেছে—যেমন সুনীল গাঙ্গুলীর লাইন 'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহংকারে ব্যাপ্ত করে দিক'। এপ্রিল মাস-নামটা আমরা ইংরেজির কাছ থেকে পেয়েছি, কিন্তু 'এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া' বাঙালি কবির হাইব্রিড নির্মাণ—ইংরেজি ভাষার আপন মাটিতে কৃষ্ণচূড়া হয় না। ঐ হাইব্রিডিজ্‌ম-এর জন্যেই লাইনটা ধাক্কা দেয়। আবার, একজন বাঙালি কবি যদি বিলেতে বসে এপ্রিলকে তাঁর কবিতায় ঢোকান, সেখানে চলে আসবে অন্য এক অনুষঙ্গ। আমার একটি কবিতা আছে যার নাম "এপ্রিলের গান"। ঐ কবিতাটির মধ্যে বসন্তবৃষ্টিসিক্ত যে-ঋতুর ছবি আছে তা কৃষ্ণচূড়াশোভিত ট্রপিকাল এপ্রিলের থেকে একেবারে আলাদা। আমার বিলেতে বা ক্যানাডায় লেখা বাংলা কবিতায় ফেব্রুয়ারি, মে, জুন, অক্টোবর, ডিসেম্বর—এ সমস্তরই সাংকেতিক তাৎপর্য দিশি রীতি থেকে অনিবার্যত আলাদা। বাংলার মাটিজলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহ্যিক ভাবানুষঙ্গের উপরে আমি নির্ভর করতে পারিনি। আমাকে নিজস্ব নির্মাণ করে নিতে হয়েছে।

বাংলা কবিতায় অভিবাসী তথা বিদেশভ্রমণে অভিজ্ঞ কবিদের একটি ধারা যদিও বেশ কিছু দিনই হলো তৈরি হয়ে গেছে, তবু আমাদের কবিতায় বিদেশের নিসর্গ ও ঋতুচক্র কিভাবে প্রবেশ করছে, বাংলাভাষার ঐতিহ্যিক কাঠামোর মধ্যে নূতন ভাবানুষঙ্গগুলিকে আমরা কিভাবে সংস্থাপিত করছি, তার ফলে কবিতার দ্যোতনার মধ্যে কিভাবে সাংগীতিক 'কাউন্টারপয়েন্ট' সঞ্চারিত হচ্ছে, বাংলা কবিতার ব্যঞ্জনাকে আমরা কিভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছি, এসব নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা দেখতে পাই না। বিষয়টা নিয়ে সমালোচকদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্নও গড়ে ওঠেনি। কোথাও কোনো-একটা জিজ্ঞাসার অভাব কাজ করছে।

হয়তো তুলনীয় কারণেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর বর্ণদৃষ্টির প্রভাব সম্পর্কে এর আগে কেউ তলিয়ে গবেষণা করেননি। আমি যে ভাবতে গেলাম, তার একটা নিহিত কারণ বোধ হয় এই, বাংলায় বিদেশী প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন অভিবাসী কবিকে যে-ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার সঙ্গে বর্ণদৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী একজন কবির সমস্যার খানিকটা মিল আছে। ভাষার স্ট্রাক্চার একরকম বলছে, আমরা আরেকরকম বলতে চাইছি। বাংলায় মে মাসটা দাহের ঋতু। আমার কবিতায় পা ফেলছে অন্য এক মে—মধুমাস। তার কথা বলতে গেলে আমাকে করতে হবে বিকল্প নির্মাণ। তুলনীয় এক প্রক্রিয়ায় কয়েকটি রঙ অধিকাংশ লোক দেখেন একরকম, আর রবীন্দ্রনাথের মতো একজন পোটানোপ দেখেন অন্যরকম। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একই বর্ণভাষা তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর রিয়ালিটিটা ছিলো আলাদা। আমরা ধরে নিয়েছি তিনি 'লাল' বলছেন বলে আমরা যা দেখি তিনিও তাই দেখছেন। কিন্তু তিনি যদি গাঢ় লালকে দেখে থাকেন কালোর কাছাকাছি, গোলাপিকে আমাদের ধূসরের মতো, সেই ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা কি তাঁর চিত্রকল্পে একটা ছায়া ফেলবে না, ভাষার নিহিত ন্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ কি একটা টেনশন সৃষ্টি করবে না? তাঁকেও কি একটা 'বিকল্প নির্মাণ' করতে হবে না? ঠিক তাই আমি আবিষ্কার করলাম, যখন ডুবুরির মতো নামলাম রবীন্দ্ররচনার গভীরে তাঁর বর্ণভাষাকে বিশ্লেষণ করতে। দেখলাম এক বিশাল বিকল্প নির্মাণ। বুঝলাম এই মহাকবিও একটা জায়গায় 'প্রবাসী'—গভীরতর অর্থেই, কেননা আমি যেখানে দু-তিনরকমের মে-জুনের চেহারা সরজমিনে তদন্ত করতে পারি, তিনি সেখানে কতগুলো রঙের বেলায় 'চিরপ্রবাসী', কোনোদিন জানলেনই না অন্যদের চোখে সেগুলো কেমন দেখায়।

চার

এই প্রসঙ্গ আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। প্রথমত, বাংলা ডায়াস্পোরার একজন লেখকের পক্ষে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গভীর স্তরে গবেষণার করার পথে যে-অসুবিধা বর্তমান তার প্রতিবিধান দরকার। এই বিষয়ে টেক্সাসের সম্মেলনে প্রথম যখন বলেছিলাম, তখন কোনো কোনো শ্রোতা আমার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারেননি। তাঁরা বললেন, কলকাতার লোকেরাও গবেষণার জন্য অনুদান পান না। অধ্যাপকরা অনুদান না পেলেও সাধ্যমতো গবেষণা করে

পারেন, এইরকমই আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণার কাজ আছে, যেগুলো একটা ন্যূনতম অনুদান না পেলে সত্যিই ঠিক করে করা যায় না। আর গবেষক যদি বেতনভোগী অধ্যাপক না হন, যদি তিনি ফ্রীলান্সার হন, তাহলে তিনি করবেনটা কী? হাওয়া খেয়ে দু-চারটা কবিতা যদি বা লেখা যায়, গবেষণার অনুসন্ধান মোটেই চালানো যায় না।

বাংলানামক ডিসিপ্লিনের মধ্যে এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে ডায়াস্পোরিক গবেষকরা তাঁদের বিশেষ অবদান রাখতে পারেন, যেখানে বিদেশের বিশেষ জ্ঞান দরকার, বিদেশী ভাষা জানা দরকার, বা বিদেশী আর্কাইভ্সে গিয়ে কাজ করা বা বিদেশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া দরকার—অর্থাৎ যেখানে তাঁদের একটা বিশেষজ্ঞতা আছে এবং সেই এক্সপার্টিজটা কাজে লাগানো যায়। গোলাম মুরশিদ যেভাবে মাইকেলের জীবনীতে নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন, তার উপরে নতুন আলো ফেলেছেন। আমি যেমন রবীন্দ্র-ওকাম্পো গবেষণায় বা রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টি-সম্পর্কিত গবেষণায় নতুন কিছু দিতে পেরেছি, অর্থাৎ আশা করি যে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ আর ওকাম্পোকে নিয়ে গভীর স্তরে কাজ করতে কেবল যে একসঙ্গে চারটা ভাষার সঙ্গে কিছু পরিচয় লেগেছিল তাই নয়,—ইংরেজি, বাংলা, স্প্যানিশ আর ফরাসী,—আর্জেন্টিনায় কাজ করার অনেক যন্ত্রণাদায়ক অসুবিধাও ছিলো, এবং সেগুলোকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে সরজমিনে অতিক্রম করতে হয়েছিলো। যেমন, ওখানকার আর্কাইভ্স্-এর কর্ত্রী কিছু বাজে খবর দিয়েছিলেন আমাকে। সেগুলো বিশ্বাস করলে রিসার্চ এগোতোই না, রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িটাতে ছিলেন সেই মিরালরিও না দেখেই ফিরে আসতাম। ঐ মহিলা আমাকে বলেছিলেন বাড়িটা আর নেই, সে অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে আমার ওখানকার কনট্যাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সেই বাড়িটা নিজের চোখে দেখে এসেছি, যার দোতলার বারান্দা থেকে বাংলার কবি দেখতেন পস্নাতা নদীর বুকে আলো আর রঙের খেলা। বুয়েনোস আইরেসের ভারতীয় দূতাবাসও বাড়িটার খবর রাখতেন না। তাঁরা বইপত্র পড়েন না, আর্কাইভ্সের মহিলা যা বুঝিয়েছেন তাই বুঝেছেন। তাঁদের বোঝা উচিত ছিলো যে সামরিক শাসনের আর্জেন্টিনা যেমন মানুষদের 'ডিসপিয়ার' করিয়ে দিতে পারে, আর্কাইভ্সের আর্জেন্টিনা তেমনি একটা আস্ত দোতলা বাড়িকে 'ডিসপিয়ার' করিয়ে দিতে পারে। আমাকে প্যারিসে অবস্থিত আর্জেন্টিনার ইউনেস্কো ডেলিগেশনের কর্তা বলেছিলেন, আর্জেন্টিনায় গিয়ে কাজ করতে হলে ট্যাংগো নাচতে জানতে হবে। আমি বলেছিলাম, শিখবো। ব্যাপারটা রূপক। ট্যাংগো জানতে হবে, রূপকার্থে হলেও। আবার শান্তিনিকেতনে গবেষণা করতে হলে জানতে হবে আরেক নৃত্যভঙ্গিমা—শান্তিনিকেতনী নাচ—কোনো কাজের জন্য উপাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে কিভাবে প্রয়োজনীয় অনুমতি আনাতে হয় তার রীতিনীতি নখাগ্রে রাখতে হবে। দুটো নাচ আয়ত্ত করতে আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতা চাই। আর সমস্ত দক্ষতাই ফেলা যাবে বাংলা না জানলে। এখানে ডায়াস্পোরিক ব্যক্তিত্বের একটা ভূমিকা আছে, তাই নয় কি?

ঠিক ওভাবেই, রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করতে আন্তর্বিদ্য গবেষণার নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজন ছিলো। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ছবি—তিনটি মাত্রাকে মিলিয়ে কাজ, সেভাবে এগোনো, ছবি আর কারুশিল্প দেখতে ইউরোপ-আমেরিকা যাওয়া, গ্যালারিতে গিয়ে জার্মান-ফরাসী ভাষার সঙ্গে সমঝোতা করা, প্রচুর পরিমাণে বিদেশী আর্টের বই হজম করা, একই সঙ্গে বাংলাভাষার গভীরে প্রবেশ করা এবং একজন শান্তিনিকেতনের গবেষকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা—এগুলি করতে যে-ধরনের দক্ষতা লেগেছিলো সেটার সঙ্গে ডায়াস্পোরিক জীবনের একটা সম্পর্ক আছে। বাংলাতে কাজের তুলনীয় ক্ষেত্র আরও আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায়, বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো লেখকের জীবনে যে-বিদেশগত মাত্রা আছে তাকে তলিয়ে দেখতে ডায়াস্পোরার অভিজ্ঞতা কার্যকর হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের গবেষণার জন্য, যে-বই বাংলায় লেখা হবে তার জন্য—আমি যে-দেশে আছি সেখানে কোনো আর্থিক মদত পাওয়া সম্ভব নয়। লন্ডনের গোলাম মুরশিদও বিনা অনুদানে গবেষণা করেন। আমার ঐ রবীন্দ্র-ওকাম্পো গবেষণায় বা রঙের রবীন্দ্রনাথের গবেষণায় কোনো বৃটিশ প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করেনি। আর্জেন্টিনায় কাজ করা সম্ভব হয় ভারতীয় আনুকূল্যে, আর জার্মানির গ্যালারি-মিউজিয়ম দেখা সম্ভব হতো না জার্মান সাহায্য না পেলে। বই বেরোবার পর কেউ যে সেমিনার দিতে ডাকবে তাও ঘটে না। 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' বেরোবার পর বিলেতের বিদ্যাজগতের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকজনকে খুঁটিনাটি পাঠিয়েছিলাম। দুজন গ্রন্থাগারিক জানালেন, তাঁরা বইটা কিনবেন। কিন্তু অধ্যাপকরা কেউ সাড়াই দিলেন না। যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালি, কিংবা বাংলা জানেন। আজকাল বিদ্যাজগতের অধিবাসীরা সর্বাগ্রে যে-যার কেরিয়ারের উন্নতিবিধানে ব্যতিব্যস্ত, তাঁদের মধ্যে বিষয়নিষ্ঠ জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। ইয়োরোপে দু'বছর অন্তর অন্তর একটা সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ কনফারেন্স হয়। গত বছর প্রাগে হয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম, 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' বইটা বাংলায়, ইয়োরোপের স্কলাররা আমার এবং আমার সহকর্মীদের গবেষণা সম্বন্ধে কিছুই জানবেন না এটা ঠিক নয়, ওখানে গিয়ে ইংরেজিতে একটা পেপার পড়ি, আমাদের কাজের একটা ছোট প্রতিবেদন অন্তত রাখি। কিন্তু উদ্যোক্তারা বললেন আমাকে লন্ডন থেকে প্রাগে নিয়ে যাবার মতো অর্থসামার্থ্য তাঁদের নেই। তাঁরা আমাকে আনাতে কোনো চেষ্টাই করলেন না। সত্যি বলতে কি, বিদ্যাজগতের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার যে-চেহারা দেখেছি তা আমাকে তেমন আশান্বিত করে না।

ঠিক একই সমস্যা দেখা দেয় অনুবাদকলার ক্ষেত্রে। এটি আমার উপরে উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। বাংলা ডায়াস্পোরার কোনো কোনো মানুষের মধ্যে হয়তো সেই দ্বিভাষিক দক্ষতা আছে যার জোরে তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু এই কাজের জন্য অর্থমদত পাওয়া অত্যন্ত কঠিনতর, প্রকাশক জুটলেও যথাযথ প্রচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বই বেরোলেও কোনো অধ্যাপক রীডিং দিতে বা সেমিনার দিতে ডাকবেন না।

প্রচারেও মিডিয়ার কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। বরং বাগড়া দেবার লোক পাওয়া যাবে। বইটা একটু পুরোনো হয়ে গেলেই তাকে আর বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে কোনোমতে পার করেছি। হাজার হোক, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর নামটা অন্তত অনেকের জানা। প্রকাশক জোটাতে বেগ পেতে হয়নি। এখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। কী করে প্রকাশক জোটাবো জানি না। এ বিষয়ে কিছু লিখেছি 'বৈদগ্ধ্য' পত্রিকার বুদ্ধদেব-স্মারক সংখ্যায়, আরও বিশদভাবে লিখেছি 'জিজ্ঞাসা'র ১৯ : ৪ সংখ্যায়। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইংরেজিভাষী পাশ্চাত্য জগতে বার করতে হলে কী ধরনের লড়াই লড়তে হয় সে-সম্বন্ধে দেশস্থিত বাঙালিদের ধারণা অস্পষ্ট। তাঁরা মনে করেন আমরা যারা 'বাইরে' আছি তারা চাইলেই দেশের কবিদের বহির্জগতের দৃষ্টিতে তুলে ধরতে পারি। কাজটা অত সহজ নয়। ভারতীয় ভাষা থেকে অনূদিত সাহিত্য বার করার ব্যাপারে ইংরেজিভাষী দুনিয়ার প্রকাশকদের প্রচণ্ড অনীহা। প্রথমত, কবিতার কাটতি নেই, অথবা খুব কম, তাই ও ব্যাপারে তাঁরা নিঃস্পৃহ; দ্বিতীয়ত, গদ্যের বেলাতেও তাঁরা চান 'ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটিং', যেটা একেবারে পাশ্চাত্য পাঠকদের টার্গেট করে ঠিকঠাক মশলা দিয়ে তৈরি-করা ঝালমুড়ি, কেবল ঠোঙাটা বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দিলেই হলো। কতিপয় মার্কিন প্রকাশভবন বিলেতের পুরনো প্রকাশভবনগুলিকে অজগরের মতো আত্মসাৎ করেছে। আটলান্টিকের দুই কূলে প্রসারিত বাজারতন্ত্র সিরিয়াস সাহিত্যের শ্বাসরোধ করেছে, অন্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকের স্বাভাবিক কৌতূহলকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এ এক পরিতাপের বিষয়। আমি নিজে দ্য বৃটিশ সেন্টার ফর লিটারারি ট্রান্সলেশনের কাছ থেকে একটি ছোট অনুদান পেয়ে আমার প্রথম নাটক 'রাতের রোদ'এর একটি ইংরেজি তর্জমা করি। সেটি তাঁদের সমাদর লাভ করেছে। ২০০০ সালে তার অভিনয় হবার কথা, আশা করি হবে। হলে তো আনন্দেরই কথা। বইটা কে ছাপবে জানি না। ছাপা হলে ভালো হতো, ইংরেজিভাষীরা আমার বাংলা কাজের একটা নমুনা পেতেন। আমার উপন্যাস, নাটক, গল্প সবই বাংলার ডায়াস্পোরার অবস্থান থেকেই লেখা। আমি যেখানে আছি সেখানেই সেটিং, পরিপ্রেক্ষিত জাগতিক, ভাষা বাংলা। আমি যে-দেশের নাগরিক সেখানকার সাহিত্যিকরা আমার বাংলা লেখকসত্তার একটা পরিচয় পেলে অন্য কাজের জন্য মদত পেতে সুবিধা হতো আমার। রুশদির অনেক আগে থেকে আমি ভারতীয় ডায়স্পোরার লেখক, কিন্তু বিদ্যাজগতের তৎসংক্রান্ত আলোচনায় আমার নাম অদৃশ্য, যেহেতু তাঁদের মানচিত্রে ভারতীয় ভাষার লেখকদের কোনো স্থান নেই। ভাগ্যমন্ত যে-বঙ্গসন্তানরা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মিডিয়ার জগতে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন তাঁরা আমাদের মতো মানুষদের সাহায্য করেন না। আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না তাঁরা। ডায়াস্পোরার অ্যাকাডেমিকরা অন্যদের যত খুশি ডি-কনস্ট্রাক্ট করুন, তাঁরা নিজেরাই কিন্তু সাবঅল্‌টার্ন, চাকরি বজায় রাখতে হলে ওপরওয়ালাদের বিধান মানতেই হয়। যাঁরা এডওয়ার্ড সাইদের শিষ্য তাঁরা একইসঙ্গে উপনিবেশবাদকেও

ঠোকেন, আবার ইংরেজিকেই চূড়ান্ত গ্লোবাল সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে গৌরবান্বিত করেন, কন্‌ট্রাডিকশনটা বোঝেন না। এই দেশান্তরিত 'উপনিবেশোত্তর' অধ্যাপকরা প্রাণ ভ'রে 'থিওরি' ও দক্ষিণ এশিয়ার 'ইংলিশ রাইটিং-এর চর্চা করে যাচ্ছেন—তাতে তাঁদের নিজেদের কেরিয়রের সোপান-আরোহণ ভালোমতোই হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের সেই সাফল্যের থেকে আমার বা দিলারার বা গোলাম মুরশিদের মতো সিরিয়াস ডায়াস্পোরিক লেখকদের বিলেতে বা মার্কিন দেশে কোনো সুরাহা হচ্ছে না। প্রকৃত মদত ও গুণগ্রাহিতার জন্য আমরা সেই কলকাতা বা ঢাকার উপরেই নির্ভরশীল। এই আবহে আমরা যে অন্তত আমাদের নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতে পারছি, নিজেদের তরফে নিজেরাই সেনাপতি থাকতে পারছি, আরও আজ্ঞাধীন হতে হচ্ছে না, এইটুকু বোধ হয় আমাদের লাভ। কলকাতা বা ঢাকা থেকে আমাদের যেটুকু ভৌগোলিক দূরত্ব, তা আজ্ঞাধীনতা থেকে আমাদের অনেকটা রক্ষা করে। দিলারা আর মুরশিদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি; আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য যে লেখকবৃত্তি চালিয়ে যাবার জন্য, প্রকাশিত হবার জন্য, স্বীকৃতি পাবার জন্য আমাদের কোনো ধামাধরা কাজ করতে হয় না।

এটাও বলা দরকার, দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াস্পোরিক লেখককুলের মধ্যে যাঁরা কেবলই ইংরেজিতে লেখেন তাঁদের যথেষ্ট বর্ণাহংকার আছে। তাঁরা নিজেদের উচ্চবর্ণ এবং আমাদের নিম্নবর্ণ মনে করেন, নিজেদের আলাদা রাখেন। আমাদের অনুষ্ঠানে তাঁরা পারতপক্ষে আসেন না। ইংরেজিভিত্তিক মিডিয়াতেও তাঁদেরই সমধিক খাতির। তসলিমা নাসরিন যে সেখানে উল্লেখ পান, বা তাঁর সাক্ষাৎকার যে সেখানে নেওয়া হয়, তার মূল কারণ রাজনৈতিক: তাঁর মাথার উপরে ধর্মীয় চরমপন্থীদের ফতোয়া এখনও বলবৎ আছে বলে, বা কলকাতার কাগজ তাঁর লেখা বার করলে বাংলাদেশে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় বলে। এই সেদিন আমেরিকার Ms পত্রিকার অগাস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁর উপরে একটি নতুন লেখা বেরিয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার ভিত্তি যদি স্রেফ সাহিত্যিক হতো, তা হলে আমেরিকার ইংরেজি কাগজে দিলারার উপরেও অনায়াসেই লেখা বেরোতে পারতো না কি? দিলারা একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কলাকুশল কথাসাহিত্যিক; তিনি অনেকদিন ধরে লিখছেন, অনেকদিন ধরে আমেরিকায় অভিবাসী, এবং হ্যাঁ, তাঁর লেখায় শিল্পিত নারীচেতনারও কোনো অভাব নেই।

ডায়াস্পোরার বাঙালিদের এটা বুঝতে হবে যে নিছক বিনোদনভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে সিরিয়াস সাহিত্যসেবীদের বা গবেষকদের সাহায্য করা যায় না। বিনোদন চলুক, আমি তার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু নূতন দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চস্তরে আমাদের কাজের স্বীকৃতি, আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের প্রচার যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে তার জন্য আমাদের ঢের বেশি প্রাজ্ঞভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে, লড়তে হবে। আমরা যারা কিছুটা স্বীকৃতি অর্জন করেছি তারা বাংলা বই শেষ করে উঠতে পারলে সেটা কলকাতা বা ঢাকা থেকে যেমন করে হোক বেরিয়ে যায়, কিন্তু আমরা যদি অনুবাদে বুদ্ধদেব বা নজরুলের জন্য প্রকাশক চাই

তা হলেই আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়। সাজেদ কামাল নজরুলের যে-অনুবাদ করেছেন সেই বইটি দেখলাম ঢাকা থেকেই বেরিয়েছে। পশ্চিমে তার বিতরণ হবে কি? বুদ্ধদেবের অনুবাদ কলকাতা থেকে বার করতে আমার হয়তো তেমন কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে বই পশ্চিমে—এমন কি ভারতের অন্যত্র—পৌঁছবে কি? কলকাতার প্রকাশকরা দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজে তেমন করে বিতরণ করতে পারেন কি? আর বাংলাভাষী দুনিয়ার বাইরে বিক্রি করতে না পারলে অনুবাদ করে কী লাভ? তাতে মূল লেখকেরও লাভ নেই, দেশান্তরিত যিনি অনুবাদ করছেন তাঁরও বিশেষ কোনো প্রাপ্তি নেই। আজকাল পাশ্চাত্য প্রকাশকরা অনূদিত সাহিত্যের জন্য প্রকাশসহায়ক অনুদানও প্রত্যাশা করে থাকেন। লন্ডনের ইয়োরোপীয় দূতাবাসগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি তাঁদের দেশের সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশের জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন। আমাদের সামনে সে-সুযোগ নেই। সাহিত্যচর্চার বা গবেষণার 'সিরিয়াস' খাতে আমাদের 'কম্যুনিটি' থেকে কোনো পুঁজির বিনিয়োগ নেই, কোনো নিজস্ব ফাউন্ডেশন নেই যা থেকে আমরা মদত পেতে পারি। আর বাঙালিদের বেলায় যে সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান যদিও বা গড়ে ওঠে তৎক্ষণাৎই কি দুই বাংলার মধ্যে বিশ্রী রেষারেষি আরম্ভ হয়ে যাবে না? আমি মার্কিন দেশের বা ক্যানাডার কথা সরজমিনে জানি না, কিন্তু বৃটেনের হালচাল জানি—এখানে দুই দিক থেকে আগত 'কম্যুনিটি'র মধ্যে রেষারেষি যথেষ্টই আছে, এবং এপার-ওপারভিত্তিক গ্রুপিজ্‌ম বেশ প্রবল।

টেক্সাসের সম্মেলনে আমার বক্তৃতার পর যে-আলোচনা হয় সেখানে একজন বলেন, আমার কথার মধ্যে 'অভিমান' ফুটে উঠছে; আরেকজন বলেন, আমি মার্কিন লেখিকাদের মতোই অধিকারসচেতন। আমি বলবো, যাকে আমাদের পুরনো দেশে 'অভিমান' বলে এ তা নয়। একে বরং বলা যায় আত্মসম্মানবোধ। আর হ্যাঁ, অধিকারচেতনার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। অধিকারচেতনা না থাকলে নূতন দেশের ডায়াস্পোরিক জীবনের সংগ্রামে আমরা তো এগোতেই পারবো না, পড়ে পড়ে মার খাবো। আর সংগ্রামটা যখন বাংলার জন্যই, তখন রণকুশলতা তো কাম্যই, ধানাইপানাই করে কী লাভ।

ডায়াস্পোরায় বাংলা সাহিত্যের পেশিকে শক্ত করতে হলে কতগুলি জিনিস আমাদের করতেই হবে। প্রথমত, দুই বাংলার শক্তিক্ষয়কারী হাস্যকর রেষারেষি পাশে সরিয়ে রেখে আমাদের শক্তিকে মিলিত করতে হবে। দু'দিকের এক্সপার্টিজই আমাদের দরকার। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় প্রজন্মকে বাংলাভাষায় কিছুটা দক্ষতা দিতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই। তৃতীয়ত, সাবঅল্‌টার্ন-অধ্যুষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারশাসিত প্রকাশনায়, আর হৈচৈতান্ত্রিক মতলববাজ মিডিয়ায় আমাদের অনুপ্রবেশকে দৃঢ় করে নিজেদের স্বাক্ষর রাখতে হবে। কিছু উপস্থিত বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক টনক লাগবে, কিছু বিচক্ষণ ইম্‌প্রেসারিও চাই, নয়তো আমরা যেখানে আছি সেখানকার সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে নিজেদের জন্য যথোপযুক্ত জায়গা আমরা করে নিতে পারবো না, প্রান্তিক অন্তেবাসী হয়ে থাকতে হবে আমাদের। এইসব প্রসঙ্গে আমাদের আরও সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তাবিনিময় করা দরকার। টেক্সাসের

সম্মেলনে সেই সম্ভাবনার একটা উন্মেষ দেখেছিলাম। আশা করি তা বিকশিত হবে, অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে না।

উপসংহারে বলি, বাংলার সেবাব্রত অবশ্যই আমার জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত—ওখানে আমার আত্মপরিচয় এবং আত্মমর্যাদাবোধ মিশে আছে—কিন্তু কোনো সংকীর্ণ মতবাদের আহ্বানে আমার মন সাড়া দেয় না। ভাষাকে ভিত্তি করে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল কুনো জাতীয়তাবাদ, কোনো নব্য পৌত্তলিকতা বা জাতিভেদ যদি প্রশ্রয় পায়, তাহলে আমাদের নিজেদের মানসিক বিকাশই বাধাগ্রস্ত হবে। যে-গোষ্ঠীপ্রীতি অন্যদের নিজেদের মধ্যে ডেকে আনতে চায় না, তাদের বাদ দিতে চায়, অন্যদের ক্ষতি করেও নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রস্তুত, তা গ্রুপিজ্‌মের নামান্তর। ন্যাশনালিজ্‌মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-বিপদ দেখেছিলেন, তার সত্যতা এই বিংশ শতাব্দীতে বারে বারেই প্রামণিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের যেন মানুষের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কৌতূহলী, সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু করে তোলে। ডায়াস্পোরার লেখক কোনো একটি জাতির সম্পত্তি নন; তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে একটা আন্তর্জাতিকতা থাকবে, এটাই প্রার্থনীয়। জীবন্ত সেতুবন্ধন হতে পারা এক রকমের বিশেষাধিকার, যার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে ডায়াস্পোরার লেখককে।

পরিশিষ্ট

('জিজ্ঞাসা' পত্রিকার বিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সময়ে সম্পাদকীয় অংশে শিবনারায়ণ রায় কিছু মন্তব্য করেন। পত্রিকাটির একবিংশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (অগাস্ট ২০০০) ঐ মন্তব্যের লেখককৃত প্রতিক্রিয়া এই পরিশিষ্ট।)

'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার ২০০৩ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের ডায়াস্পোরিক ভুবন সম্বন্ধে আমার যে-প্রবন্ধটি বেরিয়েছে সেই সূত্রে শিবনারায়ণ কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন। সে-প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা বলতে চাই। মনে হয় এ বিষয়ে আরেকটু আলোচনার অবকাশ আছে।

শিবনারায়ণ লিখেছেন, '... কেতকীর অবস্থার সঙ্গে মূল তফাত হোল আমি কোনো দিনই লিখে জীবিকা অর্জনের কথা ভাবি নি, তার জন্য বেছে নিয়েছিলাম অধ্যাপনার বিকল্প। লেখাই কেতকীর জীবন এবং অনুমান করি জীবিকার প্রধান অবলম্বন।' তিনি এরকম কেন ভাবলেন জানি না। আমি তো আমার প্রবন্ধে পরিষ্কার বলেছি, 'লেখা আমার কর্মজীবন হলেও, জীবিকা নয় কিন্তু। দুটোর মধ্যে তফাত আছে।' আমার প্রবন্ধে আমি তো এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি যে লেখালেখি আমার জীবনের মুখ্য কাজ হলেও তা থেকে আমার জীবিকা অর্জিত হয় না।

আমি কোনোদিনই ভাবি নি যে বাংলায় লিখে বিলেতে জীবিকা অর্জন করা যাবে। বাস্তবতা থেকে ততটা বিযুক্ত নই আমি। আমার প্রবন্ধে আমার নিজের

জীবনের ন্যায়টা আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম—কী করে কোন অবস্থার চাপে আমি একজন ডায়াস্পোরিক বাঙালি লেখিকা হয়ে উঠলাম, এবং তার জন্য আমাকে কী দাম দিতে হয়েছে। অধ্যাপনা করবো না এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার ছিলো না। তেমন কাজের জন্যই তো প্রশিক্ষিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রজন্মের একজন অভিবাসী বাঙালি মেয়ে হিসেবে কার্যত আমি একাধিক দফায় বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম। প্রবন্ধে সেগুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ডক্টরেট করার পরেও যখন সেই মুশকিলের কোনো আসান হলো না, তখনই আমি সত্বর সিদ্ধান্ত নিই যে আর কালক্ষেপ না করে লেখার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করবো, রোজগার যত কমই হোক, কেননা সেই দিকেই আমার মনের আসল আকর্ষণ ছিলো বরাবর। আমাকে যদি একক চেষ্টায় রুটি রোজগার করতে হতো, তাহলে একটা না একটা অন্য কাজ করতেই হতো, কিন্তু যেহেতু আমার একজন জীবনসঙ্গী আছে, যে আমার এবং সন্তানদের সাধ্যমতো প্রতিপালন করা থেকে কখনো পরাঙ্মুখ হয় নি, তাই আমার সামনে আরেকটি বিকল্প ছিলো। দুজনে মিলে রোজগার না করলে মধ্যবিত্ত জীবনের অনেক চাকচিক্যই বাদ দিতে হয়, কিন্তু প্রাণধারণ অসম্ভব এমন তো বলা যায় না। আমার সামনে এই পথটি ছিলো—জীবনযাত্রার নিম্নতর মান স্বীকার করে নিয়ে, পাশ্চাত্য জীবনের নানা বিলাসিতাকে বাদ দিয়ে, অভিবাসী অবস্থাতেই বাংলায় সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করার একটা চেষ্টা করা। সেই চেষ্টাতেই আমি ব্রতী হলাম। একজন মেয়ের পক্ষে বাড়িতে বসে লেখার কাজের একটা বাড়তি সুবিধা এই যে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া-আসার সময়ের সঙ্গে মানিয়ে বেশ খানিকটা কাজ করে ওঠা যায়। মা অফিসে চাকরি করলে সন্তানরা মাকে অনেক কম পায়। আমার ছেলেরা আমাকে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে, এবং মনে হয় তার ফলে লাভবানই হয়েছে। এমন একটা সমাজের ভিতরে আমাকে লেখালেখির কর্মজীবন গড়ে তুলতে হয়েছে যেখানে 'কাজের মাসি' ব'লে কোনো সহায়িকা নেই, ধোয়ামোছা ঝাঁটপাট সমস্ত কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

শিবনারায়ণের নিজের ডায়াস্পোরিক অবস্থান আর আমার অবস্থানের মধ্যে সব থেকে বিনিশ্চায়ক পার্থক্য এই যে তিনি পুরুষ আর আমি মেয়ে। মেয়ে হিসেবে ষাট-সত্তর-আশির দশকের বিলেতে আমাকে যে-বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। তিনি অধ্যাপকের পদে বৃত হয়ে পরিণত বয়সে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁর মনের মতো জীবন গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর সংসারযাত্রার সহায়িকা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আমি কলকাতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একজন বিদেশীকে বিয়ে করে তার দেশে প্রবাসী হই। তখন আমার মাত্র চব্বিশ বছর বয়স। আমাদের প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের কাছে নিজের নির্বাচনমতো বিয়ে করতে পারাটা একটা বিরাট ইশু ছিলো। আমি সেই স্বাধীনতাটা একটু বেশি মাত্রাতেই খাটিয়েছিলাম—একেবারে বিদেশীকে বিয়ে করে পরবাসে চলে যাওয়া। বাবামায়ের অমত হলো না, তাঁদের আশীর্বাদও পাওয়া গেলো। কিন্তু তার পরে কী

কী বৈষম্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে সে-বিষয়ে কোনো সম্যক ধারণা ছিলো না তখন। ক্রমে ক্রমে বোঝা গেলো। দুটি শিশুকে নিয়ে অনেক নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেশ খানিকটা আর্থিক সংগ্রাম করে যেভাবে আমি ডক্টরেট করেছিলাম তা একজন তরুণী মায়ের সংগ্রাম, একটি মেয়ের সংগ্রাম, কিন্তু সেই ডিগ্রি অর্জনের দ্বারা চাকরিক্ষেত্রের বৈষম্য এড়ানো সম্ভব হয় নি।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেছিলেন যে একজন মেয়েকে লেখিকা হয়ে উঠতে হলে তার নিজের একটি ঘর আর বার্ষিক ৫০০ পাউন্ড আয় চাই। তিনি বলেন নি যে টাকাটা বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি করে নিয়ে আসতে হবে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে টাকাটা এসেছিলো একজন আত্মীয়ার কাছে থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারস্বরূপ। এবং এই উত্তরাধিকার, তিনি বলেছেন, তাঁকে অপ্রিয় খুচরো কাজ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলো। মুক্তি দিয়েছিলো লেখার টেবিলে—বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন 'মায়াবী টেবিল'। তেমনি আমার ক্ষেত্রে আমার জীবনের এক সংকটলগ্নে—যখন বুঝলাম যে অধ্যাপনা করতে চাইলে আমাকে সত্যিই আবার দেশবদল করতে হবে, বৃটেনের সংসার অটুট রাখা যাবে না,—তখন ভেবে দেখলাম, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা একজন যখন করে দিচ্ছে, তখন তার সুযোগ নিয়ে বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন নিয়ম করে লিখতে বসি না কেন? কোনো রোজগারের পরোয়া না করেই কাজ আরম্ভ করলাম, এবং দু'বছরের চেষ্টায় একটা উপন্যাস খাড়া করলাম। তার জন্য অল্প কিছু পারিশ্রমিক ভারতীয় মুদ্রায় পরে পেয়েছিলাম, উপন্যাস ছাপা হবার পর। এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আরও অনেক বিবাহিত নারী দেশে দেশে নিয়েছেন। আমি যদি অধ্যাপিকা হবার জন্য জেদ করতাম, তা হলে আমার সেই সাধের বিবাহ, যার জন্য আমি দেশ ছেড়েছিলাম, তা হয়তো ভেঙে যেতো। কিছু পুরুষ শিল্পীও আছেন যাঁরা কম রোজগারে সন্তুষ্ট থেকে শিল্প রচনা করেন, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যান, ফেরত আনেন, ঘরকন্নায় হাত লাগান, যাঁদের স্ত্রীরাই পরিবারের মুখ্য রোজগেরে। আমি বরাবরই জানি বাংলায় লিখে বিলেতে সংসার চালানো যাবে না। কিন্তু আমার একটা চেষ্টা থাকে বাংলা লেখালেখি থেকে অল্প কিছু অন্তত রোজগার তহবিলে জমা পড়ুক, যেটুকু থেকে কলকাতায় গেলে আমার খরচ মেটানো যায়। সেটুকু আমি করতে পেরেছি। দমদমে একবার নামার পর আমাকে কোনো স্টার্লিং খরচ করতে হয় না। আমার একটা জেদ থাকে যে কলকাতার প্রকাশক-সম্পাদকরা এটুকু বুঝুন যে লেখাও একটা শ্রম, এবং তার জন্য অল্প হলেও পারিশ্রমিক, কিছু সম্মানদক্ষিণা থাকা বিধেয়। এটা আমাদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। সকলেই কিছু জনপ্রিয় লেখক হয়ে রয়ালটি কুড়োতে উদ্‌গ্রীব নন। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা হ্রস্বীকৃত আয় মেনে নিয়ে সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করতে প্রস্তুত। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য একটা ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিম্নকাঠামো তো লাগেই। সমাজ তাঁদের সেই ন্যূনতম নিম্নকাঠামোটা যুগিয়ে দিতে পারলে তাঁদের কাছ থেকে কিছু উন্নত মানের কাজ পাওয়া যেতেও পারে, যা নিছক জনপ্রিয়তা আর স্ফীত রয়ালটির মুখাপেক্ষী নয়। আমার ধারণা প্রকাশক-সম্পাদকদের এ সম্পর্কে

সচেতন করার ব্যাপারে লেখকদের একটা দায়ও আছে। ডায়াস্পোরার লেখকদের পক্ষে এটা একটা 'ডেলিকেট নেগোসিয়েশন', কিন্তু জরুরি। নয়তো কলকাতার প্রকাশক-সম্পাদকরা চিরকালই ভাববেন যে আমাদের পকেটে স্টার্লিং আর ডলারের গঙ্গাযমুনা, আমাদের আর কোনো-কিছুর দরকার নেই। তথ্য এই, অন্য কাজ থেকে পকেটে যদি সত্যিই টাকার বন্যা আসে, তাহলে সেই কাজটা নিঃসন্দেহে বিধ্বংসী, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যার খাই-খাই মেটানোর পর কাউকে আর কোনো মায়াবী টেবিলে বসতে হবে না। ঐ অবস্থায় শিল্পরচনা দূরে থাক, সন্তানপালন সংসারযাত্রাও সুকঠিন হয়ে পড়ে। এর চাপে কত বিবাহ যে ভেঙে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি যদি সত্যিই এ দেশে অধ্যাপিকার চাকরি পেতাম, তা হলে সে গুরুদায়িত্ব সামলে, খাতা দেখা সামলে, কমিটি-কনফরেন্স ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলে, ডি-কনস্ট্রাক্‌শন-তত্ত্ব পোস্টকোলোনিয়াল-তত্ত্ব আর পোস্টমডার্নিজমের তত্ত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করে, অপিচ সংসার-সন্তান সামলে, নিজের আত্মাকে সামলে, মাথা ঠিক রেখে 'নোটন নোটন পায়রাগুলি', 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে', বা 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' লিখে উঠতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমার তো মনে হয় আমার স্নায়বিক বৈকল্য ঘটতো। বড় বই লেখার জন্য অধ্যাপকরা স্যাবটিকাল নিয়ে থাকেন। সেগুলোকে তাঁদের নিজেদের লাইনের সমালোচনাধর্মী বা গবেষণামূলক বা তাত্ত্বিক বই হতে হয়, বলা বাহুল্য ইংরেজি ভাষায়। তাই বলতে চাই যে জীবনের এই সিদ্ধান্তগুলো কোনো সহজ সরল 'বেছে নেওয়া'র প্রশ্ন নয়। আমার পক্ষে যা করা সম্ভব সেটাই আমি করেছি।

শিবনারায়ণ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গ এনেছেন। লিখে রোজগার করাই যদি আমার মতলব হতো তা হলে তো নিঃসন্দেহে ইংরেজিতে এমন কিছু লেখার চেষ্টা করতাম যাতে বাজার মাত হতে পারে। কিন্তু সেটা আদপেই আমার জীবনের চালিকা শক্তি নয়। বরং যেভাবে হোক বাংলায় লেখা চালিয়ে যাওয়াই আমার জীবনের একটি সিরিয়াস লক্ষ্য। ইংরেজিতে আমি কবিতা লিখি, কবিতা অনুবাদ করি, গবেষণাগ্রন্থও লিখি—যেসব ক্রিয়াকলাপ থেকে কোনো বাজার মাত হয় না, কারও পকেটে টাকা আসে না। আসর সরগরম করতে হলে হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো গদ্য লিখতে হয়, নয় 'ভারতীয় ইংরেজি উপন্যাস' বাজারে ছাড়তে হয়। যাই হোক, টেক্সাসের সম্মেলনে বাংলাভাষার একজন ডায়স্পোরিক সাহিত্যিক হিসেবেই আমাকে বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছিলো, এবং আমার প্রবন্ধটা সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা। এই ডায়াস্পোরিক ভুবনে ইংরেজির বিশ্বায়িত দাপট আমার মতো মানুষের জীবনে একটি অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি করে, যেহেতু ইংরেজিভাষী পাশ্চাত্য মানুষের মগজে তথা ডায়াস্পোরার এশীয়দের মধ্যেও অনেকের মগজেই এই ব্যাপারটাই বোধগম্য হয় না যে কোনো ইংরেজি জানা অক্সফোর্ড শিক্ষিত মানুষ আদৌ কেন দক্ষিণ এশিয়ার একটি ভাষার বই লিখতে চাইবে।

এর পর আরেকটি ব্যাপারে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। শিবনারায়ণ তাঁর নিউইয়র্ক শহরের বঙ্গসম্মেলনের অভিজ্ঞতা ও তৎপরবর্তী স্থানীয় অভিজ্ঞতার

নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ এই দুই এলাকা থেকে আগত অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের ব্যাপারে একটা তফাত দেখেছেন, এবং মন্তব্য করেছেন যে আমি তাকে গুরুত্ব দিই নি। প্রথমেই মনে করিয়ে দিই যে আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রধানত বৃটেনভিত্তিক, আমেরিকাভিত্তিক নয়। আমার প্রবন্ধটি আমি পড়েছি মার্কিন দেশে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের সেমিনারে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ দুই দিকের প্রতিনিধিরাই ছিলেন, এবং আমাদের সকলের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাই যে-জমায়েতের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো। তেমন একটি সভায় আমি এমন কোনো সাধারণীকৃত তুলনামূলক মন্তব্য করতে পারি না, যা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয়, এবং যা দুই দিকের বাঙালিদের মধ্যে একটা টেনশন সৃষ্টি করতে পারে, সভাগৃহে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশ-নামক নতুন রাষ্ট্রটির গোড়াপত্তন হবার আগে থেকে আমি বৃটেনের অভিবাসী। সে-আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা এ দেশে আসতেন তাঁদের সিংহভাগ শ্রীহট্টের মানুষ। তাঁরা সাধারণত রেস্তোরাঁ খুলে জীবিকানির্বাহ করতেন। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের মধ্যে এঁরাই সংখ্যগরিষ্ঠ। নিজেদের বাঙালি সত্তা সম্বন্ধে এঁরা নিঃসংশয় ছিলেন না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে শুরু হয় এক আত্মনির্মাণ প্রক্রিয়া। এঁদের মাতৃভাষা বাংলা না সিলেটী, এই প্রশ্নটা নিয়ে সত্তরের দশক জুড়ে তিক্ত তর্কবিতর্ক চলছে। ঢাকা-রাজশাহীর কলেজশিক্ষিত বাঙালিদের সঙ্গে সিলেটীর প্রতি অনুগত গোষ্ঠীর যথেষ্টই তর্কাতর্কি হয়েছে। বাঙালি হিসেবে একটা বৃহত্তর পরিচয় গড়ে তোলার ব্যাপারে সিলেটী গোষ্ঠীর মধ্যে একটা প্রতিরোধের মনোভাব ছিলো। নিজেদের বাঙালি বলে ভাবলে মধ্যে মধ্যে ভারতীয় বাঙালিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কিছু কাজ করতে হয়। ধর্মের ব্যাপারটা এসে পড়ে। ১৯৪৭-এ দেশ তা হলে ভাগ হয়েছিলো কেন? যাঁরা গোঁড়া তাঁরা প্রথমে মুসলমান, তার পরে বাঙালি। কথাটা আমি দু-একটি ধর্মপ্রাণা অবগুণ্ঠিতা মেয়েকে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই সেদিনও বলতে শুনেছি।

আশির দশকে একবার আমি কয়েক মাস অক্সফোর্ডের 'অ্যাডভাইসরি সেন্টার ফর মাল্টিকাল্‌চারাল এজুকেশন'-এর তরফে এই জেলার বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে কাজ করি। প্রধানত ইংরেজি শেখানোর কাজ হলেও খানিকটা স্যোশাল ওয়ার্কারের ভূমিকাও পালন করতে হতো। প্রসঙ্গত বলি, বাড়ির বাইরে কাজ করার সঙ্গে ঘরের কাজ আর লেখার কাজকে মেলানো যে কতটা শ্রমসাধ্য তা আমি ঐ ন' মাসে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। প্রতি বিকেলেই এত ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম যে মায়াবী টেবিলে আসীন হওয়া দূরে থাক, রান্নাবাড়া করতেও ইচ্ছে করতো না। যাই হোক, দুটি সিলেটী রেস্তোরাঁ পরিবারের কন্যাকে মনে আছে, যারা আমাকে শিক্ষিকারূপে পেয়ে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিলো। তারা আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ খাইয়েছিলো। আমি যে বাঙালি হয়েও মুসলমান নই এ কথা জেনে তাদের মা যেন একটু বিস্মিতই। হিন্দু বাঙালি হয় কিনা সে-সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কেমন

যেন ভাসাভাসা, ওদিকে তাঁদের মানসিক জগৎটা ছিলো বোম্বাইয়ের ছবির ।৬।৬৩ দ্বারা শাসিত। মেয়েদুটি কলেজে যেতে চায়, মায়ের আপত্তি নেই, কিন্তু জানলাম তাদের বড় ভাই যেতে দেবে না। আমি ভ্রাতাটির সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম। কিন্তু ভ্রাতাটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখে নি। মেয়েদের বিশ্বাস অর্জন করলেও তাদের দাদাটির বিশ্বাস অর্জন করতে পারি নি। আমি যখন 'কলকাতার হিন্দু টিচার' এবং ইংরেজের স্ত্রী তখন নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষার নাম করে তার বোনেদের দুরন্ত স্বাধীনতার পথে উসকে দেওয়াই আমার মতলব। মেয়েদুটি কতদিন আমার বাড়িতে কাতর টেলিফোন করেছে। তারপর একদিন জানলাম তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কলেজে তারা আর যায় নি।

বৃটেনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পুব-পশ্চিম দুই দিকের বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকেই গুরুত্ব দিয়েছি। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে দুই দিকের মানুষই আছেন। বৃটেনের বাংলাদেশীরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকে বাংলা বেশি ভালোবাসেন, তার জন্য বেশি খাটেন—এমন কোনো সাধারণীকৃত দাবি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করতে পারি না। পুব-পশ্চিম দুই দিকেরই উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলিতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সাধারণত বাংলায় কথাবার্তা বলতে চায় না, সে তাদের বাবা-মা ঢাকার হোন, কি কলকাতার। বাংলাদেশীদের মধ্যে যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন বা বাইরে দোকান চালাবার চেষ্টা করেন তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে তাঁদের কম্যুনিটির লোকেরা বাংলা বই পড়েন না বা কেনেন না। লাইব্রেরিতে বাংলা বই কেনা হলেও তা ইশু হয় না। দোকানে বই সাজিয়ে রাখলেও তা বিক্রি হয় না। শুনেছি আমার যে-বই কলকাতায় আউট অফ প্রিন্ট লন্ডনের দোকানে তার পুরোনো স্টক পড়ে আছে। তবে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে ও তার বিবর্ধনে, সুযোগসুবিধা আদায়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের চাইতে বেশি সচেষ্ট, রাজনৈতিকভাবে আরও তৎপর ও সোচ্চার। পশ্চিম দিকের বাঙালিদের একটা ভারতীয় আত্মপরিচয়ও আছে, সেটা রক্ষা করার দায়ও আছে। সেটা তাঁরা খারিজ করতে চান না, কেন চাইবেন। ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখোমুখি তাঁরা একটু অস্বস্তি বোধ করেন, একটু নীরব থাকেন। ফলে এ দেশে অনেকের ধারণা যে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা সকলেই বাংলাদেশী, সকলেই মুসলিম। ভারতীয়দের মধ্যেও যে 'বাঙালি' আছেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু আছেন, যে-বিষয়ে তাঁদের ধারণা ঝাপসা হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সময়ে সময়ে কোণঠাসা বোধ করেন।

উত্তর আমেরিকায় বাঙালিদের মাইগ্রেশনের ছবিটা কিছু আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দিন ধ'রেই ওদিকে 'ব্রেন ড্রেন' হয়েছে। তার পর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তর-মার্কিন ইমিগ্রেশনের বিধিবদ্ধ চ্যানেলে যেসব বাংলাদেশী খেপে খেপে ওদিকে পৌঁছেছেন তাঁদের মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত ও পেশাদার মানুষ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে একাত্তর পরবর্তী চেতনাও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তাঁরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের চাইতে বাংলাকে বেশি ভালোবাসেন এমন কোনো মন্তব্য করা

আমার এক্তিয়ারের বাইরে হতো, অশোভনও হতো। টেক্সাসের সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বোধ করি প্রধানত বাংলাদেশী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয়রাও কাজ করেছিলেন। বস্তুত, আমাকে যিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তিনি কলকাতার ছেলে এবং 'জিজ্ঞাসা'র আজীবন সদস্য—সৌম্য দাশগুপ্ত। সৌম্যর উৎসাহ ও প্রবর্তনা ছাড়া ওখানে আমি নেমন্তন্ন পেতাম কিনা বলতে পারি না।

১৯৯৮-এর জুলাইয়ে টরন্টোর ঢাউস বঙ্গ সম্মেলনে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। সেটার উদ্যোক্তারা প্রধানত পশ্চিম বাংলার, কিন্তু বাংলাদেশের অভিবাসীরাও সহযোগী ছিলেন। কিছুটা সহযোগিতাই তো এই জাতীয় সম্মেলনের রীতি, দেখতে পাই। আর হ্যাঁ, এই মেলাগুলোর একটা বড় দিক অবশ্যই সামাজিক মেলামেশা, কেনাবেচা, নৃত্যগীতভিত্তিক মিশ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন। কিন্তু সমবেতদের মধ্যে পেশাদার বিদ্বজ্জনেরাও থাকেন। টরন্টোতে আমার সেমিনার-বক্তৃতায় তো ঘরভর্তি শ্রোতা ছিলেন, অনেকে চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন। আগ্রহ নিয়েই শুনেছেন। ঠিকই, মেলায় শাড়ি বিক্রি হয়, গানের ক্যাসেটও বিক্রি হয়, কিছু বইও বিক্রি হয়। আমেরিকার বাঙালিদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি। বই কেনার ব্যাপারে তাঁরা লন্ডনের বাঙালিদের চাইতে অধিক মুক্তহস্ত। আমি তো যখনই কিছু বই নিয়ে গেছি সব বিক্রি করে ফিরেছি। ১৯৯৮ সালের বঙ্গসম্মেলনের প্রেসিডেন্সি কলেজ পুনর্মিলনটি মনে পড়ছে। হাতের বইগুলো টেবিলে রাখার কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিক্রি হয়ে যায়। সঙ্গে আরও কেন আনি নি তা নিয়ে কেউ কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করলেন।

ঐ ১৯৯৮ সালের হেমন্তকালে আমি আবার আটলান্টিক পার হই, এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'লেকচার ট্যুর' উপলক্ষে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক ছিলেন আমার এক অনুরাগী পাঠক, যিনি কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মাড়োয়ারী। তাঁর চেষ্টায় দিলারা হাশেমের সঙ্গে আমার একটি যুগ্ম এবং মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় ওয়াশিংটন ডি-সি-তে। তার পর পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের চেষ্টায় আরও তিনটি শহরের ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দিই। পশ্চিম বাংলার মানুষদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং উৎসাহী গুণগ্রাহিতা পেয়েছি। সুটকেসে যে ক'খানা বই নিয়ে গেছি সবই বিক্রি করে ফিরেছি। নতুন অর্ডারও নিয়ে এসেছি এবং বিলেতে ফিরে এসে ডেসপ্যাচ করেছি। সত্যি বলতে কি, যে ক'বার আমি আমেরিকায় গেছি প্রতিবারই কোনো না কোনো নতুন অনুরাগী পাঠকের সন্ধান পেয়েছি, যিনি পশ্চিম বাংলা থেকে আগত অভিবাসী। এ ক্ষেত্রে আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা আমি মোটেই বলতে পারি না যে মার্কিন দুনিয়ায় অভিবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়দের বাংলার প্রতি আকর্ষণ অভিবাসী পূর্ববঙ্গীয়দের চেয়ে কম। আত্মীয়তা বোধ করবার জন্যই সম্মেলনগুলি ডাকা হয়। যোগদান করে কিছুটা আনন্দ পাই। তার পর ফিরে এসে সৃষ্টির কাজ সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই করতে হয়।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন করা যায়, নিউইয়র্কের বাংলাদেশীদের মধ্যে ডায়াস্পোরিক সাহিত্যচর্চা এতটা প্রবল হওয়া সত্ত্বেও (যেমন শিবনারায়ণ বলছেন) মার্কিন দুনিয়ায় অভিবাসী কৃতী লেখিকা দিলারা হশেমের নামটা তিনি তাঁদের মুখে শুনলেন না কেন? দিলারার নাম তো শিবনারায়ণ (এবং 'দেশ'-এর বর্তমান সম্পাদক) আমার কাছ থেকেই জানলেন। এখানেও কি লিঙ্গগত পরিচয়ের একটা ব্যাপার আছে? আনন্দের খবর এই, ২০০০ সালের বৃহৎ মার্কিন বঙ্গসম্মেলনে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা দিলারাকে অকুণ্ঠভাবে সম্মান জানিয়েছেন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যচর্চা

আমাদের দূর কালের পূর্বপুরুষেরা আমাদের কালের একটা সমস্যা থেকে মুক্ত ছিলেন : সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধে একালে আমরা যে ধরনের প্রশ্নে চমকাই না, যেমন সাহিত্যপাঠে কি হবে, আজকের জীবনের সাহিত্যের উপযোগিতা কতোটুকু, এ ধরনের প্রশ্ন সম্ভবত তাদের মনে জায়গা পেতো না। শিক্ষা ও শিক্ষিত-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক মনে হয় তাঁদের কাছে প্রশ্নাতীত ছিল। ইউরোপে, রেনেসাঁসের সময়ে, ও তার পরে বিভিন্ন আধুনিক ভাষার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠার কালে একটা প্রশ্ন উঠেছিল: গ্রীকো-লাতিন প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য ও নতুন জায়মান সাহিত্যের তুলনামূলক গুণাগুণ নিয়ে। এই বিতর্কের ফলে যে দুটো দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কৌতুকপ্রদ এক রূপক কাহিনী পাওয়া যাবে সুইফ্‌ট'-এর "কেতাবের লড়াই" Battle of the Books ইউরোপে পুরো· আঠারো শতক ধরে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে, ফলে পরবর্তী শতকে প্রযুক্তি বিদ্যারও গুরুত্ব বাড়ল। বিলেতের মতো শিল্পোন্নত দেশে এর ফলে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণশীল পাঠ্যসূচির মধ্যে পরিবর্তনের অপেক্ষা না করে নতুন সমাজ ও তার নতুন চাহিদা মেটাবার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। শিক্ষার পুরনো ধারায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন আসেনি, তার পাশাপাশি একটা নতুন ধারার জন্ম হয়েছে। এবং এই নতুন ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাধান্যত্মসাহিত্যের জায়গা হয় অনুপস্থিত, বা সঙ্কুচিত। এখন আমাদের দেশেও শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নয়, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কোন বিদ্যার জন্য কতোটুকু স্থান, এই নিয়ে বিতর্ক। সাহিত্য নির্বাসিত নয়, তবে তাকে অনেকখানি জায়গা ছাড়তে হয়েছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখার জন্য। শিক্ষা-চিন্তার ভাষা ও সাহিত্য যে একেবারেই ঠাঁই পায় না, তা নয়, তবে ধারাবিভক্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সাহিত্য বা মানবিকীবিদ্যার ধারা তার পূর্ব গুরুত্ব যে অনেকটাই হারিয়েছে, তা স্পষ্ট।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিস্থিতি, আমরা ধরে নিতে পারি, সার্বিক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তারই সমান্তরাল। অর্থাৎ আমাদের জীবনেও সাহিত্যের জায়গা এখন সংকুচিত। জীবনের ও জীবিকার বিস্তর চাহিদার মোকাবেলা করে এই আপাত অপ্রয়োজনীয়, অনেকের দৃষ্টিতে নিছক আলংকারিক (ornamental) বিদ্যার জন্য আমরা ঢের সময় ও শ্রম দিতে পারছি না। যখনই আমরা সাহিত্যকে একটা 'বিদ্যা' বলে চিহ্নিত করছি, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা,

নীজগণিত বা ভূবিদ্যার মতো তখনই আমরা সাহিত্যের আদি পরিচয়কে খণ্ডিত করে ফেলেছি। গ্রীক বা রোমানদের সময়ে, কালিদাস বা ফেরদৌসীর কালে, এমনকি ইউরোপের আঠারো শতকেও, রুশো-ভলটেয়ার-জনসনের কালে সাহিত্য তার ব্যাপক পরিচয়ে পরিচিত ছিল। মানবিকী বিদ্যা বলতে আজ যে অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ এলাকা বোঝায়, অতীতে প্রায়শই 'সাহিত্য'ও তাই বোঝাত। ইতিহাস-দর্শন সাহিত্যের অন্তর্গত বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এখন আমরা সাহিত্যের সীমানা বেশ কিছুটা কেটেছেঁটে তাকে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও সৃষ্টিধর্মী সার্থক রচনা বলে ভাবতে অভ্যস্ত। কাব্য-উপন্যাস-নাটক সাহিত্য; জীবনী ভ্রমণ-কাহিনী-প্রবন্ধও সাহিত্য, যদি তা সাহিত্য গুণান্বিত হয়। দর্শন-ইতিহাসকে এখন আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সাহিত্য বলতে রাজি নই, তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাকেও সাহিত্যের আসরে জায়গা দিতে আমরা রাজি।

দেশকাল নির্বিশেষে যদি আমরা সাহিত্যকে এক ও অখণ্ড বিবেচনা করি, তাহলে সে এক বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য প্রকৃতিগতভাবেই সঞ্চয়ধর্মী। নতুন সাহিত্য পুরনোকে বাতিল করে না, পুরনোর ভাণ্ডারে নতুন সঞ্চয় হয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করে। সাহিত্যের রং, মেজাজ, প্রকৃতি ভীষণভাবে বদলে যায়। মধ্যযুগের কাহিনী-কাব্য আধুনিকের মনে ধরে না; সেকালের রূপক কাহিনী একালে অচল; মহা মহা মহাকাব্য তাদের মহত্ত্ব নিয়ে আজো শ্রদ্ধাঞ্জলি পাচ্ছে; কিন্তু পাঠক পাচ্ছে না, গুটিকয় অধ্যবসায়ী ছাত্র ও পণ্ডিতকে বাদ দিলে। এসব সত্ত্বেও তারা সাহিত্যের ভাণ্ডার আলো করছে; সাহিত্যের ইতিহাসের বড়ো অধ্যায় রচনা করছে। সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠক ও সমালোচকের জন্য এরা অপরিহার্য। সাহিত্যের এই অখণ্ড, বৈশ্বিক পরিচয় সবার জন্য নয়। এমনকি, সাহিত্যের পঠন পাঠন যাঁর পেশা তিনিও বাধ্য হন বিশেষ দেশের, ও বিশেষ যুগের সাহিত্যের মধ্যে তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখতে।

সাহিত্যের সঙ্গে যাদের পেশার যোগ, তাদের নিয়ে আমি আপাতত কিছু বলতে চাই না। এদের বাইরে যে বিরাট শিক্ষিত-সমাজ এবং নোবেল পুরস্কার কমিটিও 'সাহিত্য'কে এই পূর্বতন ব্যাপক অর্থেই বুঝে থাকে। শিক্ষিত সমাজ বলতে আমি বুঝি একজন মানুষ যে স্কুল-কলেজের লেখাপড়া শেষ করে তারপরও বই পড়ে থাকে, পুরনো বই, নতুন বই, ভালো বই, অনেক সময় হাতের কাছে যেমনটি জোটে তেমনটি বই, একজন মানুষ যার চিন্তা-ভাবনা-আবেগ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তার বই পড়ার অভিজ্ঞতা কাজ করে চলেছে। সেই মানুষটার জন্য সাহিত্য প্রায়ই কোনো নির্দিষ্ট চেহারায় ধরা দেয় না। সাহিত্যের সঙ্গে তার যে শিথিল সম্পর্ক, সেখানে সাহিত্যরুচির ভূমিকা সামান্যই। এবং এই পরিস্থিতিটা আমাদের কালের।

অতীতে তাহলে অবস্থাটা কেমন ছিল? অতীতে, বিশেষত মুদ্রণপূর্ব-যুগে, বইয়ের সংখ্যা ছিল অনেক কম, এবং ক্লাসিক, বা চিরায়ত সাহিত্য থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। ইউরোপীয় সমাজে ছিল গ্রীকো-রোমান সাহিত্য, ও সেই সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের কিছু কিছু ক্লাসিক · এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও পরিস্থিতিটা

অনুরূপ ছিল বলে ধারণা করা যায়। এই উপমহাদেশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে এক সময়ে যুক্ত হয়েছিল ফারসি সাহিত্যের কিছু গ্রন্থ, বিশেষত সুফি ধারার কাব্যত্রহাফিজ, রুমী, আত্তার। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজি-বাংলার পাশাপাশি একটি ক্লাসিকাল ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু ছাত্ররা সংস্কৃত ও মুসলমান ছাত্ররা ফারসি নেবে, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। মাদ্‌রাসা শিক্ষাতেও ফারসির জায়গা থাকায়, ফারসি কাব্যের সঙ্গে এদেশবাসীর পরিচয় ছিল ব্যাপক। ইংরেজ আমলে যাঁরা কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁরা সবাই বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন। অর্থাৎ শেক্সপীয়র, মিলটন-এর কাব্য, সুইফ্‌ট, বার্ক, জনসন, মেকলের গদ্যরচনা ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়—তা যতোই খণ্ডিত হোক না কেন—লাভ করেছেন, যে-কোন কলেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে এটা ধরে নেওয়া যেত। এদেশের একজন গ্রাজুয়েট, সে আমলে শুধু ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিকের সংস্পর্শেই আসতেন, তা নয়, ইংরেজি সাহিত্যের সুবাদে ইউরোপীয় সাহিত্যেরও কিছু কিছু মৌলিক সংবাদ তাঁর জানা হয়ে যেত।

এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা একটা আদর্শ ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিক দিয়েই এ ব্যবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক চিন্তার ফসল, এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আমি একটা ব্যবস্থার বর্ণনা দিলাম, এইমাত্র, যে-ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার একটা পার্শ্বফল ছিল প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের কিছু চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ। একে আমরা সাহিত্য-রুচি বা সাহিত্য-সংস্কৃতি বলতে পারি।

দুটি গুণের সমন্বয় না হলে সাহিত্য চিরায়ত হয় না, উন্নত শিল্পগুণ, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপদক্ষতা, ও ব্যাপক মানবিক আবেদন। ভাষান্তরে ক্লাসিকের শিল্পগুণ অনেকখানি খর্ব হয়, তবু যা থাকে, ও সেই সঙ্গে মানবিক আবেদন যুক্ত হয়ে হোমারের কাব্য বাংলাদেশের পাঠকের কাছে, ও কালিদাসের কাব্য বেলজিয়ামের পাঠকের কাছে চিরায়ত সাহিত্যের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। ওমর খৈয়াম ও হাফিজের যতো অনুবাদ বাংলায় হয়েছে তার সবগুলিই কবিতা পাঠকের কাছে গ্রাহ্য নয়। তবে ন্যূনতম সৌকর্য যেখানেই দেখা গেছে, সেখানেই কালের, সংস্কৃতির ও আদর্শের ব্যবধান অতিক্রম করে পাঠকচিত্ত সাড়া দিয়েছে—সেই কাব্যের আবেদনে। ইংরেজ কবি ফিটজেরল্ড তাঁর খৈয়াম অনুবাদকে এক পুনঃসৃষ্টির স্তরে নিয়ে যান। ফলে তাঁর অনুবাদে ওমর খৈয়াম ইংরেজি সাহিত্যে এক ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করেছে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, ক্লাসিক একালেও রচিত হতে পারে, ও রচিত হচ্ছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্লাসিকের জায়গা নানা কারণে নষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে কিভাবে ও কি বিবেচনায় ফারসিকে হটিয়ে আরবি ও উর্দু জায়গা করে নিয়েছিল, সে কাহিনী বেশ শিক্ষাপ্রদ। আরবিকে যদিবা ক্লাসিক্যাল ভাষা গণ্য করা যায়, যদিও ফারসি সাহিত্যের জায়গা নেবে আরবির এমন কিছু দেওয়ার ছিল না, কিন্তু উর্দু কি হিসেবে ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসেবে বাঙালি ছাত্রের পাঠ্যসূচিতে এসেছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। উর্দু বাংলার মতোই একটি আধুনিক ভাষা, এবং সেই

পরিচয়ে অবশ্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এর পঠন-পাঠন হওয়া উচিত, তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

ফারসির জায়গায় উর্দুর অনুপ্রবেশের একাডেমিক ব্যাখ্যা না থাকলেও রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাখ্যা আছে। এটাও আমাদের জন্য এ-মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক নয়।

আসল কথায় ফিরে আসা যাক। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাহিত্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকায়, ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে সাহিত্য-রুচি তৈরি হওয়ার একটা ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা, এক ধরনের নিশ্চয়তা ছিল। সেটা অনেকাংশেই নষ্ট হয়েছে। এ-নিয়ে কান্নাকাটি করা বৃথা। উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা বরাবরই বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। এই ধারা-বিভক্তি এক সময়ে মাধ্যমিক স্তরেও নেমে এসেছিল। নতুন পাঠক্রমে এর সংশোধন হয়েছে। উচ্চতর পর্যায়ে কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিজ্ঞানের পাঠ নেবে, এবং অনুরূপভাবে, বিজ্ঞানের ছাত্ররাই শুধু নয়, চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রকৌশল বিদ্যার ছাত্ররা নেবে কলা অথবা সমাজ বিজ্ঞানের একটা পাঠ, পশ্চিম থেকে ধার করা এই মূল্যবান চিন্তাও আমাদের দেশে এসেছিল, যদিও এটাকে ঠিকমতো কার্যকর করা যায়নি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, উচ্চশিক্ষার সকল স্তরেই, সকল অঞ্চলেই এখন সঙ্কীর্ণতার প্রবণতা জোর পেয়েছে, এবং এই পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাহিত্যপাঠের ও সাহিত্য-রুচি গঠনের সুযোগও সীমিত।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাহিত্য—দুইয়ের মধ্যে তাহলে কি সম্পর্ক আমি কল্পনা করছি? যাদের হাতে সাহিত্য গড়ে উঠেছে—এবং এটা সকল ভাষার সকল সাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য—তারা প্রায় সবাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের লোক। অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠলে স্বভাবতই ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে পেশাগতভাবে জড়িত ব্যক্তিরাও অপরাপর পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির মতো সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের চল্লিশ জন প্রধান পুরুষের মধ্যে চার জনও শিক্ষাজগতের লোক হবেন কিনা, সন্দেহ করি। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। মোট কথা, সাহিত্য সব দেশে, সব ভাষাতেই পেশা ও প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠেছে, বলা যায়। তবে কোনো ভাষায় সাহিত্যের একটা স্পষ্ট অবয়ব গড়ে উঠলে সেই ভাষাভাষী সমাজে তার সামাজিক স্বীকৃতিও ঘটতে বাধ্য। এই সামাজিক স্বীকৃতিরই একটা রূপ হলো শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বদেশি সাহিত্যের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট হওয়া। সকল নবীন সাহিত্যকেই এই স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয়। ইংরেজিকেও করতে হয়েছে, বাংলাকেও করতে হয়েছে। স্বদেশি সাহিত্য পাঠ্যক্রমে ও পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, পাঠ্যতালিকা একটা তালিকা মাত্র, এর সীমাবদ্ধতা আছে। কোনো সমৃদ্ধ সাহিত্যের একটা খণ্ডাংশও পাঠ্যতালিকাভুক্ত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপকতম পাঠ্যতালিকাও বড়ো জোর একটা নমুনামূল্য দাবি করতে পারে, তার বেশি নয়। সুতরাং সাহিত্যের

সামগ্রিক পরিচয় লাভ এবং বৃহত্তর জনসমাজে সাহিত্যরুচি গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, শেষ বিচারে খণ্ডিত ও সীমিত।

সুতরাং একজন শিক্ষিত ও প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠকের কথা যখন চিন্তা করব, এবং সারা দেশের পাঠক-সাধারণের কথা যখন ভাবব, তখন সাহিত্যরুচির একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে, সাহিত্যরুচি গঠনের ও বিস্তারের একমাত্র বীজতলা হিসেবে আমরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে বিবেচনা করব না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই, এবং এখনও, একটা বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে। সীমাবদ্ধতার একটা দিক হলো, সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে একটা বড়ো রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বহু দিনের প্রচলিত ধারণা ছিল, সাহিত্যই ভাষা শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর, ও সবচেয়ে মনোহর মাধ্যম। এটা যেমন মাতৃভাষা সম্বন্ধে, তেমনি বিদেশি ভাষা সম্বন্ধেও খাটে। সম্প্রতি ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ ভাষাশিক্ষাকে সাহিত্য থেকে যতোদূর সম্ভব দূরে রাখতে চান। এই চিন্তার ভালোমন্দ নিয়ে তর্কের জায়গা এটা নয়। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে আমাদের স্কুল-পাঠ্য সাহিত্যের বইগুলির সংকলনে যে নিয়ম বা অনিয়ম দেখতে পাচ্ছি, তাতে অচিরেই সাহিত্যরুচি গঠনের সঙ্গে সাহিত্যপাঠের সম্পর্ক আমরা ভুলে যাবো।

আমার বিবেচনায় ভাষা শিক্ষার জন্য আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নততর প্রণালির কার্যকারিতা যাই হোক, সাহিত্য-নিরপেক্ষ ভাষা-শিক্ষা ধারণা হিসেবে অবাস্তব। সাহিত্যের মূল্য নানাভাবে দেখা যায়, তার মধ্যে একটি হলো সাহিত্য ভাষার চূড়ান্ত সৌকর্যপূর্ণ ব্যবহার। শুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত বাক্য রচনা ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় মাত্র, তার শেষ কথা কোনো দিন নয়। তিনিই সাহিত্যিক যিনি তাঁর সাহিত্যচর্চার ভাষার কুশলী প্রয়োগে হাত পাকিয়েছেন। সাহিত্যিক হিসেবে এটা তাঁর প্রাথমিক যোগ্যতা, তবে এই যোগ্যতা অর্জন কোনো দিন সহজ ছিল না, এখনও নয়। জীবনের হ্রস্বতা ও শিল্পের বা শিল্পকে আয়ত্ত করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন মধ্যযুগের ইংরেজ কবি। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যশিল্পীর কথাই বলেছেন। ভাষার পথে ব্যাকরণ বড়ো জোর আমাদের বাড়ির দেউড়ি বা গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, তারপরই তার ছুটি। বাকি নিরুদ্দেশের পথে সাহিত্যই আমাদের পথপ্রদর্শক।

সাহিত্যরুচি প্রসঙ্গে কেন ক্লাসিকের কথা উঠেছে? প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থারই বা কেন ক্লাসিকের এই অনন্য মর্যাদা? কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ক্লাসিক শুধু সাহিত্য-রস-সম্ভোগের উৎস নয়, ক্লাসিক একই সঙ্গে একটি ভাষার চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত। ভাষার মধ্যে অনেকেই একটা জৈব গুণের দেখা পেয়েছেন—জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ ও মৃত্যু। সংস্কৃত, পহলবি, প্রাচীন গ্রীক—এসব উন্নত ভাষাও অবধারিত মৃত্যু এড়াতে পারেনি। লাতিনের বৃদ্ধি ও বিকাশ যে রোমে, সেই রোম যেমন অতীতে মিলিয়েছে, ও তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে নতুন রোম, তেমনি সেই ভাষাও এখন মৃত ভাষার দলভুক্ত, তার জায়গায় এসেছে এ কালের ইতালিয়ান

ভাষা। ক্লাসিক প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন, সভ্যতা ও ভাষা পরিণতির একটা বিন্দুতে পৌঁছলেই আমরা সেই ভাষায় ক্লাসিক আশা করতে পারি, যেমন অগস্টাসের সময়ে লাতিন ভাষার পরিণতির পর্বেই সম্ভব হয়েছিল ভার্জিলের মহাকাব্য, ইউরোপের একমাত্র ক্লাসিক (এলিয়টের মতে) ঈনীড। এলিয়টের মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে হবে, এমন নয়। 'ঈনীড' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এলিয়ট একটা পরিস্থিতিগত যোগাযোগ লক্ষ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা ভারতচন্দ্রকে ক্লাসিক যদি নাও বলি, মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যকে এই গৌরব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মাইকেলের সময়ে, বা তাঁর প্রজন্মে, বঙ্গসংস্কৃতি ও বাংলা, ভাষা পরিণতির চরমে পৌঁছে গিয়েছিল, এতটা কেউ দাবি করবে না। পরিণতি ও বিকাশের সিংহদ্বারে পৌঁছেছিল, এটা বলা যায়। এলিজাবেথীয় যুগ ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে প্রশংসিত, কিন্তু আঠারো শতকের সমালোচকের দৃষ্টিতে, বিশেষত সুইফ্‌টের বিবেচনায়, ইংরেজি ভাষা ও গদ্য তার চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছে অন্তত আরো এক শতাব্দী পরে। ভাষাকে তার এই উন্নত রূপে চিরকালের জন্য বেঁধে রাখার উপায় হিসেবে সুইফ্‌ট একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন, ফরাসি একাডেমীর আদর্শ সামনে রেখে। ড. জনসন তাঁর বিখ্যাত অভিধানের ভূমিকায় এর জবাবে বললেন, ভাসা স্রোতস্বিনীর মতো, কোনো বাঁধ দিয়ে এর সদাচঞ্চল স্রোতকে আটকে রাখা যায় না। ক্লাসিকের একটা মূল্য এই যে, ক্লাসিক ভাষার একটি উন্নত ও মনোহর রূপকে ধারণ করে বহু কাল টিকে থাকে। ভাষা এগিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু ভাষা প্রয়োগের এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যায় ক্লাসিক। ঐ ভাষা অনুকরণের জন্য নয়, তবে ওর পরিশীলন মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন স্থাপত্য যেমন একালে, কোনো পরবর্তী কালেই তার পুনরাবৃত্তি নেই। তবে তার অনুশীলন ছাড়া স্থাপত্যবিদ্যা অকল্পনীয়। ফরাসি একাডেমীর আদর্শে ইংরেজ তার দেশে কোনো একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেনি। যদিও 'ব্রিটিশ একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, তবে তার কার্যক্রম ফরাসি একাডেমীর মতো নয়। কোন শব্দ অভিধানগ্রাহ্য হবে, কোনটা হবে না, এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত প্রকাশের এখতিয়ার কাউকে দেওয়া হয়নি। উত্তম সাহিত্যকর্মের জন্য সম্মান (এবং সম্মানী) প্রদানের রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি আয়োজন আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পুরস্কার ব্যবস্থাকে তার সীমিত উপযোগিতার জন্যই সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে, শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত রায় হিসেবে নয়। বস্তুত সাহিত্যে এ ধরনের রায় কেউ দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে উৎকর্ষের কথা চলে, শ্রেষ্ঠত্বের কথা চলে না।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যারা সাহিত্যের পাঠ নিয়েছে, তারা একটি উন্নত সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যরুচি অর্জন করবে, এটা একটি সঙ্গত প্রত্যাশা। সব ক্ষেত্রে এটা হয় না বলেই প্রত্যাশাটা মিথ্যা হয়ে যায় না। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমীর সাহায্য ছাড়াই সভ্যতার বিশেষ পর্বে কোনো কোনো সমাজ শিল্প ও সাহিত্য রুচির একটা উন্নত স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল। অনুকূল পরিবেশের যোগাযোগেই এটা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনে বিশেষ

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব, নিয়তির হাতে সব কিছু ছেড়ে না দিয়ে।

আমরা যদি এই বিরস সত্যকে মেনে নিই যে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়া সম্ভব নয়, এবং আমরা যদি মনে কার, একটি উন্নত সমাজের চরিত্রলক্ষণ হিসেবে সাহিত্যরুচি গঠন, বিজ্ঞানমনস্কতার মতোই সর্বতোভাবে কাম্য, তাহলে প্রথমেই আমাদের এ বিষয়ে সংশয়মুক্ত হতে হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার সঙ্গে সাহিত্যচর্চার বা সাহিত্যপাঠের কোনো বিরোধ নেই। ডারউইন-হাক্সলির মতো অনেক বিজ্ঞানী চমৎকার গদ্য লিখেছেন। মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের মতো অনেকে প্রাচীন সাহিত্যের রসে মজেছেন, জগদীশচন্দ্র বিলেতে বসে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কিভাবে ইউরোপের সমাজে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা এঁটেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে যে দূরত্ব, অনেকেই সেটা অনতিক্রম্য বলে মনে করেন না। বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের পথে অবশ্যই বাধা আছে, সাহিত্যের জগৎকেও যতোটা অবাধগম্য বলে মনে করা হয়, তা নয়, তবে তুলনামূলকভাবে সহজগম্য অবশ্যই। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক ও সম্পূরক ভূমিকা, আমার বিবেচনায় কল্পনা করা সম্ভব, এবং এটা কোনো কষ্টকল্পনা নয়।

এরপর আসে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রশ্ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। করতে পারে, তবে করছে বলা যায় না।

সমালোচনা ও সমালোচকেরও একটি ভূমিকা আছে। সমালোচনার নামে বিস্তর লেখালেখি পত্রপত্রিকায় দেখা যায়, যার সামান্য অংশই ঐ নামের যোগ্য। সমালোচনা বা সম্যক আলোচনার প্রাথমিক শর্ত ব্যাপক সাহিত্যপাঠের পটভূমি, এবং একাধিক উন্নত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। যিনি সাহিত্যরুচির এক উঁচু স্তরে পৌঁছেছেন, তিনিই সমালোচনার অধিকারী। যেমন সাহিত্যে, তেমনি সমালোচনায়, তুষে ও দানায় তফাত করা কঠিন। এবং যে পাঠকের ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সাহিত্যরুচি গড়ে ওঠেনি, তিনি তফাত করতে পারবেন না। সুতরাং সমালোচকের হাত ধরে সাধারণ পাঠক যে এগিয়ে যাবেন, সে পথও প্রশস্ত নয়। তবু সমকালীন সাহিত্যের উৎপাদন-বহুলতার কথা ভাবলে সাধারণ পাঠকের জন্য সমালোচকের সাহায্য দরকার। কি পড়ব, নানা কাজকর্মের ফাঁকে যেটুকু অবসর, সেই সময়টা কোন বই পড়লে একেবারে বৃথায় যাবে না, এই সমস্যার সমাধান দিতে পারেন সমালোচক। তিনি পাঠককে তার প্রাথমিক নির্বাচনে সহায়তা করবেন। সব কবিই যেমন রবীন্দ্রনাথ নন, তেমনি সব সমালোচকই বুদ্ধদেব বসু নন। এখানেও আছে স্তরভেদ। যেমন আছে পাঠযোগ্য (readable) সাহিত্য, তেমনি আছে গ্রহণযোগ্য সমালোচনা। আর গ্রহণযোগ্য সমালোচনা তৈরি করে চারপাশের অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসা সাহিত্যের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার কাজকে সহজ করে দেবেন যিনি, তিনি, সেই সৎ সাহিত্যপাঠক ও সজ্জন সমালোচক, আজকের সাহিত্য-জগতের একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি। তিনি যদি নিজে একজন সৃষ্টিশীল লেখক হন, তাহলে সমালোচনা কর্মে সেটা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে গণ্য হবে। না হলেও ক্ষতি

নেই। 'সজ্জন' শব্দটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যাঁর আগ্রহ ছিদ্রান্বেষিতায়, তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করেন, অপরের বিশেষ কাজে আসেন না। যাঁর ঝোঁক গুণগ্রাহিতার দিকে, তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি থাকতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টিতে তিনিই বড়ো ভূমিকা পালন করেন।

পরিবেশ সৃষ্টির প্রসঙ্গে সবচেয়ে জরুরি বিষয়ে এবার কিছু বলতে চাই। আজকের জগতে বই পড়ার অভ্যাস বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু বই সুলভ, এবং বই পড়ার জন্য বই কেনার প্রয়োজন হয় না—লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়া যায়, এবং যাদের সময় আছে. তারা লাইব্রেরিতে বসেও বই পড়তে পারে। বই পড়ার এতো সুযোগ-সুবিধা অতীতে অকল্পনীয় ছিল। পরিতাপের বিষয়, বাংলাভাষী জগতের ভারতীয় অংশ যেমন বই পড়ায় ও দেশে সবচেয়ে এগিয়ে আছে, আমাদের এই অংশে আমরা প্রায় ততোটাই পিছিয়ে আছি। বিভিন্ন কার্যকারণের যোগে এই দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উপযুক্ত উদ্যম ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়ই এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। এ দেশে যে এতো দিনেও সাহিত্যরুচি দানা বাঁধতে পারেনি, বইকে সুলভ করে, এবং বই পড়াকে সহজ করে, আমরা এর প্রতিকার করতে পারি। সাহিত্যরুচি গঠনের জন্য উপযোগী পরিবেশ গঠনে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে এতক্ষণ আমরা শুধু পাঠকের কথা বলেছি। লেখকের কথা বলিনি। স্বীকার করছি, আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় পাঠক-সাধারণ, যারা সাহিত্যের ভোক্তা; সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরা নন। তবু পাঠাভ্যাসের প্রসঙ্গে লেখকের কথা আসে। দেখা গেছে, বাংলাভাষী জগতের এই খণ্ডে, পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিম থেকে আসা বইয়ের একটা জোর চাহিদা আছে। সস্তা সংস্করণে, বাজে কাগজে, ভুলভ্রান্তিপূর্ণ মুদ্রণে এসব বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়; রেলওয়ে স্টেশনে, স্টিমার ঘাটে এসব বই ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে, ক্রেতার অভাব হয় না। জনপ্রিয় বইয়ের বাজারে বিদেশি বাংলা বইয়ের এই প্রতিপত্তি থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে, নিছক সাহিত্যমূল্যে এই বই আমাদের বইয়ের চেয়ে উন্নত মানের। বস্তুত এই বইগুলির একটা বড়ো অংশ ও দেশের সাহিত্যের নিচু তলার জিনিস। তবে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় বই লেখা হয়, ছাপা হয়, এবং পাঠকসংখ্যাও প্রচুর, সুতরাং ও দেশের জনপ্রিয় বইগুলি এ দেশের বাজারেও পৌঁছে যায়, জনপ্রিয়তার জয়চিহ্ন ধারণ করে। সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে জনপ্রিয় সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, অতীতেও ছিল। সাহিত্য যখন অল্পসংখ্যক পাঠকের গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রায় অনিবার্য নিয়মে সুসাহিত্যের পাশাপাশি এই জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে ওঠে। অবাধ অর্থনীতির দেশে এটা হবে। সাধারণ পাঠকের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং তৈরি বাজারের চাহিদা মিটিয়ে বই লেখার জন্য অনেকে এগিয়ে আসবেন। যাঁরা আসবেন, তাঁরাও সাহিত্যিক নামেই পরিচিত হবেন, অন্তত কিছুকালের জন্য। তবে প্রায়শ তাঁরা

মৌসুমি ফসল ফলাবেন, তার বেশি কিছু নয়। আমাদের এ দেশেও, সাহিত্যের এই সীমিত জগতেও, এই মৌসুমি ফসল ফলানো হয়ে থাকে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র নিম্নমানের সাহিত্যের জন্যই একচেটিয়া ব্যাপার নয়, প্রায় প্রতি যুগেই কিছু মহৎ সাহিত্যিকের ভাগ্যেও জনপ্রিয়তার দেখা মেলে। বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী যেসব দেশে গড়ে উঠেছে, জনসংখ্যার অধিকাংশ যেসব দেশে শিক্ষিত, এবং বইয়ের মুদ্রণ যেসব দেশে পাঠকসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখেই হয়ে থাকে, সেখানে জনপ্রিয় সাহিত্যই শুধু নয়, চিরায়ত সাহিত্যও বিস্তর সংখ্যায় ছাপা হয়, ও তার পাঠকের কমতি নেই। ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশে, রেডিও-টেলিভিশন সত্ত্বেও, পপ কালচারের আগ্রাসী ভূমিকার পরও, সাহিত্যের বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয়নি। পাঠকের সংখ্যা, বইয়ের মুদ্রণসংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। পুরনো ক্লাসিকের চাহিদা বেড়েছে বিস্ময়করভাবে, যে কারণে ক্লাসিকের যেসব অনুবাদে পূর্বপুরুষেরা অভ্যস্ত ছিলেন, তার জায়গায় এসেছে ও আসছে নিত্য নতুন অনুবাদ। পাঠক-চাহিদার মাত্রা ও গুণগত মান থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় : জনপ্রিয় ও নিম্নমানের সাহিত্য শেষ পর্যন্ত সুসাহিত্য, বা চিরায়ত সাহিত্যের গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এরা আপন শক্তিতেই টিকে থাকে।

সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি আমাদের দেশে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, ও বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অবাধ যোগাযোগ। এই তিনটি জিনিসের প্রকট অভাব নিয়ে আমরা চলেছি। যতোটুকু শিক্ষা, যতোটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও যতোটুকু যোগাযোগ, তার মধ্যেই গড়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্যরুচি, তার মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে আমাদের সাহিত্যচর্চা। এর মধ্যেই অগ্রগতির একটা সংবাদ মেলে—অস্বীকার করা যাবে না। তবে বড়ো ধীর, বড়োই অনিশ্চিত এর গতি। এবং প্রায়ই নানা বিতর্কে, নানা অবান্তর প্রশ্নে কণ্টকিত আমাদের যাত্রা। তবে সে প্রসঙ্গ আজকের নয়।

আমাদের সাহিত্যকে অনেক সময়ে নিন্দার্থে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয়। এবং যখন এটা করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এই খেদটাও বেরিয়ে আসে যে, এই সাহিত্য সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে না। এই অভিযোগ বা অভিমানের মধ্যে একটা সত্য আছে, তবে সেটা পুরো সত্য নয়। এটা ঠিক যে, মোটামুটি মধ্যবিত্ত লেখকের হাতেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এবং শ্রেণীগত অবস্থান যার যেমন, তার চিন্তা-ভাবনা-কল্পনায় তার প্রভাব থাকবে। তবে মধ্যবিত্ত হলেই সংগ্রামবিমুখ হতে হবে, বা আমাদের সাহিত্যিকেরা সমাজের মধ্যকার অনাচার-বৈষম্য কিছুই লক্ষ করেননি, আমার অভিজ্ঞতায় তা বলে না। সবাই বলেননি, এবং যাঁরা বলেছেন, সবাই এক ভঙ্গিতে বলেননি, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাবো, আমাদের গল্প-উপন্যাসে আমরা যে সমাজের ছবি পাই, তা এই দুঃখ-দৈন্য-সমস্যা জর্জরিত সমাজেরই ছবি। বরং যে অভিযোগ করা চলে, সে হলো এর অনেকটাই কল্পিত বা বাস্তবতাবর্জিত। দুঃখের গভীরে প্রবেশ করে তার নির্যাসটুকু তুলে আনা বড়ো শিল্পীর কাজ। দুঃখ-দারিদ্র্যের একমাত্রিক

ছবি তুলে ধরায় কোনো কৃতিত্ব নেই, এবং অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে আমরা এই চিত্রই দেখতে পাই।

বাংলাদেশের বুর্জোয়া সমাজ কোনো স্থির বা অনড় সত্তা নয়। এই সমাজের মধ্যে অনবরত ভাঙাগড়া চলছে। কেউ নীচে তলিয়ে যাচ্ছে, কেউ উচ্চবিত্তের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে যেটুকু উত্তেজনা, যা কিছু চলিষ্ণুতা, এই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই তা প্রতিফলিত। সুতরাং আমাদের অধিকাংশ লেখকের শ্রেণীগত অবস্থান তার সমাজদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে, এতোটা আমি মানতে রাজি নই। এবং বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমি এর কোনো সমর্থনও পাই না। যে অপূর্ণতা বরং চোখে পড়ে, সে হলো জীবনের গভীরতর উপলব্ধির অভাব। এর একটি কারণ কি এই যে, আমাদের এই অংশের মধ্যবিত্ত সমাজটা বেশি দিনের নয়, এটা এখনও কেবলই গড়ে উঠছে, দুই পুরুষ ধরে শহরে বাস করছে এমন মধ্যবিত্ত পরিবার প্রায় আঙুলে গোনা যাবে, আমরা এখনো বাস করছি শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী এক অনির্ণীত অস্পষ্ট জগতে, এবং আমাদের চেতনায় এখনো শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্ব চলেছে? শ্রেণী হিসেবেও আমাদের চেতনা এখনও অস্থির ও অব্যবস্থিত? এক কথায় আমাদের এই জায়মান মধ্যবিত্ত সমাজ এখনও যথার্থ মধ্যবিত্ত চরিত্র অর্জন করেনি, এবং এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত গল্প-উপন্যাসে? আমি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তবে প্রশ্নটা প্রায়ই আমাকে নাড়া দিয়ে যায়।

সুজিত ঘোষ

সৌন্দর্যতত্ত্বের অর্থ-নীতি

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সব সময় প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের জীবনাচরণে অর্থনীতির প্রভাবও বহুক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন। এডাম স্মিথের 'দি ওয়েল্‌থ অব নেশান্‌স' প্রকাশের পর থেকেই বিষয় হিসেবে অর্থনীতির গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিষয় হিসেবে অর্থনীতি আন্তর্জাতিক গুরুত্বের স্তরে পৌঁছেছে। বাজার থেকে ক্রেয় ও ব্যবহার্য পণ্যসমূহের ক্রমাগত দাম বেড়ে-চলা ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতির কোনো মূর্ত রূপ নেই। কিন্তু অর্থনীতির বিধি-বিধান নির্ণয়ে নানা তত্ত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, কোনো তত্ত্ব অচল হয়ে যাচ্ছে, কোনো কোনো তত্ত্ব পুনরায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অর্থনীতির কোনো কোনো সূত্র হয়তো কিছুটা বুঝছে, যাঁরা একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করতে চান, তাঁরাও চিন্তায় থাকেন—কোন নিয়ম বা নীতি অর্থনৈতিক নির্মাণে যথাযথ হবে। জোন রবিনসন অবশ্য মনে করেছেন, অর্থনীতির এই দৃঢ় অপরিবর্তিত মতাদর্শের সমাবেশের মধ্যে ভাবনার মূলে কাজ করে জাতীয়তাবাদ—স্বতঃসিদ্ধের মতোই জাতীয়তাবাদের উপস্থিতি বিভিন্ন দেশের আর্থিক দিকনির্দেশক। রবিনসন বলেছিলেন, "Marxism also, though theoretically universalist, had to be poured into national moulds when revolutionary administrations were set up."[১০]

ধরা হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের হাত বদলে জিনিসের দাম তার মূল্যের সমানুপাতিক। কিন্তু মূল্য (value) কিভাবে স্থিরীকৃত হবে? মার্কসের বক্তব্য আমাদের জানা : তাঁর মতে, শ্রমশক্তি (labour power) হল সেই মূল্য। নির্দিষ্ট একটি শ্রম-সময় ব্যয় করে শ্রমিক তার মূল্য উপার্জন করে, কিন্তু তার দাম (price) ঠিক করে নিয়োগকর্তা। এবং শ্রমের মূল্য-পরিমাণের চেয়ে শ্রমিককে শ্রমের দাম দেওয়া হয় কম। শ্রমিকের দামের পরিমাণ তার জীবনধারণের জন্য যে মজুরিটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। শ্রমিকের উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশ নিয়োগকর্তা নিজে রেখে দেয়। এই সূত্রেই মার্কস ধনতন্ত্রবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু অর্থনীতিই আলোচিত নয়, এই প্রসঙ্গে মার্কস একটি নৈতিকতার প্রশ্নও উত্থাপিত করেছেন। তা হল শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের নৈতিকতার প্রশ্ন, এবং তার উত্তরে শোষণের বিরোধিতার প্রসঙ্গ ও প্রস্তাব।

---

[১০] Joan Robinson. *Economic philosophy*, p. 117.

মার্কস মূলত কয়েকটি দর্শনের প্রশ্নের মীমাংসা চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন হেগেল ও ফয়েরবাখের যথাক্রমে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সিদ্ধান্তসমূহের বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনা। কিন্তু দর্শনের পরিসরে দাঁড়িয়ে সেই অবলোকন যথার্থ হয় না। কোনো কিছু দেখতে হলে তার মধ্যে থেকে তাকে দেখা যায় না, বিষয় বা বস্তুটির বাইরে এসে তাকে দেখতে হয়। মার্কস বস্তুবাদের ভূমিটি থেকে দর্শনকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান পুরনো বস্তুবাদের অবস্থান থেকে সরে গেল। তাঁর অবস্থানভূমি হল মানব সমাজ, বা সামাজিকী মানবতা। মানবতার এই সামাজিক রূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রটিকে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের বিচার-বিশ্লেষণ করার ভিত্তিভূমি হিসেবে স্থির করলেন মার্কস।[১১]

কিন্তু সামজিকী মানবকে দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে গিয়েও যে-সীমার মধ্যে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজকে থাকতে হয়, মার্কসকেও সেই সীমার মধ্যেই থাকতে হয়েছে। মানুষ বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির মধ্যে, তার বিকাশ প্রকৃতির মধ্যে থেকেই। কেননা, শুরুতে মানুষ প্রকৃতিরই এক অবিভাজ্য অংশ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ (Laws) পূর্বনির্ধারিত। মানুষ তার চৈতন্য দিয়ে অনুধাবন করেছে বলেই প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে। আপন প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করেছে এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে। মানুষ একদিকে প্রকৃতির সহযোগী, অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতিযোগী। এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক মানুষ নিজেকেও পরিবর্তিত করেছে। সচেতন প্রাণী হিসাবে অন্যান্য প্রাণী ও প্রাকৃতিক মানুষের থেকে মানব স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সচেতনভাবে মানব পার্থিব বস্তুর ও ভূমির উৎপাদনশীলতা ও আপন সৃজনশীলতা উদ্ভাবন করেই, মানুষ প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। ভাবনার এই ধারার জন্যেই শুধু অনুমান, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকল্পভিত্তিক বক্তব্যে মার্কস থেমে থাকেননি। মানুষ যেহেতু উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল, সেহেতু বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেই মার্কস থেমে থাকতে চান নি, বিশ্বকে বদলাতেও চেয়েছেন।[১২]

মার্কস মানুষের অন্তর্গত সৃজনশীলতা অন্য অনেক দার্শনিকের মতোই লক্ষ করেছেন। মার্কসের নিজের সময়ে যেমন মানুষের সৃজশীলতা ছিল, তাঁর আগেও পৃথিবীব্যাপী মানবিক সৃজনশীলতা ছিল—তার বাস্তব রূপ কলকারখানা-শিল্পের (industry) ইতিহাসে রয়ে গেছে। সেই ইতিহাসই মানুষের ক্ষমতার সারাৎসার সাক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে মার্কস মানবমনস্তত্ত্বের কথা বললেন, বর্তমান মানবিক মনস্তত্ত্বের

---

[১১] "The standpoint of the old materialism is 'civil' society; the standpoint of the new is human society or socialised humanity." Marx : Theses on Feuerbach,—The Basic writings on politics and philosophy, K. Marx and F. Engels, ed. L. S. Feuer, p. 245.

[১২] "The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it." (Marx: Theses on Feuerbach. XI.)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনশীলতা ('The perceptibly existing human psychology')। এর আগে মানুষের এই ক্ষমতাকে মানবিক অস্তিত্বের অঙ্গীভূত বা সারাৎসারের অন্তর্গত ভাবা হয়নি। শুধু মানুষের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমশক্তির বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে মানুষের প্রজাতিগত অস্তিত্ব বিভাজিত হয়েছে বহুদিনই। মানুষে মানুষে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রজাতিগত ক্রিয়াশীলতার মানবিক ক্ষমতার বাস্তব সারাৎসার রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্যে বিমূর্ত-সাধারণরূপে বিরাজ করে। কিন্তু সৃজনের পরে মানুষের ক্ষমতার সারাৎসারের বস্তুরূপ (objectified) ইন্দ্রিয়গত, বিচ্ছিন্ন, প্রয়োজনের বস্তুরূপ মানুষ গ্রহণ করে।[১৩]

শ্রেণীসমাজে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটলেও, একটি নৃগোষ্ঠীর ভাষা মূলত একই থেকে যায়। ভাষার মধ্যেই মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব নিহিত থাকে। ভাষার মধ্যেই রয়েছে তার সামাজিক চরিত্র। মানুষের ভাব-ভাবনা তার ভাষা থেকে আলাদাভাবে থাকতে পারে না, ভাষাই তার ভাবনা ও ভাবপ্রকাশের আধার ও আধেয়। একক ব্যক্তির কোনো ভাষা থাকতে পারে না। ভাষা মানেই একাধিক ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান। বিশেষ নৃগোষ্ঠীর ভাষা থেকেই সেই ভাষার সাহিত্যের ভাষারীতি গড়ে ওঠে। লোকশিল্পও ধীরে ধীরে তার মাধ্যমগুলির (মাটি, পাথর, ধাতু ইত্যাদি) মধ্যে দিয়ে একটি বহুজনগ্রাহ্য রীতি খুঁজে নেয়—যেখান থেকে সৃষ্টি হয় শিল্পের 'ভাষা'।

অন্যান্য উৎপাদনের মতো শিল্প সাহিত্যের উৎপাদনও চাহিদা তৃপ্তির উপাদান যোগায়। কিন্তু একই সঙ্গে সৃষ্ট উপাদানের চাহিদাও যোগায়—একটি ছবি বা ভাস্কর্য তৃপ্তির উপাদান হিসেবে শিল্পীর হাত থেকে অন্যের কাছে পৌঁছলে একজনের চাহিদার তৃপ্তি অন্য অনেকের কাছে সেই শিল্প-উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি করে। শিল্প বস্তুর চাহিদা বস্তুটির প্রত্যক্ষণের প্রভাবে অনুভূত হয়। শিল্প বস্তু শৈল্পিক রুচিসম্পন্ন বোদ্ধা জনগণও তৈরি করে, যারা শিল্পের সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম। অন্য উপাদানের মতোই শিল্প সৃষ্টি শুধু বিষয়ী বা শিল্প বোদ্ধার জন্যে একটি বিষয়ের (object) সৃষ্টিই করে না, একই সঙ্গে শিল্প বা বিষয়টির জন্যে বিষয়ী বা বোদ্ধাও সৃষ্টি করে।[১৪]

একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সমাজ, রাজনীতি ও বৌদ্ধিক জীবনের সাধারণ ভিত্তি হল সেই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি। মানুষ সচেতনভাবে আকাঙ্ক্ষা করলেই তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ বা পরিচালিত করতে পারে না। বরং তার অস্তিত্বই তার চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির ওপরে মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি হল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রম-রূপান্তর। আইনি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক, দার্শনিক মতাদর্শগুলি বাস্তব জীবনের বিরোধগুলি সম্পর্কে

---

[১৩] Marx-Engels : Col. Works, vol. 3, pp. 302–03.

[১৪] K. Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, p. 197.

আমাদের সচেতন করে তোলে,[১৫] এবং উপরি কাঠামোগুলি আবার পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

জীবজগতের বাবুই পাখি বা মৌমাছি তাদের সুন্দর বাসা বানায়। কিন্তু তা বংশপরম্পরা ধরে একই রকম বানানো, নিজেদের এবং তাদের শাবকদের জন্যেই নির্মিত—যে প্রজাতির জীব, তার নিজস্ব প্রাকৃতিক চাহিদা ও মান (standard) অনুসারে বানানো, 'Whilst man knows how to produce in accordance with the standard of every species, and knows how to apply everywhere the inherent standard to the object. Man therefore also forms things in accordance to the laws of beauty.[১৬] মার্কস এঙ্গেলস অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে, সুনির্দিষ্ট করে সৌন্দর্যের সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেননি।

উনিশ শতকের শেষভাগে ইওরোপে একটি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সে-আন্দোলনের বক্তব্য ছিল যে সৌন্দর্যের জন্যেই শুধু শিল্পের অস্তিত্ব। তৎকালে প্রচলিত উপযোগিতাবাদী (utilitarian) সামজিক দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় এই মতবাদের সৃষ্টি—শিল্প-কারখানার যুগে সৃষ্ট শিল্পকে এঁরা মনে করতেন কুৎসিত ও হঠাৎ গজানো। এই আন্দোলন ইসথেটিসিজম (Aestheticism) নামে প্রসার লাভ করে। আঠারো শতকে দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে এই আন্দোলনের ভিত্তি নিহিত। কান্ট সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বাধীন স্বশাসিত মানদণ্ডের কথা বলেছিলেন, যে মানদণ্ডে সাহিত্য শিল্পের বিচারে নৈতিকতা, উপযোগিতা বা সুখানুভূতি বিচার্য নয়। এই ভাবনা গ্যোয়েটের মতো কবি-নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল। ইংল্যান্ডে টমাস কার্লাইল, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ, ফ্রানসে তেযোফিল গ্যোতিয়ে, মাদাম দ্য স্টেইল (Madame de Stael) এবং ১৯১৮ সালে ফরাসি দার্শনিক ভিকতোর ক্যুসিঁ (victor Cousin) 'L'art pour L'art,—Art for art's sake শব্দবন্ধটি চয়ন করেন। ইংরেজি সাহিত্যে ১৮৪৮ সাল থেকে প্রির‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুডের কবি-শিল্পীগণ ইসথেটিসিজম-এর প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি, এডওয়ার্ড বার্নস-জোনস, চার্লস সুইনবার্জ প্রভৃতি কবিরা তাঁদের রচনায় সচেতনভাবে এই সৌন্দর্য-তৃষার সঙ্গে মধ্যযুগীয়তাকে (medievalism) মেশালেন। অসকার ওয়াইল্‌ড এবং ওয়ালটার পেটারের রচনাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। বাঙলা সাহিত্যে art for art's sake কথাটি 'কলাকৈবল্যবাদ' নামে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের পরে প্রচলিত হয়। অবশ্য সমকালে এই মত সমালোচনার মুখেও পড়েছিল—উইলিয়াম মরিস এবং জন রাসকিন ছিলেন এই মতের বিরোধী। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক লিও

---

[১৫] K. Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy,* p. 21.

[১৬] K. Marx, The Economic & Philosophic Manuscripts of 1844, ed. Dirk J. Struik, pp. 113–114.

টলস্টয়ও কলাকৈবল্যবাদের বিরোধী ছিলেন—নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টিকে তিনি স্বীকার করেননি।

ইসথেটিক (Aesthetic) কথাটি ইংরেজি-সহ ইওরোপীয় ভাষাগুলিতে শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্যবিচারের তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে, শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে, মূল শব্দটি Aisthetikos—যার গৃহীত ইংরেজি অর্থ : concerned with beauty or the appreciation of beauty।[১৭]

ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সমালোচনায় বিষয়টি অলংকারশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়েছে, এছাড়া ধ্বন্যালোক, কাব্যালোক, কাব্যজিজ্ঞাসা, কাব্যমীমাংসা, রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নামেও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা চলেছে—তা নাটক, কাব্য বা অন্য সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে আলোচনায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বকে নন্দনতত্ত্ব নামে আ্যখায়িত করার ঝোঁক বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে বেশি দিনের নয়। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য সমালোচনায় 'সৌন্দর্যবোধ' 'সৌন্দর্য' শব্দই ব্যবহার করেছেন। সৌন্দর্যবোধের বিষয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।"

"তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য। ... এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়" ('সৌন্দর্যবোধ', পৌষ ১৩১৩, সাহিত্য, পৃ. ৫০-৫১)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনায় মঙ্গল, সত্য এবং সুন্দর শব্দ-তিনটির অর্থকে একাকার করে এক সামগ্রিক অর্থব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন। তাই তিনি কবি কীট্সের 'Ode on a Grecian Urn' কবিতার প্রবাদপ্রতিম চরণটি ('Beauty is truth, truth beauty') নিজের উপলব্ধি মতো Truth is beauty, beauty truth রূপে অদলবদল করে নেন, জোর দিতে চান সত্যের, truth-এর উপলব্ধিতে—যা মূলত সাহিত্যের মঙ্গলবোধ বা হিতবোধের সঙ্গে যুক্ত।[১৮]

---

[১৭] Aesthetics শব্দের গ্রীক শব্দটির প্রতিশব্দ—Anaesthetic (মূল: ANAISTHĒTOS অর্থ : Unconcious, অচেতন। বাংলাভাষায় 'সৌন্দর্যবিজ্ঞান' নামে বিষয়টি নামাঙ্কিত ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৯১৬ খ্রি) চারুচন্দ্র গুহ-র *The Modern Anglo Bengali Dictionary*-তে Aesthetics শব্দের বাঙলা অর্থে 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯৩৪ খ্রি.)-এ শব্দটি গৃহীত হয়নি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯৩৭ খ্রি.) গ্রন্থেও শব্দটি নেই। গৌরীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৯৯ ও *Everyman's Dictionary*-তে Aesthetic-এর প্রতিশব্দ রূপে 'সৌন্দর্যতত্ত্বে'র সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব শব্দটি দেওয়া আছে।

[১৮] প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি ১৯৩২ সালে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্ত র্গত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে ব্যবহার করেছিলেন, 'নন্দনতত্ত্ব' (AESTHETICS) সম্বন্ধে

শিল্প সাহিত্য শুধুই দর্শক-শ্রোতা-ভোক্তার আনন্দদায়ী সামগ্রী ও মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সমালোচকরা দেখেননি। শুধু সুন্দরের অনুসন্ধানও সাহিত্যে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। "কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া—এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার এবং ঐ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণ ফল। ...কবি কীট্স সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কবি-প্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ-সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে।"[১৯] অতুলচন্দ্র গুপ্তও তাঁর এ-বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের মতোই কীটস-এর সুন্দর-সত্যের দ্বৈত-অদ্বৈততার বিপর্যাস ঘটিয়েছেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ভালো লাগায় তা শুধুই কল্পনার হাতে তিনি ছেড়ে দেননি, বলেছেন 'বস্তু নিরপেক্ষ রস নেই'। কিন্তু, রস বা আনন্দকে বস্তুসাপেক্ষ রেখেও অতুলচন্দ্র কাব্য সাহিত্য শিল্পের লক্ষ্য হিসেবে মঙ্গলবোধকেই রবীন্দ্রনাথের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন, "হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। ... এই হিতবাদ, যাঁদের বলে প্রাচীনপন্থী তাঁদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য; আর যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্যবিচারে দু-জনার দৃষ্টিভঙ্গি এক—'যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়'।"[২০] মনে রাখতে হবে, অতুলচন্দ্রের কাব্যজিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত। সমকালীন বিশ্বে ও বঙ্গদেশে সাহিত্যবিচারের যে মতগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই মতামতের কিছু কিছু উত্তরও অতুলচন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রবন্ধগুলিতে উপস্থিত করেছেন, কখনও কখনও কল্পিত পক্ষের উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রেখেছেন। যেমন, অবসরবিনোদনের সাহিত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "অবসর বস্তুটা কেন খারাপ, আর তার বিনোদন কেন দোষের, কাজের লোকের সে প্রশ্ন মনে আসে না। মার্কসপন্থীরা হয়তো বলবে, নিচু শ্রেণী যাতে অসূয়া না করে উঁচু শ্রেণীর জন্যে ভূতের বেগার খেটে যায়, তার অনুকূলেই এই মনোভাবের সৃষ্টি।"[২১]

কিন্তু শিল্প সামগ্রীর একটি বস্তুসাপেক্ষ রূপ আছে—কাব্য-উপন্যাস-চিত্রশিল্প প্রভৃতি সবকিছুর এক বা একাধিক ভোক্তা ও উপভোক্তা থাকে—চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর একটি বিশেষ চিত্রের সৌন্দর্য বহু দর্শক উপভোগ করতে

এজরা পৌন্ড-এর একটি কবিতা আছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। Ezra Pound-এর আলোচিত কবিতাটির নাম 'The Study in Aesthetics'.

[১৯] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্য জিজ্ঞাসা,* পৃ. ৬৮।

[২০] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্য জিজ্ঞাসা,* পৃ. ৭৫।

[২১] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্য জিজ্ঞাসা,* পৃ. ৭৭।

পারেন—শিল্পসংগ্রহশালাগুলি যে শিল্প-নমুনাগুলি দর্শকের জন্যে গ্যালারিতে বিন্যস্ত করে সেগুলি বিনা খরচে বা সামান্য ব্যয়ে, প্রবেশমূল্য দিয়ে দর্শকসাধারণ দেখার সুযোগ পান। ছাপাখানার যুগে ও গণশিক্ষার প্রসারের যুগে কাব্য-কথাসাহিত্যও তুলনায় সুলভ হয়ে গেছে। নাটক ও চলচ্চিত্র সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্যবোধের বিষয়টি সর্বদা সরলরৈখিক বিভাজনে নিয়ন্ত্রিত হয় না, অতুলচন্দ্র 'উঁচুশ্রেণী' ও 'নিচুশ্রেণী'র কথা বলেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে বিদ্যমান সমাজসমূহে এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব তর্কাতীত। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে 'নিচুশ্রেণী'র মানুষই তার অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের বাসনায় তার কাছে অলীক, মায়াময় উঁচুশ্রেণী'র জীবনের ছবিতে তন্ময়।

"রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে বিনা প্রয়োজনের যে আনন্দ তাহাকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সত্যটি এতই সুগৃহীত যে, এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করা অনাবশ্যক। সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র প্রয়োজনবিহীন তাহা নহে, এক হিসাবে তাহা সত্যবিহীন ও ভালমন্দ মর্যাদাবিহীনও বটে। সাধারণত আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, যেমন বৃক্ষলতাদির জ্ঞান বা কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্যের মধ্যে তাদৃশ কোনো জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় না। ন্যায়-অন্যায় বলিতে যে ভালমন্দ আমরা বুঝি তাহাও সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় না অথচ কোনো জ্ঞান বা কোনো ন্যায়-অন্যায়বোধ যেরূপ স্বানুভব সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে স্বানুভববেদ্য। ... সৌন্দর্যের সহিত আনন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, অথচ এ আনন্দ সাধারণ প্রয়োজনসিদ্ধির আনন্দ নয়।"[২২] —অতুলচন্দ্র কাব্যের একটি বস্তুসাপেক্ষ রূপের কথা ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবনিরপেক্ষ কাব্য সাহিত্য এবং তৎজাত সৌন্দর্যের কথা ভাবেননি, বরং বাস্তবের 'বর্ণভেদে'র মধ্যে যে সত্যটা প্রত্যক্ষের উপরেই' ভেসে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে যে সত্য 'অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই' ডুবে আছে—উভয় মিলে কাব্যের সত্যকে বোঝাতে চেয়েছেন।[২৩] সুরেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে a-moral, নীতিসংসর্গহীন ভেবেছেন। কিন্তু সমাজে প্রচল সবকিছুরই রূপের দুটি দিক আছে—একটি দুর্লভ চিত্রকলার ক্রেতা শুধু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপভোক্তা-পৃষ্ঠপোষক নন, একদিকে তাঁর সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার-মূল্য (Use-value) যেমন রয়েছে, শিল্পসম্পদটি নিজের অধিকারে আনার জন্যে তাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিময় মূল্যও (exchange value) দিতে হচ্ছে। সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ স্রষ্টা হয়ে যান বিক্রেতা, শিল্প সাহিত্য রূপ পায় পণ্যে, রূপান্তরিত হয় পণ্যে। শিল্পী সাহিত্যিক যতক্ষণ সৃষ্টি করছিলেন, সৃষ্টির জন্য যে প্রয়োজনীয় শ্রম তিনি ব্যবহার করেছেন—তা তাঁর মেধা, মনন, হাত এবং মস্তিষ্কের সহযোগে কাগজ, কালি, কলম, ধাতু, মাটি, পাথর—ইত্যাদি বাস্তব উপাদানের সহায়তায় সৃষ্টি হয়েও তা হয়ে উঠতে পারে অনুৎপাদক শ্রম (Unproductive labour)। মিলটন তাঁর

---

[২২] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *সৌন্দর্যতত্ত্ব*, পৃ. ৫-৬।
[২৩] রবীন্দ্রনাথ, "সৌন্দর্যবোধ," *সাহিত্য*, পৃ. ৩৬।

প্যারাডাইস লস্ট কাব্যটি লিখেছিলেন, পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ—মিলটনের এই শ্রম অনুৎপাদক শ্রম। কিন্তু প্রকাশকের নির্দেশে বা তত্ত্বাবধান-পৃষ্ঠপোষকতায় দিস্তা দিস্তা সাহিত্য কারখানা-উৎপাদনের ধরনে যিনি লিখে যান, তাঁর শ্রম উৎপাদক শ্রম (Productive labour)। একটি গুটিপোকা তার নিজের চারপাশে রেশম বোনে—এই বুনন তার স্বভাবের কাজ। মিলটনও গুটিপোকার মতো কবিস্বভাবের অনিবার্যতায় প্যারাডাইস লস্ট লিখেছিলেন এবং নিজের শ্রমের এই উৎপন্নটি পাঁচ পাউন্ডে বিক্রি করেছিলেন। একজন যখন নিজের জন্যে গান বিক্রি করছে, নিজে গান গেয়ে পয়সা চাইছে, তখন তার শ্রম অনুৎপাদক শ্রম, কিন্তু কোনো প্রযোজক বা কোম্পানির উদ্যোগপতির ব্যবস্থায় টাকা করার জন্যে যখন সে গান গাইছে, তখন তা উৎপাদক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত—যদি লক্ষ্য হয় মূলধন বাড়ানো—তা উৎপাদক শ্রম।[২৪] উৎপাদক শ্রম শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পীসাহিত্যিকের শিল্পের বাজারে মূলধন বাড়ানোর ক্ষমতার নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলি ও সমগ্র রচনায় যে শ্রম করেছিলেন তা অনুৎপাদক শ্রম, কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন তাঁর সৃষ্টিকে বাজারজাত করল, তখন তা উৎপাদক শ্রমের নমুনা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, জনপ্রিয়তা তথা বিক্রি রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাসের চেয়ে বেশি ছিল। সেই সব উৎপাদক শ্রমে সৃষ্ট কথাসাহিত্য সে সময়ে বইবাজারের মূলধন গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে অবসিত হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মরণোত্তর খ্যাতি লাভের বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু জীবৎকালে তাঁর শিল্পসৃজন অনুৎপাদক শ্রমেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—শিল্পীকে কোনো বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তা দেয়নি। শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা, প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমার্থক নয়। যে কোনো উৎপাদনই শুধু আমাদের চাহিদা পূরণের উপাদান (material) যোগায় না, একই সঙ্গে সেই উপাদানের চাহিদাও সৃষ্টি করে। উৎপাদন আদিম মৌলিক অসংস্কৃত এবং তাৎক্ষণিক ভোগের থেকে বেরিয়ে এল। এই অবস্থা বেশ কিছুদিন বহালও ছিল, যেহেতু উৎপাদন তখনও ছিল আদিম অসংস্কৃত—বিষয়ের (object) ইচ্ছাতেই যেন উৎপাদন হল। বিষয়ের জন্য চাহিদার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি বিষয়ীর ইন্দ্রিয় চেতনা দ্বারা আবিষ্ট হল। একটি শিল্পবস্তু এমন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যারা শিল্পকে আস্বাদ করতে ও সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে সক্ষম। শিল্পসৃষ্টি শুধু শিল্পবোদ্ধার জন্যে একটি শৈল্পিক বিষয় বা শিল্পবস্তুই সৃষ্টি করে না, শিল্প-বিষয়ের জন্যও বিষয়ী (Subject) তথা শিল্পবোদ্ধাদের সৃষ্টি করে।[২৫]

মানবের হাত শুধু শ্রমের জন্য ব্যবহার্য প্রত্যঙ্গ নয়, শ্রম থেকেই মানুষের হাতের এই বিকাশ—শ্রমের জটিল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই মানবের হাত অতি উঁচু

---

[২৪] Karl Marx, *Theories of Surplus-Value,* pt. I, p. 401.

[২৫] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy,* p. 197.

স্তরের উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে, যে মানবিক হাত র‍্যাফায়েলের (১৪৮৩-১৫২০)-এর মতো চিত্রশিল্পী, পেগানিনির (১৭৮২-১৮৪০) মতো একজন বেহালাবাদক ও সুরকারের সৃষ্টি করেছে।[২৬]

সৌন্দর্যের সূত্রগুলি (Laws of beauty) অনুসরণ করতে পারলেই সৌন্দর্য উপভোগের প্রয়াস সম্ভব। অবশ্য, সৌন্দর্য উপভোক্তার রুচি ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল। রুচি ব্যক্তির নিজস্ব অর্জন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্য গোষ্ঠীর চেতন-অবচেতন-অচেতনের দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষয়-বিলয়ের অবশেষে সঞ্চিত রিক্‌থ, যা উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিতে অর্শায়। কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ বিচারে নানা মত প্রাপ্তব্য। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মত বিচারে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সৌন্দর্যমলংকারঃ।—কাব্য অলংকারবশতই গ্রহণীয় হইয়া থাকে, এবং সৌন্দর্যই অলংকার। কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ কি? সৌন্দর্য (beauty) এমন এক প্রকার তত্ত্ব যাহাকে কোনোরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সৌন্দর্য দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে রুচিভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে। সৌন্দর্যের কোনো শাশ্বত স্বরূপ নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।"[২৭]

এ বিষয়ে প্লেখানভের উক্তি প্রাসঙ্গিক : "... an alesolute criterion of beauty, there is no such criterion. Everything is in movement, everything is changing. And men's conception of beauty change too ... Men's conception of beauty undoubtedly change in the course of history. But while there is no absolute criterion of beauty and while all criteria are relative, this is far from implying that we have no objective possibility of judging whether or not a given artistic conception is well realised. ... The more the realisation of a concept—or to put it in more general terms—the more the form of a work of art corresponds to its idea, the more successful it is. There is your objective criterion. ... when Leonardo da Vinci drew an old man with a beard, for example, it did turn out an old man with a beard. And how well he succeeded! ...To draw an old man with a beard beautifully does not mean to draw something which is beautiful, i.e. a handsome old man. The field of art is far wider than the sphere of 'The beautiful.' The criterion I have given, that of the correspondence of the form to the idea, may be used with equal facility throughout this broad field."[২৮]

বোসাঙ্কির মতে সমস্ত সুন্দরই ইন্দ্রিয়গত বা কল্পনার ('All beauty is in perception or imagination.') যখন প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্যের এলাকাটির পার্থক্য দেখাতে চাই তখন মানবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে সৌন্দর্যকে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে দেখি না। অচেতনভাবে হলেও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সমঝদারিত্বের

[২৬] F Engels, *Dialectics of Nature,* 171–172.

[২৭] বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কাব্যমীমাংসা,* পৃ. ২৭।

[২৮] G. V. Plekhanov, *Art and Social Life,* pp. 240–242.

এক স্বাভাবিক বা গড়পড়তা ক্ষমতার দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু যদিও প্রকৃতি ও শিল্প—উভয়ই মানুষের ইন্দ্রিয় বা কল্পনার মাধ্যমেই অনুভববেদ্য, কিন্তু প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অচিরস্থায়ী, সাধারণভাবে উপস্থিত গড় মানুষের ভাবনাজাত, কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য, বোসাঙ্কির মতে স্থির এবং প্রতিভার উচ্চতর স্বজ্ঞায় সৃষ্ট, যে প্রতিভা নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে।[২৯] কিন্তু এ প্রসঙ্গে মানুষের সংবেদন বা বাস্তবকে পরিবর্তনের কথা বোসাঙ্কি বলেননি। এবং স্বজ্ঞা বা intuition-এর ওপর জোর দেওয়ায় শিল্পীর সামাজিক সত্তাটি যথার্থ গুরুত্ব পায় না।

সান্টায়ানা 'সৌন্দর্য'কে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন, "...beauty is value positive, intrinsic and objectified. ... Beauty is pleasure regarded as the quality of a thing ... it is an emotion, an affection of our volitional and appreciative nature. An object cannot be beautiful if it can give pleasure to nobody : a beauty to which all men were, forever indifferent is a contradiction in terms."[৩০]

সান্টায়ানার বক্তব্যে সৌন্দর্যের বিষয়গত (objectified) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের স্বীকৃতি রয়েছে।

বাঙালি দর্শনবেত্তা ভাববাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পবিচার করেছেন, তিনি লিখেছেন, "রূপ কখনো আকার বা আকৃতি, কখনো প্রকার বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত। দৃশ্য বা অদৃশ্য সবকিছুরই একটি বা একাধিক রূপ আছে। রূপ-এর নিকটতম ইংরাজী প্রতিশব্দ ফর্ম। রূপ কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কখনো বুদ্ধিগ্রাহ্য। অধিকাংশ সময়ে রূপ উভয়বৃত্তি গ্রাহ্য; শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে তো বটেই। রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি শিল্পবস্তুর মুখ্যত বিষয়সত্তাকেই প্রকাশ করে এবং গৌণত তার অর্থের, তাৎপর্যের বা ব্যঞ্জনার দিকটিকে অস্ফুটভাবে প্রকাশ করে। বস্তুত দুটি দিক একইসঙ্গে আমাদের মনের কাছে উপস্থিত হয়।"[৩১] এবং সৌন্দর্য রুচি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রবর্তনা পায়। রুচি ব্যক্তিগত একক মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত হয়েও ঐতিহ্যের দ্বারা সীমায়িত। ঐতিহ্য অবস্থা বিশেষে উভয়ত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে—ঐতিহ্যের আধারেই শিল্পরূপের বিভিন্ন রূপগুলি (Forms) গড়ে ওঠে। আবার স্থিতিবাদের দিক থেকে ঐতিহ্যের বন্ধনের আবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ বেশি করে করা হয়, ফলে নিরন্তর গতির চলিষ্ণুতার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একই শিল্পরূপের ইতিহাসে তাই বারে বারে ঐতিহ্য ভাঙার প্রয়াসও দেখা যায়। সৃষ্টি হয় একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, যা সৃষ্টিরই পূর্বশর্ত।

---

[২৯] Bernard Bosanquet, *A History of Aesthetic,* p. 3.

[৩০] George Santayana, *The Sense of Beauty,* p. 43.

[৩১] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *রূপ, রস ও সুন্দর*, পৃ. ১৮৩।

শিল্পীর কাছে সত্য বা সুন্দর কোনো প্রবর্তনা (persuasion) বা শুধু প্রতীতি নয়, বরং শিল্পের মধ্যে সত্য বা সুন্দরকে রূপায়ণ শিল্পীর কাজের সৃষ্টির পথ প্রদর্শক। প্রবর্তনা পথ দেখায় না, তা সৃষ্টিকর্মে প্রবর্তনা দিতে পারে। শিল্পের হয়ে-ওঠা বা ভিন্নভাবে গড়ার জন্যে চাপ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে ভাষার দুটি মেরু বলে গণ্য করলে, ভাষার অন্যতম কাজ হল প্রবর্তনা। আমাদের আবেগসমূহের বিন্যাসের সামাজিক বিশ্বজনীনতার তীব্র হৃদয়দ্রাবী সংবেদনাই সৌন্দর্য।[৩২] সুতরাং শিল্পীর কাছে সৌন্দর্য শুধু কতকগুলি বিমূর্ত আকার বা ব্যাখ্যা নয়, বরং প্রকৃতি ও মানবকে হৃদয়ঙ্গম করে, শিল্পমাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব—উভয়কেই পরিবর্তিত করা। শিল্পীর এই স্ব-ক্ষমতার দিকটিই প্রকাশিত ক্লাইভ বেল-এর কথায়, "For art is the one religion that is always shaping its form to fit the spirit, the one religion that will never for long be fettered in dogmas. It is a religion without priesthood; and it is well that the new spirit should not be committed to the hands of priest. The new spirit is in the hands of artists; that is well."[৩৩]

এই চৈতন্য বা প্রাণসত্তাকে (spirit) মার্কসই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ধারণায় সূত্রাবদ্ধ করলেন, প্রাণসত্তাগত (spiritual values) মূল্যসমূহ আসলে রাজনৈতিক হাতিয়ার। প্রতিটি চৈতন্যগত সৃষ্টি, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ধারণা, বাস্তবের প্রতিটি চিত্রায়ন সত্যের একটি বিশেষ দিক থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সামাজিক স্বার্থের একটি প্রেক্ষিত থেকেই দেখা সম্ভব। এবং সে কারণেই তা সীমাবদ্ধ ও বিকৃত।[৩৪]

শিল্প সাহিত্যে বাস্তববাদ (Realism) 'সিভিল' সমাজের এই সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্পসাহিত্যকে বিকৃতরূপ দেওয়ার বিরুদ্ধতা করেছিল। এঙ্গেলস মনে করেছিলেন, বাস্তববাদ বলতে সূক্ষ্ম বিবরণগত যথার্থতা থাকা ছাড়াও বিশেষ অবস্থার মধ্যে প্রতিভূস্থানীয় চরিত্রগুলি যথাযথ সৃষ্টি করা। শিল্পীর চৈতন্যের অবস্থান তার শ্রেণী অবস্থানের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। যে শিল্পীর বড় সার্থক বাস্তবধর্মী শিল্পীমন আছে, তিনি শ্রেণীসমাজের খণ্ডিত চৈতন্যকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। এঙ্গেলস সেই শৈল্পিক ক্ষমতা দেখেছিলেন বালজাকের মধ্যে।[৩৫] আপন কাল-সহ আগামী কালের মানুষগুলিকেও দেখতে পাওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই শিল্পীর বাস্তববোধের পরিচয় নিহিত থাকে। তারাশঙ্করের একাধিক গল্পে-উপন্যাসেও আমরা এই শৈল্পিক বাস্তবতার প্রকাশ দেখি। তাই, লেখকের মতামত যতই চাপা থাকে, শিল্পকৃতির দিক থেকে ততই ভালো। সে বাস্তবতা লেখকের মতামত যাই হোক না কেন—তবুও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। (The more the

---

[৩২] C. Caudwell, : *Illusion and Reality,* p. 157.

[৩৩] Clive Bell, *Art,* p. 278.

[৩৪] Arnold Houser, *The Philosophy of Art History,* p. 7.

[৩৫] Engels to Margaret Harkness, April, 1888, in Marx and Engels, *Selected Correspondence,* Moscow.

opinions of the author remain hidden, the better for the work of art. The realism I allude to may crop out even in spite of author's opinion."—Engels)।

যে কোনো শিল্প বাস্তববাদী হয়েও তা বস্তু বা বাস্তবের শুধু অনুকরণ নয়। শিল্পীর প্রেক্ষণ ও সৃজনশীল কর্ম বাস্তবের রূপায়ণকে শৈল্পিক সৃজনসূত্রে স্বশাসিত, autonomus করে তোলে। উপকরণ হিসেবে প্রকৃতি ও সমাজ থেকেই শিল্পের রসদ শিল্পীর কাছে আসে। শিল্পের একটি বড় ক্ষেত্র হল মানুষ : নরনারী, বহুক্ষেত্রে নারীর সৌন্দর্য। নরনারীর দৈহিক রূপের প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণ তার প্রবৃত্তির অন্তর্গত। কিন্তু যে কোনো জৈব সৌন্দর্য, যা প্রত্যক্ষ, তা অচিরস্থায়ী—উপন্যাসে বর্ণিত কোনো সুন্দরী নায়িকা সেক্ষেত্রে চিরস্থায়ী এবং শিল্পী যখন মানবকে নিয়ে সুন্দর বা সুন্দরী রূপে ফুটিয়ে তোলেন, তখন সেই মানব বা মানবী আদর্শের (model) কালে কালে ক্ষয়-লয়-বিলয়ের ঊর্ধ্বে। কোনো শিল্পীর হাতে যে অ-সাধারণ সুন্দরীর পোট্রেট আঁকা হয়, কালে কালে সে-নারী জরাগ্রস্ত গতাসু।[৩৬] নরনারীর মিলনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাৎক্ষণিক আনন্দ যখন ভাস্কর্যে[৩৭] প্রতিফলিত তা এক চিরস্থায়ী বৌদ্ধিক আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারে। লোলচর্ম বৃদ্ধা ইন্দিরঠাকরুণ তাঁর সমস্ত মানবিক সংবেদন নিয়ে উপন্যাসে চলচ্চিত্রে চিরস্থায়ী রূপে থেকে যান। প্রতিটি মানুষ একাধারে ব্যক্তি এবং প্রজাতি বা গোষ্ঠীর প্রতিভূ। শিল্পী যখন মানবসৌন্দর্য ফোটাতে চান তখন তার কালে স্থিত সমাজবাস্তবের গোষ্ঠীগত সৌন্দর্যের 'ভাষা'র সারাৎসারকেই ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তা চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

সিভিল সোসাইটি, তা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ—যে অভিধায় পরিচিত হোক, সিভিল সমাজ নতুন মানব সমাজ ('human society or socialised humanity') নয়। সেখানে বাস্তবে মানবপ্রজাতি শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিতে ভাগ হয়ে গেছে। অবাধ বাণিজ্যিক (laissez faire) প্রতিযোগিতা সবকিছুই পণ্যে পরিণত করে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্যে মতাদর্শের সমগ্র উপরিকাঠামোটিকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত বিরোধের দ্বান্দ্বিকতায় স্থিতাবস্থার প্রতিবাদী রূপও অবয়ব লাভ করে। ফলে, ধনতান্ত্রিক শ্রেণী আধিপত্য দুর্বলতর জাতি-গোষ্ঠীকে ছোট করে দেখাতে চায়। গল্পে উপন্যাসে চিত্রায়নের ক্ষেত্রেও বিজয়ী জাতি বুদ্ধিতে, চেতনায় শ্রেষ্ঠতর বলে চিত্রিত হয় এবং একই ভাবে প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতায়নের মাৎস্যন্যায়ে বেশি শক্তিধর তুলনামূলকভাবে অবস্থিত দুর্বলের ওপর আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠে—মানব সমাজের সামগ্রিকতার অর্ধেক যে নারী—তাকেও শুধু দুর্বল, ভোগ্য ও

---

[৩৬] অতুল বসু অঙ্কিত রাণু মুখোপাধ্যায়ের পোট্রেট স্মরণ করা যেতে পারে।

[৩৭] পাথর মৈথুনে অপারগ। খাজুরাহের ভাস্কর্য দেখে বৌদ্ধিক নয়, যারা শরীরী উত্তেজনা বোধ করে, তারা চিকিৎস্য—কীটপতঙ্গ পশুপাখির মিলনও তাদের উত্তেজিত করতে পারে।

সন্তানউৎপাদক হিসেবে চিত্রিত হতে দেখি। যা কেবল ব্যক্তিগত, তার ওপরেই পবিত্রতার মোহর এঁকে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘ্য পবিত্রতার ধারণার সঙ্গেই আসে নারীকে সম্পত্তি হিসেবে দেখার প্রবণতা। সম্পদ ও সম্পত্তিঘটিত বিরোধ থেকে সংঘটিত হয় অসংখ্য ধরনের অপরাধ—তৈরি হয় অপরাধ-আশ্রয়ী 'সাহিত্য', অপরাধজগতের ভাষা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সব শিল্পীর সংবেদনা বাস্তববোধে আজ ও আগামীকে উপলব্ধি করে সৃজনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন, তাঁরাই শোষক-শোষিত বিচ্ছিন্ন মানবতার নকল সীমান্ত অগ্রাহ্য করে গড়ে তোলেন এক একটি স্থায়ী সৌন্দর্যের রূপ—দামিনীতে, শ্রীবিলাসে, এলায়।

১৯১৭-র নভেম্বরে লেনিন বলশেভিক পার্টির নামে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যত বিনা রক্তপাতে হাতে তুলে নিলেন। রয়টার খবর দিয়েছিলেন জারকে সরিয়ে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত মাত্র একজনের মৃত্যু হয়েছিল।[৩৮] কিন্তু, গৃহযুদ্ধ ও বাইরের আক্রমণ, নিউ ইকনমিক পলিসি ধীরে ধীরে লেনিনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জাতি-রাষ্ট্রের (National State) দিকে ঠেলে দিয়েছিল—যে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাতি-রাষ্ট্রকে সহায়তা না দিতে প্রলেতারিয়েতদের ডাক দিয়েছিলেন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুলেছিলেন! দুনিয়া কাঁপানো দশদিনের উত্তেজিত উদ্দীপনার দিনগুলিতে বলশেভিক পার্টি ও প্রলেতেরিয়েত শ্রেণীর সমীকরণ ঘটেছে বলে ভাবা হল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ওপর ভেতর ও বাইরে থেকে সশস্ত্র ও মতাদর্শগত চাপ শোষিত শ্রেণীর ওপরে আঘাত বলে মনে করা হল, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে লেখক শিল্পীদের সংঘবদ্ধ করা হল—প্রথমে প্রলেট-কাল্ট, পরে ১৯৩৪ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার (socialist realism) কথা বলা হল।[৩৯] শ্রমজীবী মানুষের কথা বলতে গিয়ে এ্যাজিট-প্রপ (agitation-propaganda)-এর ক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্যকে দেখতে চাওয়া হল। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কাব্যের ক্ষেত্রে কিছু কবি-সাহিত্যিক এই নতুন পরিবর্তনকে প্রায় প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেননি, যেমন কবি আন্না আখমাতোভা ১৯১৯ সালে সোভিয়েত দেশে থেকেই লিখলেন :

> æWhy Is This Age Worse ...?"
> Why is this age worse than earlier ages?
> In a stupor of grief and dread
> have we not fingered the foulest wounds
> and left them unhealed by our hands?

---

[৩৮] Christopher Hill, *Lenin and the Russian Revolution.*

[৩৯] (A) Soviet Writers' Congress, 1934, "The Debate on Socialist Realism and Modernism," *Gorky, Radek, Bukkharin, Zinoviev and Others*, 1977, Lawrence and Wishart, London; (B) A. A. Zhdanov, *On Literature, Music and Philosophy*, 1950, Lawrence and Wishart, London.

In the west the falling light still glows
and the clustered housetops glitter in the sun,
but here Death is already chalking the doors with crosses,
and calling the ravens, and the ravens are flying in.
(Anna Akhmatova : Selected Poems, 1992, Harvill)

১৯১৯ সালের রাশিয়ায় উদ্দীপনাময় কর্মকাণ্ডের মধ্যে আখমাতোভা পশ্চিম ইওরোপকে সূর্যালোকে ঝকমক করতে দেখেন এবং সেই সময়ের রাশিয়ায় ক্ষুধার্ত কুচকুচে দাঁড়কাক উড়তে দেখেন। পশ্চিম ইওরোপেও টি. এস. এলিঅটের মতো কবি তাঁর বিখ্যাত The Waste Land কবিতায় লিখলেন

There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From the door of mud cracked houses ...
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air.
(The Waste Land : Sec. V, What the Thunder said, p. 72–73
The Complete Poems and Plays: T. S. Eliot Faber, 1982.

এবং এই কবিতার কবিকৃত টীকায় এলিঅট এই কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে পূর্ব ইওরোপ তথা রুশ বিপ্লবের বিশৃঙ্খলার (chaos) কথাই বললেন।[৪০] The Waste Land রচিত হল ১৯২১ সালের শেষ থেকে ১৯২২ সালের বসন্তকালে এবং The Criterion পত্রিকায় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে The Waste Land এলিয়টকে কবি হিসেবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আখমাতোভার কবিতাটি এলিঅটের উদ্ধৃত কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলি কাব্যব্যাঞ্জনার চেয়ে সোচ্চার। ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে রাডেক এলিঅটের এবং ঝানভ আখমাতোভার সমালোচনা করেন। রুশ বিপ্লব ইওরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপ্লবের পক্ষে-বিপক্ষে এক স্পষ্ট বিভাজনরেখা টেনে দিয়েছিল এবং সেই বিভাজনরেখার একপারে প্রগতিপন্থীরা অনেকেই এঙ্গেলসের "Realism, to my mind implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances. ... The more the opinions of the authors remain hidden, the better for the work of art."[৪১] কথাগুলি স্মরণে

---

[৪০] A. L. Morton, *The Matters of Britain, T. S. Eliot*, p. 155–166.

[৪১] পূর্বোক্ত মার্গারেট হার্কনেসকে এঙ্গেলস-এর পত্র, ১৮৮৮ সাল।

রাখেননি বা সাহিত্যশিল্পে বাস্তবায়িত করতে পারেননি, লেখকের মতামত চাপা থাকার (remain hidden) শিল্পোৎকর্ষের বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু সকলেই যে বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা নয়। পূর্বোক্ত ১৯৩৪ সালের রুশ লেখক সম্মেলনে নিকোলাই বুখারিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "... it is obviously necessary somehow to differentiate the special properties of poetic speech, of poetic language and of the corresponding poetic thought, because thought is firmly and indissolubly linked up with language. Ancient Hindu poetics had already developed the Anandavardhana doctrine (tenth century B.C.)[42] of the twofold, 'hidden' meaning of poetic speech. According to this doctrine, language in which words are used solely and exclusively in their direct, 'customary' sense cannot be called poetic speech. Whatever such speech may convey, it will be prose. Only when the words, by various associations evoke other 'pictures, images, feelings', when 'poetic thoughts glimmer, radiate, as it were, through the words of the poet, but are not expressed directly by him', do we have authentic poetry. Such is the doctrine of the 'dhvana', of the poetic innuendo of the hidden meaning of poetic speech."[৪৩]—কাব্যের সাহিত্যের শিল্পের ভাবপ্রকাশে এই "hidden meaning" তথা ব্যঞ্জনার গুরুত্ব শিল্প প্রবক্তারা সাধারণভাবে বুঝতে চাননি। বিশেষ করে স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাগত মুহূর্তে সমগ্র ইওরোপের সাহিত্য শিল্পভাবনায় আসে জটিলতা, বিষয় ও আঙ্গিকে নানা নিরীক্ষা, প্রকাশে নানা দ্বিধা, তাৎক্ষণিকতা, সিভিল সমাজ নয়, মানব সমাজ সৃষ্টির প্রয়াসে স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত সচেতন গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের সমাবেশ ঘটেছিল। যথার্থ মানব সমাজ গঠনের প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বহু মানুষের মতো প্রাণ উৎসর্গ করেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল। এবং স্পেনে গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে লিখিত হয়েছিল 'Beauty' নামে প্রবন্ধ, যার উপশিরোনামে ছিল "In a society which is based on co-operation not on compulsion, and which is concious, not ignorant of, necessity, desires as well as cognitions can be socially manipulated as part of the social process. Beauty will then return again, to enter conciously into every

---

[৪২] অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "আনন্দবর্ধন সম্ভবত খ্রীস্টিয় নবম শতকের মধ্যভাগের লোক।" *কাব্যজিজ্ঞাসা*, পৃ. ৪। এবং 'dhvana' শব্দটি মুদ্রণের ভুল মনে হয়, হবে 'dhvani' ধ্বনি।

[৪৩] Nikholai Bukharin, *Poetry, Poetics and the Problems of Poetry in the U.S.S.R in Soviet Writers' Congress 1934*, p. 188. Lawrence and Wishart, London 1977.

part of the social process. It is not a dream that labour will no longer be ugly, and the products of labour once again beautiful."[88]

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সঙ্গেই ইওরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানে রাশিয়াকেও, জোন রবিনসনের ভাষায়, 'revolutionary administration'-কেও বাধ্য করল শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য মতাদর্শের ক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদী ছাঁচে চলতে। শিল্প সাহিত্যও শেষ বিচারে এই ছাঁচেই ঢালাই হতে থাকে। এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চলতে থাকা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামগুলি অনিবার্যভাবে জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে, যা দেশে দেশে সিভিল সমাজ গড়ে ধনতন্ত্রের দিকে আগুয়ান। শুধু মার্কসের নয়, রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবাদী নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবসমাজ এবং সেই সমাজের সৌন্দর্যতত্ত্ব অপেক্ষিত এখনো।

---

[88] Christopher Caudwell, "Beauty," *Further Studies in a Dying Culture*, p. 115, The Bodley Head, London, 1974.

হাসানুজ্জামান চৌধুরী

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক কালের এক প্রবল ও বহুল উচ্চারিত শব্দ হলো বিশ্বায়ন। এর নির্মাতা ও প্রবক্তাদের প্রচারগুণে এটা একালের এক নির্দোষ, নির্বিরোধী ও সর্বকল্যাণকর বিশ্ববিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। এ সত্ত্বেও এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিশ্বায়নের ধারায় বস্তু-ব্যক্তি-জ্ঞান-তথ্যের বৈশ্বিক সচলতা বিশ্ব পরিসরে ন্যায়পরতা-সহযোগিতা-সংহতি-সমৃদ্ধি যতটা বৃদ্ধি করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে শোষণ-বৈষম্য-সংঘাত-স্বার্থান্ধতার বিস্তার। মূল বৈশিষ্ট্যে পুঁজিবাদের পূর্ণতার রূপও তার সমার্থক হলেও, একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের কেবল পূর্বগামীই নয় বরং বহুগুণে প্রাচীন। বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বিস্তার এবং এমনকি বহিঃসম্প্রসারণ ব্যতীত যেমন পুঁজিবাদী যুগের কথা ভাবা যায় না, তেমনি সেসব ব্যতিরেকে কোন প্রাচীন সভ্যতার কথাও বলা যায় না। এদিক থেকে ঐসকল সভ্যতাও ছিল বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেমনটা বৈশ্বিক বর্তমান পুঁজিবাদ, যদিও স্বকীয় বিকাশের মাত্রা ও শক্তি অনুপাতে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বহুগুণে বেশি সার্বত্রিক, সংহত, আগ্রাসী ও আধিপত্যশীল। সকল প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তি ও অবস্থান প্রাচ্যে হওয়ার কারণে আদি বিশ্বায়নের ভরকেন্দ্রও ছিল প্রাচ্যে। পরবর্তী কালে বিকশিত পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিশেষত গ্রিকো-রোমান সভ্যতার মূলও আফ্রো-এশীয় সভ্যতার পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিহিত ছিল বলে পাশ্চাত্যের গবেষকগণ ব্যক্ত করেছেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাথে বিশ্বায়নের ভরকেন্দ্র পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে এবং অবশেষে আজকের প্রবল পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের রূপ পরিগ্রহ করে। এই বিশ্বায়নের সূচনা পর্বে এর সাথে বাংলাদেশ জড়িত হয়েছিল এক অনন্য ভূমিকায়, আবার তার পরিণত পর্বে তার ভারবাহী "বাহন ও ভূমি" রূপেও তার সাথে যুক্ত হয়েছে অনুরূপ অনেক দেশের মত। বিশ্বায়নের গতিবিদ্যা ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের মত দেশগুলির অস্তিত্বের সংকট মূলত এক গ্রন্থিবদ্ধ বাস্তবতা। এর স্বরূপ ও শর্তগুলি উদ্ঘাটন এক অনুপেক্ষণীয় চ্যালেঞ্জ।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন অথবা সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরকে লেনিন আখ্যায়িত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে। সাম্প্রতিক বিশ্বায়নকে তার স্বকীয় বিরোধ-বৈরগ্রস্ততা ও সন্ত্রাস-সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর বললে হয়ত ভুল হবে না। পাশ্চাত্যে

আধুনিক পুঁজিবাদের উন্মেষের সাথে যে নতুন ধারার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল মার্কস তার সমুদয় কৃতিত্ব দিয়েছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে। মধ্য-উনবিংশ শতকে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, "নিজ উৎপন্নের জন্য একটি নিরন্তর সম্প্রসারণশীল বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়া শ্রেণীকে পৃথিবীর সর্বত্র তাড়িয়ে বেড়ায় ... দেশীয় উৎপাদন দ্বারা মেটে এমন চাহিদাদির স্থলে আমরা দেখি নতুন চাহিদা যেগুলি মেটানোর জন্য দরকার হয় দূর দেশ ও পরিবেশের উৎপন্ন সামগ্রী। পুরাতন স্থানীয় ও জাতীয় স্বয়ম্ভরতার স্থলে, সকল দিকে ঘটে বিচরণ, জাতিসমূহের বিশ্বজনীন পরস্পর নির্ভরশীলতা ... নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয় জাগিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী সকল জাতিকে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালীকে গ্রহণ করে নিতে; বুর্জোয়ারা যাকে বলে সভ্যতা সেই বস্তু নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করতে তারা জাতিসমূহকে বাধ্য করে ... ঠিক যেভাবে এই শ্রেণী গ্রামকে করেছে শহরের উপর নির্ভরশীল, সেভাবেই এটা বর্বর ও অর্ধ-বর্বর দেশগুলিকে নির্ভরশীল করেছে সভ্যগুলির উপর, কৃষকবহুল জাতিগুলিকে বুর্জোয়া জাতিগুলির উপর, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের উপর।" (Marx and Engels (1), 1962 : 37-38)। মার্জিত ভাষায় এটাই এখন বিশ্বায়ন—জাতিসংঘের কথায়, 'জাতীয় সীমানাগুলি অতিক্রম করে বস্তু-সামগ্রী, সেবা, জনগণ ও তথ্যের মুক্ত চলাচল।' আবার এটাকে যুগপৎ একটি 'বর্ণনা' ও 'ব্যবস্থাপত্র' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ঃ বর্ণনারূপে এটা হলো একটি একক বৈশ্বিক বাজারে বাণিজ্য, অর্থ ও তথ্যের আন্তর্জাতিক প্রবাহের গভীরতর হওয়া। ব্যবস্থাপত্র রূপে এটা হলো এই বিশ্বাসে জাতীয় ও বৈশ্বিক বাজার উদারীকরণ যে তাতে বাণিজ্য-অর্থ-তথ্য প্রবৃদ্ধি ও মানব কল্যাণে সর্বোত্তমভাবে ফলদায়ক হবে। (UNDP, 1997 : 11)

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, পরবর্তীতে জাতিসংঘ ব্যক্ত করেছে, 'বিশ্বায়ন নতুন ও চমকপ্রদ সুযোগসমূহ সৃষ্টি করে, এবং সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন সুযোগ গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ সিন্ডিকেটগুলি।' (UNDP 1999 : 43)। অধিকন্তু, 'অসম বিশ্বায়ন কেবল সংহতি বা অখণ্ডতাকে আবাহন করছে না, বরং সম্প্রদায়, জাতি ও অঞ্চলসমূহের মধ্যে সংহত ও বহির্ভূতদের বিভাজনের মাধ্যমে, বিখণ্ডীকরণও আনয়ন করছে ... সংকোচনশীল সময় ও স্থান মানব নিরাপত্তার জন্য নতুন হুমকি সৃষ্টি করছে ... মুদ্রা বাজার, এইচআইভি/এইডস, বৈশ্বিক তাপবর্ধন, বৈশ্বিক অপরাধের মত মানব নিরাপত্তার প্রতি হুমকিসমূহ বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।' (Ibid.: 36)। দ্রুত বিস্তৃতিশীল আয়ের বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে জাতিসংঘ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, '১৯৬০ সালে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশগুলির অধিবাসী বিশ্ব জনসংখ্যার ২০% মানুষের আয় ছিল দরিদ্রতম ২০% মানুষের ৩০ গুণ বেশি—১৯৯৭ সালে এই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ গুণে।' (Ibid.)। এই ধারায় বিশ্বায়নের নিয়ামক শক্তিগুলির দাপটে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলির জাতীয় সামর্থ্য। কারণ, 'বাণিজ্যিক বাজার শক্তিসমূহ দ্বারা চালিত হয়ে এ যুগে বিশ্বায়ন চায় অর্থনৈতিক দক্ষতা উন্নত করতে, প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করতে ও মুনাফা উৎপাদন করতে। কিন্তু এটা

উপেক্ষা করে সুষমতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব নিরাপত্তার লক্ষ্যগুলি।' (Ibid.: 43-44)। এই বাস্তবতার সমান্তরালে বিশ্বায়ন প্রচার করে জাতিসমূহের আন্ত নির্ভরশীলতা, তাদের স্বার্থের পারস্পরিকতা, অর্থনীতিগুলির অংশীদারি ও বিনিময়গুলির ভাগাভাগির কথা। এটা করা হয় আদপে পুঁজি-পণ্য-প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রবাহ থেকে রয়ালটি-সুদ-মুনাফা-খাজনা আত্মসাৎকারী বহুজাতিক কর্পোরেশন ও ব্যাংকসমূহের পক্ষে পুঁজিবাদের কেন্দ্রের তথা সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টান্তে। ফলে, 'বিশ্বায়ন ধারণাটির মধ্যে প্রোথিত অনুমানগুলির চেয়ে সাম্রাজ্যিক প্রত্যয়টি বাস্তবতার সাথে অধিকতর ভালোভাবে মিলে যায়।' তাই পেত্রাস যথার্থই ব্যক্ত করেছেন যে, 'মুখ্য ঘটনাদির জরিপ, বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, আঞ্চলিক সংহতি প্রকল্পগুলি তাৎক্ষণিকভাবেই প্রযুক্তিবিদ্যা-নির্ভর ব্যাখ্যাগুলিকে হটিয়ে দেয় : আদপে সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানরাই বৈশ্বিক বিনিময়ের কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। ঐ কাঠামোর মধ্যে পুঁজি চলাচলের প্রধান হস্তান্তর প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক রূপগুলিকে দেখা যায় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির মধ্যে যেগুলি সমর্থন যোগায় আইএফআই-গুলি দ্বারা (আইএফআই-গুলির শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা নিযুক্ত হয় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির স্বার্থ রক্ষাকারী সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারা)। ক্ষমতার এইরূপ বিন্যাসটিকে জোরদার করে যেসব উপাদান সেগুলির ভিতরেই ঘটে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহ। এভাবে বিশ্বায়নের ধারণাটির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যয়টি পুঁজি-পণ্য-প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী চলাচলের সামাজিক এজেন্সিগুলি সম্পর্কে আমাদের অধিকতর স্পষ্ট ও যথার্থ ধারণা প্রদান করে।' (Petras, 1999 : 7)।

বিশ্বায়ন ধারণার মধ্যে 'পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' তথা সাম্রাজ্যবাদের বিধানগুলি, আরো প্রকটভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। এর সংযুক্ত অথচ অসম বিকাশের রূপটি ফিদেল ক্যাস্ট্রো তুলে ধরেন এভাবে: "বিশ্বায়ন হলো এক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা যেটি ধারণ করে আছে এই সত্যটিকে যে আমরা সকলে একই জাহাজের যাত্রী, অর্থাৎ একই গ্রহ যেখানে আমরা সকলে বাস করি। কিন্তু এই জাহাজের যাত্রীরা ভ্রমণ করছেন অত্যন্ত অসমঞ্জস অবস্থায়। সামান্য সংখ্যালঘুরা ভ্রমণ করছেন ইন্টারনেট, সেলুলার ফোন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সংবলিত বিলাসবহুল ক্যাবিনগুলিতে। তারা বিশুদ্ধ পানির সরবরাহসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ, অঢেল ও ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য উপভোগ করে থাকেন। তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনসমূহ। ভারাবনত ও ব্যথিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভ্রমণ করছেন এমন সব অবস্থার ভিতর যেগুলি আমাদের ঔপনিবেশিক অতীতে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় ভয়ঙ্কর দাস ব্যবসার অনুরূপ। অর্থাৎ এই জাহাজের যাত্রীদের ৮৫% এরই নোংরা খোলের ভেতর ঠাসাঠাসি করে রয়েছে ক্ষুধা, রোগ-শোক ও অসহায়ত্বের দুর্গতির মধ্যে। পরিষ্কারভাবে, ভাসমান থাকার পক্ষে এই জাহাজ খুব বেশি পরিমাণে অবিচারে পূর্ণ এবং এটি এমন অযৌক্তিক ও নির্বোধ পথে নিজেকে চালিত করছে যে কোন নিরাপদ বন্দরেই এর পক্ষে ভিড়া সম্ভব নয়।" (Castro : 2000)। ক্যাস্ট্রোর উক্তির যথার্থতা বিধৃত রয়েছে জাতিসংঘের

প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে। (সারণি আকারে উপস্থাপিত) একটি তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে বিশ্বায়ন থেকে লাভবান অংশটির মধ্যে রয়েছে: উৎপাদন, বিত্তশালী মানুষ, মুনাফা, শিক্ষিত ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ, পুঁজি, ঋণদাতা, শক্তিমান, পেশাজীবী-ব্যবস্থাপক-কৃৎকৌশলী, উচ্চতর প্রযুক্তির উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রেতা, বৈশ্বিক বাজার, বৈশ্বিক সংস্কৃতি, ইত্যাদি। আর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্যে রয়েছে: কর্মসংস্থান, বিত্তহীন মানুষ, মজুরি, অশিক্ষিত ও নিম্ন দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ, শ্রমিক মেহনতি মানুষ, শ্রম, ঋণগ্রহীতা, দুর্বল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মান কারখানাজাত সামগ্রীর বিক্রেতা, স্থানীয় গোষ্ঠী, স্থানীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। (UNDP, 2000 : 11-12)। বিশ্বায়নের এরূপ সাধারণ বাস্তবতায়, বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থা প্রসঙ্গে জাতিসংঘ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়াবাসীদের অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল বাজার সংহতকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ফলে আয় অসমতা বিস্তৃত হয়েছে, বিশ্বায়ন কালে দারিদ্র্য কবলিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ১৯৬০ সাল থেকে উন্নত হতে থাকা মানব উন্নয়ন স্তরগুলি স্থবির বা অবনমিত হতে শুরু করেছে। কতক [ক্ষুদ্র] জাতিসত্তা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বায়নের উপকার থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।' (Ibid.: 15-16)। এতে আরো ব্যক্ত করা হয়েছে, 'বস্তুত বিপুল অধিকাংশ দক্ষিণ এশিয়াবাসীর কাছে বিশ্বায়নের ফলাফল দাঁড়িয়েছে উচ্চতর দাম, নগণ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অধিকতর দারিদ্র্যের প্রকোপ। দুর্বল বাণিজ্য শর্ত সার্বিক অবস্থাকে অধিকতর খারাপের দিকে ঠেলে দিয়েছে।' (Ibid.: 17)।

বিশ্বায়নের শক্তিগুলি কিভাবে দরিদ্র দেশগুলিকে এরূপ অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখে সে সম্পর্কে জাতিসংঘ রিপোর্টে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 'শিল্পায়িত দেশগুলি যদিও নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গড়ে নিম্ন শুল্ক ধার্য করে, বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির জন্য তারা সর্বোচ্চ আমদানি (শুল্ক) প্রতিবন্ধক বজায় রাখে। ... উচ্চ-আয়ের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ (শুল্ক) প্রতিবন্ধক আরোপ করে ঐসব দেশে রপ্তানিকারী নিম্ন-আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে গড়ে তার থেকে তিন/চার গুণ বেশি শুল্ক প্রদান করতে হয়। ... ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মত দেশসমূহ থেকে আমদানির উপর যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর আমদানি শুল্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অধিকাংশ দেশ থেকে আমদানির বেলায় প্রযোজ্য শুল্ক থেকে ১০ গুণ বেশি।' (UNDP, 2005: 126-27)। বিশ্বায়নবাদীরা এইচআইভি/এইডস-এর পরে আফ্রিকার 'দারিদ্র্য' নিয়ে নিরন্তর তৎপরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু দরিদ্রদের কোন প্রকার ভর্তুকির বিষয়ে তাদের অবস্থান হয় নেতিবাচক যদিও নিজেদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর্তুকির ব্যাপারটিকে তারা দেখে ভিন্নভাবে—'উন্নত দেশগুলি যখন বলে ভর্তুকি ভর্তুকি নয় তখন সেটা ভর্তুকি নয়।' যেমন, 'ঘানার দরিদ্রতম উত্তর অংশে ধান চাষীরা বাজারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সস্তা চাল আমদানির দ্বারা। এই আমদানির উপর শুল্ক আরোপের উদ্যোগকে আইএমএফ এই যুক্তিতে বাধা প্রদান করে যে এক্ষেত্রে

অন্যায্য প্রতিযোগিতার কোন প্রমাণ নেই। অথচ বাস্তব ঘটনা হলো এই যে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ধান উৎপাদনে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩০ কোটি ডলার অর্থাৎ উৎপন্নের মূল্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।' (Ibid.: 132)। বিশ্বায়নের প্রতিভূরা অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান পুঁজি সম্পদের অনটন ঘোচানোর যুক্তিতে বাজার উন্মুক্তকরণ ও আধা বৈদেশিক বিনিয়োগ আবাহন করার নিরন্তর চাপের মধ্যে রাখে অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলিকে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো বিশ্বায়ন এদেশগুলির পুঁজির উল্টো প্রবাহ সৃষ্টি করে তাদের পুঁজি ঘাটতির অবস্থাকেই বজায় রাখে। এর একটি সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরা হয় এভাবে : অর্থ পুঁজির ঢালু প্রবাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বে যা বলা হয় বিশ্বায়িত বাজারগুলির আবির্ভাব তাকে উল্টে দিয়েছে। এর আবির্ভাবে পুঁজি উল্টা দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং বর্তমানে রকেট গতিতে দক্ষিণ গোলার্ধ পুঁজি রপ্তানি করছে উত্তর গোলার্ধে। জতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী (১৯৯৭ সালে দু'দিকের প্রবাহ ভারসাম্যপূর্ণ থাকলেও) ২০০২ সালে দরিদ্র দেশগুলি থেকে ধনী দেশগুলিতে নীট পুঁজি স্থানান্তরের পরিমাণ ছিল ২২৯ বিলিয়ন (বা ২২,৯০০ কোটি) ডলার। ২০০৬ সালে নীট পুঁজি স্থানান্তরের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৮৪ বিলিয়ন (বা ৭৮,৪০০ কোটি) ডলারে। বিশ্বায়ন কর্তৃক সম্পদের এই ঊর্ধ্বমুখী পুনর্বণ্টনের কারণ প্রধানত বৈশ্বিক 'ফিন্যান্স' যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মার্কিন ডলারে দেশসমূহের নগদ সঞ্চয় বা 'ফরেন-এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ'। যখন ইউ.এস. ট্রেজারি বিলে এটা সংরক্ষণ করা হয় তখন নিম্নসুদে এটাকে ধার হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মিটাতে পারে। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিকেই এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়। হাভার্ড কেনেডি স্কুল ও গভর্মেন্ট-এর অর্থনীতিবিদ ড্যানি রড্রিক-এর মতে তিন মাসের অধিক অনুরূপ রিজার্ভ-এর জন্য বাৎসরিক ১১০ বিলিয়ন (বা ১১,০০০ কোটি) ডলার আর, জোসেফ স্টিগলিজ-এর মতে তার দ্বিগুণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয় দরিদ্র দেশগুলিকে। রিজার্ভ (ও ডলারের লেনদেনের প্রক্রিয়া) ছাড়াও বৈশ্বিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত 'ট্যাক্স হলিডেজ', গরিব দেশ থেকে 'মেধা পাচার' সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিপুল মেধা ভর্তুকি; গম-চাল-তুলা (ধনী দেশগুলি তাদের 'এগ্রিবিজিনেস'-কে ২০০৫ সালে ভর্তুকি দিয়েছিল ২৮৩ বিলিয়ন বা ২৮,৩০০ কোটি ডলার) সস্তায় রপ্তানি (সাহায্যের 'ট্রোজান হর্স') করে গরিব দেশে ঐসবের উৎপাদন হ্রাস ও আমদানি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি; উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও জীবনযাত্রার মানের জন্য ব্যয়িত উচ্চ মাথাপিছু জ্বালানি থেকে সৃষ্ট অথচ হিসাব বহির্ভূত পরিবেশ সংকটজনিত ব্যয়-ভর্তুকি (বাংলাদেশে প্রবলতর বৃষ্টি ও বন্যা, হন্ডুরাসে তীব্রতর সাইক্লোনের ছোবল বা মাল্লীপের সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা), ইত্যাদি দরিদ্রদের মূল্যে ধনীদের স্বার্থকে সমুন্নত রাখে। (Rosenberg, 2007)।

বিশ্বায়িত বাজার ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজি বা সম্পদ-সমৃদ্ধির এই ধনীদেশমুখী প্রবাহ কয়েক শতাব্দীর পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ারই অবশ্যম্ভাবী ফল। এটাকে স্বীকার করে ব্যক্ত করা হয় যে, 'উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান বিশ্ব জিডিপি-এর ৮০ শতাংশ উৎপাদন করে। অবশিষ্ট বিশ্ব ('অর্থনৈতিক পরাশক্তি'

চীনসহ, দক্ষিণ এশিয়ার অবশিষ্টাংশ, লাতিন আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ) উৎপাদন করে বিশ্ব জিডিপি-এর ২০ শতাংশেরও কম। এটা হল তিনশ বছর ব্যাপী শিল্প, লগ্নি (পুঁজি), সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সঞ্চিত ধন ও উৎপাদনশীল সম্পদাদির পুঞ্জীভবনের ফল' যা তাদের 'বিপুল ক্রয় ক্ষমতা'র কারণ। (Gottesman, 2006 : 38)। সম্পদ প্রবাহের পুঁজিবাদী বিধানের পরিণতিকে এভাবে 'বিপুল ক্রয় ক্ষমতা' ("Huge buying power") হিসেবে গণ্য করে তার ইতিবাচক দিকটিকেও তুলে ধরা হয় : 'প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক, একটি বৈশ্বিক মুক্ত বাজারে ঐসব সম্পদই হলো এনআইসি-গুলির (নতুন শিল্পায়িত দেশসমূহ) প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস।' (Ibid.: 39)। অধিকন্তু, আরো বেশি আশাবাদী প্রবক্তারা মনে করেন চলতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 'নতুন অর্থনীতিগুলির' পক্ষে 'পাশ্চাত্যের' নাগাল ধরে ফেলাও অসম্ভব নয়। যেমন, ব্যক্ত করা হয়েছে যে 'চলতি বৈশ্বিক গতিবিদ্যার বাস্তবতার সম্ভাবনাই এমন যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অথবা জাপান নয়, বরং এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপ-এর 'নতুন অর্থনীতিগুলি' থেকেই আবির্ভাব ঘটবে পরবর্তী মাইক্রোসফ্‌ট অথবা জেনারেল ইলেকট্রিক-এর। ... বিকাশমান বাজার কোম্পানিগুলির প্রবৃদ্ধি বিস্ময়কর বৈ নয়। ১৯৮৮ সালে বিকাশমান বাজারগুলিতে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিক্রয়কারী কোম্পানির সংখ্যা ছিল ২০। বিগত বছরে [২০০৬] ঐ সংখ্যা ছিল ২৭০ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল অন্তত ৩৮টি কোম্পানি, যেগুলির বিক্রয় ছিল ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।' (Agtmael, 2007 : 42)। অতএব, 'নতুন অর্থনীতিগুলি' পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে কেবল তাই নয়, পরন্তু 'যুক্তরাষ্ট্রের মত এক পরাশক্তির অধিপত্যের ফল দাঁড়াচ্ছে বিদেশী অর্থ, বিদেশী সম্পদ, বিদেশী পেশাজীবী মণ্ডলী, ও বর্ধিত হারে, বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার উপর তার গভীরতর নির্ভরশীলতা।' আর, 'ক্ষমতার এরূপ বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রতি পাশ্চাত্যকে অবশ্যই একটি সৃজনশীল সাড়া উদ্ভাবন করতে হবে' এবং এটাই হলো 'এখন আমাদের কালের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।' (Ibid.: 46)। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, এই 'অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ'-এর অন্তঃসার আদপে এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের অব্যাহত নিরাপত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বৈশ্বিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ থেকে প্রকটিত হয় যে, 'বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনশীলতার কোন আকস্মিক সমৃদ্ধি ঘটেনি; ঘটেছে আমদানির আকস্মিক সমৃদ্ধি। এটা মার্কিন অর্থনীতির বিপুল প্রবৃদ্ধি-তাড়িত কিছু ছিল না; এটা ছিল এই সম্পদ উৎপাদনকারী নিম্ন-মজুরির দেশগুলি থেকে ধার-করা ঋণ-তাড়িত সমৃদ্ধি। অন্য কথায়, নিজেদের রপ্তানির আসক্তি-জনিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্তরালে উঞ্ছবৃত্তির দারিদ্র্যের স্তরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত 'ভ্যাসেল' রাষ্ট্রগুলি ("vassal states") কর্তৃক প্রদত্ত 'ট্রিবিউট'-এর ("payment of tribute") ইন্ধনই সম্ভব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক একাধিপত্য।' (Liu, 2002)

২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টপেন্ট পরিচালিত গবেষণার তথ্য অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ চোখ ছাড়াবাড়া-করা ৬৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার—যা আদপে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপি-এর পাঁচ গুণ এবং জাতীয় সম্পদের আয়তনের দ্বিগুণ। কটলিকফ-এর মতে, 'দেশসমূহ দেউলিয়া হয়ে পড়তে পারে এবং দেউলিয়ায় পরিণত হয়। স্বকীয় ৬৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার [৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি ডলার] 'ফিসক্যাল গ্যাপ' নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্পষ্টভাবে সেদিকে অগ্রসরমাণ বলেই প্রতীয়মান হয়।' (Kotlikoff, 2006 : 248)। এর প্রতিবিধানের জন্য কটলিকফ প্রস্তাব করেন কর বৃদ্ধি, কল্যাণ কর্তন, প্রত্যক্ষ চীনা বিনিয়োগ আহ্বান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদির আমূল সংস্কার, ইত্যাদি। কিন্তু অন্যরা ভরসা করেন যুক্তরাষ্ট্রের আদি বাণিজ্য শক্তির উপর : 'বৈশ্বিক বাজারস্থলের অভিভাবক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে মুক্ত বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন যুগিয়েছে যদিও সংরক্ষণবাদ থেকে তার সরকারগুলি মুক্ত ছিল না। আর 'ঠাণ্ডা লড়াই' যুগে (মুক্ত বাণিজ্য-নির্ভর) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণের নামে এটি বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বিস্তৃত করেছে, প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার যাকে অভিহিত করেছিলেন এক সামরিক-শিল্প সংশ্রয় ("military-industrial complex") নামে।' (Pereboom, 2006 : 40)। অন্য কিছুর চেয়ে, এমনকি 'ঠাণ্ডা লড়াই'-উত্তর বিশ্বের কথিত একক পরাশক্তি রূপে যুক্তরাষ্ট্রকে তার ধারের অর্থনীতির বিস্ময়কর সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য তার সামরিক-শিল্প সংশ্রয়কেই আরো বেশি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এটা প্রতিফলিত হয় নতুন নতুন অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিস্তার থেকে, যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিকগুলি কর্তৃক স্থানীয় বাজার ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের বেপরোয়া চাপ বৃদ্ধি ও তার সাথে জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে নানান কৌশলে ব্যবহারের মধ্যে। আবার, বিশ্বায়নের মূলধারাকে সচল রাখার নীতিগত অবস্থানে থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের চিত্রও প্রকটিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে। বিশ্বায়নের 'অনিবার্য' বিধান থেকে সর্বাধিক সুফল ঘরে তুলে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করার পর যুক্তরাষ্ট্র এখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের অজুহাতে সংরক্ষণবাদী নতুন অবস্থান গ্রহণে প্রবৃত্ত হচ্ছে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের চেয়ারম্যান বেন বারনানকে অগাস্ট ২০০৬ সালে ব্যক্ত করেছেন যে, সমস্যা দেখা দিয়েছে 'কারণ উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তনসমূহ কতক শ্রমিকের জীবিকা এবং কতক সংস্থার মুনাফাকে হুমকিগ্রস্ত করতে পারে, এমনকি যখন এসব পরিবর্তন, অধিকতর উৎপাদনশীলতা ও সার্বিক উৎপাদনের অনুকূল।' (উদ্ধৃত, Abdelal and Segal : 2007)। এই বিশ্লেষকদ্বয় ব্যক্ত করেছেন যে 'আজ বিশ্বায়নের সাধারণ প্রত্যাখানের একটি অন্যতম প্রধান দুশ্চিন্তার দিক হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং সেগুলির ভিতরে বিশ্বায়নের উপকারগুলির অসম বণ্টন নিয়ে বর্ধিত জন-অসন্তোষ ও সর্বসাধারণের সংশয়ের বিস্তার। এরূপ অনুভূতি এখন সর্বত্রই প্রকাশ পাচ্ছে, তবে সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে সেটা সবচেয়ে তীব্র।' (Ibid.)।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বায়ন ইতোমধ্যে যে বিরোধ ও বৈরগ্রস্ততার বিস্তার ঘটিয়েছে তার প্রতিক্রিয়া বিশ্ব পরিসরেই ব্যাপ্ত রয়েছে যা একটি বা দুটি বৃহৎ শক্তির অভ্যন্তরীণ কৌশলগত সংস্কারের দ্বারা স্তিমিত হওয়ার নয়। খোদ জাতিসংঘের মূল্যায়নে বলা হয়েছে যে 'বস্তুতপক্ষে আন্তঃসরকারি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াগুলি আজ প্রধান শিল্প-শক্তিসমূহ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। 'মুক্তবাজার পরিবেশের নিরাপত্তা' নিশ্চিতকরণের বাইরে মানবাধিকার ও মানব উন্নয়নের অবনতি রোধে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। এই পটভূমিতে শুধু বিশ্ব-ব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধিই পায়নি, পরন্তু 'সংঘাত ও ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্যটাই ঘুচে গেছে, প্রতিরক্ষার বেসামরিকীকরণ ও ব্যবসায়িক স্বার্থে, অবাধে ভাড়াটে সামরিক সংস্থাসমূহকে নিয়োগ করা হচ্ছে।' (UNDP, 1999 : 42)। পেত্রাস-এর বিশ্লেষণে, অতীত বিশ্বায়ন বর্তমানটি থেকে এ অর্থে স্বতন্ত্র যে 'বহির্মুখী বিকাশের পূর্ববর্তী যুগটি গভীর সংকটে পতিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ ও মন্দার ভিতর দিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর বর্তমান রূপটি এখনো তার 'চূড়ান্ত পর্বে' প্রবেশ না করে থাকলেও, এমন আলামত রয়েছে যে এতে অতীত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।' (Petras, 1999 : 16)। পেত্রাস দেখান যে, নব্য-উদারনৈতিক বিশ্বায়ন-কবলিত দেশগুলির জন্য বিশ্বায়নের কেন্দ্রীয় বস্তুটি হলো রাষ্ট্রকে সামাজিক দায়মুক্ত করে তার শক্তিকে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাজারের সুবিধা বিস্তারে নিযুক্ত রাখা এবং সেটা নির্বিঘ্ন করার জন্য দমনমূলক সংস্থানগুলিকে সম্প্রসারিত করা। এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির নানাবিধ উপাদান এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। এসবের মাধ্যমে বিকশিত 'বিশ্বায়নের মতাদর্শ ও বাগাড়ম্বরের' প্রতিবিধানকল্পে 'জাতীয় রাষ্ট্রক্ষমতার' ("national-state power") পুনরুদ্ধারের কোন বিকল্প নেই। একইভাবে বিশ্বায়নকে 'বৈশ্বিক লুটেরাদের অন্ধলালসা ও পাগলামি' হিসেবে আখ্যায়িত করে জেলিনাস ব্যক্ত করেন যে, নব্য-উদারনৈতিক বিশ্বায়নবাদী মতাদর্শ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি/মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তার ধ্বজা তুলে ও এ গ্রহের সম্পদরাজিকে অফুরান বিবেচনা করে অসীম প্রবৃদ্ধির পশ্চাদ্ধাবনের মাধ্যমে পণ্যায়ন, মুনাফা শিকার ও মজুদদারি করে বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের বিপর্যয়গুলিকে বজায় রাখে। এজন্য তারা ব্যবহার করে গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন বাণিজ্য ও জনসংযোগ শিল্পের শক্তিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'ভর্তুকি ভিক্ষা ও বাইরের বৃহৎ বিনিয়োগ, অথবা, স্থানীয় ও আঞ্চলিক সঞ্চয় ও সম্পদের সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতায়ন, স্থানীয় শিল্প সৃষ্টি ও নিজেদেরই চিন্তা ও উদ্যোগ গ্রহণ—এদু'য়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। লালসা আর ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে নতুন মূল্যবোধে মানবজাতির এই পৃথিবীর পুনঃসংগঠন আজকের বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা বণিকতান্ত্রিক অদৃষ্টবাদের অধীন কোন প্রজাতির কবলে থাকাই এই পৃথিবীর চূড়ান্ত নিয়তি নয়। এটা বরং এক চলমান পৃথিবী। দরকার শুধু এটাকে জীবন ও সংহতির দিকে চালিত করা।' (Gelinas, 2003 : 240)।

বিশ্বায়নের আদিপর্বে বাংলাদেশ

বিশ্বায়নকে প্রাক-পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদী এই দুই পর্বে ভাগ করে অবলোকন করলে এটা উপেক্ষা করা যায় না যে, যেমন প্রথমোক্ত পর্বের বিশ্বায়নের স্তরে বাংলাদেশ একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অবস্থান লাভ করেছিল, তেমনি শেষোক্ত পর্বের বিশ্বায়নের সূচনাতেও তার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা ছিল। শেষোক্ত পর্বের প্রধান বিষয়ের মধ্যে অনুল্লেখিত সত্যটি হলো এর আবির্ভাবের সাথে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে, অথবা, দক্ষিণ থেকে উত্তর গোলার্ধে, বিশ্বায়নের ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন, আর সম্ভবত অনুল্লেখ্য বাস্তবতাটি হলো, ঐ পরিবর্তনটির সাথে আরো বহু বহু অঞ্চল বা দেশের সাথে বাংলাদেশেরও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের উপাঙ্গে পর্যবসিত হওয়া। আদি পর্বে, ইউরোপীয় অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলির সাধারণ সমৃদ্ধির দৃশ্যপটে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির চিত্র ছিল বিশেষ ব্যতিক্রম স্থানীয়। সেই অতুল সমৃদ্ধির দুর্বার আকর্ষণে এখানে আগমন ঘটেছিল বিশ্বের সকল প্রান্তের পর্যটক, প্রচারক, ভাগ্যান্বেষী, বণিক-ব্যবসায়ী ও আগ্রাসী শক্তির। কেবল শপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাণিজ্যিক তৎপরতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় কোন্ মাত্রায় এদেশে অর্থনৈতিক বৈশ্বিকতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আর এই সমৃদ্ধির আপাত-বিরোধী সত্যটিও ছিল এমন যে এটা ঘটেছে ইউরোপীয় ধারার উৎপাদন সম্পর্কের বিপরীতে সাধারণ এশীয় রূপের রাষ্ট্র ও উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ১৭ শতকের ষাটের দশকের বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'দুবার বাংলায় আগমন করে এই রাজ্যটি সম্পর্কে আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি সেটা আমার মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছে যে যেই গুরুত্ব মিশরের উপর অর্পণ করা হয়েছে আসলে সেটা বাংলারই প্রাপ্য।' (Bernier, 1972 : 437)।

ঐ সময় বাংলাদেশের বহু বিচিত্র মূল্যবান পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন, বাণিজ্য ও বিদেশী বণিকদের কুঠি স্থাপনের জন্য বিশেষত ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সেজন্য সরকারি অনুমতি লাভের প্রতিযোগিতা, বাণিজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে বার্নিয়ার ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'এমন আর কোন দেশের সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই যেখানে বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করার মত বিচিত্র ও মূল্যবান পণ্যসামগ্রীর এত বিপুল সমাবেশ রয়েছে। চিনি ছাড়াও ... বাংলায় এত বিপুল পরিমাণ সুতি ও ও রেশমি বস্ত্র রয়েছে যে ঐ দুটি পণ্যের জন্য রাজ্যটিকে কেবল হিন্দুস্তান বা বিরাট মুঘল সাম্রাজ্য নয়, পরন্তু প্রতিবেশী সকল দেশ এমনকি ইউরোপেরও সাধারণ ভাণ্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শুধু ওলন্দাজরাই যে পরিমাণ মোটা ও চিকন, সাদা ও রঙিন সকল প্রকার সুতিবস্ত্র বিভিন্ন দেশ বিশেষত, জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করে, অনেক সময় সেটা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। ইংরেজ, পর্তুগিজ এবং দেশীয় বণিকরাও ব্যাপক হারে ঐসব পণ্যের কারবার করে। রেশম ও রেশমি সামগ্রী সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। প্রতি বছর বাংলা থেকে কি পরিমাণ সামগ্রী বাইরে প্রেরণ করা হয় সেটা ধারণা করাও সম্ভব নয়। ... ওলন্দাজ ও

ইংরেজরা ইন্দিজ ও ইউরোপে শোরার বিপুল চালান পাঠিয়ে থাকে। ... এই সুফলা রাজ্যটি থেকে সর্বোত্তম লাক্ষা, আফিম, মোম, সুগন্ধিদ্রব্য ও মরিচ সংগৃহীত হয়; আর মাখন ... এত বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, রপ্তানির পক্ষে একটি ভারী সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রপথে তাও নানা স্থানে প্রেরণ করা হয়।' (Ibid.: 439-40)। এশীয় উৎপাদন প্রণালীর সীমাবদ্ধতার (ব্যক্তিগত মালিকানার আইনানুগ স্বীকৃতি-হীনতার) মধ্যে অর্জিত এই উৎপাদনশীলতা থেকে সম্পদের যে অপরিমেয় পুঞ্জীভবন ও শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রভাবে পুরাতনের ভাঙন ও নতুন উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ বিপুল সম্ভাবনামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশীয় উৎপাদক, বণিক, ব্যাংকার ও (অবৈধ) ভূমিমালিকদের দ্বারা স্বাধীনভাবে সেই সম্ভাবনা উন্মীলিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে সুচতুর ইংরেজ বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের প্রসারিত হাত ধরে সেদিকে যাত্রার চেষ্টার পরিণামে, শতাব্দী কাল পরে ইংরেজ বুর্জোয়ারাই তার বিকৃত বিকাশের পরবর্তী ইতিহাসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে 'পলাশী যুদ্ধের' (১৭৫৭) মাধ্যমে।

অতঃপর প্রাক্-পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এক সমৃদ্ধ কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাংলাদেশ পর্যবসিত হয় পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক যুগীয় নতুন বিশ্বায়নের নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম এক শোষণ-উৎপীড়ন ও উন্মত্ত লুণ্ঠনের নৈমিত্তিক ভূমিতে। স্বকীয় ব্যতিক্রম সমৃদ্ধির কারণে বাংলার ঔপনিবেশিকীকরণ প্রত্যক্ষ করেছে ব্যতিক্রম কৌশল। কিন্তু অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও পরিণামবহ পরিবর্তন তথা নতুন পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ভিত্তি স্থাপনের জন্যেও বাংলার ঔপনিবেশিকীকরণ ছিল সমধিক ব্যতিক্রমি গুরুত্বসম্পন্ন। নতুন পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ভিত্তিটি ছিল ইংল্যান্ডে সংঘটিত আঠার শতকের শিল্প বিপ্লব। পনের-ষোল শতক থেকে বিস্তৃত বাণিজ্যিক ভিত্তির উপর ইউরোপের কতিপয় দেশ আধুনিক পুঁজিবাদী যাত্রা শুরু করলেও, ইংল্যান্ডের ঐ শিল্প বিপ্লবের পরেই কেবল পুঁজিবাদ এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। নতুন শিল্প প্রযুক্তির শক্তি চালিত হয়ে তখন ব্রিটেনসহ গুটি কয়েক ইউরোপীয় দেশ, জাপান ছাড়া গোটা পৃথিবীর উপর তাদের পুঁজিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোর উপর বিকশিত পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তখন বিশ্বব্যাপী যে 'সংযুক্ত ও অসম বিকাশের বিধান' প্রবর্তন করেছিল তার বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটলেও অন্তঃসার যে অপরিবর্তিত রয়েছে সেটা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনের' (গুন্দার ফ্রাঙ্ক-এর শব্দগুচ্ছ) এই কাঠামো শিল্প বিপ্লবের 'চেইন রিঅ্যাকশন' তথা অদ্যাবধি এক 'স্থায়ী বিপ্লব'-এর যেই ঘটনার সাথে যুক্ত সেই ঘটনার অনুঘটনের দৃশ্যপট ছিল বাংলাদেশ। 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক ইংরেজ বণিক ও দেশীয় বণিক-ব্যাংকার-সেনাপতি পক্ষদ্বয়ের মধ্যেকার ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রই ছিল এর অনুঘটক। মানব ইতিহাসে আর কোন ষড়যন্ত্র বিশ্ব পরিসরে এতটা সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যসম্পন্ন হতে দেখা যায়নি। ষড়যন্ত্রের দিকটি উহ্য রাখলেও এর মূল হোতা ইংরেজ বণিক পুঁজিপতিদের কৃতিত্বেই যে শিল্প বিপ্লবের যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেটা ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে : 'পলাশীর ঘটনার

অব্যবহিত পরে বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ লন্ডনে পৌঁছতে শুরু করে এবং তার ফলোদয় হয় তাৎক্ষণিকভাবে। কারণ সকল বিজ্ঞ মহলই এ ব্যাপারে একমত যে 'শিল্প বিপ্লব' নামক যে ঘটনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীকে পূর্ববর্তী সকল যুগ থেকে পৃথক প্রতিপন্ন করেছে সেটি ১৭৬০ সালেই সূচিত হয়। ... পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে, এবং তারপর পরিবর্তনগুলি যে গতিতে সংঘটিত হতে থাকে তার সাথে সম্ভবত কোন কিছুরই তুলনা চলে না। ... যদিও বা যান্ত্রিক কৌশলসমূহ ঐ সময়ের দ্রুত সচলতার নির্গমপথ হিসেবে কাজ করেছে তথাপি সেগুলি দ্রুততার কারণ ছিল না। উদ্ভাবনসমূহ নিজেরা নিষ্ক্রিয় ... কার্যকরী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি জমা হওয়ার জন্য সেগুলিকে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। ঐ শক্তিকে অবশ্যই অর্থের রূপই পরিগ্রহ করতে হয়, যে অর্থ সচল, গুপ্তভাণ্ডারের অচল অর্থ নয়। ... সেভাবে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে স্টিম ইঞ্জিনের জন্য তার আবিষ্কারকের চেয়ে পুঁজিপতির প্রতিই সভ্যতা অধিকতর ঋণী।' (Adams, 1959 : 255–7)।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতির অভাবে সচল অর্থ কিভাবে গুপ্ত ভাণ্ডারের অচল অর্থের পরিণতি লাভ করে সে সম্পর্কে বার্নিয়ার লিখেছিলেন যে, 'এটি কারো দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয় যে পৃথিবীর সর্বত্র সঞ্চলিত হয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য অবশেষে হিন্দুস্থানে এসে ['গুপ্তধন' হিসেবে] উদরস্থ হয়ে যায়, কিছু পরিমাণ হারিয়েও যায়।' (Bernier, 1972: 202)। কিন্তু পলাশীর ঘটনা সেই অচল গুপ্তধনকে সচল করে শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি ভাণ্ডারের 'যৎসামান্য ধারণা' প্রদানের জন্য ম্যাকলে-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে এডামস্ ব্যক্ত করেন যে 'বাংলা দখলের' পর 'এক ইংরেজ সৈনিকের সামনে প্রাচ্যের ধনভাণ্ডারের দরজা উন্মোচিত হয়ে গেল', 'ক্লাইভ এর কাছে তার আপন পরিমিতি ব্যতিরেকে প্রাপ্তির আর কোন সীমা ছিল না। বাংলার ধনভাণ্ডার তার সামনে উন্মীলিত ...। ক্লাইভ হীরা ও মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ আর রৌপ্যের স্তূপের মধ্যে পায়চারি করে সাধ্যমত তুলে নেওয়ার অবকাশ পেল।' ২৩ জুন, ১৭৫৭-এর পর 'হুগলি নদী দিয়ে কলিকাতায় একটি চালানেই পাঠানো হয়েছিল আট লক্ষ পাউন্ড; ক্লাইভ নিজে রেখেছিল দুই থেকে তিন লক্ষ পাউন্ড।' এডামস্ লিখেছেন, 'এমন লোক কমই আছে যাদের জীবন ক্লাইভ ও হেস্টিংস-এর মত সুবিদিত, আবার এমন কোন লোকও কম, মানব জাতির নিয়তির উপর যাদের প্রভাবের মূল্যায়ন হয়েছে এত সামান্য। এটা বলা অতিশয়োক্তি নয় যে ইউরোপের অদৃষ্ট [রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক] বাংলা দখলের উপরই নির্ভর করেছিল।' (Adams, 1959 : 248–9, 251)। বলা হয়েছে, আশৈশব দুরন্ত স্বভাবের ক্লাইভ আঠার বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কেরানি হিসেবে মাদ্রাজে অবতরণ করলেও আদপে 'এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার নিয়তি' যা সূচিত হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধ ও তার বাংলা দখলের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবে এই বিরল ঘটনার পশ্চাৎপটে ছিল, ইউরোপীয় প্রতিপক্ষগুলির বিপরীতে বাংলার অতুল ধনাঢ্য বণিক-ব্যাংকারদের স্বাধীনতা-ক্ষমতা, বা আভিজাত্যহীনতাজনিত হতাশা ও ক্ষোভ, আর ক্ষমতা-লিপ্সু

এক সিপাহসালার (মীর জাফর)-এর লোভকে পুঁজি করে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ঐ ইংরেজ বণিক কেরানি সেনাপতির অমোঘ ষড়যন্ত্র।

ঘুষ-উপঢৌকন-ষড়যন্ত্র-বিশ্বাসঘাতকতার ছাপাঙ্কিত পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলা বিজয় কেবল ঐভাবে এখান থেকে বিশ্বায়নের স্থানান্তর ঘটায়নি, পরন্তু পাশ্চাত্যের নতুন পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের অন্তর্জাত চারিত্র্যকেও প্রকটিত করেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এটা জন্ম-চিহ্ন, তার স্থায়ী চারিত্র্য বটে। এই বিশ্বায়নের ঐ সাধারণ বাস্তবতাটির সমান্তরালে, পরবর্তী কালের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রেও পলাশীর প্রভাব এক পুনরাবর্তক বাস্তবতা হিসেবে বিরাজমান বলে প্রতীয়মান হতে পারে। যাই হোক, বাংলা দখলের পর তার লুণ্ঠিত সম্পদ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত করে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ভিত্তি দৃঢ়মূল করেছে এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হলো এই লুণ্ঠনের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে এডাম্‌স ব্যক্ত করেন, 'নিজের জন্য অথবা সরকারের জন্য ক্লাইভ যতটা তুলে নিল সেটা ছিল তার ফেরত যাওয়ার পর, অগণিত লালসার্ত কর্মকর্তাদের কাছে এক অসহায় শিকার হিসেবে সোপর্দ করা বাংলার পাইকারি ডাকাতি ও লুণ্ঠনের তুলনায় যৎসামান্য।' (Ibid.: 252)। এক ইংরেজ বণিকের 'স্বচক্ষে দেখা' এই লুণ্ঠনের বর্ণনা ছিল এরূপ : 'দেশটির ভাগ্যাহত শিল্প-উৎপাদক ও কারিগরদের উপর চালানো হয়েছে অভাবনীয় উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা, প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি তাদের পরিণত করেছে তার একচ্ছত্র দাসে ... দরিদ্র তাঁতিদের উৎপীড়নের পদ্ধতি ছিল বহুবিচিত্র ও অসংখ্য ... যেমন জরিমানা, কয়েদ, বেত্রাঘাত, জোরপূর্বক মুচলেকা আদায় ইত্যাদি।' (উদ্ধৃত, Mukherjee, 1973 : 302)। পলাশীর ঘটনার পর ইংরেজ কোম্পানি নিযুক্ত পুতুল নবাব, মীর জাফর, স্বয়ং কোম্পানির লোকেদের বিরুদ্ধে মে ১৭৬২-তে কলিকাতায় কোম্পানির গভর্নরের কাছে অভিযোগ করে যে, 'তারা রায়ত, বণিক, প্রভৃতি থেকে দ্রব্যাদি ও পণ্য সামগ্রী জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় সেগুলির মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে; এবং রায়ত, প্রভৃতিকে তারা সহিংস ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় বাধ্য করে [কোম্পানির] এক টাকা দামের জিনিসের জন্য পাঁচ টাকা দাম পরিশোধ করতে।' (উদ্ধৃত, Ibid.: 304)। এসবের পরিণামে বাংলার কৃষি, শিল্প উৎপাদনে বিরাট ধস নামে। কিন্তু তারপরও দেখা যায় ১৭৬৬–১৭৬৮ এর তিন বছরে এদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ৬৩,১১,২৫০ পাউন্ড মূল্যের ধন-সম্পদ যার বিপরীতে আমদানি হয়েছে ৬,২৪,৩৭৫ পাউন্ড মূল্যের সামগ্রী অর্থাৎ ঐ সময়ে যে পরিমাণ এদেশে এসেছে তার দশগুণেরও বেশি গেছে বাইরে। (উদ্ধৃত, Ibid.: 351)। আরো পরে, ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটি ১৭৮৩ সালে এক প্রতিবেদনে বাংলা ও ইংল্যান্ডের 'বাণিজ্য-সম্পর্কের' বিষয়ে ব্যক্ত করে যে 'সেদিক থেকে কোম্পানির তরফে দেশটির সমুদয় রপ্তানি সামগ্রী কোন বার্টার প্রক্রিয়ায় বিনিময় হয় না, বরং কোন প্রকার প্রতিদান বা মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।' (উদ্ধৃত, Ibid.: 361)। এই নির্দয় নির্বিবেক 'আদি সঞ্চয়' প্রক্রিয়াটি সংযুক্ত ছিল ব্রিটিশ শিল্প পুঁজিবাদী বিকাশ ও বিশ্বায়নের সাথে।

আদি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় দেশীয় উৎপাদকদের নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে নানা কৌশলে বণিকদের বাণিজ্য থেকে উচ্ছেদ করে ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত হয় তার সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যোগাযোগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আইন ও প্রশাসনিক সংস্কার, নতুন অর্থনৈতিক ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের সমান্তরালে সম্পদ লুণ্ঠন, স্থানীয় অর্থনীতির ধ্বংসসাধন, মড়ক-মহামারী-দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয় উপুর্যপরি বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের। এসবের অবদমনে সর্বাত্মক বল প্রয়োগের সাথে সর্বাপেক্ষা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নিয়োগ করে সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক 'বিভক্ত কর শাসন কর' নীতির নিকৃষ্ট মতাদর্শগত কৌশল। ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের এই ভয়ংকর কৌশল আর ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত 'রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ' (লর্ড ম্যাকলে, শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান) নামক এক সংকর দোভাষী শ্রেণী সৃষ্টির যুগল ক্রিয়ায় শ্রেণী ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পর্যবসিত হয় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে। পরিণামে, এক 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' নামে দ্বি-খণ্ডিত হয় ভারত, যেখানে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মুসলমান-প্রধান অংশ পাকিস্তানের পূর্ব-পাকিস্তান প্রদেশ আর বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের এই বিকৃত সমাপ্তি আরো বিকৃত ঔপনিবেশিকতার জন্ম দেয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে এবং তা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টান্তে আপতিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানে—যা আজকের বাংলাদেশ। শুধু ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি অঞ্চলের মধ্যে রাষ্ট্র নির্মাণের সূচনা লগ্নে পশ্চিম-পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা তথা বাঙালির সংস্কৃতির উপর প্রথম আঘাত হানে। এই আঘাত থেকে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক ভাষা ও সংস্কৃতির লড়াই। (প্রায় পাঁচ দশক পরে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকারের বিশ্বায়ন করে)। এ লড়াই, পরবর্তী দু'দশকে ক্রমে গণতন্ত্র ও আর্থ-সামাজিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম থেকে অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যে শেষ হয়।

স্বাধীনতা, সামরিক অভ্যুত্থান ও বিশ্বায়নতাড়িত বাংলাদেশ

উপনিবেশোত্তর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের একটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের প্রধান শিকার হওয়ার কারণে মুক্তির জন্য তাকে দীর্ঘতম কাল ব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই এ সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে তার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ছিল অসাম্য, সাম্প্রদায়িকতা, সামরিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সংকল্প ও শর্তযুক্ত। স্বাধীনতা-উত্তকালে প্রণীত '৭২-এর সংবিধান, '৭৩-এর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), '৭৪-এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, '৭৫-এর (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫) বাকশাল কর্মসূচি, ইত্যাদি ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন কাঠামোর বাইরে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন

জাতীয় বিকাশের লক্ষ্যাভিমুখী জাতীয় রাজনৈতিক সরকারের নীতি-পরিকল্পনার মোহরাঙ্কিত পদক্ষেপ। বস্তুত, পলাশীর পর থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় সম্পদ ও উদ্বৃত্তের বহির্মুখী আত্মসাৎ ও পাচারের ধারায় ছেদ পড়ে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। ফলে, জাতীয় স্বাধীনতা স্বাভাবিক নিয়মে অবারিত করে স্থানীয় ও জাতীয় সঞ্চয়নের সকল সুযোগ, যা ছিল উপরোক্ত নীতি-পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনাদীপ্ত। কিন্তু ঐ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয় মধ্য '৭৫-এ সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান ও জাতীয় রাজনৈতিক সরকার ও নেতৃত্বের উৎখাত ও হত্যাযজ্ঞ। অতঃপর সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের 'টাকা কোন সমস্যা নয়', 'রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের জন্য আমি কঠিন করে দেব,' ইত্যাকার ঘোষণার সাথে স্বাধীনতা-বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন সহ নিষিদ্ধ-ঘোষিত রাজনৈতিক ইসলামবাদী দল ও গোষ্ঠীসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হলে পুরাতন রাষ্ট্র ও ক্ষমতা কাঠামোর চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যাদিও পুনরুজ্জীবিত হয়। বস্তুত একটি মুক্তিযুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রের অপরিহার্য পুনর্বিন্যাসগুলি স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হতে না পারার কারণে এ পুনরুজ্জীবন ঘটে দ্রুত লয়ে অধিকতর ক্ষতিকারক সব উপসর্গ সহকারে। প্রসঙ্গত এটাও অনস্বীকার্য যে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের কতক অব্যাখ্যাত ও আত্মঘাতী দলীয় ও সরকারি কৃতকর্ম দ্বারাও এসব সহজসাধ্য হয়েছে।

পরিণতির দিক থেকে '৭৫-এ সংঘটিত এ পরিবর্তনের তাৎপর্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ-সঞ্জাত জাতীয় রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ বহির্মুখী ও বহির্নির্দেশনাগ্রাহী আমলা গোষ্ঠীসমূহ (সামরিক ও বেসামরিক) কর্তৃক অধিগ্রহণ। এটা ছিল জাতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিশ্বায়নমুখীকরণের যাত্রাবিন্দু। এটা ছিল, রাজনীতির লঘূকরণ ও দুর্বৃত্তায়ন, ঘুষ-কমিশন-চুরি-চাঁদার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানের আইনি ও প্রথাগত কার্যবিধি ও সংহতির বিনষ্টি এবং তরুণ ও যুব শক্তিকে বিভ্রান্ত ও কলুষিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির উপর বৈশ্বিক পুঁজির আধিপত্য অবারিতকরণের বিনিময়ে অরাজনৈতিক ও রাজনীতিবৈরী শক্তিনিচয়ের ক্ষমতারোহণ বদ্ধমূল করার কৃৎকৌশল। জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্যতা থেকে এভাবে উন্মেষ ঘটে আমলা-মোল্লা-দুর্বৃত্ত বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সংযুক্ত ক্ষমতা কাঠামো ও শাসকগোষ্ঠীর। এ শাসকগোষ্ঠীর শাসনের পুনরুৎপাদন কার্যকর করা হয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর উপদেশ-নির্দেশের ছকে রাষ্ট্রীয় খাতসমূহের বিরাষ্ট্রীয়করণ ও মুক্তবাজার বিশ্বায়ন, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিধ নির্বাহী কর্মকর্তা-পরামর্শক-ব্যবস্থাপক-প্রচারক-প্রকাশকমণ্ডলীর অলিগার্কি শক্তিশালীকরণ, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সেভাবে স্বাধীনতালব্ধ বহুমুখী জাতীয় সঞ্চয়ন ও সমৃদ্ধির সুযোগগুলিকে মুষ্টিমেয়র সীমাহীন দুর্নীতি ও দুবৃত্ত সঞ্চয়নের সুযোগে পর্যবসিত করার মাধ্যমে। 'লিয়জন লেফটেনেন্ট'-বর্গের সরকারের রূপে মুৎসুদ্দি চরিত্রের এই শাসকগোষ্ঠীর শাসন থেকে সৃষ্টি হয় সমাজের বিত্ত-ক্ষমতা-বল-বুদ্ধির

একচেটিয়া অধিকারভোগী এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও ঐসবের অধিকার-বঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৈরগ্রস্ত সামাজিক বিভাজন। '৭৫-উত্তর বাংলাদেশে বিশ্বায়নের বিস্তার মূলত এই বৈরগ্রস্ত সম্পর্কেরই বিস্তার। ভোগ-বণ্টনের দিক থেকে না হলেও, স্বাধিকারের দিক থেকে যে কোন ধরনের স্বাভাবিক একটি পরিবারের আদলেই সংগঠিত হয় যে কোন ধরনের উল্লেখযোগ্য একটি উন্নত সমাজ বা দেশ। দেখা যায়, পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এই স্বাধিকারের প্রতিপক্ষ হলো বিশ্বায়ন। কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে যেমন পরিবার প্রধান, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেশের শাসকগোষ্ঠীর নীতি-আদর্শগত অবস্থান বা দিকস্থিতিই নির্ধারণ করে ঐ দু'য়ের যে কোন একটির প্রাধান্য। '৭৫-উত্তর বাংলাদেশে কার্যত মূল বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন নানাবিধ শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তে স্বাধিকারের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বায়নের প্রাধান্য। এর ব্যবহারিক রূপ ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা যায়।

মধ্য '৭৫-এর রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের পরে সামরিক শাসনাধীন জাতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে জাতীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো হলে অল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশ পরিণত হয় সম্পূর্ণভাবে এক বহির্নির্ভর ও বহির্মুখাপেক্ষী রাষ্ট্রে। বাংলাদেশের এক সর্বাগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদ উদ্ভূত অবস্থার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, একটি আমদানি নীতি ঘোষণা, একটি খাদ্যনীতি তৈরি বা এমনকি কতজন শিশুর জন্মগ্রহণ করা উচিত সে-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকগণ ওয়াশিংটন, লন্ডন, টোকিও, বন এবং প্যারিসের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। উন্নত বিশ্বের সিদ্ধান্ত দাতাগণ ঐভাবে তাদের নিজের হাতে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারের জীবন-রজ্জু ধরে রাখে এবং দু'দশক আগে কল্পনাও করা যেত না এমনভাবে তারা দেশটির ভাগ্য-বিপর্যয়ও ঘটাতে সমর্থ। বিদ্যমান সামাজিক বিন্যাস-ব্যবস্থায় তাই বাংলাদেশ জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিছক এক বিনম্র কল্পকথাই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ...।' (Sobhan, 1982 : 226)। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের কাছে এভাবে সমর্পিত সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের ধ্বংস। ১৯৭৫-এর অব্যবহিত পরে ছয়টি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত শিল্পকারখানাগুলি বিশ্বায়নবাদী বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি সংস্থার চাপে বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়ায় বিশিল্পায়িত হয়। বহু যুগব্যাপী সর্বোৎকৃষ্ট মানের কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে দেশ বিশ্বের বাজারে আধিপত্য করেছে এবং যখন পরিবেশগত কারণে বিশ্বব্যাপী পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন বাংলাদেশে পাটকলের সংখ্যা ৮২ থেকে অবনমিত হয়েছে ১৪টিতে। পাট খাত সমন্বয় ঋণ (JSAC) চুক্তির নামে বিশ্বব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত ১৯৯৪ সালের এক চুক্তির পরিণামে ২০০২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার বন্ধ ঘোষণা করে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল, আদমজি জুট মিলস। ২০০৭ সালের আগস্টে খুলনার পিপলস জুট মিলসসহ চারটি ও চট্টগ্রামে দুটি বৃহৎ পাটকল বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাটকল শ্রমিকের

সংখ্যা ছিল ২,৫০,০০০। বর্তমানে নিয়মিত ও খণ্ডকালীন নিয়োগসহ এসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে অনধিক ৪৫,০০০-এ। বিপরীত দিকে, (বায়ো ডিগ্রেডেবল আঁশ হিসেবে) সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব হওয়ায় বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত সামগ্রীর যে বিপুল চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পাট চাষ ও পাটকলের সংখ্যা। (*The Daily Star*, August 19, 2007)। বস্তুত, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে হবে পাট চাষ থেকে রপ্তানি ও পাটকল সংশ্লিষ্ট অন্যবিধ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কয়েক কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের দিক থেকেও। অন্যদিকে, এভাবে পাটসহ একের পর এক অন্যান্য শিল্প-কারখানা বন্ধ করে উৎপাদনশীল খাতে দেশীয় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সংকুচিত করার ধ্বংসাত্মক তৎপরতার সাথে ঐভাবে বৃদ্ধি পায় বৈধ ও অবৈধ পথে ঐ ধরনের শিল্পজাত পণ্যের আমদানির জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীলতা। (দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ : ২০০৫)।

সাধারণভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশ্বিক সংবদ্ধতা একচেটিয়াবাদী কাঠামো ও সর্বকালীন অসম বিকাশের প্রবণতা আর বৈদেশিক বিনিয়োগ-কাতর মুৎসুদ্দি 'বাহন ও ভূমি' সদৃশ দেশগুলির প্রসঙ্গে পল ব্যারন ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের উপর বিদেশী উদ্যোগের মুখ্য প্রতিক্রিয়াটি নিহিত থাকে বণিক পুঁজিবাদের আধিপত্যকে দৃঢ় ও শক্তিশালীকরণ, তার শিল্প পুঁজিবাদে রূপান্তরকে ধীরগতিসম্পন্নকরণ বা প্রকৃতপক্ষে ঐ রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করার মধ্যে।' (Baran, 1968 : 194)। ঐভাবে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানাগুলি যে গতিতে বন্ধ হয়েছে সে গতিতেই বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশের পেশাগত ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বৈধ-অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার তথা বণিক পুঁজিবাদী আধিপত্যের ক্ষেত্রে। দেখা যায় : 'এগুলির মধ্যে আবার যেগুলোতে আয় বেশি, অস্ত্র-মাদকদ্রব্য ব্যবসা বাদে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, যোগাযোগ ও বিদেশি তহবিল প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহৎ নির্মাণ ফার্ম, বৃহৎ আইন ফার্ম, ঠিকাদারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনি প্রতিষ্ঠান, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার, সুপার মার্কেট, বিদেশি ডাক্তার ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত ক্লিনিক, স্পোকেন ইংলিশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বায়িং হাউজ, হস্তশিল্প বিপণন, এনজিও, ভিসা-ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, রফতানিমুখী দেশি-বিদেশি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মুদ্রা ও হুন্ডি ব্যবসা ইত্যাদি ...। লক্ষণীয় যে, নতুন পেশাগুলোর সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনশীল ভিত্তির সম্পর্ক ক্ষীণ। দেশীয় তৎপরতায় যে পেশাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো তুলনায় অনেক ভঙ্গুর।' (মুহাম্মদ, ২০০৫ : ৫৩-৫৪, ৫৬)।

দুর্বল ভিতসম্পন্ন বা ভঙ্গুর হলেও বিশ্বায়নজাত নতুন (শহুরে) পেশাসমূহের সাধারণ বৈধতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। কিন্তু সেগুলোর সমান্তরালে বাংলাদেশে 'অনুপার্জিত আয়' বা 'কালো টাকা' দুর্বত্ত সঞ্চয়নের অসীম সুযোগও

অবারিত হয়েছে বিশ্বায়নের সাথে। এর বিশটি উৎস উল্লেখ করেন অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ, যেগুলির মধ্যে রয়েছে : অস্ত্র উৎপাদন, আমদানি, ক্রয়-বিক্রয়; জমি, সম্পত্তি দখল; ঘুষ, রাজস্ব ফাঁকি; সিস্টেম লস নামে সম্পদ লুণ্ঠন; বেসরকারীকরণের নামে সম্পদ দখল, পাচার; ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি; আমদানি-রফতানির নামে ভুয়া কারখানা দেখিয়ে সরকারি ভর্তুকি আত্মসাৎ; দুর্বল ও কারচুপিমূলক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তেল-বিদ্যুৎ কোম্পানিসহ বহুজাতিক সংস্থার গোপন কমিশন; ক্ষতিকর প্রকল্প পাশের বিনিময়ে 'বিদেশি সাহায্য-দাতাদের কমিশন; বিভিন্ন সংস্থার বৃহৎ ক্রয়-বিক্রয় সংশ্লিষ্ট জালিয়াতি; মাদক ব্যবসা; নারী ও শিশু পাচার; যৌন বাণিজ্য; চোরাচালান; খাদ্য ও ওষুধের ভেজাল, নকল; উন্নয়ন-কাজ-শিক্ষা-ত্রাণ খাতের বরাদ্দ আত্মসাৎ ইত্যাদি। নিছক অর্থ-বিত্তের উৎস বলে প্রতীয়মান হলেও এগুলি সামগ্রিক অর্থনীতি, রাজনীতি সহ সর্ব প্রকার অপরাধবৃত্তি, নির্যাতন, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও নৃশংসতার সাথে যুক্ত এবং পরস্পরের পরিপূরক ও পুনরুৎপাদক প্রক্রিয়া। শুধু অর্থের হিসেবে তথা অবৈধভাবে কুক্ষিগত, সরকারি হিসাব ও করব্যবস্থা বহির্ভূত আয় হিসেবে এই দুর্বৃত্ত সঞ্চয়নের পরিমাণ ও প্রভাব পরিমাপ করা দুঃসাধ্য বৈ নয়। ইউএনডিপি, এফবিসিসিআই প্রভৃতি উৎস পর্যালোচনা করে অনুমান করা হয় যে চলতি বাজার দরে ২০০১–২০০২ সালের ২ লক্ষ ৭১ হাজার ১২৪ কোটি টাকার জিডিপি-এর ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকাই ছিল 'কালো টাকা'—অর্থনীতির 'স্ট্রেঙ্গার হাফ'। (দ্রষ্টব্য, ঐঃ ৯৯-১০১)। অন্য কথায়, বিশ্বায়ন তাড়িত বাংলাদেশের বাজার অর্থনীতির প্রধান শক্তি হলো কালো টাকা, এবং পুঁজি হিসেবে স্বকীয় দুর্বৃত্ত চরিত্র নিয়ে সার্বিক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমেই এটি আপন পুনরুৎপাদন ও শাসন কার্যকর রাখে। এই দুর্বৃত্ত পুঁজির বা 'কালো টাকার' আদি বা প্রাথমিক সঞ্চয়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত দেখিয়েছেন ১৯৭১–৭২ থেকে ১৯৯৮–৯৯-এর প্রায় তিন দশক সময় কালে লব্ধ মোট বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের পরিমাণ অন্যূন ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এ টাকার ২৫ শতাংশ হস্তগত হয়েছে উপদেষ্টা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এজেন্টদের; ৩০ শতাংশ আত্মসাত করেছে স্থানীয় আমলা ও রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্টস, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা; ২০ শাতংশ লাভ করেছে শহর ও গ্রামের ধনীরা; আর ২৫ শতাংশ বা মাত্র এক-চতুর্থাংশ পৌঁছেছে গরিবদের কাছে (গ্রামীণ ঋণগ্রহীতা, খাদ্যের বিনিময়ে কাজের শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, ইত্যাদি)। (বারকাত, ২০০১ : ৫)। বর্তমানে, বাংলাদেশে সকল উৎসের বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের পরিমাণ মোট জিডিপি এর অনধিক ৩ শতাংশ। কিন্তু 'দাতা গোষ্ঠী' ও তাদের মিশন প্রধানসহ বিশ্ব সংস্থাদির প্রতিনিধিদের সুপ্রকাশ্য উপস্থিতি, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সভা-সাক্ষাৎকার, উপদেশ, সুপারিশ বা সার্বিক নীতি-নির্ধারণী বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে প্রদর্শিত খবরদারির পরিমাণ প্রায় শতভাগ। আর, পৃথকভাবে, এদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যাদানকারী মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা বা অনুরূপ সরকারি ব্যক্তিদের কাছে এদেশের সম্পদ, সরকার, গণতন্ত্র, মায় ধর্ম, সবকিছু প্রাত্যহিক তদারকির ব্যাপার। বিশ্বায়নবাদীদের ইচ্ছার কাছে জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের এই পরিণতিই রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশে বিশ্বায়নের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট দিক।

উপর্যুক্ত পরিণতি তথা আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের কারণেই, উদাহরণস্বরূপ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার বাপেক্স-এর সাফল্য বহুগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বিদেশি তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থের অনুকূলে ত্রুটিপূর্ণ ও 'উৎপাদন-বণ্টন-চুক্তি' স্বাক্ষরের দিকে। ২০০২ সাল পর্যন্ত এর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় : চুক্তি বাস্তবায়নের আগে পেট্রোবাংলা ১০টি গ্যাস ক্ষেত্র ও ১টি তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করে; এতে খরচ হয় মোট ৯০০ কোটি টাকা; নিয়মিতভাবে বছরে গড়ে ২০০ কোটি টাকা মুনাফা লাভ করে; এবং ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত থাকে। আর, চুক্তি বাস্তবায়নের পর নতুন তেল-গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার থাকে শূন্য; ১৯৯৮ সাল থেকে ৩ বছরে পেট্রোবাংলা লোকসান দেয় ১,৮০০ কোটি টাকা; এবং ১৯৯৮ সাল থেকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পায় ৬০ শতাংশেরও বেশি। (মুহাম্মদ, ২০০৫ : ৯৭)। মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল/ ইউনোকাল/ শেভরন-এর অধীন মাগুরছড়া গ্যাস ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের ১৪ই জুন এবং কানাডীয় কোম্পানি নাইকো-এর অধীন ছাতক-ট্যাংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে ২০০৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণে দেশের বিপুল গ্যাস সম্পদ ধ্বংস হয়। রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী দুটি গ্যাস ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫,৭২০ কোটি টাকা ও ৭,২৬০ কোটি টাকা। কিন্তুক্ষতিপূরণ হিসেবে এই পরিমাণ অর্থই (মোট ১২,৯৮০ কোটি টাকা) অনাদায়ী থেকে গেছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্নীতি-দুর্বলতা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির শক্তির দাপটে। (মুহাম্মদ, ২০০৭: ৫৮)। বস্তুতপক্ষে, পেট্রোবাংলার তথ্য অনুসারে বিদেশি কোম্পানির (দেশীয়) গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালের 'মার্চ মাসের আগে দেশে উৎপাদিত মোট গ্যাসের এক-তৃতীয়াংশ আসত বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে। অর্থাৎ ৩৩ ভাগ। বাকি ৬৭ ভাগ গ্যাস আসত সরকারের বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু বর্তমানে বিদেশি কোম্পানিগুলির [কেয়ার্ন-সাঙ্গু; শেভরন-বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ; নাইকো-ফেনী; তাল্লো-বাঙ্গুরা] গ্যাসের পরিমাণ ৪২ শতাংশ। তিন মাসের মধ্যে (বিবিয়ানায় শেভরনের আরো ৩০ কোটি ঘনফুট উৎপাদন যোগ হলে) এটা বেড়ে দাঁড়াবে ৫৬ শতাংশে। পেট্রোবাংলা আইওসি-গুলির প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস ২.৭ ডলার থেকে ২.৯ ডলার দামে কিনে সাধারণ গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করে, যার ৭০ ভাগ ব্যয় হয় বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে—সার কারখানায় গড়ে ১ ডলার ও বিদ্যুৎ খাতে ১.৫ ডলার দামে অর্থাৎ লোকসান দিয়ে। সুতরাং আইওসি-এর গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা যত বাড়বে

পেট্রোবাংলার লোকসানও তত বাড়তে থাকবে।' অধিকতর আশঙ্কার দিকটি হল এই ধারায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ-সার সহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে আইওসিগুলির কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে পারে। (*সমকাল*, আগস্ট ২০, ২০০৭)।

'৭৫-উত্তর সামরিক, আধা-সামরিক শাসকগোষ্ঠীর মুৎসুদ্দি শাসনজাত দুর্বৃত্ত উন্নয়ন ধারায় জাতীয় উদ্বৃত্ত ও জাতীয় সম্পদের যে নিরুৎপাদক আত্মসাৎ এবং দুর্বৃত্ত ও বহির্মুখী সঞ্চয়ন কাঠামো তৈরি হয়েছে, সেটাই বাংলাদেশে বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে উপরোক্ত আশঙ্কার উৎসও সেখানে নিহিত। ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক বঞ্চনা (৪০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে—GOB, 2007 : 172) ও বিভক্তি (এনজিও), ধর্মাশ্রয়ী আদর্শিক নিয়ামন (রাজনৈতিক ইসলামবাদিতা), যুবশক্তির এক বড় অংশের নৈতিক বিচ্যুতি (অস্ত্র-সন্ত্রাস-মাদকাসক্তি, মোবাইল বিনোদন, বিদেশ পলায়ন), রাজনীতির পরিপূর্ণ ব্যবসায়ন, ইত্যাদি ঐ কাঠামোর স্থায়িত্ব এবং ঐ আশঙ্কার প্রবলতা বৃদ্ধি করে। এই পটভূমিতে জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংসের বিশ্বায়নবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় হয় 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। ২০০২ সালের মার্চে ঢাকা-বিবিয়ানামুখী ও অক্টোবরে ঢাকা-চট্টগ্রামমুখী লংমার্চ কর্মসূচির আয়োজন করে এই কমিটি যেখানে 'রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে' জাতীয় সম্পদ রক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অংশগ্রহণকারী অগণিত মানুষ। লংমার্চের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত চেতনা সঞ্চারিত হয় বৃহত্তর গণমানসে এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরবর্তী কয়েকটি গণঅভ্যুত্থানের ঘটনায়। বিশ্বায়ন-উদ্দীপ্ত কৃষি উৎপাদনের পুঁজি উপকরণাদির দুর্নীতি দুষ্ট কৃত্রিম সংকট কৃষি উৎপাদকদের নিয়মিত উৎপীড়নের কারণ সৃষ্টি করে। সারের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে আঠার জনকে একসাথে প্রাণ দিতে হয়। বিদ্যুতের দাবিতে পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অবদমন করার জন্য চরম দুর্নীতি ও বৈষম্যমণ্ডিত বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সরকার অবলম্বন করে সহিংস পন্থা। এরূপ প্ররোচনা থেকেই সংঘটিত হয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জের কানসাট গণ-অভ্যুত্থানের। কানসাটে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ ও ২৩ তারিখের পুলিশ-বিডিআর-র‍্যাবের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে এপ্রিল মাসের ৬ ও ১২ তারিখে; সেখানে হত্যা করা হয় ৯ জন আন্দোলনকারীকে আর জীবনের মত পঙ্গু করে দেওয়া হয় আরো অনেককে।

নানা হয়রানিসহ পৃথিবীর সর্বনিম্ন মজুরি ও অনিয়মিত মজুরির বিনিময়ে বিশ্বায়ন-তাড়িত ও নারী শ্রম-ঘন পোশাক শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশের ২২ লক্ষাধিক শ্রমিক। রুদ্ধ-ফটক, বহুতল কারখানা ভবনে কখনো আগুনে পুড়ে, কখনো ত্রুটিপূর্ণ বহুতল কারখানা ভবন ধসে পড়ে, ইতোমধ্যে প্রাণ দিয়েছে অগণিত শ্রমিক। সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যূনতম বাঁচার মত মজুরির দাবিও দীর্ঘদিন অগ্রাহ্য হয়েছে; পরিণামে, ২০০৬ সালের মে-তে রাজধানী জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটে শ্রমিক অভ্যুত্থানের।

শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ঐ দাবানলে ধ্বংস হয় বহু কারখানা। অবদমনের চেষ্টার পর আলোচনার মাধ্যমে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হলেও তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই শ্রমিকদের অসন্তোষ এই বিরাট রপ্তানিমুখী শিল্পকে অনিশ্চয়তার মধ্যেই আটকে রেখেছে। পোশাক শিল্পের অভ্যুত্থানের পর বিশ্বায়নবাদী বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক কয়লা সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান ঘটে কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ দিনাজপুরের ফুলবাড়ি এলাকায়। এই এলাকার অত্যুচ্চ মানের বিপুল কয়লা ভাণ্ডার লুণ্ঠনের জন্য সরকার চুক্তি করেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশনের সাথে। এ চুক্তি হয়েছিল মাত্র ৬% রয়ালটির বিনিময়ে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার আদিবাসীসহ অন্যূন আড়াই লক্ষ মানুষকে ভিটে-মাটি জমি-জমা থেকে উচ্ছেদ করে, এলাকার পরিবেশ ধ্বংস করে, এশিয়া এনার্জি কর্তৃক উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (ওপেন পিট মাইনিং) কয়লা উত্তোলনের পক্ষে। এই অমানবিক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপচুক্তির বিরুদ্ধে ফুলবাড়ির জনগণের আন্দোলন অবদমনে নিযুক্ত পুলিশ-বিডিআর-এর গুলিতে নিহত হয় তিন জন আন্দোলনকারী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ২০০৬ সালের ২৬ ও ২৭শে আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণ রুখে দেয় ঐ চুক্তির বাস্তবায়ন। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ : ২০০৭)। ২০০৬ সালের ৩০শে আগস্ট সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পাদিত যে ৬-দফা চুক্তির মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছিল তার মধ্যে তখন এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ি ত্যাগসহ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান এবং নিহতদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যাপারে পরবর্তী সরকারের (১/১১ সরকার) নিশ্চয়তা ছাড়া অবশিষ্ট শর্তগুলি পূরণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, 'চুক্তি বাতিলের' শর্তটি পূরণ না হওয়ার সুযোগে দেশীয় গণমাধ্যম, আমলা-উপদেষ্টা-ব্যবসায়ীদের নানাভাবে প্রভাবিত ও ব্যবহার করে এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ি এলাকায় পুনরায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পক্ষে জোর প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে। (*New Age,* August 18, 2007)।

বিশ্বায়নের অজুহাতে জাতীয় সম্পদ, সিদ্ধান্ত ও সামর্থ্যের শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা বহুজাতিক সংস্থাদির কাছে বিকিয়ে দিয়ে মুৎসুদ্দি ক্ষমতাশালীরা নিজেরা যতটা শক্তিশালী হয়েছে ততটাই শক্তিহীন হয়েছে দেশ ও জাতি। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধে উপর্যুপরি পাঁচবার তারাই দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। যুগপৎভাবে ঐ সময় ইসলামবাদী জঙ্গিদের বোমার আঘাতে রক্তাক্ত, ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে জাতির সাংস্কৃতিক থেকে রাজনৈতিক অঙ্গন, বিচারালয় থেকে আদালত প্রাঙ্গণ আর, সাধারণ মানুষের জীবন। সাযুজ্যপূর্ণভাবে, ক্ষমতাসীন মদতদাতাদের নিজেদের সীমাহীন দুর্বৃত্ত সঞ্চয়নের সমান্তরালে ঐ রাজনৈতিক ইসলামবাদীদের নিজস্ব সঞ্চয়ন ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে বিপুলভাবে। 'মৌলবাদের অর্থনীতি' নামে এক বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত দেখান যে, 'বর্তমানে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের অর্থনীতির নীট বাৎসরিক মুনাফা প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা ...

মৌলবাদীদের অর্থনীতির খাতওয়ারি ধরন মূলধারার অর্থনীতির সাথে যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ।' (উদ্ধৃত, *The Daily Star,* April 22, 2005)। বলা যায়, বাংলাদেশে বিশ্বায়নের এরূপ ব্যতিক্রমি বিকাশ সংঘটিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিসরে সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের মধ্যেকার সমসাময়িক বৈর সম্পর্কের বিপরীতে বহুলাংশে অবৈর সম্পর্কের আবহে (মার্কিন অভিধায় বাংলাদেশ একটি 'মডারেট মুসলিম স্টেট')। বস্তুত এই আবহেই এখানে সর্বাত্মক প্রসার ঘটেছে মৌলবাদী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানাদির; নিকৃষ্টতম বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে গুণগতভাবে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে, গড়ে তোলা হয়েছে উচ্চ ব্যয়সাপেক্ষ বিচিত্রমানের ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি শিক্ষাবাণিজ্য বিতানসমূহ। এই ধারার বিশ্বায়নেরই প্রভাব ও প্রসার পরিলক্ষিত হয় স্বাস্থ্য, বিচার, আইন-শৃঙ্খলা, বাজার, খাদ্য, বস্তি বসতি তথা গোটা সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনব্যাপী। অন্যদিকে, বিদেশে কর্মরত শ্রম-শক্তির 'রেমিটেন্স' বৈদেশিক আয়ের সর্বোচ্চ উৎস হওয়া সত্ত্বেও ২০০০–২০০৫ সময়কালে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পেয়েছে ৪.৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেনডিচার সার্ভে'-এর তথ্যের ভিত্তিতে বিআইডিএস পরিচালিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে (গড় হার ৪.৪ শতাংশের বিপরীতে) সর্বনিম্ন আয় উপার্জনকারীদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হারের হ্রাস ঘটেছে ৮.১ শতাংশ। বলা হয়েছে, দেশে বেকারত্বের ক্ষেত্রে এই বর্ধিত অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ অ-কৃষি সংস্থাগুলিতে মোট কর্মসংস্থানের ব্যাপক হ্রাস যেখানে সংস্থা-পিছু হ্রাসের হার ৩০ শতাংশ। ব্যয়বৃদ্ধিকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (উদ্ধৃত, *The Daily Star,* August 18, 2007)। এভাবেই আমলা-মোল্লা-দুর্বৃত্ত বুর্জোয়া শাসনাধীনে দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ আর দারিদ্র বেকারত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে বিশ্বায়ন-তাড়িত বাংলাদেশ।

দুর্বৃত্ত বুর্জোয়া রাজনীতির উদ্ধার অভিযান ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ঐক্যের প্রেরণা

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নজাত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর্যুপরি শিকার হচ্ছে প্রতি বছর। জাতিসংঘের 'ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০৭' রিপোর্টে এই দুর্যোগের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছে সম্প্রতি। ঐ সূত্রে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ উষ্ণায়নজনিত সংকট মোকাবিলায় বর্ধিত আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছে। কারণ, 'বঙ্গোপসাগরের কেবল এক মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে আমাদের ৩০ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাবে।' (*The Daily Star,* September 29, 2007)। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সংকটের মোকাবিলা যুগপৎ জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক্ষেত্রে জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের দিক থেকে বাংলাদেশের নিজের অবস্থানই খুব স্পষ্ট নয়। বহির্মুখী চেতনা ও সম্পর্ক সূত্রে বৈদেশিক ঋণ-

ত্রাণ-দান-উপদেশ-নির্দেশের ছকে তৈরি নানা উন্নয়ন কৌশল বা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের মত বিষয়াদিকে ঘিরে আবর্তিত রাষ্ট্রীয় কর্মবৃত্তির মধ্যেই এর কারণ নিহিত। বলতে গেলে, পরোক্ষভাবে হলেও এর স্বীকৃতি ও উপলব্ধির তাগিদ রয়েছে ২০০৬ সালের নবেল শান্তি পুরস্কারের মধ্যে। শুরুতে দরিদ্র লাঘব এবং পরে দারিদ্র্যকে ব্যাংকিং ও বহুজাতিক সংস্থার সাথে ব্যবসার পুঁজি ও প্রধান প্রেরণা হিসেবে ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবন তথা 'ক্ষুদ্র ঋণের' উদ্ভাবনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস ২০০৬ সালের 'নবেল শান্তি পুরস্কার' লাভ করেন। ক্ষুদ্র-ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও শান্তি নিশ্চিতকরণের নামে প্রদত্ত এই পুরস্কার, খাদ্যাভাব দূর করে বিপ্লবের বিস্তার রোধ করার নিমিত্তে (রকফেলার ফাউন্ডেশন-এর অর্থানুকূল্যে মেক্সিকোয় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে) উচ্চ ফলনশীল গমের বীজ উদ্ভাবনের জন্য নরম্যান বারলোগ-কে প্রদত্ত নবেল পুরস্কারের সাথে তুলনীয় হতে পারে। অবশ্য, উচ্চ ফলনশীল বীজের মত বহুমাত্রিক ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত না হলেও বাংলাদেশের এই উদ্ভাবনেরও বিশ্বায়ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ সমাজের এক চরম সংকট ও অনিশ্চয়তার কালে ঘোষিত এই পুরস্কারের আনন্দ, অথবা, এর প্রেরণায় নবেল বিজয়ী খোদ ড. ইউনূস কর্তৃক গৃহীত স্বীয় নতুন দল (নাগরিক শক্তি) গঠনের উদ্যোগসহ নানাবিধ রাজনৈতিক তৎপরতা অচিরেই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এটা ছিল চারদলীয় জোট সরকারের অধীনে ২০০১-২০০৬ সালের দুর্নীতি-দুর্বৃত্ততা-সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের এক অখণ্ড দুঃশাসনের সাংবিধানিক পরিসমাপ্তির কাল। কিন্তু তখনো '৭৫-উত্তর কালের সর্বাপেক্ষা দুর্বিষহ এই নির্বাচিত স্বৈরাচার সংবিধান উল্লঙ্ঘন-পূর্বক দলীয় রাষ্ট্রপতির 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২২শে জানুয়ারি, ২০০৭-এর সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। ৪-দলীয় জোট সরকারের বিরোধী ১৪-দলীয় রাজনৈতিক জোট, পরবর্তীতে আরো সম্প্রসারিত কলেবরে মহাজোট গঠনের মাধ্যমে এই অবস্থার মোকাবিলায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুললে উদ্ভূত সংঘাতময় পরিস্থিতির পটভূমিতে রাষ্ট্রপতি নতুন সামরিক-অসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সাঅতস) তথা ১/১১ সরকার গঠনের মাধ্যমে নিজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি ঘটায়।

বিরোধী মহাজোটের নেতৃত্বদানকারী দল (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ—আ.লী.) ১/১১ সরকার বা সাঅতসের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায় তাদেরই আন্দোলনের ফসল হিসেবে—এমনকি আ.লী. নেত্রী শেখ হাসিনা এ সরকারের সব কৃতকর্মকে ভবিষ্যতে বৈধতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে : 'নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় গেলে আ. লী. বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকলাপকে বৈধতা প্রদান করবে, কেননা এটা জনগণের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছে।' (*The Daily Star*, March 16, 2007)। এটা করতে গিয়ে দৃশ্যত এই নেতৃত্ব নিজের অজ্ঞাতে এক 'ট্রোজান হর্স'কেই আবাহন করে এক অভাবিত মূল্যের বিনিময়ে, তথা মহাজোটের (৩১-দফা সংস্কার প্রস্তাবসহ) আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য

ও ক্ষমতায়নের সম্ভাবনাটির বেহাত হওয়াকে বৈধতা দানের মাধ্যমে। '৭৫-এর অভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী ক্ষমতা-কাঠামোর চরিত্রকে বুঝতে না চাওয়া বা তার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া, অথবা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাজনৈতিকভাবে বিসর্জন দিয়ে বিশ্বায়নবাদী মুৎসুদ্দি-ক্ষমতার উন্মত্ত পশ্চাদ্ধাবনের মধ্যেই হয়ত আ.লী.-র এরূপ আচরণের ব্যাখ্যা নিহিত। হতে পারে, এরই প্রেরণায় ব্যতিক্রম পটভূমিতে উদ্ভূত ব্যতিক্রম সাঅতস তার কার্যপরিধিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে নেয়। নির্বাচন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, দুর্নীতিদমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে ৪-দলীয় জোট সরকার যেভাবে সম্পূর্ণ দলীয়করণের মাধ্যমে অকার্যকর করে দিয়েছিল, সাঅতস তার প্রতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে ঐসবের শীর্ষ পদগুলিতে নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগদানের মাধ্যমে। বিচার বিভাগকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক্‌করণের উদ্যোগও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আর, এসবের সমান্তরালে দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে এর গৃহীত পদক্ষেপ দৃশ্যত এক ঐতিহাসিক ঘটনা, এক অভাবনীয় অভিযান হিসেবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এর ফলাফলগুলির ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠে দুর্নীতির বাহন রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির বহুমাত্রিক কাঠামো ও কার্যপ্রণালীবিধি এবং নীতিগত ভিত্তি ও দিকস্থিতির স্থিতাবস্থা বজায় রেখে 'রাজনীতি'কে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে কিছুটা ভারসাম্য, কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক চাপ প্রয়োগ, কিছুটা নির্বাচনমূলক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রধান দুটি দলের শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা, অনুগত নেতৃত্ব এমনকি অনুগত নতুন রাজনৈতিক দল (যেমন, ফেরদৌস কোরেশীর নেতৃত্বে গঠিত পিডিপি) সৃষ্টির প্রচেষ্টার দ্বারা। অন্যদিকে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করার অভিপ্রায়ে ঠুনকো অজুহাতে ও দ্বৈত-নীতির অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্রদের লাঞ্ছিতকরণ; বৈদেশিক দাতা-ব্যবসায়িক সংস্থাসমূহ ও কূটনীতিকদের নিরবচ্ছিন্ন হস্তক্ষেপ; দ্রব্যমূল্যের দুর্বিষহ ঊর্ধ্বগতি রোধে ব্যর্থতা; নির্বাচন কমিশন-এর নির্বাচনী প্রস্তুতির বহুমুখী বা বিভ্রান্তিকর তৎপরতা ও শ্লথগতি; স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল, ৪-দলীয় জোট সরকারের শরিক, ধর্মাশ্রয়ী অপশক্তিসমূহের প্রতিভূ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি সুপ্রকাশ্য সহনশীলতা প্রদর্শন; দুর্নীতির অসামরিকীকরণ ও নির-আমলাকরণ; রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ ও দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্নীতির মুখ্য অ-রাষ্ট্রিক উৎস ও এজেন্ট—ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী 'ট্রুথ কমিশন' গঠনের উদ্যোগ, ইত্যাদিও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অধিকন্তু, দেশে জরুরি অবস্থা ও বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীসমূহের শীর্ষ পদসমূহের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও বর্ধিতকরণ (মে ২৬, ২০০৭) সহ 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ দেশকে দুর্নীতিমুক্তকরণের অভিপ্রায়ের সাথে, দেশ শাসনে সশস্ত্রবাহিনীর অংশগ্রহণের অভিপ্রায়টিকেও স্পষ্ট করে তোলে। এটা '৭৫-উত্তর সরকার ও রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতির চেয়ে আরো বেশি কিছু বলেই

প্রতীয়মান হয়। 'বাংলাদেশের নিজস্ব গণতন্ত্রের ধরন,' 'ক্ষমতার ভারসাম্য' (এপ্রিল ৩), 'পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের মত সেনাবাহিনীও সর্বদা সরকারের সঙ্গে থাকে' (আগস্ট ২৯), বা 'সেনাবাহিনী সরকারের অংশ' সম্পর্কিত সেনাপ্রধানের বিভিন্ন সময় প্রদত্ত খোলামেলা বক্তব্যের মধ্যেও এর প্রতিফলন রয়েছে বৈ কি। (*The Daily Star,* October 17, 2007.)।

সাঅতস-এর প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ ২৮শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে নিজ দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেন যে, 'সংকট নিরোধে বাংলাদেশ সিভিল-মিলিটারি সহযোগিতার একটি কার্যকর মডেল-এর প্রতিনিধিত্ব করে'। সংকট ব্যবস্থাপনায় আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক সংকট-পীড়িত, নবীন গণতন্ত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।' একইভাবে প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের 'কমপ্রিহেনসিভ ডিপ্লয়মেন্ট প্যাকেজ' সেবার সামর্থ্যের কথাও ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে সৈন্য সরবরাহে আরো সুষম প্রতিনিধিত্বের আবেদন জানান। (*The Daily Star,* September 29, 2007)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হত্যার পর '৭৫-উত্তরকালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দৃশ্যত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল যদিও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর যে বিপুল পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা, বাংলাদেশে সেটা ঘটেছে কেবল নেতিবাচক অর্থে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সর্বসাম্প্রতিক সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফ যেভাবে দুই প্রধান দলের দুই নেতা—বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরীফকে দেশান্তরে পাঠিয়ে সামরিক শাসনের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছিল, ১/১১ এর পর বাংলাদেশের সাঅতস বা সামরিক-অসামরিক তত্ত্ববধায়ক সরকারেও অনুরূপভাবে দুই প্রধান দলের দুই নেত্রীকে দেশান্তরে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে, সাঅতস দুজনকে দুর্নীতির অভিযোগে (বেগম খালেদা জিয়াকে পরে—প্রকৃত অভিযোগসমূহের সূত্রে এবং শেখ হাসিনাকে আগেই, দৃশ্যত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে) সাবজেলে অন্তরীণ করে কথিত 'মাইনাস টু ফরম্যুলা'র ভিত্তিতে দলীয় রাজনৈতিক সংস্কারের নানামুখী চাপসহ নতুন অনুগত দল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাহ্যত এসব কিছুর মধ্যে যা প্রতিফলিত হয় তা হলো (ব্যবহারিক প্রয়োজনে না হলেও আদর্শিক কারণে) শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর করে দিয়ে (২০শে জুলাই, ২০০০-এ কোটালিপাড়ায় হাসিনার সভা মঞ্চের পাশে ৭৬ কে. জি. ওজনের বোমা পুঁতে রাখা, ২১শে অগাস্ট, ২০০৪-এ ঢাকায় হাসিনার সভামঞ্চে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা, ইত্যাদিও প্রাসঙ্গিক), বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪-দলীয় জোট সরকারের ভয়াবহ দুঃশাসনের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিএনপি নেতৃত্বের রদবদল ঘটিয়ে '৭৫-উত্তর রাষ্ট্রক্ষমতা কাঠামোকে সংহত ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে 'সিভিল-মিলিটারি কোওপারেশন মডেল'টিকে কোন উপায়ে রাজনৈতিক বৈধতার আওতায় নিয়ে আসার সংকল্প। এটা ভাবা হয়ত অমূলক নয় যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ভৌগোলিক অবস্থান-নির্ধারিত সীমিত

প্রতিরক্ষা সামর্থ্য অথচ স্বাধীনভাবে সম্প্রসারিত সাংগঠনিক কলেবর এবং সেই সাথে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে কাজের সুযোগ ও স্বীকৃতিজনিত উচ্চ আত্ম-বিশ্বাসের কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা নিয়ামন ও প্রশাসনিক কাজের অংশীদারির দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। আবার কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে এখানে বিশ্বায়নবাদী বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বহুমুখী স্বার্থ প্রোথিত হয়েছে তার প্রভাবও হয়ত অনুরূপ দাবির অন্যতম প্রধান ভিত্তি রচনা করে। অধিকন্তু, সাম্প্রতিক কালের কানসাট-ফুলবাড়ি-শনির আখড়া-গার্মেন্টস অভ্যুত্থানগুলির প্রভাবও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকবে।

এই প্রেক্ষাপটে, ১/১১ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের সামনে যে চ্যালেঞ্জটি উপস্থিত করেছে সম্ভবত সেটা হল এই যে, হয় তাদেরকে '৭৫-উত্তর 'পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনের' ঘূর্ণাবর্তে 'ব্যবসায়' টিকে থাকার 'রাজনীতি' করতে হবে, নতুবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা মূল ধারার রাজনীতিকে অবলম্বন করে রাষ্ট্রের স্বাধিকার পুনরুদ্ধার ও স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। অতীত জাতীয় নেতৃত্বের সংগ্রাম, তাদের নির্মূল প্রক্রিয়া ও তার জাতীয় পরিণতির যথাযথ মূল্যায়ন দ্বিতীয়টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা ও শক্তির উৎস হতে পারে। এটা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ সকল দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে ন্যূনতম অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কর্মসূচি-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক মোর্চার অন্তর্ভুক্ত করে সমাজের তুচ্ছ, পরজীবীয়, নিকৃষ্ট পদার্থগুলি কর্তৃক স্বাধীনতার অবারিত শক্তি ও সম্পদ স্থায়ীভাবে কুক্ষিগতকরণের ও সেভাবে সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থানের বিরুদ্ধে নতুন মুক্তি সংগ্রামের অমোঘ শক্তিতে পরিণত করতে পারে। বলাবাহুল্য, ঐসব স্থানীয় শ্রেণী-জন পদার্থগুলি এবং সেসবের সেবা ও স্বার্থের রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ও বৈদেশিক পৃষ্ঠপোষকদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ঐ মোর্চার শ্রেণী-জন ভিত্তির ব্যাপ্তি ও শক্তি নির্ভর করবে তার লক্ষ্য, কৌশল, নেতৃত্বের গঠন-কাঠামোর মত বিষয়গুলির উপর। তবে নিশ্চিতভাবে ঐ ভিত্তির বিষয়গত উপাদানসমূহের—যেমন বাজার, কর্মসংস্থান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবন, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তার দিক থেকে যারা বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোজাত বৈষম্য-বহির্ভূতকরণ, শোষণ-উৎপীড়ন, উপায়হীনতা-অনিশ্চয়তায় ক্ষুব্ধ-ক্লীষ্ট-কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাদের ব্যাপ্তি বিপুল বিস্তৃত। আর, ঐ ক্ষমতা-কাঠামো ও বিশ্বায়নের পাষাণভেদী অযুত অযুত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও সম্মিলিত স্বার্থের ব্যাপ্তিও বিপুল। '৭৫-উত্তর কালের মুৎসুদ্দি শাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় দ্রুত বিকশিত দুর্বৃত্ত সঞ্চয়ী বৃহৎ বণিক-বুর্জোয়া শ্রেণীর তুলনামূলকভাবে, উৎকৃষ্ট ও নেতৃস্থানীয় অংশও আজকের পরিণত পর্বে তার স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া স্বার্থের সচেতন সমর্থক ও দাবিদার হয়ে উঠছে। দেশের বারটি শীর্ষ ব্যবসায় সংগঠন তাদের এক যৌথ বিবৃতিতে ব্যক্ত করেছে : 'আন্তর্জাতিক এজেন্সিসমূহের হস্তক্ষেপ, বিশেষত আইএমএফ কর্তৃক একটি সার্বভৌম দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিটি

খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রভাব খাটানো ও শর্তাদি আরোপ সহ বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ব্যবসায় সংগঠনগুলি কঠোরভাবে সমালোচনা করে আসছে।'(*The New Age,* August 2, 2007; *The Daily Star,* August 16, 2007)।

এটা ধারণা করা হয়ত অমূলক নয় যে ব্যবসায়ী নেতৃত্বের অনুরূপ জায়মান জাতীয় বুর্জোয়াবাদী অবস্থানকে দুর্বল বা নস্যাৎ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিচারাধীন পলায়নপর বা বিচারের বাইরে রাখা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের সাথে আপোসরফামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 'ট্রুথ কমিশন' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'সিভিল-মিলিটারি' সহযোগিতামূলক মডেলের সম্ভাব্য বৈরী শক্তি হিসেবে ব্যবসায়ীদেরকে 'অন্তর্ভুক্তকরণ-নির্বিরোধীকরণ' উপায়ে কোন বৃহত্তর বিশ্বায়ন-ব্যবসায়ন প্রকল্পের পক্ষে এটা ১/১১ সরকারের উদ্ধার অভিযান-অন্বিত কোন এজেন্ডারও অংশ হতে পারে। যাই হোক না কেন, এর প্রধান শিক্ষাটি হলো '৭৫-উত্তর কালের বিকৃতি-বৈকল্যসমূহের আবহে বিকশিত ও আমূল বিনষ্ট 'বুর্জোয়া' রাজনীতির পক্ষে তার ব্যবসায়-প্রবণ দুর্নীতি-দুর্বৃত্ততার নর্দমা থেকে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করে হয়ত আবার রাজনীতির মঞ্চে উঠে আসা সম্ভব—কিন্তু তার প্রভাব ও ক্ষমতার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করতে হবে নিজ অতীতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আবাহনের দ্বারা। অনিবার্যভাবে এটা হবে 'বুর্জোয়া' রজিনীতির একটি ঐতিহাসিক আত্ম-রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও যুগপৎ একটি ঐতিহাসিক বিপ্লব—জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব-সাধনের পথ। আর বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামো, রাজনৈতিক-ভৌগোলিক প্রভাব, বহির্মুখী 'সিভিল সোসাইটি' ওলিগার্খ, ইত্যাদির বিপরীতে বা বর্তমানতায় ঐ আত্ম-রূপান্তর প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে 'বুর্জোয়া' রাজনৈতিক শক্তিকেও অনিবার্যভাবে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের স্বার্থ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার স্বার্থ, বৃহৎ বুর্জোয়ার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া অংশের স্বার্থ ও সেগুলির প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণী-জন-রাজনৈতিক শক্তির সাথেই মৈত্রী স্থাপন করতে হবে, মোর্চাবদ্ধ হতে হবে। জাতীয় তারুণ্যের শক্তিকে, জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে বিশ্বায়নের বিনষ্টি ও লুণ্ঠন থেকে রক্ষা; সকল উৎসের জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের উৎপাদনশীল ব্যয়-বণ্টন নিশ্চিতকরণ ও সামরিক-বেসামরিক সকল অনুৎপাদনশীল খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের যৌক্তিক সংকোচন; বিশ্বায়নবাদীদের কবল থেকে জাতীয় স্বাধিকার পুনরুদ্ধার ও জাতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতাকে জাতীয় রাজনৈতিক শক্তির কর্তৃত্বাধীনকরণ; রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির আদর্শিক ঢাল ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির অপনোদন সহ আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহের উৎপীড়ন—'ক্রস্ ফায়ার'-'এনকাউন্টার'-'সুট আউট' সংশ্লিষ্ট বিচার-বহির্ভূত হত্যার অবসান ঘটানোর জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম ও বাম-শক্তির সক্রিয় ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। কার্যত, উভয়ের অস্তিত্বের জন্যেও এই সংগ্রামী ঐক্য সমান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যৌক্তিক মোকাবিলার মাধ্যমে

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুত সমষ্টিগত জাতীয় সমৃদ্ধির স্বায়ত্তীকরণের জন্য ও পরিবেশতাত্ত্বিকভাবে সমুপস্থিত জাতীয় ভৌত অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলার জন্য।

'ক্ষুদ্র ঋণের' উদ্ভাবনের জন্য 'নবেল শান্তি পুরস্কার' লাভের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরই সাথে উল্লেখ্য, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে আর্সেনিক-দূষিত পানি সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছে 'সনো ফিল্টার'-এর উদ্ভাবক এদেশের বিজ্ঞানী ড. আবুল হুসসাম ও ডাঃ একেএম মুনির। এর জন্য তাঁরা লাভ করেছেন মিলিয়ন ডলারের প্রথম পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমী অব ইনজিনিয়ারিং-এর 'গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ প্রাইজ ফর সাসাটেইনেবিলিটি' (২০০৭) এবং পরবর্তীতে, বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক ক্যাটিগরিতে টাইম ম্যাগাজিন প্রদত্ত 'গ্লোবাল হিরোজ অব দ্য এনভায়রনমেন্ট' পুরস্কার (২০০৭)। এসব স্বীকৃত ও পুরস্কৃত বৃহৎ সাফল্য গাঁথার সমান্তরালে আবার স্থানীয়ভাবে নিয়ত তৈরি হচ্ছে অগণিত উদ্ভাবকের নানা সৃজনশীল উদ্ভাবনের অসামান্য সাফল্য গাঁথা যেগুলি অবহেলায় হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। কিন্তু রেখে যায় এই নির্দেশনাটি যে একটি বৈষম্যমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী ও উচ্চ মানবিকতা ও 'মানব-উন্নয়ন-সূচক'-ঋদ্ধ সমাজ নির্মাণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে যেরূপ মানুষ, স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা, ও উদ্ভাবনী শক্তির সমাবেশ দরকার বাংলাদেশে তার বেশি অনটন নেই। অনটন আছে কেবল এর উপলব্ধি, মূল্যায়ন ও সমন্বয়পূর্বক জাতীয় রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাথে তাকে জুড়ে দেওয়ার মত সংগঠিত নেতৃত্বের। '৭১, '৭৫ ও ১/১১-এর পর হয়ত অনুরূপ কোন নেতৃত্বের বিকাশের পর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ।

তথ্যপঞ্জি

বারকাত, আবুল, "বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা?" *শিখা অনির্বাণ*, নবম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

মুহাম্মদ, আনু, *বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫।

ÍÍÍ, *ফুলবাড়ী, কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

Abdelal, R. and A Segal, "Has Globalization Passed the Peak?" *Foreign Affairs,* Vol. 86, No. 1, Jan/Feb 2007.

Adams, Brooks, *The Law of Civilization and Decay* (1896), Vintage Books, New York, 1959.

Agtamael, A. V., "Industrial Revolution 2.0." *Foreign Policy,* No. 158, Jan/Feb 2007.

Baran, P., *The Political Economy of Growth,* Monthly Review Press, New York, 1968.

Bernier, F., *Travels in the Mogul Empire AD 1656–1668,* Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1989.

Castro, Fidel, "Address at the opening session of the Group of 77 South Summit Conference," Havana, April 12, 2000.

Gelinas, J. B., *Juggernaut Politics—Understanding Predatory Globalization,* Zed Books, London, 2003.

Gottesman, A. E., "Two Myths of Globalization," *World Policy Journal,* Vol. 23, No. 1, Spring 2006.

Government of Bangladesh, *Bangladesh Economic Survey 2006.* Dhaka, 2007.

Kotlikoff, l. J., "Is the United States Bankrupt," *Federal Reserve Bank of St. Louis Review,* Vol. 88, No. 4, July/August 2006.

Liu, H. C. K., "The Economics of a Global Empire," *Asia Times,* August 14, 2002.

Marx, K. and F. Engels, *Selected Works,* Vol. 1, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1962.

Mukherjee, R. K., *The Rise and Fall of the East India Company,* Popular Prakashan, Bombay, 1973.

Pereboom, M. L., "Trade and Economics as a Force in US Foreign Relations," *Foreign policy Agenda,* Vol. II, No. 1, April 2006.

Petras, j., "Globalization : A Critical Analysis," *Journal of Contemporary Asia,* Vol. 29, No. 1, 1999.

Rosenberg, T., "Reverse Foreign Aid," *The Times Magazine, New York Time,* March 25, 2007.

Sobhan, R., *The Crisis of External Dependence,* University Press Limited, Dhaka, 1982.

UNDP, *Human Development Reports 1997, 1999 & 2005.*

— *Human Development in South Asia 2001,* University Press Limited, Dhaka.

এম. এম. আকাশ

বাংলাদেশে বিশ্বায়ন

ভূমিকা

'বিশ্বায়ন' একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। পণ্যের, অর্থের, তথ্যের, ফ্যাশানের, সবকিছুরই যখন বিশ্বব্যাপী প্রবাহ ত্বরান্বিত হতে থাকে এবং সমগ্র পৃথিবী যখন নানা ধরনের সম্পর্ক জালে আষ্টেপৃষ্ঠে পরস্পর জড়িয়ে পড়ে তখন সেই সমগ্র ব্যবস্থাটিকে আমরা একটি সমন্বিত বিশ্ব-ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে বাধ্য হই। দূরত্ব তখন সম্পর্কহীনতার সমার্থক হয় না। এর অনিবার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে জগদ্ব্যাপী যোগাযোগ বিপ্লব। বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি তাই যে প্রতীকটির সাহায্যে সবচেয়ে সহজে আমাদের মননে ধরা পড়ে তা হচ্ছে www বা 'বিশ্বব্যাপী জাল'—পশ্চিমবঙ্গে যার অনুবাদ করা হয়েছে 'আকাশ-জাল' হিসেবে। 'বিশ্বায়ন' নিয়ে তর্কের কোনো শেষ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম যখন ইউরোপের কয়েকটি দেশকে কেন্দ্র করে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তখন থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা। সূচনা লগ্নে প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই উলঙ্গভাবে অসম। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র, অন্যদিকে উপনিবেশ। সম্পর্কের প্রকৃতি ছিল আদিম এবং শোষণমূলক। তাই বিশ্বায়ন বললেই তৃতীয় বিশ্বের লোকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভয়াবহ দুঃখের স্মৃতি। মার্কসের ভাষায় বলতে হয়, ম্যানচেস্টারের বস্ত্র-শিল্পের প্রভূত উন্নতির অপর পৃষ্ঠে লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় তাঁতিদের হাড়গোড়ের পাহাড়। তাই এখনও 'বিশ্বায়নের' অর্থ অনেকের কাছেই 'ওয়েস্টার্নাইজেশন', 'আমেরিকানাইজেশন', 'ট্র্যান্সন্যাশনালাইজেশন' ইত্যাদি ধারণার সমার্থক।

যেদিন থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে সেদিন থেকে এর নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হয়েছে। কার্ল মার্কস এমন এক বিশ্বায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সমগ্র বিশ্ব হবে শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, সাম্যবাদী বিশ্ব। যেখানে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাটি গড়ে উঠবে সৃজনশীল শ্রম এবং প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে। অনেক মহৎ মানুষ সেই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরো জীবন সেজন্য উৎসর্গ করে গেছেন। অন্যদিকে আরেকদল মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তিগত স্বার্থে পৃথিবী জয়ের। তাদের মটো ছিল 'বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরা'। এই বীরদের প্রধান শক্তি হচ্ছে 'পুঁজি'। পুঁজি শুধু প্রযুক্তি নয়, পুঁজি হচ্ছে একটি সামাজিক শক্তি, যা গড়ে উঠে বৃহদায়তন আধুনিক প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে শ্রমিক এবং পুঁজিপতির অসম সম্পর্কের মাধ্যমে। তাই এই

পুঁজি শক্তির পেছনে শুধু ব্যক্তিপুঁজিপতির অবদানই একমাত্র অবদান নয়। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য শ্রমজীবীর সামাজিক শ্রমশক্তির সম্মিলিত বিশাল অবদান। কেউ কেউ মনে করেন 'পুঁজিপতিরা' স্বচেষ্টায় বা প্রতিভাবলে স্বীয় ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। কোনো কোনো উদ্যোক্তা পুঁজিপতির ক্ষেত্রে এ কথা আংশিক সত্যমাত্র। যাদের সামান্যতম ইতিহাস জ্ঞান আছে তারা জানেন যে দাসেরা যদি দাস মালিকদের জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে অবসর উপভোগ ও জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে না দিতেন তাহলে গ্রিক প্রতিভা ও সভ্যতার আদৌ কোনো উন্মেষ হতো না। এ কথাটি সামগ্রিক অর্থে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বায়ন

ব্যাপারটি যদি এরকম হতো যে একজন মানুষ খুব সঞ্চয়ী এবং পরিশ্রমী তাই ধীরে ধীরে তিনি উচ্চতর আয়ের অধিকারী হয়েছেন এবং আরেকজন মানুষ খুব অলস এবং অমিতব্যয়ী তাই তিনি ধীরে ধীরে দরিদ্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, তাহলে সমাজবিজ্ঞানীরা বৈষম্যকে সমস্যা হিসেবে দেখলেও অন্যায় হিসেবে দেখতেন না। কিন্তু বিশ্বায়নের শুরু থেকেই বিষয়টা সেরকম ছিল না। কিছু কিছু দেশ বরাবরই ছিল উদ্বৃত্ত পুঁজির মালিক—আর কিছু কিছু দেশ ছিল উদ্বৃত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির মালিক। প্রশ্ন হচ্ছে এদের মধ্যে সুষম বিনিময় সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব? কীভাবে সম্ভব একটি সমঅংশীদারিত্বের বিশ্ব গড়ে তোলা?

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা 'অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের' ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন যে মুক্ত বাজারে শ্রম এবং পুঁজির অবাধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হলে এই বৈষম্য দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাদের যুক্তি অনুযায়ী উদ্বৃত্ত পুঁজি তখন উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশগুলোর দিকে ধাবিত হবে এবং অন্যদিকে উদ্বৃত্ত শ্রমও তখন উদ্বৃত্ত পুঁজির দেশগুলোর দিকে ধাবিত হবে—আর এই দ্বৈত প্রক্রিয়া ততদিন চলতে থাকবে যতদিন না উভয় অঞ্চলে পুঁজির 'সংবিন্যাস' (অর্গানিক কম্পোজিশন অব ক্যাপিটাল) একই মাত্রায় পৌঁছায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী 'বিশ্বায়ন' হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে পৃথিবীতে আঞ্চলিক বৈষম্য অথবা তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে প্রথম বিশ্বের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে না, বরং কমবে। কিন্তু আসলেই কি ব্যাপারটা তাই ঘটেছে। ব্যাপারটা যে আসলে তা ঘটেনি এবং ঘটা সম্ভবও নয় তা মুক্ত বাজারপন্থীদের বুঝতে মোটেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ অবাধ বাজার ব্যবস্থার একটি পূর্বানুমান হচ্ছে পণ্য-পুঁজি-শ্রম, এই তিনটি উৎপাদন-উপাদানেরই অবাধ প্রবাহের নিশ্চিত সুযোগ এবং এদের মালিকরাও আগে থেকে জানতে পারবেন কোথায় কোনটির দাম কি রকম। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অসমতা বা দ্বৈত নীতি (ডাবল স্ট্যান্ডার্ড) বিদ্যমান। নানারকম পেটেন্ট ও মেধা স্বত্ব আইনের বেড়াজালে তথ্যও এখানে বন্দি। বর্তমান বিশ্বায়নের অভিভাবকরা নিজেদের পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেছেন এবং প্রয়োজনমতো সে জন্য চাপও সৃষ্টি করেছেন কিন্তু শ্রমের ও তথ্যের ব্যাপারটা

তারা জাতি-রাষ্ট্রের আওতাধীন বিষয় হিসেবে রেখে দিয়েছেন। ফলে সস্তা শ্রম, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক শক্তির আকর্ষণে উন্নত বিশ্বের পুঁজি অনুন্নত দেশে যাওয়ার অবাধ সুযোগ পেলেও অনুন্নত বিশ্বের উদ্বৃত্ত শ্রম উন্নত বিশ্বের পুঁজির কাছে ছুটে যেতে পারছে না। জ্ঞান ও তথ্যের প্রবাহও রয়ে যাচ্ছে সীমাবদ্ধ ও একমুখী। একই ভাবে দেখা যাচ্ছে পুঁজিঘন উন্নত ধরনের পণ্যগুলো অনুন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশের অবাধ অধিকার পেলেও অনুন্নত বিশ্বের কৃষি দ্রব্যাদি বা অপেক্ষাকৃত শ্রমঘন ম্যানুফেকচারড দ্রব্যাদি উন্নত বিশ্বের বাজারে অবাধ প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না। এখানেও দেখা যাচ্ছে উন্নত বিশ্বের অপেলক্ষাকৃত শিল্প ও কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একদিকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে অশুল্ক বাধা, শ্রম স্ট্যান্ডার্ড আরোপ, কোটা পদ্ধতি ও গুণগত মানের প্রশ্ন, ইত্যাদি একগাদা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অনুন্নত বিশ্বের শ্রমঘন পণ্যকে উন্নত দেশের বাজারে অবাধে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু একই ধরনের সংরক্ষণবাদী নীতি নিয়ে যদি কোনো ক্ষুদ্র অনুন্নত দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তখন তাকে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এবং ডব্লিউটিওর মতো তথাকথিত বিশ্বায়ন অভিভাবকরা 'বাজার বিরোধী', 'বিশ্বায়ন বিরোধী' আখ্যা দিয়ে একঘরে করে ফেলার চেষ্টা করছে। এই দ্বৈত নীতির অধীনে এক ধরনের অসম বিশ্বায়নই বর্তমান বিশ্বে চালু রয়েছে।

সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিযোগিতাটি হচ্ছে অসম, যেখানে দৈত্যের সঙ্গে বামনের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ফলে বিশ্বায়নের মোট সুফলের বণ্টনও বৈষম্যমূলক হচ্ছে এবং তা ক্রমাগত বিশ্বের বৈষম্য বৃদ্ধি করে চলেছে।

অসম বিশ্বের তথ্যভিত্তিক চিত্র

চলমান 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়ার অন্যতম অভিভাবক বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর একটি বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। তাদের ২০০০ সালের ডব্লিউডিআর-এর বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ব দারিদ্র্য। তাদের সেই রিপোর্ট থেকেই যে ভয়াবহ বৈষম্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তা আমি নিচে তুলে ধরছি—

১. পৃথিবীর সবচেয়ে কম উন্নত ৬৩টি দেশে পৃথিবীর যে ৫৭ শতাংশ জনগণ বাস করেন তাঁরা পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র ৬ শতাংশ ভোগ করেন।
২. ১৯৮৯-১৯৯৯ এই এক দশকে পৃথিবীর মোট উৎপাদন প্রতিবছর কমপক্ষে গড়ে ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও, এই সময় দারিদ্র্যসীমার (অর্থাৎ দৈনিক ১ ডলারের চেয়েও কম আয় করেন এমন লোকেরা) নিচে বসবাসকারী লোকদের মোট সংখ্যা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।
৩. ১৯৮৮ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল পৃথিবীর মোট আয়ের ৪৮ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। পক্ষান্তরে পৃথিবীর নিচের দিকের ১০ শতাংশ দরিদ্রের আয়ের অনুপাত এই একই সময়ে .৮৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে .৬৪ শতাংশে। [এই তথ্যটি অবশ্য নেওয়া হয়েছে ইকনমিস্ট, এপ্রিল ২৮, ২০০১-

এ প্রকাশিত রবার্ট ওয়েজ এর "গ্লোবাল ইনইকুয়ালিটি : উইনার অ্যান্ড লুজারস" প্রবন্ধ থেকে]

৪. আয়ের বৈষম্যের চেয়ে 'সম্পদ' এবং 'ভোগের' বৈষম্য অবশ্য আরো অনেক অনেকগুণ বেশি। আর 'লাগামহীন সম্পদ' এবং 'লাগামহীন ভোগের' সামাজিক ও পরিবেশগত কুফল বা প্রতিক্রিয়াও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বর্তমানে পৃথিবীতে মাত্র ৩৫৮টি ধনী পরিবার পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেকের মালিক। মূল্যমানের দিক থেকে তা পৃথিবীর ৪৫ শতাংশ মানুষের আয়ের যোগফলের সমান। এরই প্রতিফল হিসেবে পৃথিবীর মোট সম্পদের ৮৬ শতাংশের ব্যবহারকারী/ভোগকারী হচ্ছেন মাত্র ২০ শতাংশ ধনী মানুষ। এতে কি ধনী মানুষদের দৈহিক ও মানসিক প্রাচুর্য আদৌ উন্নতর হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৯৯৮ সালের ইউএনডিপি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্টে একাধিক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে—

ক. ধনী দেশ আমেরিকার একজন নাগরিককে তার সারা জীবনে গড়ে ১৫০ হাজার বিজ্ঞাপন দেখতে হচ্ছে। রক্ষণশীল হিসাবানুযায়ী ১৯৯৮ সালে গ্লোবাল বিজ্ঞাপন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ৪শ' ৩৫ বিলিয়ন ডলারের সমান। (সে বছর আমাদের বাংলাদেশের বাৎসরিক মোট জাতীয় আয় ছিল মাত্র ৫৭ বিলিয়ন ডলার।)

খ. বিশ্বের ২০ শতাংশ ধনী লোকেরা বিশ্বের মোট মাছ-মাংসের ৪৫ শতাংশ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে নিচের দিকের ২০ শতাংশ ভোগ করেন তাদের ৯ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ অর্থাৎ মাত্র ৫ শতাংশ মাছ-মাংস।

গ. এই ২০ শতাংশ ধনীরা বিশ্বের ৫৮ শতাংশ শক্তি ও এনার্জি, ৭৪ শতাংশ টেলিফোন লাইন এবং ৮৪ শতাংশ কাগজ ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে ২০ শতাংশ দরিদ্র লোকেরা ব্যবহার করেন বিশ্বের ৪ শতাংশেরও কম এনার্জি, মাত্র ১.৫ শতাংশ টেলিফোন লাইন এবং ১.১ শতাংশ কাগজ।

ঘ. পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের ৫৩ শতাংশই তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর ২০ শতাংশ ধনীর লাগামহীন ভোগের কারণে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ২০ শতাংশ দরিদ্ররা তৈরি করেন মাত্র ৩ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। অথচ এই বর্ধিত হারে CO_2 গ্যাস উৎপাদনের কারণে যে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' (Global Warming)-এর সৃষ্টি হবে তার প্রধান চাপটা গিয়ে পড়বে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিশেষজ্ঞরা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ উপকূলীয় এলাকা তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ইতোমধ্যেই প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বায়নের মাধ্যমে বাঘ হওয়ার স্বপ্ন?

বর্তমানে বিশ্বায়নের মৃদু সমর্থকরা অনেক সময় 'ফ্লাইং গিজ (উড়ন্ত হাঁস) মডেলের' মাধ্যমে উন্নয়নের কথা বলে থাকেন। এই মডেলের মূল কথা হচ্ছে যেহেতু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শ্রম সস্তা, সেহেতু প্রথমে তাদের শ্রমঘন শিল্প পণ্য তৈরি করে 'হার্ড কারেন্সি' উপার্জন করতে হবে। এইভাবে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চিত হওয়ার পর পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুঁজিঘন শিল্পে পদার্পণ করতে হবে। এজন্য সঞ্চিত বৈদেশিক পুঁজি ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলো থেকে পুঁজি দ্রব্য বা প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমদানি করা তখন সম্ভব হবে। এ জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে খোলা দ্বার নীতি গ্রহণ করে বৈদেশিক প্রযুক্তি ও পুঁজিকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এতে আপেক্ষিক অগ্রগতি না হতে পারে কিন্তু 'অ্যাবসলিউট' (চরম) অগ্রগতি হবেই। এই মডেলকে 'ফ্লাইং গিজ' মডেল বলা হয় এ জন্য যে, উত্তর থেকে আসা অতিথি পাখিদের বিন্যাসে যেমন দেখা যায় যে শীর্ষে একটি পাখি রয়েছে, পরে দুটো, আরো পরে তিনটি ... এইভাবে সবচেয়ে শেষে অনেকগুলো পাখি, তেমনি পৃথিবীর দেশগুলোও উন্নতির পর্যায় ভেদে এইভাবে একটি ত্রিভুজাকৃতি কাঠামোর মধ্যে সুবিন্যস্ত রয়েছে এবং ওড়ার সময় যেমন একটি পাখি আগে বেড়ে গেলে পেছনের পাখিটি সে স্থান দখল করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, তেমনি রপ্তানিমুখী একগুচ্ছ দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সম্ভব বলে এই মডেল বিশ্বাস করে। বলা বাহুল্য যে এই মডেলের মেকানিজম অতীতের 'লিউয়িস মডেলের' চেয়ে ভিন্ন। কারণ ৬০ দশকে অনুসৃত 'লিউয়িস মডেলে' ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয় পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি হবে অভ্যন্তরীণ বাজার। তাই সেখানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত শ্রম শহরে এনে শিল্পপণ্য তৈরি করে কৃষকদের কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রমশ একটি প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করতে হবে। এভাবে মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারকে ভিত্তি করে শিল্প ও কৃষির যুগপৎ বিকাশের একটি চিন্তা লিউয়িস মডেলে তুলে ধরা হয়েছিল। লিউয়িস মডেলে অনায়াসে সাময়িক সংরক্ষণ সুবিধা দিয়ে শহরে বা গ্রামে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের সুযোগ করে দেওয়াও সম্ভব ছিল। পরবর্তীতে ওই সংরক্ষিত আমদানি বিকল্প শিল্পগুলো সাবালক হলে সংরক্ষণ সুবিধা প্রত্যাহার করে নিলেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এমনটিই ছিল তখনকার চিন্তা। এইভাবেই অতীতে অনুন্নত দেশগুলোর উন্নতির কথা চিন্তা করা হতো। এই হিসেবে লিউয়িস মডেল অনেক বেশি নিরাপদ, ঝুঁকিহীন এবং স্বয়ম্ভর। যদিও এরও অনেক সমস্যা রয়েছে। বিশেষত বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার ও গ্রামীণ জীবনের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই মডেলে দ্রুত সাফল্য অর্জন করা কঠিন বা অসম্ভব। এই মডেলের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকেও হতে হবে অনেক বেশি সৎ এবং জাতীয়তাবাদী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ঔপনিবেশিক দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে শুরু করে তখন অধিকাংশ সদ্য স্বাধীন দেশই জাতীয় পুঁজি ও অভ্যন্তরীণ বাজারকে গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে লিউয়িস মডেলকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। এর ফল অবশ্য একেক দেশে একেক রকম

হয়েছে। ভারতে, চীনে, কিউবায়, ভিয়েতনামে এর ফল হয়েছে শক্তিশালী জাতীয় শিল্পায়ন এবং প্রভূত উন্নতি। কিন্তু পাকিস্তানসহ ল্যাটিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে অদক্ষ পুঁজিঘন শিল্প, ভর্তুকির বোঝা, বর্ধিত আয় বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য, অবিকশিত কৃষি, গণদারিদ্র্য, উদ্বৃত্ত শ্রম ইত্যাদি টিকেই থেকে গেছে। ফলে এসব দেশ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে ধস নেমে অচিরেই নতুন সঙ্কটে পতিত হয়েছে। পরবর্তীতে ৮০ ও ৯০ দশকে এই 'জাতীয়তাবাদী উন্নয়ন মডেলটিকে' প্রবলভাবে আক্রমণ করা শুরু হয়। রোনাল্ড রেগ্যান এবং মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে তখন থেকেই সমস্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে উদারীকরণ, ব্যক্তিগতকরণ ও ভর্তুকিহীন বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের পক্ষে জোরেশোরে আওয়াজ উঠতে শুরু করে। এই সময়ই একে একে ল্যাটিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এশিয়ায় চালু হয়ে যায় 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস নীতিমালা' এবং তথাকথিত 'রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির' মডেল। একেই বলা হয়েছে বিশ্বায়নের আদর্শ মডেল। ১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিজে ল্যাটিন আমেরিকার দশটি দেশের প্রতিনিধিদের ডেকে এক বৈঠকে 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' নীতিমালা প্রণীত হয়। তখন বলা হয়েছিল ল্যাটিন আমেরিকার উন্নতির জন্য এই কয়েকটি পয়েন্টে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোর অবশ্যই একমত হতে হবে। পরবর্তীতে অবশ্য এই একই কর্মসূচিটি শুধু ল্যাটিন আমেরিকা নয়, এশিয়া, আফ্রিকাতেও ভিন্ন নামে (স্যাপ বা স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি) চালু করা হয়।

এই ওয়াশিংটন কনসেনসাসের মূল কথাগুলো হচ্ছে—

- ঘাটতি বাজেট চলবে না। সরকারের আয় বাড়াতে হবে, ব্যয় কমাতে হবে।
- উন্নয়নের দায় সরকারের নয়, বেসরকারি বিনিয়োগকারীই হবে উন্নয়নের ইঞ্জিন। অতএব, সরকারি ব্যয় সংকুচিত কর।
- সুদের হার কমাতে হবে যাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে না।
- সরকারি ভর্তুকিসমূহ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, স্ট্যাটেজিক পণ্য ইত্যাদি খাতে) প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব হবে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রতিরক্ষা।
- বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ের উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। দেশি-বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবাহ তথা ঢোকা এবং বাইরে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদেশি বিনিয়োগের উপর সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে।
- বেসরকারিকরণের অভিযান অব্যাহতভাবে চালাতে হবে।
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মর্যাদা দিতে হবে।
- নিয়ন্ত্রণ তুলে স্থানীয় বাজার উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

'ওয়াশিংটন কনসেনসাসে' বর্ণিত উল্লিখিত নীতিমালার ফলাফল ল্যাটিন আমেরিকায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভালো হয়নি। প্রথম দিকে এই নীতিমালার অন্যতম একনিষ্ঠ অনুসারী আর্জেন্টিনার ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির যে গল্প আমরা শুনেছিলাম তা ফাঁপা বেলুনের মতো অচিরেই ফেটে গিয়েছিল এবং সেখানকার হার্ভার্ড প্রশিক্ষিত অর্থমন্ত্রীকে ২০০১ সালে প্লেনে করে আমেরিকাতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। (এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : রতন খাসনবিশ, 'বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন : দক্ষিণ কোরিয়া ও আর্জেন্টিনার শিক্ষা' নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৪)।

রপ্তানিমুখী মডেলের সাফল্যের প্রবক্তারা অবশ্য এখন আর কোথাও আর্জেন্টিনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন না। এখনো পর্যন্ত তাদের টিকে থাকা দৃষ্টান্তগুলো হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, চীন ইত্যাদি। ভারতও অল্প অল্প করে এ পথে পা বাড়াতে শুরু করেছে এবং এখন পর্যন্ত তাদের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে এই মুলাগুলোই ঝুলানো রয়েছে।

কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই দেশগুলোর কোনোটিই 'ওয়াশিংটন কনসেনসাসের' নীতিগুলোকে হুবহু অনুসরণ করেনি। দক্ষিণ কোরিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্রীয় নীতির আওতায় নির্বাচিত শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা, সংরক্ষণ সুবিধা, ভর্তুকি সুবিধা যেমন অব্যাহত রেখেছিল তেমনি পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্প ও বিদেশি বিনিয়োগকেও বেছে বেছে (Selectively) উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে। ভারতও বেছে বেছে যুগপৎ আমদানি বিকল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের নীতি গ্রহণ করেছে। আগে প্রথমদিকে আমদানি বিকল্প শিল্পে গুরুত্ব দিয়েছে, এখন রপ্তানিমুখী শিল্পে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। চীনের কৌশলও ছিল আরো অনেক বেশি মিশ্র এবং সংকর কৌশল। চীনাদের নেতার ভাষাতেই বলা চলে 'বিড়াল কালো না সাদা সেটা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার হচ্ছে বিড়াল ইঁদুর মারতে পারে কি না?' চীন বরাবরই প্র্যাগমেটিস্ট এবং জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করে এসেছে। আর এসব প্রত্যেকটি দেশেই কৃষির বিকাশে, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রাদনের ক্ষেত্রে বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এবং সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা কেউই 'ন্যূনতম রাষ্ট্রই সব চেয়ে ভালো রাষ্ট্র' এই নিওলিবারাল দর্শন অনুসরণ করেননি। মজার ব্যাপার হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া রেডিকেল ভূমিসংস্কারও সাধন করেছিল। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ অমান্য করে উন্নয়নের আদি পর্বেই আগ বাড়িয়ে ভারী ইস্পাত কারখানা সৃষ্টি করেছিল যার সুফল তারা এখন পাচ্ছেন। তাদের হায়ুন্ডি গাড়ি এখন বিশ্ব বাজারে অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে সক্ষম। অনুরূপ সাফল্যের দৃষ্টান্ত ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। আর চীনের সাফল্য তো এখন পুঁজিপতিদের মুখে মুখেই বেশি শোনা যাচ্ছে। চীন এখন বিশ্বের অন্যতম 'কর্মশালায়' রূপান্তরিত হয়েছে। মুক্ত বাজার, বন্ধ বাজার কোনো কিছু দিয়েই চীনের অগ্রগতিকে আজ আর ঠেকানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশকে আজ তাই অন্ধের মতো এক দিকে ঝুঁকে পড়লে হবে না। 'SAP' একটি 'স্ট্রেইট জ্যাকেট পলিসি' যা সকল দেশের জন্য মোটেও সমানভাবে খাপ খায় না। একথা ঠিক যে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' ছিল বিশেষ এক পরিস্থিতিতে বিশেষ ১০টি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের তাৎক্ষণিক বিশেষ সমস্যা সমাধানের একটি দাওয়াই। এই দাওয়াইয়ের প্রণেতা মি. উইলিয়ামসনই পরবর্তীতে ২০০৩ সালের এপ্রিলে এসে স্বীকার করেছেন যে তার কল্পনাতেও ছিল না যে এই খসড়াটিই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিকামী দেশের জন্য কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির কাজে ব্যবহৃত হবে। আজ যাঁরা বাংলাদেশে ঢালাওভাবে SAP প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করতে চাচ্ছেন এবং অতীতে যারা একে নির্বিচারে গ্রহণ করে বাংলাদেশের এই দুর্দশা সৃষ্টি করেছেন তাদের বোধোদয়ের সময় এখন এসে গেছে। 'দাতারা' অবশ্য SAP-এর ব্যর্থতার দরুন এখন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তারা বলছেন সকল নষ্টের গোড়া হচ্ছে 'সুশাসন ও সুষ্ঠু গণতন্ত্রের' অভাব। SAP নীতি-দর্শনের কোনো ত্রুটি নেই, ব্যর্থতা বা ত্রুটি হচ্ছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়। তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সত্য বাংলাদেশের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা আমরা এখন পরীক্ষা করে দেখবো।

বাংলাদেশে 'বিশ্বায়নের প্রভাব : ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কম বেশি ষাট-সত্তুর দশকের পুরোনো অভ্যন্তরীণমুখী (Inward Looking) উন্নয়ন মডেলই চালু ছিল। অর্থনীতিতে তখন পর্যন্ত আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন নীতি, কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং প্রধান প্রধান শিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ বিশেষ পণ্য যেমন কৃষি উপকরণে, বিদ্যুতে, পেট্রোলিয়ামে, গ্যাসে, পানিতে প্রচুর ভর্তুকি ইত্যাদি একগুচ্ছ পুরাতন নীতিমালা অব্যাহত ছিল। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর এসব নীতিমালা দ্রুত একটির পর একটি পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। একদিকে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর প্রচুর সাহায্যের লোভ অন্যদিকে সামরিক আইনের কঠোর ছত্রছায়ায় বাংলাদেশে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে। কিন্তু এর সামগ্রিক ফলাফল শুভ হয়নি। এরশাদ যে দশ বছর দেশে রাজত্ব করেছিলেন তাকে এ দেশের অর্থনীতিবিদরা 'স্থবিরতার এক দশক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এরশাদের সময়ই বড় বড় পাটকল ও বস্ত্র কলগুলো নামমাত্র মূল্যে 'প্রাইভেটাইজ' করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাছে জামানত হিসেবে বন্ধক রেখে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বাংলাদেশের লুটেরা পুঁজিপতিরা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কয়েকটি ধনী ক্ষমতাবান 'হাউস' হয়েছিলেন। কেউ কেউ বিরাষ্ট্রীয়কৃত কারখানার জমি ও যন্ত্রপাতিও বিক্রি করে দিয়েছেন। কারখানাগুলো থেকে প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই করা হয় এবং অবশেষে অনেক কারখানাই বন্ধ হয়ে যায়। এদের কেউ কেউ এই অনুপার্জিত টাকা অন্যত্র উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কাজে লাগালেও তার

মাত্রা ছিল নগণ্য। ফলে দেশের ব্যক্তিখাতে এইভাবে সহজে বড়লোক হওয়ার এবং খেলাপি ঋণের একটি স্থায়ী লোভনীয় কালচারের সৃষ্টি হয়েছিল। জেনারেল এরশাদের রাজত্বকালে 'দাতারা' প্রচুর বিদেশি ঋণ-সাহায্য দিয়েছিলেন যার ৭৫ শতাংশ না হলেও অন্তত সিংহভাগ যে আমলা-লুটেরা বুর্জোয়াদের পকেটে চলে গিয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এভাবে লুটেরা বুর্জোয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় দাতারাও ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন। (এ বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক লিখিত 'ধনিক গোষ্ঠীর লুট-পাটের কাহিনী', প্রাচ্য প্রকাশনা, ১৯৮৭)। এই পটভূমিতে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণসংগ্রামের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং শুরু হয় 'গণতন্ত্রের' হাঁটি-হাঁটি পা-পা 'এক্সপেরিমেন্ট'। অনেকেই তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই গণতন্ত্র লুটেরা অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কখনোই টেকসই হবে না। দুঃখের বিষয় গণতন্ত্রের এই পর্বে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক দুই বুর্জোয়া দলের মূল নেতৃত্ব তাদের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের সীমিত জাতীয়তাবাদী আর্থ-সামাজিক দর্শনটিও প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে নিজেরা প্রত্যেকে কে কত বিদেশিদের অনুগত হতে পারেন তার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। এরই ফলে ৯০ দশকে বাংলাদেশ ক্রমশ পরিণত হয়েছে বিশ্বায়নের বর্তমান অভিভাবকদের অবাধ 'পলিসি এক্সপেরিমেন্টের' লীলাভূমিতে। এজন্য বিদেশিদের বাংলাদেশকে বিশেষ কোনো সাহায্য বা ঘুষ দিতে হয়নি। বস্তুত বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান বিদেশি ঋণ সাহায্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নীতি নির্ভরতা। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এসব নীতির সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীরাই এখন এর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে গত শুল্ক হার ছিল (আনওয়েটেড) ৪৭.৪ শতাংশ। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সাইফুর রহমান সাহেব একে ২২.৩ শতাংশে নামিয়ে আনলেন। অর্থনীতিবিদরা তখন বলেছিলেন যে এর ফলে প্রতিকূল প্রতিযোগিতার মুখে বহু দেশি শিল্প 'সিক ইন্ডাস্ট্রিতে' পরিণত হবে। ক্ষমতায় আসার আগে জনাব তোফায়েল আহমেদ বিরোধী দলের মঞ্চ থেকে সাইফুর রহমান সাহেবের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগও পূর্বসূরিদের সেই একই নীতিই অব্যাহত রাখলেন। ১৯৯৭-৯৮ সালে গড় শুল্ক হার ২২.৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০.৭ শতাংশে পরিণত করা হল।

এর পরেও এ কথা সত্য যে সাম্প্রতিককালে প্রতিকূল বিশ্বায়নের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে অন্তত দুটো শিল্প সাফল্যের মুখ দেখেছে : পোশাক শিল্প এবং ঔষধ শিল্প। কিন্তু এটা কি অনুকূল সরকারি নীতিমালার কারণে না কি প্রতিকূল সরকারি নীতিমালা সত্ত্বেও? ইতিমধ্যেই একথা সর্বজনস্বীকৃত পোশাক শিল্পের বেলায় পরিপূরক আমদানি বিকল্প গড়ে না তুলতে পারলে এই প্রবৃদ্ধিই ভবিষ্যতে ধরে রাখা কঠিন হবে। এখন পর্যন্ত যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সস্তা নির্বিরোধ নারী শ্রমিকদের কঠোর শ্রম। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা এজন্যই এ ধরনের শিল্পকে তাচ্ছিল্যভরে বলে থাকেন, 'ঘামের

দোকান'। কিন্তু 'ঘামের দোকানের' এই 'সুবিধাটুকুও' স্থায়ী নাও হতে পারে কারণ কৃষিখাতে উৎক্রান্তি (Break Through) না হওয়ার ফলে অচিরেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষত বর্ধিত দামে চাল আমদানি ও ভর্তুকিহীনভাবে তা বিক্রি করলে বা রেশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় বাজারে চালের দাম অবধারিত ভাবে বেড়ে গেলে তখন দেড় হাজার টাকা বেতনের এই সমস্ত শ্রমিকদের তা নাও পোষাতে পারে। আর সেই অবস্থায় শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়লে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশের পোশাক সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে এবং তখন বাংলাদেশের বর্তমান বাজার দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞতা এও বলে প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে বাজার একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে দ্রুত তা কেউ না কেউ দখল করে নেয়। 'ফ্লাইং গিজ' মডেলে কোনো পাখিই কারো জন্য খালি স্থান ফেলে রাখে না। এছাড়া বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উৎপাদন প্রথম দিকে যে মুনাফা 'মার্জিনে' বিক্রি হতো তা ক্রমাগত কমছে। বর্তমানে মধ্যস্বত্বভোগী বিদেশিরা এই মার্জিনের বড় একটি অংশ নিজেরা পকেটস্থ করে নিচ্ছেন। ফলে সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মোট পোশাক উৎপাদন বা সরবরাহ যে হারে বাড়ছে মোট আয় সে হারে বাড়ছে না। সর্বদাই এক ধরনের প্রতিকূল বিনিময় শর্তের অধীনে (টার্মস অফ ট্রেড) তৃতীয় বিশ্বের রপ্তানিকে কাজ করতে হয়। এখনো তাই করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়।

আর ঔষধ শিল্পের যে সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আসলে বিশ্বায়নের অনুকূল্যে সংঘটিত কোনো সাফল্য নয়। জেনারেল এরশাদের আমলে বিশ্বায়নের মুরুব্বিদের পরামর্শ প্রত্যাখান করেই ড. জাফরুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে যে নতুন স্বদেশি ঔষধ নীতি প্রণীত হয়েছিল তারই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে বহুজাতিক কোম্পানিকে কিছুটা হটিয়ে দিয়েই এ দেশে ঔষধ শিল্পের বিকাশটি সম্ভব হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে বরং আমরা এটাই বুঝতে পারি যে সাহস করে ঘুরে দাঁড়ালে বাংলাদেশেও ব্যক্তিখাতে স্বনির্ভর শিল্পায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে অবশ্য কেউ কেউ এখনও স্বপ্ন দেখছেন উন্মুক্ত বাজারে বিদেশি পুঁজিকে উদারভাবে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে তাকে ভিত্তি করেই দেশটিতে বিনিয়োগের বন্যা বইয়ে দিবেন এবং অচিরেই বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবেন। তারা ভুলে গেছেন বাংলাদেশে বিদেশি পুঁজি আসার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তার সীমিত গ্যাস-কয়লা সম্পদ। এই ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের এসব খাতে অতীতে বিদেশি বিনিয়োগের যেটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে তা এ কথাই প্রমাণ করে যে এ ধরনের বিদেশি বিনিয়োগের প্রধান প্রবণতা হবে দ্রুত মুনাফা ও খরচ উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত পাত্তারি গুটানো। এজন্যই তারা বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে আবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে জুড়ে দিয়েছেন রপ্তানির শর্ত। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ এতই সীমিত যে তা এখন রপ্তানি করলে অচিরেই বহু গুণ দামে তা আমাদেরকেই আবার আমদানি করতে হবে। এই সহজ 'ইকুয়েশনটি' অনেক প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদ না বোঝার ভান

করলেও—একটি বুর্জোয়া দলের অন্যতম নেত্রী কিন্তু ঠিকই তা বুঝেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে—'৫০ বছরের জন্য গ্যাসের মজুদ জমা না রেখে কোন গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না'। তাই বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের স্বপ্নে যারা বিভোর তাদের অবগতির জন্য এখানে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরছি।

১৯৯৮ সালে সারা পৃথিবীতে যে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ৬১৯২৫.৮ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৪৪৮১৩.৬ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭২ শতাংশ পুঁজিই নিয়োজিত হয়েছিল উন্নত বিশ্বে। উন্নত বিশ্বে ৪৪৮১৩.৬ কোটি ডলার বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই শেয়ার ছিল ১৯৩৩৭.৩ কোটি ডলার। অথচ সে বছর সকল মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলি মিলে মোট যে বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭০৯৪.২ কোটি টাকা অর্থাৎ একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের চেয়েও কম। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে নীতি বদল করে কনসেশান দিয়ে বিদেশি পুঁজিকে উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে না। বস্তুত উচ্চতর ও দ্রুততর মুনাফা অথবা বৃহৎ বাজার সুবিধা ছাড়া বিদেশি পুঁজি সহজে উন্নয়নশীল বিশ্বের দিকে আকৃষ্ট হবে না। তাই চীন বা ভারত যত সহজে বিদেশি পুঁজিকে আকর্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তত সহজে বাংলাদেশের পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে বিদেশি পুঁজিকে আকর্ষণের জন্য যে মূল্য দিতে হবে তা তার লব্ধ উপকারের চেয়ে অধিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই বিদেশি পুঁজি সর্বদাই আমাদের মত কম উন্নত দেশের জন্য হবে একটি 'শাঁখের করাত'। এর সামগ্রিক সামাজিক ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া একে পেটুকের মত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না। বিশেষ করে অর্থনীতির স্ট্র্যাটেজিক খাতগুলি যেমন—ব্যাংক-বিমা-তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর এগুলোকে বিদেশি বিনিয়োগের দোহাই দিয়ে বিদেশিদের পূর্ণ মালিকানায় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের অনুকূলে যাবে না। বরং এসব 'কম্যান্ডিং হাইটে' বিদেশিরা একবার অধিষ্ঠিত হলে তখন সেখান থেকে তারা সহজেই আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন বলেই মনে হয়। তাৎক্ষণিক লাভের লোভে এই মহা বিপদটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। ব্যাংক বা সেবা খাতেও বিদেশি বিনিয়োগের রেকর্ড সুবিধার নয়। আর্থিক ব্যবস্থা তথা পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রণহীন উদারীকরণ অনেক শক্তিশালী অর্থনীতির জন্যও যে কি ভয়ানক আকস্মিক বিপদ ডেকে আনতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে সাম্প্রতিক 'এশীয় মুদ্রা সংকট' আক্রান্ত দেশগুলি। এসব দেশে বিদেশি পুঁজি স্থানীয় মুদ্রা মানের অবনতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রুত বহির্গমন ঘটিয়েছিল। একই সাথে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে তেল-গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিৎজ এই দুই প্রক্রিয়ারই নামকরণ করেছিলেন যথাক্রমে 'Hot Money Cycle' এবং 'IMF RIOT'। শুধু স্টিগলিৎজ নয়, এমনকি বিশ্বব্যাংক আইএমএফেরই আরো দুজন গবেষক ডেমিরগুক-কান্ট এবং ডিট্রাজিয়াসি নমুনা

হিসাবে ৫৩টি দেশ এবং সময়কাল হিসাবে ১৯৮০-৮৫-কে বিবেচনায় নিয়ে একটি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে 'উদারীকৃত আর্থিক ব্যবস্থাতেই ব্যাংকিং সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।' বিস্তৃত এক জরিপে নিওলিবারাল অর্থনীতিবিদ উইলিয়ামসন এবং মাহার সাহেবই দেখিয়েছেন যে, আর্থিক উদারীকরণের ফলেই আর্জেন্টিনা, চিলি, মেক্সিকো, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনজুয়েলাতে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। (আরো বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, কাভালজিৎ সিং, 'বিশ্বায়ন : কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন', ইউপিএল, ২০০৫) যদিও এর পরেও আমাদের দেশের কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ এখনও শর্তহীনভাবে আর্থিক বা পুঁজি বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েই দেশের উন্নতি ঘটানোর স্বপ্ন দেখছেন।

এদেশের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এও মনে করেন যে অবাধ মুক্ত বাজার ও বিশ্বায়নের বরপুত্র হচ্ছে অবাধ গণতন্ত্র। আসলেই কি তাই? বর্তমান অসম বিশ্বায়নে ভাসিয়ে দেওয়া অধিকাংশ দেশে নিখাদ গণতন্ত্রের বদলে আজকাল গড়ে উঠেছে এক ধরনের হাইব্রিড ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা। 'সত্যিকার গণতন্ত্র' এবং 'ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্র' এই দুই-এর মাঝামাঝি এক ধূসর অঞ্চলে এই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একেক জন এক এক নামে এই ব্যবস্থাকে অভিহিত করেছেন যেমন—নিচু মাত্রার গণতন্ত্র (Low Intensity Democracy), অনুদার গণতন্ত্র (Illiberal Democracy), নকল গণতন্ত্র (Pseudo Democracy), যান্ত্রিক গণতন্ত্র (Mechanical Democracy) ইত্যাদি। এসব গণতন্ত্রের যেই বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন এগুলো আব্রাহাম লিংকন কথিত সেই গণতন্ত্র নয় যেখানে শাসনব্যবস্থা হচ্ছে 'of the people' 'for the people' এবং 'by the people'। এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তি থাকে দুর্বল, বিদেশি শক্তির আধিপত্য হয় বেশি এবং গণতন্ত্র পাঁচ বছর পর পর নিছক ভোট দেওয়ার খেলায় পরিণত হয়।

তাই সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় বাংলাদেশে বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা খুব আরামদায়ক ও সম্ভাবনাময় হয়নি। বিশ্বায়ন হচ্ছে অনিবার্য বাস্তবতা শুধু এটুকু বলে সমর্পিত চিত্তে বসে থাকলে বাংলাদেশ খুবই ভুল করবে।

উপসংহার

এতক্ষণে মনে হয় 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়ার একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের সময় এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন আগে ব্র্যাক মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত একটি সেমিনারের কথা মনে পড়ছে। ওই বৈঠকে বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন এবং ড. ইউনূস উভয়েই খোলাখুলিভাবে তাদের ব্যক্তিগত মতামত মৌখিকভাবে প্রদান করেছিলেন এবং আমার তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্মৃতি থেকে তাদের সেদিনের সেই বক্তব্য তুলে ধরছি। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন 'বিশ্বায়ন বিরোধীদের বিরোধী' (Anti-Anti-globalization)। এই অবস্থানকে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এও বলেছিলেন যে এই বক্তব্যের মানে যদি কেউ এইভাবে করে যে তিনি 'বিশ্বায়নের সমর্থক' সেটাও ভুল হবে। বিশ্বায়ন

বিরোধিতার বিরোধিতা মানে নিছক বিদ্যমান বিশ্বায়নে ফিরে যাওয়া নয়। তিনি আসলে যেটা বলতে চেয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি একজন খাঁটি আন্তর্জাতিকবাদী, বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের জয়যাত্রায় বিশ্বাসী, তাই বিশ্বায়ন বিরোধিতার নামে আঞ্চলিকতাবাদ, কূপমণ্ডুকতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদ তিনি কখনই সমর্থন করবেন না। তাঁর 'Argumentative India' গ্রন্থেও এই যুক্তির প্রতিধ্বনি বারংবার শোনা যায়।

সেদিন সেমিনারে ড. ইউনূস বলেছিলেন যে, বর্তমানে বিশ্বায়নের রাজপথে চলছে 'পাজেরো' গাড়ি। আর আমাদের মতো অনুন্নত দেশে আমরা চালাচ্ছি আমাদের নিজস্ব গলিপথের বাহন রিকশা আর ঠেলাগাড়ি। যতদিন আমরা বিশ্বায়নের হাইওয়েতে চলার উপযুক্ত হতে না পারবো ততদিন বিশ্বায়নের সুফল আমরা উপভোগ করতে পারবো না। বিশ্বায়ন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করতে গিয়ে এই দুই বক্তব্য থেকে যেটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে আমাদের কূপমণ্ডুক হলে চলবে না এবং নিজেদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু তারপরও পাঠকের কাছে আমার প্রশ্ন বর্তমানে উন্নত বিশ্বের নেতৃত্বে যে অগণতান্ত্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তার কবলে পড়ে আমাদের মতো কম উন্নত দুর্বল দেশগুলো যখন—ক) নিজস্ব জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা হারাচ্ছে, খ) নিজেদের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি নিজেরা নির্ধারণের স্বাধীনতা হারাচ্ছে, এবং গ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আত্মসম্মান ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে আত্মমর্যাদাসহ মতামত প্রদানের অধিকার হারাচ্ছে, তখন আমরা কি নীরবে শুধু তা চেয়ে চেয়ে দেখবো না কি ল্যাটিন-আমেরিকানদের মতো গর্জন করে সেই কথা বলার সময় আমাদেরও এসেছে : 'অনেক হয়েছে—আর নয়! (দিস ফার অ্যান্ড নো ফারদার!)'

আতিউর রহমান

বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব : মধ্যবিত্তের ভূমিকা

বাঙালি বরাবরই রাজনীতি সচেতন। এমন প্রবাদ চালু ছিল যে বাংলা আজ যা ভাবে ভারত তা ভাবে কাল। ঐতিহাসিক বিচারেই বাংলা ছিল সমন্বয়ের কেন্দ্র। বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রধান ধর্মই হচ্ছে পরকে আপন করা, বাইরের প্রভাবকে আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যকে গ্রহণ করার এই গতিময়তাই বাঙালির বহুমাত্রিক চরিত্রকে বহুবর্ণিল উজ্জ্বলতা দিয়েছে। এই বাংলার আত্তীকরণের টানে পাঠানও এ দেশে এসে বাঙালি হয়ে গেছেন। এভাবেই হাজার বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক বাংলাদেশ। বাঙালির বহমানতার সেই প্রক্রিয়া এখনও থেমে যায়নি। নিরন্তর বহমানতার সেই প্রক্রিয়ায় ইদানীং নয়া মাত্রা যোগ হয়েছে। আজকাল অনেক বাঙালিই বিদেশ যাচ্ছেন। সারা বিশ্ব থেকেই বাঙালি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার শক্তি আহরণ করে চলেছে। তার নদ-নদীর গতির মতোই চির-চঞ্চল গতির এক স্থায়ী রূপ বাংলাদেশ। দূর-দূরান্তের ভাবনার সঙ্গে স্বদেশের মাটি-ঘেষা ভাবনাকে যুক্ত করে বাঙালি হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। পলিমাটির দেশ বাংলাদেশ। নানা দেশের পলির মতোই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কতো জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষ এক হয়েছে মিশ্রণের এই বেলাভূমিতে তার ইয়ত্তা নেই। বিস্ময়কর এক বৈচিত্র্যের প্রতীক এই বাঙালির সত্তাও মিশ্রিত। স্ববিরোধ সত্ত্বেও সুষমার সন্ধানী এই বাঙালির সমন্বয় সাধনা সত্যি অনন্য। মোটেও একরৈখিক নয়, বহুত্ববাদী এই বাঙালি জাতি হিসেবে অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। ভেতর ও বাইরের উৎস থেকে নানা ভাবনাকে এক কেন্দ্রে জড়ো করে প্রচলিত ও আধুনিক সব আকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধে যুক্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদের মতো আধুনিক সব ধারণাকে আত্মস্থ করে বাঙালির মানসপটে স্থাপন করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। এসব ভাবনাকে বাঙালির আবেগ ও উচ্ছ্বলতায় সিক্ত করে প্রাণবন্ত এক সত্তায় প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবহমান বাঙালির আত্মপরিচয়কে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরার এই অনন্য কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে। তিনি এই বিরল নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন এ কারণে যে তিনি তাঁর কালের ও সমাজের ভাষা বুঝতে পারতেন। সেই ভাষাকে আপন সৃজনশীলতায় এমন করে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর অনুসারীরা মনে করতেন তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই সকলের সঙ্গে যোগ রাখা হবে। পূর্ব-

বাংলার এক ঝাঁক তরুণ পাটভিত্তিক অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত থেকে বেড়ে ওঠে। গ্রাম থেকে মফস্বল শহর, সেখান থেকে কলকাতা ও ঢাকা হয়ে তারা এমন এক সামাজিক স্রোতধারা সৃষ্টি করেন যা কিনা শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা বনে যায়। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি জাতির উত্থান তার নেতৃত্বে ছিল বঙ্গবন্ধুর চারপাশের এক বিরাট মধ্যবিত্ত প্রতিনিধি দল। শোষণহীন কল্যাণময় এক সমাজ গড়ার সাধনায় এই নয়া মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব বলতে গেলে অসাধ্য সাধন করেছে। রাষ্ট্রসাধনায় শ্রেয়োবোধ, গরিবের কল্যাণবোধ, মানবিকতার বিস্তার—এমন সব আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের পবিত্র অঙ্গীকারে তারা ছিলেন নিষ্ঠাবান। এমন এক মহৎ স্বপ্নকে ধীরে ধীরে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনে জাগিয়ে দিতে পেরেছে যে নেতৃত্ব তার শিরোমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন পরিবর্তনেরও পরিচালক। যদি পুরো সমাজ তাঁকে মদদ না দিত তাহলে নিশ্চয় তিনি বিশ্বকে এমন সর্বব্যাপী পরিবর্তনের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ উপহার দিতে পারতেন না। যদি তিনি তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, মনি সিংহ, ভাসানী, মনোরঞ্জন ধরদের পাশে না পেতেন তাহলে নিশ্চয় এত দ্রুত একটি বাঙালি জাতির অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করতে পারতেন না। এমনি এক প্রেক্ষাপট মনে রেখেই আমরা নীচে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ধারাটির আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝবার চেষ্টা করব।

মধ্যবিত্তের উৎপত্তি

নিঃসন্দেহে বাঙালির সার্থকতার শীর্ষতম শিখর ছিল একাত্তর। হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রাপ্তি স্বাধীন বাংলাদেশকে অর্জন করার এই সনটি তাই বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয়। একাত্তরে পৌঁছুতে বাঙালির অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে। তবে বাঙালির জাতি হয়ে উঠবার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্বটি সবচেয়ে ঘটনাবহুল। আর এই পর্বটির নিয়ন্ত্রক ছিল দ্রুত বিকাশমান একটি নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। পাকিস্তানের অনুগত ও অমানবিক পরিবেশে ক্রমবিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশের দ্রুত বিকশিত হতে না পারার ক্ষোভ এবং আরেক অংশের জীবনযাত্রায় টানাপোড়েনের জ্বালা—এই দুই প্রবণতার সম্মিলিত শক্তি তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বুঝতে হলে এই শ্রেণীর উৎপত্তি এবং উদ্ভবের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক পর্যায়ে এই শ্রেণীর নিজস্ব উন্নতির পথ হতে তাকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা হয়। কার্যত ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদৌলার পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নয়নের (ইউরোপীয়দের মত) সকল উপসর্গ বিকশিত হচ্ছিল। একদিকে জমিদারদের একটি শক্তিশালী দল বিকশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে স্বনিয়োজিত চাষিদের দল,

প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীদের দলও নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে তোলে। এই সময় ক্ষুদ্র আকারের কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল (আজাদ, ১৯৮৯: ৬৭-৮২)। কিন্তু ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে এই প্রক্রিয়াটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অথচ প্রায় ইউরোপের মতোই সনাতনী কায়দায় এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হতে শুরু করেছিল। অবশ্য সিরাজের পতনের আগে থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক ধরনের দালালদের নিজেদের দলে ভিড়িয়েছিল। এরা স্থানীয় পণ্য কিনতো এবং ব্রিটিশ পণ্য বিক্রি করতো। এদের বলা হতো গোমস্তা (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০:৯)। পলাশীর যুদ্ধের পর এদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এই স্থানীয় দালালরা ছিল কোম্পানির প্রতিনিধি। যে প্রক্রিয়ায় সনাতনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হচ্ছিল এরা তার বাইরেই ছিল। শুধু বাইরে কেন, ঐ প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছিল।

যথেষ্ট সম্পদ উপার্জনের পর এই প্রতিনিধিরা নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। তাদের কেউ কেউ সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজের জন্য প্রচুর অর্থ দান করে (ঘোষ, ১৩৮৬:১৪৬০)। কোম্পানি তাদের উত্তরণে নাখোশ ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ সময় এমন কিছু নতুন নিয়ম কানুন চালু করা হয় যা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে যায় এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় অথবা শিল্পে পুঁজি খাটাতে নিরুৎসাহিত করে। কার্যত স্থানীয় পুঁজি ব্যবসায় অথবা শিল্পে না খেটে জমিদারি কেনার কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে (উমর, ১৯৮৭:১৬-১৭)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তাদের ঐতিহ্যগত ভিত্তি থেকে পৃথক করার জন্য ১৮৩৭ সালে ফার্সি ভাষার জায়গায় ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষায় অধিষ্ঠিত করা হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সামাজিক সুবিধা ভোগ করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে প্রশাসনিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়, যা নতুন শিক্ষানীতির জন্ম দেয়। এই নীতির ফলে হাই স্কুল এবং কলেজগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পায় ইংরেজি এবং তা সরকারি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমলা, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রশাসন এবং সমাজের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্পষ্ট কোন অবদান ছিল না। কিন্তু যখন থেকে কৃষকদের একাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে তখন থেকেই এই চিত্র বদলে যেতে শুরু করে। এই সময় থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্যি ১৮৫৯ সালে জমিদারি প্রথার বিপক্ষে আদালত রায় দেয়ার পর কৃষকরা আংশিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকদের জমির মালিকানা লাভে সাহায্য করেছিল (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০ : ২৮-২৯)। তাছাড়া ১৯০২ সালের আরেকটি আইন কৃষকদের জমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। এইভাবে কৃষকরা তাদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় বেশি নিরাপদ বোধ করতে লাগলেন এবং এই পদ্ধতিতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একটি স্বাধীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বের হয়ে আসে। পরবর্তীকালে তাদের

উৎপাদিত বাণিজ্যিক পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং তারা কিছু বাড়তি আয় করতে শুরু করেন। বাড়তি এই আয় সন্তানদের শিক্ষাখাতে ব্যয় হতে থাকলো। এই প্রক্রিয়ায় ধনিক কৃষকদের উদ্বৃত্ত শিক্ষাখাতে ব্যবহৃত হয়ে তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় পদ্ধতি অবদান রেখেছিল:

(১) কোম্পানির স্থানীয় দালালদের মধ্যস্থতার কারণে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত;
(২) ইংরেজি শেখা জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রশাসনিক এবং সামাজিক অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি; এবং
(৩) ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের আইনের মাধ্যমে কৃষকদের জমির ওপর মালিকানার অধিকার।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ওপরের পদ্ধতিগুলোকে আরো বেগবান করেছে। কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর সন্তোষের বাস্তব ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও এ কথা ঠিক আংশিকভাবে হলেও পূর্ব বাংলার অভিজাতরা কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সুবাতাস পেয়েছিলেন। ব্যবসায় ও শিক্ষার সুযোগ হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যিক পণ্যের দাম বিশেষ করে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ছেলেমেয়েরা প্রথমে স্থানীয় শহরগুলোতে এবং পরে কলকাতা ও ঢাকায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া শুরু করলো। এই নতুন শিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং অন্যরা প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন পেশাদারি কাজে জড়িয়ে পড়েন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকারও পান। তা সত্ত্বেও তাদের একটি বড় অংশ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে সাধারণভাবে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পূর্ব বাংলার এই শিক্ষিত অভিজনদের বেশির ভাগই পাকিস্তান চেয়েছিলেন। বাহ্যত ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য মনে হলেও পূর্ব-বাংলার কৃষক সন্তানেরা আসলে তাদের পরিবারের বস্তুগত উন্নতির চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েই পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, তারা কিছুটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু তারা শিগগিরই বুঝতে পারলেন, তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। তাই এ অঞ্চলে একটি নতুন জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন শুরু হতে থাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে। পাকিস্তানের প্রশাসন কৃষক শ্রেণীতে জন্ম নেওয়া পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে চায়নি। এই প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথমে গণতন্ত্রের জন্য এবং পরবর্তীকালে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মানসিকতা নিয়ে বিস্তৃত হয়। আর এভাবেই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন শক্তিশালী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত সুদৃঢ় হতে থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন উপাদান

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গকে বোঝার জন্যে আমরা সারণি ১ দেখতে পারি। এই সারণিতে ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের পেশাগত অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও পরিবহন ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক এলিট ছাড়া দুই কোটি ষাট লক্ষ শ্রমশক্তির বেশির ভাগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো একটি বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রশাসনিক এলিটরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নন। এদের বেশির ভাগই রাষ্ট্র অথবা পুঁজির পক্ষে কাজ করতেন। শোষণের মাধ্যম হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং তারা ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত। পরিবহন এবং অন্যান্য শ্রমিকরা মজুর শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার বর্গাচাষিদের বড় অংশ প্রলেতারিয়েতের অন্তর্গত। তাছাড়া ছাত্ররা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে হিসেবে না ধরলে মাত্র ৩৭ লক্ষ শ্রমশক্তি মধ্যবিত্ত হিসেবে শ্রেণীভুক্ত হবে। এরা মোট শ্রমশক্তির ১৪.৩ শাতাংশের মতো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত কৃষকদের পরিচয় জানার জন্যে আমরা *Pakistan Census of Agriculture, 1960* এবং *Survey of Agriculture in Bangladesh 1967-68* (সপ্তম সংস্করণ, ১৯৭২-এ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত)-এর ওপর নজর দিতে পারি। এই দুই নিরীক্ষা মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত কৃষকের সংখ্যা ২৩ লাখ ১৩ হাজার ৯৭০ এবং ২৪ লাখ ২৪ হাজার ২২৪। অন্যভাবে বলা যায়, এই আট বছরে এই শ্রেণীর কৃষকদের বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৪৬ শতাংশ।

সারণি ১

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমশক্তির পেশাগত মর্যাদা

পেশাভিত্তিক শ্রেণী	হাজারে	শতকরায় %
১. বিশেষজ্ঞ/পেশাজীবী	৩৭৪	১.৪৩
২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪১	০.১৬
৩. কেরানি	২১৩	০.৮১
৪. দোকান কর্মচারী	৯৩৪	৩.৫৭
৫. চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবী	৩৮৬	১.৪৮
৬. কৃষিজীবী	২০১১১	৭৬.৯৬
৭. পরিবহন ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী	২২৪৭	৮.৫৯
৮. ছাত্র	১৫৭৪	৬.০২
৯. অন্যান্য	২৬৪	১.০১
মোট	২৬১৪৪	১০০.০০

উৎস : ১) মহিউদ্দিন আলমগীর এবং লডউইক জে. জে. বি. বারলেজ (১৯৭৪), *বাংলাদেশ: ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার ১৯৪৯-৫০; ১৯৬৯-৭০*, বিআইডিএস, পৃ. ১৭৫-৭৬। ২) বিবিএস (১৯৭২); *স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাইজেস্ট অব বাংলাদেশ*, ১৯৭২; নং ৮, পৃ. ৩৩-৬২ এবং ২৩৫-৫২। ৩) ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো (১৯৭১), *স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অব বাংলাদেশ*, সোসাইটি এ্যান্ড কমার্স পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃ. ২৫-৩৯। ৪) বিবিএস (১৯৭৭), *বাংলাদেশের আদমশুমারী, ১৯৭৪*; সারণি ৪২, পৃ. ৪১।

এখন ১৯৬৯ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রমশক্তি বন্টন সম্পর্কে জানার জন্যে আমরা সারণি ৩.২ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। সারণি ২ অনুযায়ী ১৯৬৯ সালে শ্রমজীবী হিসেবে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৫,৬২,১৪৪। ঐ বছরের জন্য এই সংখ্যাটি ছিল মোট শ্রমশক্তির ৩২.৭৫ শতাংশ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কিছু উপশ্রেণীও ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই (প্রায় ৭০ শতাংশ) ছিলেন স্বাবলম্বী গ্রামীণ কৃষক। এরা অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন না। নিজেরা অন্যদের দিনমজুর হিসেবে নিয়োগও করতেন না। ছাত্ররা ছিল দ্বিতীয় বৃহৎ মধ্যবিত্ত উপশ্রেণী। তারাও পুঁজিপতি অথবা পেশাজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও তারা পিতা-মাতা ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরশীলও ছিল না। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীটিকে লেখক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, দোকান-মালিক ও কর্মচারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করলেও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা সবাই কমবেশি স্বাধীন শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। দোকান কর্মচারীদের এই শ্রেণীতে বিশেষ করে দোকান মালিকদের (অনিবন্ধিত) শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের আয়ের স্তর প্রায় সমান বলেই তা করেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যখন আঘাত করা হয় তখন সেই সঙ্কটের মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সাড়া দেন। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগগুলো সংখ্যায় বেশি ছিল না। এরাই ছিল ১৯৬৯ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় এক-দশমাংশ।

সারণি ২

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রমশক্তির বিভাজন (১৯৬৯)

পেশা	হাজারে	শতকরায় %
১. কর্মচারী/কেরানি		
ক. দোকান কর্মচারী (নিবন্ধিত দোকান)	৩,১৮,৭৮৭	৩.৭২
খ. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	৭০,৯৭৪	০.৮৩
গ. শিল্প প্রতিষ্ঠান	৩৯,৩১৮	০.৪৫
ঘ. অফিসের কেরানি (সরকারি, আধাসরকারি) এবং অন্যান্য	৩০,২৬৬	০.৩৫

২. আইনজীবী ও চিকিৎসক (নিবন্ধিত)	১৪,২৩০	০.১৭
৩. প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশাদারী (শিক্ষক বাদে)	১,৯১,৮৬৮	২.২৪
৪. প্রতিরক্ষা, পুলিশ এবং অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থায় নিয়োজিত কর্মী	৩,৪৫,১৫১	৪.০৩
৫. স্ব-নিয়োজিত মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণী	৫২,৮৩,৫৪৮	৬১.৭১
৬. ছাত্র (হাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত)	১৫,৭৪,০০০	১৮.৩৮
মোট	৮৫,৬২,১৪৪	১০০.০০

উৎস : সারণি ১-এ উল্লেখিত।

কেরানি ও অন্য কর্মচারীরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় ৪ শতাংশ। সংখ্যায় কম হলেও তারা শহরাঞ্চলের অফিস ও কারখানাগুলোতে কাজ করতেন বলে যে-কোনো আন্দোলনে তাদের সহজেই সংগঠিত করা যেত।

পক্ষান্তরে, নিবন্ধিত দোকান এবং ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোর কর্মচারীরা বরাবরই ঝুঁকির মধ্যে থাকতেন। মালিকদের মানসিকতা সম্বন্ধে তাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হতো। তাদের যে বিপুলভাবে শোষণ করা হচ্ছে তা এ সময়টাতেই তারা অনুভব করলেন। তাদের চাকরিদাতাদের নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে তারা অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তারাই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করলেন। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগদানে সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল। তাদের চাকরির এই শর্তে তারা খুশি ছিলেন না। বেতন কাঠামো এবং আবাসন সুবিধার দিক থেকে অসমতা তাদেরকে প্রায়ই আন্দোলনে উৎসাহিত করতো। যদিও তা সীমিত ছিল, তবুও কিছু রাজনৈতিক দল এই অসন্তোষকে দক্ষতার সাথে ঐ সময় কাজে লাগিয়েছিল। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীরা আকারে ক্ষুদ্র হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের ধারা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। বিকাশমান বাঙালি জাতির বিবেক হিসেবে তারা বিবেচিত হতেন এবং বৈষম্যের ভিত্তির গভীরতর অন্বেষণে তারা অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তারা শহরে বাস করতেন এবং বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ ছিলেন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের একাংশ পাকিস্তানের দুই অংশের মূলত দুই অর্থনীতির যে ধারণা তা জনসম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ ও রাজনীতিতে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। রেহমান

সোবহান, নূরুল ইসলাম, মুশাররফ হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও আরও অনেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদেও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

আইনজীবী এবং চিকিৎসকগণ সংখ্যায় মাত্র ১৪ হাজার হলেও মধ্যবিত্ত বিভিন্ন অংশ এবং জনসাধারণের ওপর তাদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। তাদের কারো কারো ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল আইনজীবী এবং চিকিৎসকরা ছোট খাটো সমাজসচেতন গোষ্ঠী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এরা আলোকিত মধ্যবিত্তের ধ্যানধারণাকে মূলধারার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

অবশ্যি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাত্ররা ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি জাতীয় মুক্তির স্বপ্নের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। তারা গ্রাম এবং শহর উভয় অঞ্চল থেকেই এসেছিল। তারা সবসময়ই তাদের শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে থাকতো। সুতরাং, চলমান রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। চাষি এবং শ্রমিক উভয়ের কাছে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এই ধারণা তাদের সাহায্য করেছিল। একইভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরও তারাই আরো সচেতন করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। কার্যত তারাই আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা

পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে পাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কাঁচা পাটের ৯২ শতাংশ পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্ববাজারে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। এ সময় কলকাতায় পাটকলের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

এই কলগুলোতে কাঁচা পাট যোগান দিতে একটি নতুন সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ফড়িয়া বলে ডাকা হতো। উৎপত্তিগত দিক থেকে তারা বাংলার উদ্বৃত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের অংশ। মধ্যস্বত্বভোগী এবং পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ কৃষকই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাই ফড়িয়াদেরও বেশিরভাগ ছিলো ঐ সম্প্রদায়ের (রহমান ও আজাদ, ঐ; পৃ. ৪৩)। অন্যভাবে বলা যায়, পাটের এই ব্যাপক চাহিদা শুধুমাত্র সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বৃত্ত কৃষক বৃদ্ধিতেই সহায়তা করেনি বরং পাট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ব্যবসায়িক শ্রেণীর বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এরাও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কলকাতাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাট এবং পাট সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিছু মধ্যস্বত্বভোগী পাট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়ে কলকাতার পৌর অভিজনদের দলে যোগ দেন। এক সময় কলকাতাভিত্তিক শক্তিশালী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা এর জবাবে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির সূচনা করে। এ

কারণেই ১৯০৫ সালে বাংলার বিভক্তি ঘটে। নতুন প্রদেশের মূল রাজধানী হয় ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার আইন প্রণয়ন কেন্দ্র ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং এ অঞ্চলের এলিটরা এই সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এরপরে এ অঞ্চলে অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আদালতকে ঘিরে একদল আইনজীবীর উদ্ভব হয়। এভাবেই তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পেতে শুরু করেন। কিন্তু ঐ সময় কলকাতাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ রাজকে অবিরাম চাপ দিয়ে আসছিলেন বাংলাকে পুনরায় একত্র করার জন্য। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রশাসন এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বাংলা আবার এক হয়। এই অল্প সময়ের জন্য পাওয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, তা যত সীমিতই হোক না কেন, পূর্ব বাংলার সাধারণ এবং অভিজন উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই আশীর্বাদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। এ কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা দেবার নতুন সুযোগ তারা পেয়ে গেলেন। পূর্ব বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রামকে ঘিরে অভিজনেরা, যাদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান, তারা মনে করলেন যে হিন্দু-প্রভাবিত কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের প্রতি আন্তরিক নন। পরিসংখ্যানও তাদের এই অসন্তুষ্টির পক্ষে যায়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯০৭ এবং ১৯১২ সালের মধ্যে শিক্ষিত জনসংখ্যার পরিমাণ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারা বাংলায় ঐ সময় শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়েছিল ৩৭ শতাংশ। এভাবে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৫ সালের পর কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা এক হবার পর সেখানে একটি ভাটার টান লাগে। সাধারণ চাকরিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রশ্ন শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ব্যবসা করার জন্যে যে পুঁজির প্রয়োজন তা যোগান দেওয়ার মতো অতিরিক্ত অর্থ এই অঞ্চলে মধ্যবিত্তের কারো ছিল না। সরকারি চাকরির জন্য মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তৎপরতা চালান, যাতে এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকরা প্রয়োজনে যোগ্যতা শিথিল করে হলেও তা লাভ করতে পারে (রহমান ও আজাদ, ঐ, পৃ. ৬৮)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই দাবির পক্ষে বিখ্যাত বাংলা চুক্তির মাধ্যমে তাঁর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১৯২৩ সালে নির্বাচনে মুসলমানদের অভূতপূর্ব সমর্থন নিয়ে তাঁর স্বরাজ পার্টি জয়যুক্ত হয়। তিনি বাংলা চুক্তিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেন এবং মুসলমানরা তাঁকে সেজন্যেই বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তাঁরা তাঁকে নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে তিনি মারা গেলেন এবং স্বরাজ পার্টির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দ্রুতই হারিয়ে গেল। আর এভাবেই মধ্যবিত্ত মুসলমানরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলীম লীগ বহিরাগত দল ছিল। অবাঙালি জমিদারদের প্রভাবে এটি চলতো। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে রাজি হবার সাথে সাথেই মুসলীম লীগ পূর্ব বাংলার বিপুল সমর্থন পেল। কৃষক-প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল

হক মুসলীম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর লাহোর প্রস্তাব এক নতুন মাত্রা যোগ করলো। পূর্ব বাংলার কৃষকরা জমিদারদের (বেশিরভাগ হিন্দু) শোষণে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হবে। পাশাপাশি তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি সৎ এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের যাতে তারা অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে আগের চেয়ে ভালো থাকতে পারবেন।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের সে স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয় নি। জমিদারি প্রথা সত্যিকার অর্থে তখনও লোপ পায় নি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রশাসন ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে কম নির্মম কিছু ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা তাদের উন্নয়নের ধারা নিয়ে তাই দারুণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছিল। খাজা নাজিমউদ্দীন বরাবরই জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। আর তিনিই হলেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি কখনোই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইচ্ছের মর্যাদা দেন নি। বরং সারা জীবনই অবাঙালি আমলা, প্রকৌশলী এবং শিল্পপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে রইলেন। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধনী হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে গেলেন। ফলে ব্যবসায় ও প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিল (করিম, ১৯৮৪ : ২৪১)। যেসব মুসলমানের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি ছিল তারা দেশান্তরী হিন্দুদের সম্পত্তি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারা ব্যবসায় ও শিল্পেও তাদের পুঁজি খাটালেন না।

শিগগিরই এই শূন্যস্থান অবাঙালিদের দ্বারা পূরণ হতে লাগলো। তারা পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন (রহমান ও আজাদ, ঐ; আলী, ১৯৮৫ পৃ. ৪৫)। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা শিগগিরই বুঝতে পারলেন যে, তারা অবাঙালি আমলা, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তাদের আশা পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমর্থন সম্পর্কে তারা বিশ্বাস হারালেন। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হতাশার কারণ না খুঁজে শাসক সম্প্রদায় বরং বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলো। ফলে বাঙালি অভিজনদের হতাশা আরো তীব্র হতে লাগলো।

সাথে সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্র বহুমাত্রিক বাঙালি সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাদের ইচ্ছেমতো তথাকথিত 'ধর্মীয়' সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলো। সুতরাং তারা শুরুতেই বাংলা ভাষার পবিত্রতায় আঘাত হানলো। তৎকালীন পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার জায়গায় জোর করে তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই অসৎ উদ্দেশ্য দ্রুতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ভাষা আন্দোলন সেই অর্থে বাঙালি মধ্যবিত্তের ঐ চ্যালেঞ্জেরই ফসল।

আগেই বলেছি, পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষ কৃষক সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তারা সক্রিয় ভূমিকাও রেখেছিলেন। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাই তারা মনে করেছিলেন, রাষ্ট্র তাদের আবেগ অনুভূতির মূল্য দিয়ে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবে। কিন্তু বাস্তবে তারা বরং উর্দুকে সেই মর্যাদা দিলো। বাংলাকে করলো অপমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ ছাত্ররা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করলো। এমনকি বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে তাদের রক্ত ঝরলো। তারা সরাসরি সরকারের রাষ্ট্রভাষা নীতির বিপক্ষে চলে গেল। তাদের এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে সেগুলোর প্রধান দুটো কারণ হলোঃ

এক. বাংলা অপমানিত হওয়ার কারণে তারা মনে করলো পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং গর্বের বিরুদ্ধে। যারা মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ তাদের ভাষার প্রতি এই অবিচার বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়া এক সময় সাধারণ মানুষের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

দুই. তারা এটা উপলব্ধি করতে পারলো যে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তাদের সরকারি ও আধাসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হবে। তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো হারিয়ে যাবে। তাদের সন্ত ানদের শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তাদের সংস্কৃতি বিকশিত হবে না।

ভাষা আন্দোলনে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত অংশের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে। মাতৃভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্বসাধারণের দাবির মাধ্যমে বাঙালি জাতির পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেবার কাজটি দক্ষতার সাথেই করতে পেরেছিলেন নেতৃত্বের অপেক্ষাকৃত বেশি আলোকিত অংশটি। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সংখ্যাগুরু বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে মোটেই আন্তরিক নয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটে পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে। ঐ নির্বাচনে বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত ২১-দফা আসলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিচ্ছবি। এই ছবিটি আরো পরিষ্কার হয় যখন এই দাবিটি শ্রমশক্তির বিভিন্ন উপদলে বণ্টন করে দেখা হয়। আমাদের কাছে ১৯৫৪ সালের শ্রম শক্তির তথ্য না থাকার কারণে আমরা ১৯৬১ সালের উপাত্ত ব্যবহার করেছি।

১৯৬১ সালে মাত্র ৭ শতাংশ শ্রমশক্তি অকৃষিজীবী মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর অন্ত র্গত ছিল। শ্রমশক্তির প্রায় ২৯ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক। তাদের প্রায় সব আকাঙ্ক্ষাই এই ইশতেহারে উল্লেখিত বা প্রতিফলিত হয়েছিল। ২১-দফায় অন্তর্ভুক্ত

আর্থ-সামাজিক দাবিসমূহের ২৪ শতাংশ ছিল এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে তৈরি। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৬ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু ২১-দফায় প্রায় ৬৮ শতাংশ আর্থ-সামাজিক দাবি-দাওয়াই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘিরে। এটা অভাবিত নয়। কার্যত যুক্তফ্রন্ট ছিল ম্যধবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক জোট। সুতরাং নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সত্যিকার অর্থে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে শহুরে এবং গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ ছিল খুবই গভীর। রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর প্রথমদিককার প্রজন্ম। সুতরাং কৃষকদের আর্থ-সামাজিক দাবি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রাণের দাবি ছিল।

সারণি ৩ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে বর্গাচাষি, কৃষিমজুর এবং শিল্পশ্রমিক (যাদের মোট পরিমাণ ৬০ শতাংশ) ছিলেন মোট শ্রমশক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কিন্তু তাদের দাবি-দাওয়ার মাত্র ১৯ শতাংশ ২১ দফায় প্রতিফলিত হয়। তখন দেশে প্রায় ২৭,৬০,০০০ কৃষি শ্রমিক ছিলেন। তাদের নামে মাত্র একটি দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা সংখ্যায় কৃষিশ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম, তাদের জন্য প্রায় ১৮টি দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার দরুনই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৯১টি আসন দখল করে এবং শাসকদল মুসলিম লীগকে ১০টি আসন নিয়েই খুশি থাকতে হয় (সেন, ১৯৮৬:১২৪)। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চক্রান্ত এবং পূর্ববাংলার অভিজন নেতাদের একতার অভাবে পূর্ববাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় নি। মূলত কেন্দ্রীয় আমলারা পূর্ববাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রকে দুরূহ করে তোলেন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। প্রথমদিকে তারা পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করলেও ১৯৫৮ সালের পর তারা আনুষ্ঠানিকভাবেই তা করতে শুরু করে।

সামরিক শাসনের প্রথম পাঁচ বছর সামরিক শাসক আইয়ুব খান প্রচণ্ড রূঢ় ছিলেন এবং কোন সংগঠনের প্রতিবাদকে মাথা চাড়া দিতে দেন নি। কিন্তু ১৯৬২ সালে ছাত্ররা খুবই সবল একটি শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করলো এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য অংশও আন্দোলনের উদ্যোগকে সমর্থন দিতে শুরু করলো। পাকিস্তান রাষ্ট্রও প্রচণ্ডভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্র নিজেই উদ্যোগী হয়ে সাধারণ দাঙ্গা লাগিয়ে দিল, যা প্রকারান্তরে বাঙালির জন্যে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। এই ঘটনা তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। এরপর জনসাধারণ গণতান্ত্রিক এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাদের দুরবস্থা এবং বিপদ আরো ভালোভাবে বুঝতে পারলেন।

সারণি ৩

১৯৬৪-৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আহুত ধর্মঘট

ধর্মঘট আহ্বানকারী শ্রেণী/দল	ধর্মঘটের সংখ্যা		%	
ছাত্র	১০৬		২৪.৮৮	
কর্মজীবী (অফিস/দোকান)	১১৫		২৭.০০	
পেশাজীবী শ্রেণী	৬০	}২৮১	১৪.০৮	}৬৫.৯৬
শিল্প শ্রমিক	১০৫		২৪.৬৫	
অন্যান্য শ্রমিক	৪২		৯.৮৬	
মোট	৪২৬		১০০.০০	

উৎস: আজাদ, প্রাগুক্ত।

ষাটের দশকের শুরুর দিককার আন্দোলনের প্রধান সারিতে ছিলেন শ্রমিক, ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ১৯৬৯-এ আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, আইয়ুব খানকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হলো। কিন্তু সামরিক শাসন তখনো বহাল ছিল। তারপর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করলেন। আজাদ (১৯৯৩)-এর গবেষণা মতে ১৯৬৪ থেকে ৬৯-এর মধ্যে প্রায় ৪২৬টি ধর্মঘট হয়েছিল। সারণি ৩-এ ধর্মঘট আহ্বানকারীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই সারণি অনুযায়ী ১৯৬৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫ শতাংশ ধর্মঘটই ছিল ছাত্রদের নেতৃত্বে। তার মানে আন্দোলনকারীদের মধ্যে তারাই ছিল প্রভাবশালী।

অফিস এবং অন্য কর্মজীবীরা ডেকেছিলেন ২৭ শতাংশ এবং সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ডেকেছে মাত্র ১৪ শতাংশ ধর্মঘট। অন্যভাবে বললে, সনাতন এবং নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই সময় একত্রে প্রায় ৬৬ শতাংশ ধর্মঘট ডেকেছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিরুদ্ধে আহূত ধর্মঘট বাস্তবায়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ধর্মঘট ছাড়াও প্রতিরোধের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রতিরোধে যোগ দেন। দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে (সারণি ৪ দেখুন)।

সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের ৩০৫টি খবর এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ শতাংশ বিক্ষোভ ছাত্ররা সংগঠিত করেছিল। সাংবাদিক এবং শিক্ষকদের প্রতিরোধের হার ছিল ১৫ শতাংশ। কৃষকেরাও নিশ্চুপ ছিলেন না (১৪শতাংশ)। চাকরিজীবীরাও (৫.৫ শতাংশ) তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন।

এই দৈনিকে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ৫৭ শতাংশ সংবাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংযোগ ছিল। বাঙালি শিল্পতিরাও নিশ্চুপ ছিলেন না (৪ শতাংশ)।

সারণি ৪

দৈনিক আজাদে প্রকাশিত ধর্মঘটের সংবাদ, ১৯৬৪-৬৯ কাল পর্ব

ধর্মঘট আহ্বানকারী শ্রেণী/দল	প্রতিবেদন/সংবাদ-এর সংখ্যা		%	
ছাত্র	১৩৯		৩৭.০৫	
কর্মজীবী (অফিস/দোকান)	১৭		৫.৫৭	
শিক্ষক ও সাংবাদিক	৪৫	}২০১	১৪.৭৫	}৫৭.৩৭
কৃষক	৪৩		১৪.১০	
শ্রমিক	৭৪		২৪.২৬	
শিল্পপতি	১৩		৪.২৬	
মোট	৩০৫		১০০.০০	

উৎস: আজাদ, প্রাগুক্ত।

অবশ্য, মনে রাখতে হবে যে পত্রিকাটি আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপদলের সকল প্রতিরোধের খবর প্রকাশ করতে পারে নি। একটি সাধারণ সমীক্ষায় (১৬২ জন উত্তরদাতা) দেখা গেছে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশ ছিলেন শহুরে এবং বাকি ৬০ শতাংশ ছিলেন গ্রামের অধিবাসী (আজাদ, ঐ)। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তারা ভৌগোলিকভাবে ১৭টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলা হতে এসেছিলেন। সমীক্ষাটি চারটি বিভাগীয় এবং কিছু জেলা সদরের প্রধান কার্যালয়ে চালানো হয়েছিল। উত্তরদাতাদের ১৭ শতাংশ ছিলেন ভূমিহীন, ৪০ শতাংশ ছিল উদ্বৃত্ত কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ৮ একরের বেশি (গড়ে জমির পরিমাণ ছিল ৩১ একর)। ধনী ভূমিমালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিলেন না। পেশাগত দিক থেকে তারা ছিলেন ছাত্র, অফিস কর্মজীবী, দোকান মালিক ইত্যাদি। বাকি ৪৩ শতাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের। ৮৩ শতাংশের পারিবারিক আয়ের উৎস ছিল আংশিক অথবা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। তাদের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১৬ হাজার ৩১৬ টাকা। মাত্র ১৩ শতাংশ তাদের বাৎসরিক আয় বলেছিলেন ২০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ২৪ শতাংশের জন্যে এই পরিমাণ ১০ হাজার টাকারও কম।

আয়ের এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। উত্তরদাতাদের ৯১ শতাংশ মনে করেন, বিভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে ছাত্ররাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনসত্তরের বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি প্রভাব

অংশগ্রহণকারী অংশ ছিল সে ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু তাদের কোন কোন গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে প্রশ্নে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতাদের মতে, শ্রমিকরা এবং ৩৬ শতাংশের মতে বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এবং ৩ শতাংশ বুদ্ধিজীবী ছিলেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী, দোকানদার এবং বস্তিবাসীদেরও আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

একথা ঠিক ১৯৬০-এর আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশাল অবদান ছিল এবং তাদের এই অংশগ্রহণ বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী ভাবনা স্পষ্টভাবে জাগিয়ে তোলে। ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেন, তারা আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস বা অবদমন করছিল এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও বিপন্ন হচ্ছিল বলে তারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন (৬৪ শতাংশ)।

উত্তরদাতাদের অনেকেই (৬০ শতাংশ) বলতে চেয়েছেন যে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল মুক্তিযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। কার্যত ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতাই বলেছেন, তারা ১৯৬৯-এর আন্দোলনের সময় স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যারা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, যদিও তাদের অনেকেই রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। তা সত্ত্বেও তাদের এই মতামত কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কও ছিল গভীর। তখনও তাদের অনেকেরই পিতামাতাও ছিলেন গ্রামে।

এটা নির্বিবাদে বলা চলে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সাধারণ মানুষও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান যে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল সে কথাটি অনুমান করা যায়। ইতিহাসের ধারাও ঠিক সেই পথেই ধাবিত হয়। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীকালে ছাত্রদের নেতৃত্বে উত্থাপিত ১১-দফায় পরিষ্কারভাবেই জাতীয় দাবির পাশাপাশি গণমানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাম রাজনীতিকরা গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও আওয়ামী লীগ সঠিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। দলের নেতারা সফলভাবেই নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়া বক্তৃতা-বিবৃতিতে গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে তুলে আনেন। প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ, পঁচিশ বিঘার নীচে জমির খাজনা মওকুফ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পাট শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানির হিস্যা, কৃষকের উন্নতি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকাশসহ এমন সব আর্থ সামাজিক প্রতিশ্রুতি তারা ঐ সময় দেশবাসীকে দিয়েছিলেন যার ফলে পূর্ব-বাংলায় আওয়ামী লীগের পক্ষে এক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। মধ্যবিত্ত, শ্রমিকশ্রেণী, প্রান্তিক চাষী, ছাত্র তথা পুরো বাঙালি জাতিই তাই ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। কিন্তু

নির্বাচনে জিতেও তারা তাদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণে অসহযোগ আন্দোলন (দেখুন রহমান, ১৯৯৮) এবং অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। খুবই দক্ষতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সকল জনগণের সমন্বিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন পেশার মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সে কথাই প্রমাণ করে। আর সে কারণেই তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে খেটে-খাওয়া মানুষদের অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। তার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন:

> যাঁরা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ১৫)।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের সেই প্রত্যয়ই ছিল একাত্তরের সকল বাঙালির এক হওয়ার মূল অনুপ্রেরণা।

উপসংহার

মাটি থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে তারই পরিচালনায় বায়ান্ন-একাত্তর পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধে। পুরো ষাটের দশক ছিল এই জাতীয়তাবাদের বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বের হয়ে আসা তরুণ নেতৃত্বকে আরও সুসংহত করে। ছাত্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে সুদৃঢ় এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে বন্দী শেখ মুজিবকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করে এই নেতৃত্ব। একই সঙ্গে পুরোনো বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই তরুণ নেতৃত্ব সারা পূর্ব বাংলায় এমন এক গণজোয়ার তৈরি করে যার ফলে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তা পেয়েও বাঙালি নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের শাসনভার হাতে নিতে সক্ষম হন নি। পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক আমলা, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল বাঙালি নেতৃত্বের এই উত্থানকে মেনে নিতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত, নির্বাচনে জয়ী হওয়া গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিতে হলো। একাত্তরের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালির দীর্ঘদিনের আরাধ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ইতিহাসের এক বড় বিস্ময়। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যুদ্ধে বিজয়ী বাঙালি জাতির আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব হাতে তুলে নিলেন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরীক্ষিত সহকর্মীবৃন্দ। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ নেতৃত্বের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। তা সত্ত্বেও, মধ্যবিত্তের দ্রুত উত্থান ও বাংলাদেশ নামের কল্যাণকামী দেশটির উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় তার অবিস্মরণীয় ভূমিকার সংক্ষিপ্ত এই নথিভুক্তি করতে পেরে আমি খুবই সন্তুষ্ট।

তথ্যপঞ্জি

আজাদ, লেনিন (১৯৮৯); *ভারতীয় সমাজতন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষিকাঠামো;* ইউপিএল, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দিন (১৯৮৭); *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন;* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

করিম, এ কে নাজমুল (১৯৮৪); *মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত; একে নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ;* সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষ, বিনয় (১৩৮৬); *বাংলার নবজাগৃতি;* পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: *দলিলপত্র (৩য় খণ্ড),* ১৯৮২।

রহমান, আতাউর (১৯৯৮); *অসহযোগের দিনগুলি; মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতিপর্ব;* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রহমান, আতাউর ও লেনিন আজাদ (১৯৯০); *ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি;* ইউপিএল, ঢাকা।

Azad, L. (1993); *The Mass Uprising in 1969 : A Sociological Analysis;* Unpublished Ph.D Thesis, Dhaka University.

Sen, R. (1986): *Political Elites in Bangladesh*; UPL, Dakha.

হাসান ফেরদৌস

ধর্ম, মৌলবাদ ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা

এক

আমরা দেশেই থাকি আর বিদেশে, বাংলাদেশ বললে আমাদের প্রায় সবারই দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

এক, আমরা আবেগে খুব গদগদ হয়ে উঠি। মুক্তিযুদ্ধ, একুশ, বাংলা শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে আমাদের সিনা আড়াই ইঞ্চি বেড়ে ওঠে। এটা বিশেষ করে হয় প্রতিবেশীদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে, অথবা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে গেলে। নানারকম পরিসংখ্যান দিয়ে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা জাতিসংঘের কথা ধার করে তখন প্রমাণ করে ছাড়ি আমরাই সেরা। মনে পড়ছে, নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে, তাতে বেশ ক'জন বাঘা বাঘা পশ্চিম বাংলার কবি-সাহিত্যিক ছিলেন, ঢাকার এক জাঁদরেল সাংবাদিক চ্যালেঞ্জ করে বসলেন, আমরা ভুল উচ্চারণে বাংলা বলতে পারি, কিন্তু আমরাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি। তোমরা পেরেছ?

দুই, বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের হাতাশা পর্বত-প্রমাণ। নিজেদের মধ্যে যখন দেশ নিয়ে কথা বলি, সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর অযোগ্যতায় আমাদের বিরক্তির শেষ নেই। ধর্মীয় উগ্রতা দেখে আমরা শঙ্কা প্রকাশ করি। দুর্নীতির দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় লজ্জায় আমরা অধোবদন হই। দেশের গরিবি দেখে মুখ কালো করি। যে সাংবাদিকের কথা বললাম, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তার যে কোনো ভাষ্য পড়ে দেখুন। মনে হবে কোনো নরকের বর্ণনা পড়ছি। এ কোন দেশ! এই শিরোনামে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন, বাংলাদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই।

এই দুই বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হতে পারে বাঙ্গালিরা বড় দ্বিচারী। বিশ্বাস করি এক রকম, কিন্তু মুখে বলি ভিন্ন কথা। আসলে শুধু আমরা নই, দেশের ব্যাপারে সর্বত্রই মানুষের মনোভাব এই রকম আপাত-বিপরীতমুখী। ভারতীয় বা পাকিস্তানিদের বেলাতেও একই ব্যাপার। ভারতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক টাইমস ভীষণ স্তুতিমূলক প্রতিবেদন ছেপেছিল, বলেছিল দেশটি কতো এগিয়ে গেছে। অথচ কলকাতার 'দেশ' পত্রিকা সে সময় যুক্তি-তক্কো দিয়ে বুঝিয়েছিল এই পঞ্চাশ বছরে ভারত কতোটা পিছিয়েছে। শুধু 'দেশ' নয়, আরো অনেক ভারতীয় পত্র-পত্রিকাই ভারতের অগ্রগতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ

করেছিল। টাইমসের ভাষ্যকার টম ফ্রিডম্যান সে কথা উল্লেখ করে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভাল রকম জুতোপেটা করেছিলেন।

দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক আসলে অনেকটা নিজেদের ছেলেমেয়েদের মত, বিশেষ করে সেইসব ছেলেমেয়ে যারা লেখাপড়ায় তেমন একটা ভাল করছে না। ঘরে বসে তাদের তুলোধুনো করব, কিন্তু লোকের সামনে হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলবো, আমার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো তো করছেই, ছবি আঁকাতেও চমৎকার, কি সুন্দর ভায়োলিন বাজায়, কি সুন্দর আবৃত্তি করে। কখনো তাদের পিছিয়ে পড়ার কথা যদি স্বীকার করি, তো সাথে সাথে কোয়ালিফায়ার যোগ করি, এবার পরীক্ষার আগে ও যা ভীষণ অসুখে পড়েছিল যে বেঁচে উঠবে তাই আমরা ভাবিনি। নিজের ছেলেমেয়েদের সাথে দেশের এই তুলনা যে আমিই প্রথম করলাম, মোটেই তা নয়। অনেক আগে বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এডমন্ড বার্ক (১৭২৯–১৭৯৭) লিখেছিলেন, আমরা ছেলেমেয়েদের ভালবাসি এই কারণে নয় যে তারা খুব ভাল। আমরা ভালবাসি কারণ তারা আমাদের। নিজের দেশও তাই। বার্ক অবশ্য এও বলেছিলেন, নিজের দেশকে ভালবাসতে হলে দেশটাকেও সুন্দর হতে হবে। আসল কাজ হল দেশকে ভালবাসা নয়, দেশকে ভালবাসার যোগ্য হতে সাহায্য করা।

দুই

আমার ধারণা, বাংলাদেশ এই মুহূর্তে খুব নড়বড়ে গোটাকতক খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বড়ধরনের একটা ঝড় এলে সে এলিয়ে পড়বে। নিজেকে ধরে রাখবার মত যথেষ্ট শক্তি তার নেই। প্রতিটি বাঙালি, যে দেশকে ভালবাসে তার সন্তানের মত, এই দুর্বলতা সম্বন্ধে তার সচেতন হওয়া দরকার।

রাষ্ট্রের খুঁটি মানে সে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, গণপ্রশাসন, তথ্যমাধ্যম ইত্যাদি হল রাষ্ট্রের এক একটা খুঁটি। এসব খুঁটি যতো পোক্ত, যত মজবুত, রাষ্ট্রও তত পোক্ত, তত মজবুত। বাংলাদেশের এই খুঁটিগুলির প্রতিটি দুর্বল। কোনো কোনোটি ক্রমশ দুর্বলতর হচ্ছে। এক খুঁটি দুর্বল হলে ভার বহনের ক্ষমতা অন্য খুঁটিদের বেলাতেও কমে আসে। এক সময় হয়তো পুরো বাড়িটাই ভেঙে পড়ে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খুঁটিগুলি দুর্বল হয়ে আসার ফলে যে দুর্ভোগ, তার যন্ত্রণা বাংলাদেশের মানুষকে প্রতিদিন ভোগ করতে হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থেকে নাগরিক অধিকার, গণ প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবক্ষয়ের চিহ্ন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অক্ষমতা বা অনাগ্রহ, এই অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। রাষ্ট্রের প্রধান খুঁটি সরকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সে। তো, সরকারই যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্রও দুর্বল হতে বাধ্য।

নব্বই দশকের গোড়া থেকে মোটামুটিভাবে ১০০টি দেশকে গণতন্ত্রের পথে আগুয়ান বলে ভাবা হত। এর মধ্যে অধিকাংশই তাদের প্রাথমিক সাফল্যের পর এখন হয় ঝিমিয়ে পড়েছে, নয়ত পিছু হটছে। বাংলাদেশ এই শেষের দলের

একটি। গণতন্ত্র দাঁড়ি-পাল্লায় মেপে বলা সম্ভব নয় তার ভার কতটুকু। তবে যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক 'ফ্রিডম ফোরাম' একটি ফর্মুলা বের করেছে, যার ভিত্তিতে বলা যায় কোন দেশ কতটুকু রাজনৈতিকভাবে মুক্ত। এদের হিসেবে বাংলাদেশ পার্টলি ফ্রি—আংশিক মুক্ত। অকার্যকর বহুপাক্ষিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অধিকাংশই ফ্রিডম ফোরামের হিসেবে পার্টলি ফ্রি।

পোশাকি অর্থে বাংলাদেশ একটি বহুপাক্ষিক গণতান্ত্রিক দেশ। নব্বইয়ের দশকে বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রের যে জোয়ার বয়ে যায়, বাংলাদেশ তাদেরই একটি। অন্ততপক্ষে একসময় সে কথাই ভাবা হত, কিন্তু এখন সে ভাবনা সঠিক নয় বলে মনে হচ্ছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত এই পনেরো বছর ধরে সেখানে নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছে, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা আইন পরিষদ গঠিত হয়েছে। অথচ সে দেশকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক বলতে অনেকেরই আপত্তি। কারণ সেখানে আইনের শাসন নেই, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি, নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো পক্ষেরই আস্থা নেই, পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু বিরোধী দল সেখানে আসন নেয় না। শুধু বাংলাদেশ নয়, বছর বছর নির্বাচন করে নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে তৃতীয় বিশ্বে এমন দেশের সংখ্যাই এখন বেশি। কেনিয়া থেকে উজবেকিস্তান, মিসর থেকে মরক্কো তার উদাহরণ। 'নিউজ উইক' পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ জাকারিয়ার সংজ্ঞায় এরা হল 'ইল-লিবারেল ডেমোক্রাসি'। বাইরে থেকে ফিটফাট হলেও ভেতরে ভেতরে এরা সবাই সদরঘাট। কার্নেগি এন্ডাউমেন্টের পক্ষ থেকে টম ক্যারোথার্স 'ক্রিটিকাল মিশন : এসেইস অন ডেমোক্রেসি প্রমোশন' নামে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। প্রকাশক ওয়াশিংটনের কার্নেগি এন্ডাউমেন্ট (২০০৪)। তাতে বাংলাদেশ বা উজবেকিস্তানের মত পোশাকি গণতান্ত্রিক দেশের নাম দিয়েছেন ফেকলেস প্লুরালিজম বা অকার্যকর বহুপাক্ষিকতা।

'ফেকলেস ডেমোক্রেসি'র সে বর্ণনা ক্যারোথার্স দিয়েছেন, আজকের—অর্থাৎ ১/১১ পূর্ববর্তী-বাংলাদেশের সাথে তার আশ্চর্য মিল। আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আপনারা মিলিয়ে নিন :

> অকার্যকর বহুপাক্ষিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহে নাগরিকেরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে। সেখানে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিকভাবে একে অপরের বিরোধী এমন রাজনৈতিক দল সেখানে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা ভোগ করে। এইসব ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এসব দেশে গণতন্ত্র অগভীর। ভোট প্রদানের বাইরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে নাগরিকদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। সরকার বা বিরোধী রাজনৈতিক এলিটদের দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর এবং অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। দেশের নাগরিকেরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও নিজে দেশের চলমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তারা গভীরভাবে অসন্তুষ্ট। রাজনীতি এসব দেশে স্থবির, দুর্নীতিপরায়ণ, এলিট-নির্ভর, দেশের অধিকাংশ মানুষের কোনো উপকারে আসে না,

> এমন একটা ব্যাপার। রাজনীতি এখানে কোনো সম্মানের ব্যাপার নয়। এসব দেশে রাষ্ট্রও খুবই দুর্বল থাকে। দেশের অর্থনৈতিক নীতির পেছনে কোনো দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা-চিন্তা থাকে না, তাদের বাস্তবায়নও তথৈবচ। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কার বলতে কিছুই নেই। দেশের সরকার দুর্নীতি, অপরাধপ্রবণতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা বা গণকল্যাণ প্রশ্নে কাজের কাজ কিছুই করতে সক্ষম নয় (পৃ. ১৭২)।

বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করেই ক্যারোথার্স অকার্যকর বহুপাক্ষিকতার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখেছেন :

> এইসব দেশে যেসব রাজনৈতিক দল পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা দখল করে তার একে অপরের সাথে কোন্দলেই বেশি ব্যস্ত থাকে। তারা যখন ক্ষমতার বাইরে, সে সময় তাদের প্রধান লক্ষ্য হল কি করে ক্ষমতা যারা দখল করেছে তারা যেন কিছুতেই সফলভাবে কিছু না করতে পারে। দন্তহীন বহুপাক্ষিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক এলিট ক্লাস এসব দেশে মূল জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলে এসব দেশে সকল রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা অর্থহীন, বাজে কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ধরে নেওয়া হয় (পৃ. ১৭৩)।

বাংলাদেশ নিয়ে আমার মনের কথাটাই তিনি বলেছেন। তাই এই মূল্যায়নের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, এমন লোক বেশি থাকার কথা নয়।

তিন

এবার দু-চারটে পণ্ডিতি কথা বলা যাক। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা বলার আগে কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা কি প্রত্যাশা করি, তা বিবেচনা করা উচিত। এক সময় রাষ্ট্রের প্রধান প্রতীক ছিল রাজা। এখন তার স্থান দখল করেছে সরকার। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাজা বা সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু মৌলিক 'ফাংশান' প্রত্যাশা করি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট রটবার্গ যাকে 'পলিটিক্যাল গুডস' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রত্যাশার কোনো লিখিত-পড়িত চুক্তি নেই, কিন্তু একধরনের অলিখিত 'সামাজিক চুক্তি' যে রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো রাজা বা সরকারের লেজিটিমেসি—ক্ষমতার ওপর তার আইনসিদ্ধতা—নির্ভর করে এই কাজগুলো কিভাবে, কতোটা যোগ্যতা বা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয় তার ওপর। তা সম্পাদনে ব্যর্থ হলে প্রশ্ন ওঠে নতুন 'সামাজিক চুক্তি'-র, রাষ্ট্রের নতুন প্রতীক নির্বাচনের। এই নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক বহুপাক্ষিকতার কল্যাণে শান্তি পূর্ণভাবে অর্জন সম্ভব, কিন্তু এক সময় রক্তারক্তি কাণ্ড ছাড়া তা অসম্ভব ছিল।

রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের যে প্রত্যাশা তাকে সম্মিলিতভাবে 'সুশাসন' বা গুড গভারনেস নামে অভিহিত করা যায়। এই সুশাসন বলতে আমরা কি বুঝি, তার

সেরা এবং সবচেয়ে বিখ্যাত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। ১৯৪১ সালে তাঁর এক ভাষণে তিনি চারটি মৌলিক মানবিক অধিকারের কথা বলেছিলেন। সে চারটি অধিকার হলো : মুক্তচিন্তা ও তা প্রকাশের অধিকার, উপাসনার অধিকার, ক্ষুধা থেকে মুক্তির অধিকার ও ভীতি থেকে মুক্তির অধিকার। রুজভেল্টের সে ভাষণের চল্লিশ বছর পর, নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে তার 'সহস্রাব্দ প্রতিবেদনে' জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানও এই চারটি অধিকারকেই বিশ্বের সকল নাগরিকের কেন্দ্রীয় বিবেচনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

রুজভেল্টের কথা খানিকটা প্রতীকী ও বিমূর্ত। তিনি তার এই সংজ্ঞার জন্যে তাত্ত্বিকভাবে ঋণী ইমান্যুয়েল কান্টের কাছে, যিনি সবার আগে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা চিহ্নিত করেছিলেন। কান্ট বলেছিলেন তিনটি উপাদানের কথা : দেশের ভেতর আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আনুগত্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই দুই পর্যায়ে মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা। তাদের দুজনের সে কথা ভেঙে, খানিকটা সহজ করে পাঁচটি মৌলিক দাবি বা অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রধান, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যারেথ ইভান্স। তাঁর কথায়, কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে দেশের নাগরিক কি প্রত্যাশা করে তা মোটেই কোনো অভিনব বা রহস্যময় ব্যাপার নয়। সব সময়ে, সব দেশের নাগরিকেরই কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে, তারা চায় রাষ্ট্র তার সকল রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সে চাহিদাগুলো কমবেশি পূরণ করুক। স্থানীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ যে পাঁচটি জিনিশ প্রত্যাশা করে তা হলো :

- জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করে শান্তিতে বেঁচে থাকা;
- সম্প্রদায়গত নিরাপত্তা, অর্থাৎ দেশের ভেতর জানমাল নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা ও সুবিচারসহ বেঁচে থাকা;
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়া, চাকুরি পাওয়া, ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়া, স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ থাকা;
- পরিবেশগত নিরাপত্তা, অর্থাৎ যে পরিবেশে আমরা থাকি তার ন্যূনতম সুস্থাবস্থা; এবং
- নাগরিক অধিকার, অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ ও তার বাস্তবায়ন।

এই পাঁচ ধরনের নিরাপত্তা বা অধিকার যে রাষ্ট্রে সুরক্ষিত তাকে আমরা সফল রাষ্ট্র বলতে পারি। সে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে যে সরকার সে সব অধিকারের নিশ্চয়তা দেবে তাকে আমরা সুসরকার বলবো। অন্য কথায়, ইভান্সের কথা ধার করে আমি বলছি, সুশাসন ও সুসরকার সমার্থক। ইভান্সের দেওয়া এই তালিকা ছোট করা যায় বা তাকে বাড়ানো যায়, তবে মোটের ওপর তার যৌক্তিকতা নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। একথায় কোনো ভুল নেই যে, যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সাথে সম্পাদিত সামাজিক চুক্তি বাস্তবায়নে অক্ষম, রাষ্ট্র হিসেবে সে ব্যর্থ। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই এক লাফে ব্যর্থতার সিঁড়িতে পৌঁছে যায় না, সেখানে পৌঁছায় ধাপে

ধাপে। রটবার্গ চারটি ধাপের কথা বলেছেন। প্রথমে সে হয় দুর্বল রাষ্ট্র, তারপর ব্যর্থতার দিকে পতনমুখী রাষ্ট্র, তৃতীয় ধাপে এসে হয় ব্যর্থ রাষ্ট্র, এবং সব শেষে দাঁড়ায় পতিত বা নিশ্চিহ্ন এমন রাষ্ট্রে। যুগোশ্লাভিয়াকে আমরা নিশ্চিহ্ন রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই নামে এক সময়ে একটি দেশ ছিল, এখন আর নেই। এক দেশ ভেঙে অনেক দেশে তৈরি হয়েছে। সোমালিয়াকে আমরা ব্যর্থ রাষ্ট্র বলতে পারি। আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্র এখনও আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকাংশ 'ফাংশান' সেখানে এখন সম্পাদিত হয় না। হাইতি ও জিম্বাবুয়ে-কে আমরা বলতে পারি ব্যর্থতার দিকে পতনমুখী রাষ্ট্র। নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে এই দুটি দেশের ক্ষমতা দ্রুত কমে আসছে। এখনি না ঠেকানো গেলে তারাও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর আফগানিস্তান, ইরাক ও আইভোরি কোস্ট-কে আমরা দুর্বল রাষ্ট্র বলে নির্দেশ করতে পারি। এই চারভাগের বাইরে যে সব দেশ, কেবল তারাই রাষ্ট্র হিসেবে সবল, রাষ্ট্র হিসেবে কম-বেশি সফল। এসব দেশের সরকার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কম বা বেশি দক্ষ, কর্মক্ষম বা যোগ্যতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে। মাত্রার হেরফের হতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর দায়িত্বের সাথেই তারা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজগুলো সম্পাদন করে। উদাহরণত বলা যায়, এসব দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ স্বীকৃত ও সংরক্ষিত, সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন শাসনতান্ত্রিকভাবে অর্জন সম্ভব, ভয়ে বা মরিয়ে হয়ে সেসব দেশের লোক দেশ ছেড়ে পালায় না, সেখানে দারিদ্র্যের মাত্রা সহ্যমাত্রার ভেতরে, আইন ও বিচার ব্যবস্থা কাজ করে, দুর্নীতি নেই বা তা সহনীয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'রাষ্ট্র' আসলে একটি ধারণা মাত্র। সে ধারণা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যে দেশে রাষ্ট্রযন্ত্র বা তার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী, সেখানে রাষ্ট্রও শক্তিশালী। সরকার, বিচার ব্যবস্থা, বা আইন প্রশাসন যেখানে দুর্বল, সেখানে রাষ্ট্রও দুর্বল। এইসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যখন অচল বা অকেজো হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্রও দুর্বল বা অকেজো হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে সোমালিয়ার কথা ভাবা যাক। সোমালিয়া নামের দেশটি কিন্তু উধাও হয়ে যায়নি, কিন্তু সোমালিয়ায় কার্যকর কোনো সরকার আর নেই। সেখানে কোনো গণপ্রশাসন নেই, বিচার ব্যবস্থা নেই, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নেই। ঠিক সে কারণেই সোমালিয়া একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। সেখানে যখন আবার একটি কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থাৎ তার সরকার ও অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, রাষ্ট্র হিসেবে সোমালিয়া তার কার্যকারিতা আবার ফিরে পাওয়া শুরু করবে।

অন্য সহজ উদাহরণ হল আফগানিস্তান। মোল্লা ওমরের তালিবান সরকার ব্যর্থ ছিল। তার না ছিল কোনো আইন, না ছিল কোনো বিচার ব্যবস্থা। বলা হয়, মোল্লা ওমর তার বসার ঘরের সিন্দুকে ডলারে নগদ টাকা রাখতেন। বাজেটের কথা উঠলে সেখান থেকে টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতেন বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের মধ্যে। অর্থাৎ পুরো রাষ্ট্র এক নেতার সিন্দুকে। সে সময়ের আফগানিস্তানকে আমরা তাই সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ বলছি। সেই ব্যর্থ রাষ্ট্রের জমির ওপরেই কিন্তু এখন নতুন করে নির্মাণ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্র নতুন করে নির্মিত হচ্ছে না, নতুন

করে নির্মিত হচ্ছে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার, পার্লামেন্ট ইত্যাদি।

একথা ঠিক যে সরকার ব্যর্থ হওয়া মানেই রাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়া নয়। আমেরিকায় এখন যে সরকার, তার ব্যর্থতা যেকোনো মাপকাঠিতেই প্রমাণযোগ্য। কিন্তু তাই বলে আমেরিকা রাষ্ট্র হিসেবেও ব্যর্থ এ কথা কেউ বলবেন না। আমেরিকার ব্যর্থতা মূলত তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। এই সরকার বদলাবে, আরেক সরকার আসবে। এখনকার ব্যর্থতাগুলো শোধরানোর সুযোগ তখন মিলবে। সরকারের ব্যর্থতার ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়, এমনকি অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশেও, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন আমেরিকার বুশ প্রশাসন আমলে নাগরিক অধিকারের অবনমন হয়েছে, প্রশাসনের ক্ষমতা মারাত্মক বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্গত ভারসাম্য ব্যহত হয়েছে, এমনকি বিচার ব্যবস্থার দলীয়করণ ঘটছে। কিন্তু এর কোনোটিই 'সিস্টেমিক' সমস্যা বা সংকট নয়। এই সংকট মূলত রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান সম্ভব। আমেরিকার মানুষ প্রতিদিন সে সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

একটা রাষ্ট্র কেন ব্যর্থ হয়, তার কাঠামোগত নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। সে আলোচনায় আমরা যাব না। কিন্তু যেসব দুর্বল, পতনমুখী বা ব্যর্থ রাষ্ট্রের উদাহরণ আমরা জানি, তার প্রতিটির বেলায় একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আফগানিস্তান থেকে রুয়ান্ডা, সর্বত্রই রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কঙ্গোর আজকের যে দশা তার পেছনে রয়েছে প্রেসিডেন্ট মবুতুর স্বেচ্ছাচারিতা। সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট সিয়াদ বারে-এর সীমাহীন দুর্নীতি। আফগানিস্তানে মোল্লা ওমরের অযোগ্যতা। আবার ঠিক উল্টো, দুর্বল কোনো রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপারেও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। দক্ষিণ আফ্রিকা, মালি এবং অংশত মোশারফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান-কে আমি এই তালিকায় রাখতে চাই।

বাংলাদেশের বেলায়ও সংকট মূলত রাজনৈতিক। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাই সে সংকটের আদত কারণ। কিন্তু আমেরিকা বা প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় আমাদের সংকট অনেক বেশি সিস্টেমিক ও কাঠামোগত। বাংলাদেশের বয়স ৩৫। এই ৩৫ বছরে তার প্রতিটি সরকারই কমবেশি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সরকার হলো রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান প্রতীক। রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে জোরদার করতে তারই নেতৃত্ব দেবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে তা ঘটেনি। উল্টো সরকারের সমর্থনে বা নেতৃত্বে আইনের শাসন দুর্বল হয়েছে, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থার দলীয়করণ হয়েছে, নাগরিক অধিকার অবনমিত হয়েছে। এক সরকারের বেলায় নয়, প্রতিটি সরকারের বেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। আজ যে সরকার ক্ষমতায় আছে, কাল তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসালে অবস্থার খুব যে হেরফের হবে, এমন প্রত্যয় কি কারো আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে ভাবা যাক রাষ্ট্র হিসেবে তার 'ফাংশান' সম্পাদনে বাংলাদেশ কতোটা সক্ষম হয়েছে। এর উত্তর খোঁজার জন্যে আমি অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের শরণাপন্ন হব। সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বার্ষিক সভায় মূল বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সোবহান। দাতাদের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নটি সামনে রেখে তিনি সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিচিতিই তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণে তার বক্তব্য সময়গত দূরত্ব সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনুসরণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে ব্যর্থতার ফলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও তার আইনসিদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ, বা তার পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহিতার বদলে দাতাদের কাছে জবাবদিহিতে বাংলাদেশ অধিক আগ্রহী। এমন নিয়ন্ত্রণহীন, লক্ষ্যহীন রাষ্ট্র তার জনগণের চোখে ক্রমশই তার আইনসিদ্ধতা—লেজিটিমেসি—হারাচ্ছে।

রাষ্ট্র কিভাবে তার আইনসিদ্ধতা হারাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা হিসেবে রেহমান সোবহান কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ চিহ্নিত করেছিলেন। যেমন—

- প্রশাসন ক্ষেত্রে সংকট। এই সংকটের প্রকাশ দেখা যায় আইন-শৃঙ্খলা ক্ষেত্রের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে। বাংলাদেশের মানুষ মনে করে আইন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উৎসই হল খোদ রাষ্ট্র।
- গণকল্যাণ খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নাটকীয় অবনমনের ফলে দেশের ভেতরে প্রতিটি 'পাবলিক সার্ভিস' ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট।
- গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতায় সংকট। বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় খাতে আজ যে সংকট তার উৎস হল তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সংকট। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অর্জন হতে পারত সচল, কার্যকর দুই-দলীয় ব্যবস্থা। অথচ সেই টু-পার্টি সিস্টেম পরিণত হয়েছে দুই শিবিরে বিভক্ত, সংঘর্ষমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

এই সংকট যে কাল্পনিক নয়, সে কথা বাংলাদেশের মানুষ তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষাতেও সেই কথাই ধরা পড়েছে। ২০০৬ সালের জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকে মোট ১৭৭-টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৩৭। ঠিক তার পরপর রয়েছে নেপাল, পাপুয়া নিউগিনি, কঙ্গো ও সুদান। বাংলাদেশের এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত শেষের দিকে ৪০-টি দেশই তাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিকের অধিকার—বিশেষত, ক্ষুধা, ভীতি ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ থেকে নিরাপত্তা দেবার ব্যাপারে খুবই দুর্বল। ফ্রিডম হাউসের ২০০৪ সালের ফ্রিডম ইন্ডেক্স-এ বাংলাদেশকে বলা হয়েছে 'অংশত মুক্ত'। ১ সর্বোচ্চ ও

৭ সর্বনিম্ন এই স্কেলে বাংলাদেশ পেয়েছে ৪। বাংলাদেশের তথ্য মাধ্যমকে বলা হয়েছে 'মুক্ত নয়'। মোট ১৯৩টি দেশের মধ্যে তথ্যমাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপারে বাংলাদেশের স্থান ১৫০। রিপোর্টার্স উইদাউট বোর্ডারস তাদের ২০০৩ সালে প্রতিবেদনে যেসব দেশ সাংবাদিকদের জন্যে বিপজ্জনক, বাংলাদেশকে তাদের একটি বলে চিহ্নিত করেছে। এই সংস্থার মুক্ত তথ্য ব্যবস্থা সূচকে ১৬৬-টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান দেওয়া হয়েছে ১৪৩। এছাড়া ট্রানসপারেনসি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিবেদন থেকে আমরা জানি, এই দেশটি বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিপরায়ণ দেশ।

উদাহরণ আরো বাড়ান যায়, তাতে কেবল পরিচিত একটি সত্যের পুনরাবৃত্তিই হবে। দেশের ভেতরে বা বাইরে যে সূচক বা মানদণ্ডই ব্যবহার করি না কেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি তার পক্ষে করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সে এখনো ব্যর্থ রাষ্ট্র নয়, কিন্তু এগুচ্ছে সেই পথেই। আপনি যদি বাংলাদেশকে ভালবাসেন, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে আপনার উপায় নেই।

চার

বাংলাদেশের কাঠামোগত দুর্বলতার সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের প্রভাব। অনেকেরই ধারণা, এই শক্তিসমূহের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান বা সোমালিয়ার মত দুর্বল বা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। দুর্বল বা ব্যর্থ রাষ্ট্র কেবল তাদের নিজের নাগরিকদের জন্যেই দুর্ভোগ ও দুর্ভাবনার কারণ নয়। এইসব দেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যেও বড় ধরনের হুমকি। প্রমাণ আফগানিস্তান। রাষ্ট্র দুর্বল হলে রাষ্ট্রশক্তির বাইরের খেলোয়ারেরা সেখানেই সহজেই অনুপ্রবেশ করে, রাষ্ট্রশক্তির ওপর প্রভাব অর্জন করে, সরকারসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার শক্তি অর্জন করে। এইসব 'নন-স্টেট অ্যাক্টরস'-দের ভূমিকার ফলে কি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, কঙ্গো থেকে সিয়েরা লেয়ন থেকে হাইতি-র কথা একবার ভেবে নিলেই সে ছবিটি পরিষ্কার হবে। ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারে আল-কায়েদার আক্রমণের বিভীষিকা এখনো আমেরিকাকে তাড়িয়ে ফিরছে। বাংলাদেশ ধর্মভিত্তিক নন-স্টেট অ্যাকটর্সদের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ কথায় অধিকাংশ নির্দলীয় পর্যবেক্ষক একমত। বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে, তা বোঝার জন্যে এই ধর্মভিত্তিক নন-স্টেট একটর্সদের ভূমিকা বোঝা দরকার। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকাও মাথায় রাখা দরকার। এই দুই উপাদান একত্র হলে রাষ্ট্র হিসেবেই বাংলাদেশ স্পষ্ট হুমকির সম্মুখীন হবে।

ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি এখন বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে। এখন কেন, বরাবরই। তাদের রাজনৈতিক 'লেজিটিমেসি' আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মের দিকে হাত বাড়িয়েছে বাংলাদেশের সকল রাজনীতিক—শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী পালন শুরু করেন শেখ মুজিব। ইসলামকে

শাসনতন্ত্রভুক্ত করেন জিয়া ও এরশাদ। 'ইসলাম গেল' আওয়াজ তোলেন খালেদা জিয়া। আর ওমরাহ হজকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারে দক্ষতা দেখান শেখ হাসিনা। যে 'পলিটিক্যাল গুডস' তাদের কাছ থেকে জনগণ প্রত্যাশা করে, এসব নেতার কেউই তা সরবরাহ করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার ফলে মূলধারার রাজনীতিক ও নাগরিকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে, সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক শূন্যতার। এই শূন্যতা পূরণে একদিকে মূলধারার রাজনীতিক হাত বাড়িয়েছেন ধর্মের দিকে, পাশাপাশি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে ধর্মীয় দলগুলো। বাংলাদেশে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আইনসিদ্ধ, সেখানে সব সরকারই ধর্মকে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করেছে। মূলধারার দলগুলোও তাদের সুবিধামত ধর্মের ব্যবহার করেছে বা করে যাচ্ছে। ফলে ধর্মীয় রাজনীতিকরা যখন ধর্মকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেন, তার বৈধতা বা নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা খুব যুক্তিযুক্ত বলা যাবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কৃতি বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের মনোজগতে স্থান করে নিয়েছে। গত ৩৫ বছরে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারই তার কারণ। এখন ধর্মকে রাজনীতিকে থেকে বাদ দেবে, সে সাধ্য কার?

ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের এই প্রবণতা উপমহাদেশে নতুন বা অভিনব কিছু নয়। প্রতিবেশী ভারতে সে চেষ্টা হয়, এখনো হচ্ছে। কিন্তু যেখানে এই চেষ্টা সবচেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে তা হলো পাকিস্তান। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্যে সেকুলার রাজনীতিবিদেরা সেখানে প্রথমে গাটছড়া বেঁধেছিলেন ধর্মগুরুদের সাথে, ভেবেছিলেন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে ঠিক উল্টো। সেকুলার রাজনীতিবিদেরাই মধ্যমঞ্চ থেকে ঠিকরে পড়েছেন, তাদের আসন দখল করে নিয়েছে মোল্লারা। তার চেয়েও বড় কথা, মোল্লাতন্ত্র যে 'আইডিওলোজি' প্রচার করে, পাকিস্তানে রাজনৈতিক 'লেজিটিমেসি' অর্জনে তা হয়ে উঠেছে একমাত্র উৎস। ধর্মের লেবাস গায়ে না চড়িয়ে রাজনীতি করা সেখানে অসম্ভব। এই ঘটনা কিভাবে ঘটল, তা বোঝার জন্যে ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক।

১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ মারা যাবার পর পাকিস্তানের শাসনভার বর্তায় লিয়াকত আলি খানের ওপর। জিন্নাহ-র মতো তিনিও সুট-বুট পরা মানুষ, লিবারাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, মোল্লাদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। কিন্তু দেশ চালানোর জন্যে যা রাজনৈতিক 'বেস' দরকার, মোহাজির লিয়াকত আলির সে 'বেস' ছিল না। সে সময় সিন্ধু প্রদেশে বানের জলের মতো ভারতীয় মোহাজেররা ঢুকছে বটে, কিন্তু করাচিতে তাদের কেউ সহ্য করে না। অন্যদিকে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্র পাঞ্জাবে ঘোট পাকিয়ে আছেন মিয়া দৌলতানা। কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে তিনি বা অন্যান্য প্রাদেশিক নেতারা তৈরি নন। জামাতে ইসলামি ও মাজলিশ-ই-আহরার, যারা এক সময় পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল, তারা এ সময়ে রাজনীতিতে নেমে পড়ে। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু দেশটি যথেষ্ট ইসলামি নয়, এই অভিযোগে তারা

রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করে। তাদের মূল লক্ষ্যঃ সেকুলার পন্থীদের হাত থেকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তারা যেহেতু ইসলামের সেরা সিপাহি, তারাই তো ইসলামি পাকিস্তানের সেরা রক্ষক। আহমদিয়াদের অমুসলমান ঘোষণার উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনও শুরু হয় ঠিক এই সময়।

বেগতিক দেখলেন লিয়াকত আলি খান ও মুসলিম লীগের নেতারা। মোল্লাদের হাতে রাখার জন্যে এবং নিজেদের ইসলামি ক্রেডেনশিয়াল পোক্ত করার লক্ষ্য একের পর এক ছাড় দেওয়া শুরু হল। লিয়াকতই প্রথম ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র, সেখানে জনগণ আল্লাহর রসুলের আদর্শ অনুসরণ করবে, 'মার্ক্স, স্তালিন ও চার্চিলের আদর্শ নয়'। লিয়াকতই প্রথম রমজানের সময় হোটেল-রেস্তোরা বন্ধের নির্দেশ দিলেন। মদ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা, তাও লিয়াকতের সময় জারি করা হয়। কিন্তু এসব লোক দেখানো ঘোষণায় তেমন কাজ হল না। জামাত-আহরার সেকুলার পন্থীদের দুর্বলতা টের পেয়ে তাদের হাত মচকানো শুরু করলেন, উদ্দেশ্য, যতটা সম্ভব ছাড় আদায় করে নেওয়া। ১৯৪৯-এ দেশের আইন পরিষদ পাকিস্তানের জন্যে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শুরু করল। তাতে লিয়াকতের সমর্থনে যে 'অবজেক্টিভ রেজুলুশন' গৃহীত হল, তাতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হল, ইসলাম-বিরোধী এমন কোনো আইন পাশ করা যাবে না। তাতেও যখন ইসলামি দলগুলোকে খুশি করা গেল না, তখন কোনটা ইসলামি কোনটা ইসলামি নয়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার জন্যে একটি উলেমা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অর্থাৎ দেশের আইন ও নীতিমালা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার বর্তাল দেশের মোল্লাদের ওপর, যারা এক সময় পাকিস্তান নামক এই দেশটি হোক সে চেষ্টারই প্রবল বিরোধিতা করেছিল। সে প্রস্তাবে অবশ্য এমন কথাও জুড়ে দেওয়া হল যে 'ইসলামে নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী গণতন্ত্র, মুক্তি, সমতা, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করা হবে'। সুট-প্যান্ট পরা পাকিস্তানি নেতারা ভাবলেন, তারা একদিকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের আদর্শ তুলে ধরছেন, অন্যদিকে মোল্লাদেরও খুশি করতে পেরেছেন।

অবজেক্টিভ রেজুলুশন যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এমন ভীতি সে সময়েই ব্যক্ত করা হয়েছিল। আইন পরিষদের অমুসলমান সদস্যরা এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন, জিন্নাহ যে অসাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই আইন বাস্তবায়িত হলে তার মৃত্যু হবে। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, এই প্রস্তাবে আমি জিন্নাহ বা লিয়াকত আলির কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি না। আমি শুনতে পাচ্ছি পাকিস্তানি মোল্লাদের কণ্ঠ। (তিনি 'উলেমা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন যদিও কি অর্থে সে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা বোঝা কঠিন ছিল না।) তার সে কথা চাটি মেরে উড়িয়ে দিলেন লিয়াকত আলি নিজেই। তার আমেরিকান বন্ধুদের তিনি এই বলে বুঝ দেবার চেষ্টা করলেন, ইসলাম নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। মুখে ইসলামের কথা বললেও পাকিস্তান শুধু যে ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকবে তাই নয়, সে হবে পশ্চিমা ধাচের বহুপাক্ষিক গণতন্ত্র।

পাকিস্তানি ঐতিহাসিক আয়েশা জালাল সে সময় পাকিস্তানি রাজনীতিকদের এইসব কথা-বার্তাকে 'ট্রাজিকালি কমিক' বলে বর্ণনা করেছেন। তার কথায়, এ সবই করা হচ্ছিল মোল্লাদের খুশি করার জন্যে। কিন্তু সে সবের সত্যি সত্যি বাস্তবায়নের ইচ্ছা পাকিস্তানি নেতাদের ছিল না। কিন্তু ভুলটা সেখানেই। 'ইসলামি সামাজিক নৈতিকতা প্রবর্তনে রাষ্ট্রের নাক গলানোর ফলে সেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি একদম মাথা গেড়ে বসে।' লিয়াকত আলি থেকে পরবর্তী অধিকাংশ পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাই তাদের 'লেজিটেমেসি' আদায়ের লক্ষ্য বারবার ঐ ইসলামের কাছে ছুটে গেছেন, চেঁচিয়ে বলেছেন, দেখো আমরাই সাচ্চা ইসলামের বরকন্দাজ। সেকুলার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উভয়ের কাছ থেকে ঐ এক ইসলামের কথা উচ্চারিত হবার ফলে রাষ্ট্র গঠনের আর ভিন্ন কোনো মানদণ্ড রইল না। ধর্মের নামে রাজনৈতিক বৈধতা ক্রয়ের সেই চেষ্টাই ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়ে পাকিস্তানের গলায় ফাঁস হয়ে বসে। আজকের পাকিস্তান, সেখানে না আছে ইসলাম, না আছে গণতন্ত্র। ইসলামের কথা বলেই সেখানে মেয়েদের ওপর হুদুদ আইন চাপান হয়, ইসলামের কথা বলেই শিয়া বা আহমেদিয়া মসজিদে বোমা ফেলা হয়।

গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিবর্তন আমরা দেখেছি, তার সাথে পাকিস্তানি অভিজ্ঞতার অদ্ভুত মিল রয়েছে। পাকিস্তানের মত আমাদের 'সেকুলার' নেতারাও ধর্মগুরুদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের অল্প অল্প করে ছাড় দিয়েছেন। ধর্মগুরু ও ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের বাড়ানো হাত খপ করে ধরে ফেলেন। তারপর থেকেই শুরু হয় সেই হাত মচকানো। এখন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে 'ইসলাম'-কে ব্যবহারের প্রশ্নে সেকুলার ও ধর্মবাদীদের মধ্যে স্পষ্ট কোনো ফারাক আর নেই।

তাহলে বাংলাদেশ কি একটি তালিবানি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে?

এ রকম একটি প্রশ্ন তুলেছেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলি রিয়াজ তার 'গড উইলিং'-গ্রন্থে (রোওম্যান এন্ড লিটলফিরড, ম্যারিল্যান্ড, ২০০৪)। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কতিপয় লক্ষণ চিহ্নিত করে প্রশ্নটি তুলেছেন তিনি। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় এখানে বইটি নিয়ে আলোচনা করছি।

'সেক্যুলারিজম' শব্দটির অর্থ আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা বলে করে থাকি। বাংলা অর্থ যাই হোক না কেন, সেক্যুলারিজমের আদত অর্থ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত রাখা। একই রাষ্ট্রে নানা ধর্মের নানা মানুষ থাকবে, কিন্তু সেসব ধর্ম দিয়ে তাদের নৈতিকতা নির্ধারিত হবে না, বা দেশের আইন বা বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হবে না। সোজা কথায়, তার ব্যক্তিগত জীবনচারিতায় যে যত খুশি ধর্ম পালন করুন, তা যে ধর্মই হোক না, আমাদের কোনো 'কমন স্পেস'-এ ধর্মের অনুপ্রবেশের বা তার অধিগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। অথচ এই সহজ কথাটিই কদর্থে ধর্মহীনতা বলে কেউ কেউ ভেবে থাকেন। যারা ধর্মকে গায়ের জামা-বা আজানুলম্বা পাঞ্জাবি-বানিয়ে পরতে ভালবাসেন, তারা গালাগালি অর্থেই এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। শব্দটির প্রতি ঘৃণা এবং ভীতি এত প্রবল যে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে কেটে

বাদ দিতে হল শুধুমাত্র ধর্মবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্যে। তা নিয়ে টু শব্দ করার সাহস পর্যন্ত পেলেন না ধর্মনিরপেক্ষ কোনো রাজনীতিক।

ধর্ম যখন রাজনীতিতে ও নাগরিক জীবনে প্রভাবশালী হয়ে পড়ে, তখন নাগরিক অধিকার সঙ্কোচনের সম্ভাবনা বাড়তে বাধ্য। ধর্মে সব প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে জ্ঞাত, সে সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দ্বিমত প্রকাশের তেমন কোনো সুযোগ নেই। পোশাক-আশাক থেকে বিচার ও আইন ব্যবস্থা সবই ধর্মের অনুশাসন দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। ঠিক এই কারণে ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা সীমিত, তার অধিকারও সীমিত। এসবের ফলে কি দাঁড়ায়, তার একটি ভাল ও সহজ উদাহরণ হল তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলি রিয়াজ এই গ্রন্থে তার উদ্বেগের বিবরণ দিয়েছেন। তার উদ্বেগের কারণগুলি খুবই স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ধর্ম-ভিত্তিক সহিংসতা মারাত্মক বেড়ে গেছে। মাদ্রাসাকেন্দ্রিক গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতা সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফতোয়াবাজি ও মেয়েদের ওপর আক্রমণ বেড়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রশ্নে সহিষ্ণুতা কার্যত লোপ পেয়েছে। একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটেই চলেছে, সেসবের কোনোটিরই মীমাংসা হচ্ছে না। খোদ সরকারের ভেতর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ খুঁটি গেড়ে বসেছে। এসব সহিংসতার পেছনে সেসব সরকারি শক্তিসমূহের যে সমর্থন নেই, তা হলফ করে কে বলবে? বাংলাদেশের তালিবানিকরণের কথা সে কারণেই উঠেছে। আলি রিয়াজের দাবি, মূলধারাভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতার ফলস্বরূপই জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলসমূহ ক্ষমতার কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। গত তিন দশকের গণতান্ত্রিক রক্তক্ষরণের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, একদিকে ধর্মীয় রাজনীতি আইনসিদ্ধতা আদায় করে নিয়েছে, পাশাপাশি ধর্মীয় দলগুলো যে বিশেষ 'আইডিওলজি'-র অনুসারী, তাও একটি প্রকাশ্য ধারা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। প্রধান দলগুলি সাধারণ্যে স্বীকৃত ও গ্রহণীয় কোনো নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজেদের আইনসিদ্ধতা খুঁজতে গিয়ে উল্টো ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারস্থ হয়েছে। এভাবে জাতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক এজেনডায় ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে ধর্মীয় রাজনীতির 'লেজিটিমেসি' স্বীকৃত হয়েছে, পাশাপাশি দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে ধর্ম-অথবা ধর্মের একটি বিশেষ ইন্টারপ্রিটেশন—নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ধর্ম যে ব্যক্তিজীবনে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক সোচ্চার, তা বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-আশাক, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, নারী অধিকারের ব্যাপারে অসহনশীলতা ইত্যাদি থেকে বেশ বোঝা যায়। এর সাথে যুক্ত করুন ফতোয়ার রাজনীতি, ক্ষমতাভুক্ত ইসলামি দলগুলির আক্রমণাত্মক বিবৃতি, ধর্মীয় সহিংসতার বিস্তার, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার এবং ধর্মগুরুদের দলে টানবার ব্যাপারে রাজনীতিকদের উদগ্র আগ্রহ। ধর্মের ব্যাপারে যে কোনো বাড়াবাড়ি বাংলাদেশের সমাজ ও সরকার যেন নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে।

নাগরিক জীবনে ইসলামিকরণের এই প্রবণতা যদি অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে বাংলাদেশে আগামী কোনো এক সময়ে তালিবান-ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়।

আলি রিয়াজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধর্মীয় রাজনীতির এই ক্রমবিস্তারকে মৌলবাদী বলতে গররাজি। তার ব্যাখ্যায়, মৌলবাদের সাথে ধর্মীয় শুদ্ধতার একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি, মৌলবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত আমেরিকায়, বিশ শতকের গোড়ার দিকে। তখন সে আন্দোলনের মোদ্দা কথা ছিল ধর্মের আদি নির্দেশনায়—তার মৌলতায়—ফিরে যাওয়া। বিশ শতকের শেষ পাদে এসে যে ইসলামি মৌলবাদ বিস্তার লাভ করে, তারও একটি প্রধান অনুষঙ্গ ধর্মীয় শুদ্ধতা। কিন্তু বাংলাদেশে নাগরিক জীবনে ধর্মের যে ক্রম-অধিগ্রহণ দেখছি, তার প্রায় পুরোটাই রাজনীতি কেন্দ্রিক। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, বা সে ক্ষমতার আইনসিদ্ধতা আদায়। মৌলবাদ না বলে এই আন্দোলন ও তার আইডিওলজিকে রিয়াজ ইসলামাবাদ-ইসলামিজম—এবং সে আন্দোলনের অনুসারীদের ইসলামাবাদি-ইসলামিস্ট—বলে অভিহিত করতে আগ্রহী।

রিয়াজের বিবেচনায়, বাংলাদেশে যে ধর্মীয় রাজনীতির প্রসার, তা প্রায় সর্বৈব মূলধারাভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যর্থতার ফল। বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু যে আওয়ামী লীগ দেশের প্রথম সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে, তারা দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নৈতিক বলসম্পন্ন ও নাগরিক সমর্থনপুষ্ট নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ আইডিওলজি নির্মাণে ও প্রচারে তাদের অক্ষমতা। এই সংকটকে রিয়াজ বলেছেন 'ক্রাইসিস অফ দি হেজেমনি অব দি রুলারস'। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি দেশের প্রথম শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় বটে, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ও তার নেতৃবর্গ ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিযুক্তিকরণের বদলে নিজেরাই একদম গোড়া থেকে তাদের ইসলামি ক্রেডেনশিয়াল প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ক্ষুণ্ন হয়। ইসলামকে বাদ দিয়ে একটি 'সেক্যুলার' আইডিওলজি নির্মাণের চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু মুজিববাদ নামক সেই আইডিওলজিতে খোদ আওয়ামী লীগই কখনো সম্পূর্ণ আস্থা ন্যস্ত করেনি। তার প্রমাণ ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে এই দল ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় কস্মিনকালেও মুজিববাদকে তাদের রাজনীতির কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করেনি।

মুজিব ও আওয়ামী লীগের পর যে সামরিক বা আধা-সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে, তারাও কোনো স্পষ্ট ও স্বীকৃত আইডিওলজি নির্মাণে ব্যর্থ হয়ে হাত বাড়ায় ইসলামের দিকে। তাদের রাজনীতির আদর্শিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় চেতনা। রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি বদলে যাওয়ায় ইসলামবাদীদের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্য যে পরিস্থিতি ইসলামবাদীদের প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে তা হলো অব্যাহত সামরিক শাসন। মূলধারাভুক্ত দলসমূহ ১৯৭৫-

পরবর্তী দুই দশক কার্যত গণতান্ত্রিক অবকাঠামোয় ফিরে যাবার সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। আশু রণকৌশল হিসেবে ইসলামবাদীদের তারা সে আন্দোলনে স্থান দেয়, তাদের প্রতি সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এই আপাত-সাময়িক আঁতাতের মাধ্যমে ইসলামবাদীরা তাদের নিজেদের জন্যে যে জায়গাটুকু করে দেয়, সেক্যুলারপন্থীদের তা আর ফেরত নেওয়া সম্ভব হয়নি। সে জায়গার ক্রমপ্রসারও ঠেকানো যায়নি। ইসলামিকরণের এই যে প্রক্রিয়া, তারই ফলস্বরূপ ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামবাদী দলগুলো ক্ষমতা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে একথা এখন বিতর্ক-ঊর্ধ্ব একটি সত্য যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে—তার আইডিওলজি হিসেবে—ইসলাম একটি আদর্শিক উপাদান হয়ে উঠেছে। রিয়াজের ব্যাখ্যানুসারে, এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ ইসলামপন্থীরা যে রাজনৈতিক আইনসিদ্ধতা অর্জন করে তার প্রকাশ কেবল যে নির্বাচনী সমীকরণে সীমাবদ্ধ থাকল তা নয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শিক ভিত্তিভূমিতেও ইসলামপন্থীদের পতাকা পুতে দেওয়া হলো।

ইসলামবাদীরা আপাতভাবে বিজয়ী হলেও বাংলাদেশের সেক্যুলার শক্তিসমূহ, বিশেষত তার সুশীল সমাজ, বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয় নি। ধর্মীয় শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই যে শেষ হয়ে গেছে তাও নয়। ধর্ম-এবং ধর্মবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুখ্যত রাজনৈতিক দলসমূহের দেউলিয়াপনার কারণে। কিন্তু বাংলাদেশের সেক্যুলার নাগরিক গোষ্ঠী—এর সদ্য জাগরিত সুশীল সমাজ—বরাবরই সে চেষ্টার বিরোধিতা করেছে। রিয়াজ তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমত, গোলাম আজমের বিচার প্রশ্নে ঘাতক-দালাল নির্মূল আন্দোলন, তসলিমা নাসরিন প্রশ্নে ইসলামবাদীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও এনজিও-দের বিরুদ্ধে ইসলামবাদীদের সংগঠিত আক্রমণের প্রতিরোধ। ঘাতক-দালাল নির্মূল আন্দোলনের আপাত সাফল্য সত্ত্বেও তিনটি ক্ষেত্রেই সেক্যুলারপন্থীরা কার্যত পরাজিত হয়। তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ, একদিকে আন্দোলনের শহর ও বুদ্ধিজীবী-নির্ভরতা, অন্যদিকে পুরো দেশকে একত্র করে এমন অভিন্ন প্রতীক নির্মাণে ও তার ব্যবহারে সেক্যুলারিস্টদের ব্যর্থতা। গোলাম আজমের ক্ষেত্রে আন্দোলনের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট যে ইসলামবাদীদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির বিরুদ্ধে তা পরিচালিত হয় নি। তসলিমা নাসরিন ও এনজিও-বিরোধিতা প্রশ্নে কোনো অভিন্ন ও শক্তিশালী প্লাটফর্ম নির্মাণেও সেক্যুলার সুশীল সমাজ কার্যত বিভক্ত ও দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়। এই ইস্যু নিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করার কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাতে সুশীল সমাজ পুরোপুরি ব্যর্থ হয় বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কোন পথে চলবে—সেখানে সেক্যুলার শক্তি না ইসলামবাদীরা রাজনীতির কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করবে—তা নির্ভর করছে সে দেশের মানুষ, তার রাজনীতিক ও সুশীল সমাজের ভূমিকার ওপর। রিয়াজ মনে করেন, ইসলামীকরণের ফল কি দাঁড়ায়, বাংলাদেশের মানুষ তা দেখেছে। ব্যবহারিক জীবনে তার প্রকাশ যত সর্বব্যাপী হোক না কেন, রাজনীতির কেন্দ্রে ধর্মকে আশ্রয়

দেবার কোনো ইচ্ছা তাদের থাকার কথা নয়। কিন্তু সে সম্ভাবনা ঠেকানোর জন্যে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, আজকের বাংলাদেশে তার প্রবল অভাব। ফলে সেখানে আশার চেয়ে অন্ধকারই বেশি। কিন্তু রিয়াজ পাশাপাশি একথাও মনে করেন, বাংলাদেশ তার সকল সংকটের মুহূর্তে বরাবরই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। তার চলতি সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে করতে পারে, মনে করতে পারে, কোন উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে রাষ্ট্র নির্মাণের সংগ্রামে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল। একাত্তরের স্বপ্ন তাদের নতুন সংগ্রামের ভিত্তি হতে পারে।

খুব নতুন কিছু না বললেও বাংলাদেশের চলতি সংকটের একটি বিশ্লেষণ-নির্ভর পর্যালোচনা আলি রিয়াজ তার গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর চোখে, বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির কথা বলতে গেলে যে যার মত শিবির-ভুক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্লেষণের চাইতে নিজ নিজ পছন্দের রাজনীতির সাফাই গাওয়াতেই তা পর্যবসিত হয়। রিয়াজের বইটি সে সমস্যা থেকে মুক্ত। একসময় সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন রিয়াজ, ফলে খুব কঠিন কথা সহজ করে বলার ক্ষমতা তার রয়েছে। গবেষক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ও নিয়মনিষ্ঠ। ফলে প্রমাণ ও উপাত্ত ছাড়া চটজলদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি অনাগ্রহী। বইটি, তার ক্ষুদ্র কলেবর এবং পুনরাবৃত্তির সমস্যা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আমার ধারণা।

আগেই বলেছি রিয়াজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামের উত্থানকে মৌলবাদী বলতে নারাজ। বাংলাদেশের রাজনীতির ইসলামীকরণের সাথে আন্তর্জাতিক মৌলবাদের ফারাক রয়েছে বলেও তার দাবি। আমরা দেখেছি ৯/১১-এর ঘটনার পর তাবৎ ইসলামি-রাজনীতিকে এক ঘুলঘুলি দিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে যেখানেই ইসলাম, সেখানেই মৌলবাদ। স্থানীয় উপাদানের সাথে বহির্গত শক্তিসমূহের সখ্যের ফলে ইসলামী মৌলবাদ আজ কোনো একটি দেশ বা এমনকি একটি মহাদেশের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। ইসলামি মৌলবাদ এখন একটি প্যান-ইসলামিক আন্দোলন। আলি রিয়াজ খুব জোরের সাথে দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক ইসলামি মৌলবাদের সাথে বাংলাদেশের ইসলামিকরণ গুলিয়ে ফেললে ভুল করা হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে সেখানে ইসলামবাদ—মৌলবাদ নয়—আসন জেঁকে বসেছে। একদিনে নয়, গত তিরিশ বছর ধরে তাকে লালন করা হয়েছে। কোনো বহির্গত শক্তির প্রভাবে নয়, তার রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতিসঞ্চালন—তার ডোমেস্টিক ডিনামিক্স-এর ফলেই বাংলাদেশে একটি দেশি, সহিংস ইসলামবাদ আসন গেড়ে বসার চেষ্টা করছে।

তার এই ব্যাখ্যার সাথে আমি মোটের ওপর একমত, তবে বহির্গত উপাদানের প্রভাব তিনি যতোটা খাটো করতে চান, আমি ততোটা নই। একথা ঠিক, বাংলাদেশে গত তিরিশ বছর ধরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আবহে মৌলবাদী রাজনীতি—তার কথায় ইসলামবাদী রাজনীতি—গায়ে গতরে পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু

একথাও ভুল নয় যে, গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশে ওয়াহাবি মৌলবাদের সংক্রমণ ঘটেছে প্রধানত বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতায়, বিদেশি নির্দেশে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবকাঠামো দুর্বল হওয়ায় খুব সহজেই জেহাদি ইসলাম অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। একই ঘটনা দেখেছি সোমালিয়াতে, অথবা সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়ায়।

বাঙ্গালির জীবনে ধর্ম খুব গুরুত্বপূর্ণ তা মানি, কিন্তু তাই বলে ধর্ম রাজনীতির কেন্দ্রে আশ্রয় নিক, তাই কি তারা চায়? স্পেকুলেশন নয়, জনমত গণনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে, তা থেকে কিন্তু একটি ভিন্ন ছবি মেলে। ১৯৯২-সালে প্রকাশিত তার তথ্য-নির্ভর গবেষণা 'ইসলাম ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থে অধ্যাপিকা রাজিয়া আখতার বানু (এ জে ব্রিল, লন্ডন, ১৯৯২) যে জনমত গণনার ফলাফল দিয়েছেন, তাতে দেখি যে বাংলাদেশের গ্রামের মাত্র ৩৯.৩ শতাংশ মানুষ তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের দেখতে চান। ৫৩.৫ শতাংশ মানুষ চান ইংরেজি-শিক্ষিত কিন্তু ধার্মিক মানুষ তাদের প্রতিনিধিত্ব করুক। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের শহরে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সমর্থন অনেক বেশি (৭৮ শতাংশ) এবং ধর্মীয় নেতাদের পক্ষে সমর্থন অনেক কম (মাত্র ৭ শতাংশ)। এমনকি বাংলাদেশী হিসেবে তারা সবচেয়ে কোনো বিষয়ে গর্ববোধ করে, এই প্রশ্নের জবাবে গ্রামের মাত্র ৮.৯৩ শতাংশ মানুষ ধর্মকে উল্লেখ করে। শহুরে মানুষদের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ, ১৪.৬ শতাংশ।

এই জনমত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে মানুষের ধর্মবোধকে ধর্মীয় রাজনীতির প্রতি সমর্থন ভাবা কেবল ভুলই নয়, তা রীতিমত আহম্মকি। আমরা জানি ধর্মীয় দলগুলি জেনেশুনেই সে দাবি করে। তাদের রাজনীতির পুঁজিই হলো ধর্ম। কিন্তু সেক্যুলার দলগুলিও যখন সেই একই ভুল করে তখন তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দেউলিয়াপনা দিনের মত ফর্সা হয়ে ওঠে। আসল ভয় সেখানেই। পাকিস্তান এখন সে ভুলেরই মাশুল গুনছে।

সন্দেহ নেই, ইসলাম বাংলাদেশে, বাঙ্গালির জীবনে বরাবরই একটি প্রধান বিবেচনা। কিন্তু সহিংস ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের যে প্রকাশ আজকের বাংলাদেশে দেখি তা একটি সম্পূর্ণ বহিরাগত ও সাম্প্রতিক উপাদান। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ। এমন নয় যে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা হয় নি। কিন্তু বিশুদ্ধ ইসলামের নামে মওদুদি প্ররোচিত জামাতে ইসলামী যে সহিংস ও বিভেদাত্মক রাজনৈতিক মতাদর্শ আরোপের চেষ্টা করে, বাংলাদেশে তা কখনোই মাটি পায় নি। পেট্রো ডলারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোনো নির্বাচনেই যে তারা এবং তাবৎ ইসলামবাদী জোট ১৫ শতাংশের বেশি ভোট সংগ্রহ করতে পারে নি, তা থেকেই ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা টের পাওয়া যায়। বাংলাদেশকে নিয়ে আশার সেটি একটি প্রধান কারণ।

আশার অন্য কারণ বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মৌলবাদী রাজনীতি বাংলাদেশে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে একথায় কোনো ভুল নেই, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও ক্রমশ নতুন গতি লাভ করছে। এই প্রতিরোধে বাঙ্গালির এক বড় অস্ত্র তার সংস্কৃতি। সম্ভবত মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির তাণ্ডবের প্রতিবাদ হিসেবেই বাংলাদেশে গত কয়েক বছরের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চর্চার এক লক্ষণীয় জোয়ার এসেছে। একুশ, নববর্ষ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি সেক্যুলার উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সেখানে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংহত করার সচেতন প্রয়াস চোখে না পড়ার যো নেই। এমনকি অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত কবি শামসুর রাহামানের মৃত্যুতে শোকের যে নাগরিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাও সম্ভবত মৌলবাদকে রুখবার একটি সচেতন চেষ্টা।

ব্রেখট ঠিকই বলেছিলেন, আঁধারভরা সময়েও শোনা যায় গান, আঁধারভরা সময়ের গান। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ভেতরই শোনা যাচ্ছে সেই আঁধারভরা সময়ের গান। একসময় হয়ত এই গান কোরাস হয়ে উঠবে। আমরা সেই সময়ের অপেক্ষায় রইলাম।

আনু মুহাম্মদ

ভূমি সংস্কার : বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা

বর্তমান বাংলাদেশ ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘসময় অভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই পার হয়েছে। এই অভিন্ন বাংলা দখলের মধ্য দিয়েই ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়েছিল। আবার এই বাংলাতেই মোগল আমলের ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে নানা রদবদল পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে জারি করা হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাজনা আদায় নিয়মিত ও নিশ্চিতকরণ ও এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি, যারা 'নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনকে টিকাইয়া রাখিতে' সকল শক্তি নিয়োগ করেছিল। নীলচাষ ও জমিদারি প্রথার নিপীড়ন নির্যাতন এই বাংলাতেই জন্ম দিয়েছিল নতুন নতুন কৃষক আন্দোলনের। ব্রিটিশ শাসন থাকাকালীন সময়ের সর্বশেষ কৃষক আন্দোলন ছিল 'তেভাগা আন্দোলন'। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল উৎপাদিত ফসলের উপর প্রজা কৃষকদের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বেগার প্রথাসহ নিপীড়নমূলক নানা ব্যবস্থার অবসান। এই আন্দোলন অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

এই তেভাগা আন্দোলনের রেশ থাকতে থাকতেই ভারত বিভক্তি ঘটে। এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মতো বাংলাও বিভক্ত হয়। তখন থেকেই দুই ভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যাত্রা শুরু হয় বাংলার দুই অংশের। জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন এই আন্দোলনের কারণেই বিভাগপূর্ব ও বিভাগ-উত্তর রাজনীতির একটি বিশেষ ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনে অগ্রসর হয়।

ভূমি সংস্কার কেন?

ভূমি সংস্কার বা ভূমি মালিকানা আর সেই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নয়। এক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে আরেক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণের অপরিহার্য পথ হচ্ছে পুরনো ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। সামন্ত ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী বিকাশ কিংবা শিল্পবিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে তাই আমরা একের পর এক ভূমি সংস্কারের ঘটনা দেখি। এর রূপ সব জায়গাতে একরকম নয়। একই গতিতে বা একই মাত্রায় বা একই ধরনে সব জায়গায় ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ইউরোপে জার্মানির সঙ্গে ইংল্যান্ড কিংবা তাদের সঙ্গে

জাপানের পথ এক নয়। এক নয় যুক্তরাষ্ট্রের পথও। পুঁজিবাদের পরবর্তী পর্বে তাইওয়ান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় ভূমি সংস্কারের ধরন ও এসবের রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের চরিত্র আবার অন্যদের থেকে আলাদা। এই পার্থক্য তৈরি হয় সামন্ত ব্যবস্থার ধরন, তার প্রতিরোধ ক্ষমতা, উদীয়মান শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আপেক্ষিক ক্ষমতা ইত্যাদি এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সমীকরণের উপর। এসবের মধ্যে পার্থক্যের কারণে কোথাও পরিবর্তন দীর্ঘ হয়েছে, কোথাও সংঘাত হয়েছে অনেক তীব্র।

পুঁজিবাদী ভূমি সংস্কারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভূমিকে পুঁজির ক্রিয়ার অধীনস্থ করা, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করা, শিল্পায়নের সম্পূরক হিসেবে কৃষির বিকাশ ঘটানো। আরেকভাবে বলা যায়, মূলধন সংবর্ধনের তাগিদে ভূমির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা, যে উৎপাদনশীলতার লক্ষ্য থাকে বাজার ও মূলধন সংবর্ধন, এবং তার প্রয়োজন ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগের সকল বাধা অপসারণ। এই হিসেবে অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা দূর করা পুঁজিবাদী ভূমি সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়ায়। ভূমি খণ্ডীকরণ রোধ করে তাকে বৃহদায়তন খামার হিসেবে রূপান্তরও একটি লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত হয়। যদিও ক্ষুদে খামারের বৃহদায়তনের উৎপাদনের অংশীদারিত্বের ধরনও দেখা যায়।

পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায় পুঁজির যে কেন্দ্রীভবন এবং আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটে সেখানে বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ঘটে। পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোতে তো বটেই প্রান্তস্থ দেশগুলোর জমিও তার দখলের অন্যতম লক্ষ্য। উপনিবেশে তার দখল হয়েছে সরাসরি শারীরিকভাবে, আর বর্তমানে উন্নয়ন কর্মসূচি ও পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয় এই দখলপর্ব। উন্নয়ন দর্শনের আধিপত্য এবং 'স্বাধীন রাষ্ট্র' কাঠামোর সমর্থন নিয়েই তা অগ্রসর হয়। বর্তমান বিশ্বে কৃষিকেন্দ্রিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাম্প্রতিক তৎপরতা এরই স্বাক্ষর বহন করে। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে মূল মনোযোগ দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর। বিশ্বপুঁজির ব্যবস্থাপক হিশেবে বিশ্বব্যাংকের এই মনোযোগ বিশ্ববাজারের সঙ্গে কৃষিকে অধিকতর সম্পৃক্ত করা, বিশ্বের প্রান্তস্থ দেশগুলোর কৃষিকে বহুজাতিক পুঁজির অধিকতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং বাজারকেন্দ্রিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ। ভূমি সংস্কারে যে সামাজিক ক্ষমতাবিন্যাসে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় তার ব্যাপারে ভীতি ও অনিশ্চয়তাবোধ এই সংস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার ছাড়া বাজার সম্পর্কের বিকাশের পথ অনুসন্ধানে আগ্রহী করেছে। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে একটি মডেল হিশেবে বিবেচিত হতে পারে। ভূমি সংস্কারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ও তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি মনে রাখা দরকার।

একদিকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, শিল্পায়ন সম্পর্কিত ভাবে কৃষির বিন্যাস সমাজতান্ত্রিক ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যেরও অন্তর্গত। কিন্তু যে জায়গায়

পুঁজিবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য তৈরি হয় সেটি হল ভূমিকে ব্যক্তি মালিকানার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে রূপান্তরের পথে অগ্রসর হওয়া। সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি উপস্থিত করেছিল সেসব দেশে যৌথকরণ, রাষ্ট্রীয়করণ এবং সাধারণ সম্পত্তিকরণ তিন ধরনের চেষ্টাই আমরা দেখতে পাই। ভূমি ও তার উৎপাদিকা শক্তি এভাবেই নতুন একটি উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে আনার চেষ্টা করা হয়। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির এক নতুন সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতি মানুষের লোভ, দখল ও মুনাফার দাপট থেকে মুক্ত হয়। এর মধ্যে দিয়ে মানুষও মুক্ত হয় তার সৃজনশীলতা ও অধস্তনতার সংঘাতের কারণ ব্যক্তি মালিকানার শৃঙ্খল থেকে। কিন্তু মানব ইতিহাস এভাবে একরৈখিকভাবে অগ্রসর হয় না। এসব ব্যবস্থা টিকে থাকার মতো পরিপক্বতা এখনও মানবসমাজে তৈরি হয়নি। পশ্চাদপসরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তার আটকে যাওয়ার সঙ্গে এই পরিস্থিতিরও একটি যোগ আছে।

পূর্ববঙ্গে ভূমি সংস্কার : পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববঙ্গে জমিদারি প্রথা বাতিল হয় ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের তিন বছর আগেই। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা ছিলেন প্রধানত হিন্দু পরিবারের সদস্য। অনেক হিন্দু পরিবারের জমিদার পাকিস্তান ত্যাগ করায় জমিদারদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। কিন্তু এর মধ্যেই উদ্ভব হয় একটি শক্তিশালী মুসলিম জোতদার গোষ্ঠীর। যাদের প্রভাব ১৯৫০ সালের ভূমি সংস্কারকে বেশিদূর অগ্রসর হতে দেয়নি। শুধুমাত্র জমিদারি প্রথা বাতিল, রায়তদের মালিক হিসেবে স্বীকৃতি, খাজনা আদায়কারী হিশেবে একমাত্র রাষ্ট্রের এখতিয়ার নিশ্চিত করা ছাড়া বাকি সবকিছুই কাগুজে বিষয়ে পরিণত হয়।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের যে চারটি অভিজ্ঞতা তার প্রথমটি ১৯৫০ সালে। এই বছর ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হয় এবং সিলিং ধরা হয় পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথা বিলোপের যে আইন পাশ হয় তার প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয় ১৯৪৭ সালেই। সেটি প্রথমে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত কর্মকর্তা এবং গবেষক কামাল সিদ্দিকী অনুসন্ধান করে জানাচ্ছেন যে, সেই কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন জমিদার না নয় জোতদার।

এই কমিটি আড়াই বছর ধরে জমিদারি প্রথা বিলোপ প্রক্রিয়ায় নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেটা করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষতিপূরণ যতবেশি সম্ভব নিশ্চিত করবার জন্য তারা চাপ বিস্তার করেছে এবং পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের বিল থেকে বর্গাদারদের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ এবং বর্গাস্বত্ব বিধান বাদ দিতে সক্ষমও হয়েছে। জমিদারি প্রথা বিলোপের পক্ষে যখন জনমত প্রবল হচ্ছে তখন

অধিকাংশ জমিদার হিন্দু হলেও মুসলিম লীগের প্রভাবশালী অংশ এই বলে প্রচার করতে থাকে যে, 'ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমি নেওয়া ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কাজ।' তারা কমিউনিস্ট ভীতি তৈরি করেও এই কার্যক্রম ঠেকাতে চেষ্টা করে।

১৯৫৪ সালে এই মুসলিম লীগকে পরাজিত করেই যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হয়। তাদের ২১ দফা কর্মসূচিতে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং বর্গাদারদের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ ও বর্গাস্বত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হবার পর সরকারের পক্ষ থেকে এক পর্যায়ে এরকম বক্তব্য আসে যে প্রাদেশিক সরকার হিসেবে তাদের ক্ষমতা সীমিত এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের মূলনীতির পরিপন্থী। এ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও তর্কবিতর্ক ছিল। কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা হবার আগেই পুনরায় সামরিক শাসন জারি হয়।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর ১৯৫৯ সালে ভূমি সংস্কার নিয়ে পর্যালোচনা ও সুপারিশ করবার জন্য 'মাহমুদ কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশন জমির সিলিং ১০০ বিঘা বা ৩৩.৩ একরের স্থলে ১০০-১৩৩ একরে পুনর্বিন্যস্ত করার সুপারিশ করে। একই সময়ে পরিকল্পনা কমিশন ১৫০ একরের সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করে। মাহমুদ কমিশন তাদের রিপোর্টে বলে যে, 'প্রশ্ন হল এই, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাদের ধ্বংস করে কোনো উপকার হবে কি, যখন এই ব্যবস্থা ভূমিহীন মজুর ক্ষুদে চাষীদের সমস্যাকে সন্তোষজনকভাবে সমাধান করে না . . . আমাদের মত হচ্ছে, জমির সর্বোচ্চ সীমার পরিমাণ এমন করতে হবে, যাতে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভাবের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং তার সন্তানদের স্কুল কলেজে পড়াতে পারে।' অতএব এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে' 'অভাবের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি' দেবার জন্য ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে জমির সিলিং বাড়িয়ে করে ৩৭৫ বিঘা বা ১২৫ একর।

একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে জমির সিলিং ধার্য করা হয় ৫০০ একর, যেখানে জমির প্রকৃত মালিকানা ছিল বহু হাজার একর জমি। পশ্চিম পাকিস্তানে সিলিং কমিয়ে উদ্বৃত্ত জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয় তার সঙ্গে শিল্প প্রকল্প বিনিয়োগের শর্ত যুক্ত করার ফলে ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পপুঁজিরও বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সিলিং বাড়ানোর ফলে কৃষি থেকে শিল্পে পুঁজি স্থানান্তরের সম্ভাবনা রহিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার : পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার বিষয়ক পদক্ষেপ বা আইনের মাধ্যমে নেওয়া হয় তার নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট একুইজিশন অ্যাক্ট'। এই আইনে পরিবার না ধরে মাথাপিছু সিলিং ধরা হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির ভিটেসহ মাথাপিছু সর্বোচ্চ ২৫ একর আবাদি জমি ও ২০ একর অনাবাদি জমির মালিকানার বিধান রাখা হয়। এর বাইরে মৎস্য খামার, ফলের

বাগান, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ, ট্রাস্ট ইত্যাদি নামে বিপুল জমি রাখা সম্ভব ছিল। এসব ফাঁকফোকড়ের কারণে সিলিং প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৯৬৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। একই বছর পরই শুরু হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন, প্রথম পর্যায়ে যার মূল মনোযোগ ছিল জোতদার ও ধনী কৃষকদের দখলকৃত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন ও বর্গাদারদের পক্ষে ভূমি দখল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা সেটি ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল সিপিআই এম এল গঠনের মধ্য দিয়ে আরও সুসংগঠিত হয়। ১৯৭০ এর ১৫-১৬ মে পার্টির সর্বভারতীয় কংগ্রেসে চারু মজুমদার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি জেলখানায় নিহত হন ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই।

বামফ্রন্ট সরকার যে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তার মধ্যে সিলিং নির্ধারণ এবং বর্গাদারদের স্বত্ব প্রদান ছিল অন্যতম কর্মসূচি। এই সময় কৃষক সভার মাধ্যমে বেনামি জমি, উদ্বৃত্ত জমি সনাক্ত ও দখল নেওয়ায় ভূমিহীন কৃষকদের উৎসাহী করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯-৭০ সময়কাল প্রায় ৩ লাখ জমি উদ্ধার করা হয় ও বিলিবণ্টন করা হয়। বর্গাদারদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং জোতদারদের পক্ষে পুলিশ ব্যবহার বন্ধ হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই কর্মসূচি নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি, তার আগেই কংগ্রেস আবার ক্ষমতাসীন হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিস্তারের কারণে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও ভূমি সংস্কার প্রশ্নে আগের তুলনায় বেশি মনোযোগী হয়।

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার : সত্তর ও আশির দশক

বাংলাদেশের অভ্যুদয় গ্রামাঞ্চলে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে মালিকানা বিন্যাসে কার্যত কোনো পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বর থাকলেও উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি ছিল পাকিস্তান আমলেরই ধারাবাহিকতা। প্রাথমিক কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও দ্রুতই অর্থনৈতিক গতিমুখ পুনর্বিন্যস্ত হয় পুরনো ধাঁচে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে যে ভূমি সংস্কার করা হয় তা ছিল কার্যত ১৯৫০-এর ভূমি সিলিং এর পুনঃপ্রবর্তন। এছাড়া ছিল খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কিংবা 'সবুজ বিপ্লব' এর বিস্তৃতি ৭০ দশক পর্যন্ত সেভাবে ঘটেনি। সুনির্দিষ্টভাবে কৃষিতে এই 'নতুন প্রযুক্তির বিস্তার' এবং 'গ্রাম উন্নয়নে গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশগ্রহণ' এর লক্ষ্যে তাদের ধরনে ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব ইউএসএইড-এর প্রকল্পতেও ব্যক্ত হয়।

১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কারের সময় 'কৃষক' সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। বির্তক ওঠে কৃষক বলতে কাদের বোঝানো হবে, কৃষি উৎপাদনে যুক্ত কৃষকদের না অনুপস্থিত ভূমি মালিকদেরও? শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত ভূমি মালিক জোতদার গোষ্ঠী বিজয়ী হয় এবং তাদের জন্য সুবিধাজনক কৃষক সংজ্ঞাটি অক্ষত থাকে। ১৯৭৪ সালে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব), ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে 'উদ্বৃত্ত জমি

বণ্টন কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি কার্যত কোনো কাজ করতে পারেনি। তার আগেই প্রথমে জরুরি অবস্থা জারি হয়, এরপর সব দল বাতিল করে একদলীয় শাসনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাকশাল গঠিত হয় এবং এর কয়েক মাসের মধ্যে এই সরকারের উচ্ছেদ করে সামরিক শাসন আসে। ১৯৭৬ সালে সামরিক শাসনের অধীনে আবারো ভূমি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এতে সদস্য হন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), থানা শিক্ষা অফিসার, থানা কৃষি অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

১৯৭২ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ নিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও খাসজমির বড় অংশ বরাবরই ধনী কৃষকদের নামে বেনামে থেকে যায়। তহবিল অফিস, ভূমি জরিপ বিভাগ, ভূমি রেকর্ড অফিসগুলোতে একে কেন্দ্র করে দুর্নীতিরও বিস্তার ঘটে। কিছু কিছু খাসজমি বিতরণের ঘটনা শোনা গেলেও পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায় তা কার্যত ভূমিহীনদের নিয়ন্ত্রণে নেই। কাগজে কলমে বিক্রির নিষেধাজ্ঞা থাকায় অভাবের সময়গুলোতে জোতদার ধনী কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভূমিহীন দিনমজুরদের ভূমিদান বৃদ্ধি পাবার ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে করা। ভূমি সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত জনমত জরিপ করা হয়। বাংলাদেশে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারির পর ১৯৮২ সালে একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়, এই কমিটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ ল্যান্ড রিফর্মস অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়। এর মূল দিকগুলো ছিল: (১) পূর্বের ১০০ বিঘার ভূমি সিলিং অব্যাহত থাকবে তবে নতুন ভাবে কোনো পরিবার ৬০ বিঘার বেশি জমির মালিক থাকতে পারবে না; (২) বর্গাদারদের ৫ বছর পর্যন্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না; (৩) জমির ফসল তিন ভাগে ভাগ হবে, এক ভাগ জমির মালিক, এক ভাগ বর্গাদার আরেক ভাগ যে উৎপাদন উপকরণ যোগাবে সে; (৪) বেনামি লেনদেন নিষিদ্ধ; (৫) কৃষি মজুরদের মজুরি হবে কমপক্ষে সাড়ে ৩ সের চালের সমান; এবং (৬) শুধুমাত্র ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ করা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭২ ও ১৯৮৪ সালের দুটো ভূমি সংস্কারই বাস্তবায়নের উদ্যোগ ছিল খুবই শিথিল। এমনকি রাষ্ট্রীয় ভাবে এসব আইন জনগণের অবহিত করারও কোনো উদ্যোগ ছিল না। ১৯৯১ সালে বিআইডিএস থেকে এক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। এতে দেখা গেছে শতকরা ৯৯ জন গ্রামীণ মজুর ও বর্গাদার এসব আইন সম্পর্কে অবহিতই নন।

খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের সরকারী নীতিমালা এখনও বহাল আছে কিন্তু এই বণ্টন বিষয়ে আর কোনো কথাবার্তাই ৮০ দশকের পর আর শোনা যায় না। ১৯৭২ সালে তৎকালীন ভূমিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন নতুন সিলিং আরোপে ১২ লাখ একর জমি উদ্বৃত্ত হবে। ১ বছরের মধ্যে তিনি এই পরিমাণ ৮ লাখ একর বলে উল্লেখ করেছেন। সরকারি দলিলে একই সময়ে এই জমির পরিমাণ উল্লেখ

করা হয়েছে ২ লাখ একর। ৮০ দশকের শুরু পর্যন্ত উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৩১,২৫০ একর। ৮০ দশকের পর ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গটি রাজনীতি এমনকি গবেষণার বিষয়ে হিশেবে তার পূর্ব গুরুত্ব হারিয়েছে।

আবুল বারকাত ও অন্যদের গবেষণা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জমির শতকরা ৮.৯ ভাগ বা ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার ১৭ একর জমি খাস ও খাস জলা। খাস কৃষি জমি ৮ লক্ষ ৩ হাজার ৩০৮ একর, খাস অকৃষি জমি ১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৫৪ একর। বিশাল জলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৭১,০০০ একর অকৃষি জমিও 'নিখোঁজ'। সবমিলিয়ে ১১.৮ শতাংশ কৃষিজমি কার্যকরভাবে ভূমিহীনদের মালিকানায় রয়েছে। ৮৮.৫ ভাগ ধনী ও শক্তিধরদের অবৈধ দখলে।

বিভিন্ন সমীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমি প্রশাসন হল দুর্নীতির অন্যতম বৃহৎক্ষেত্র, ভূমি দখল মালিকানা জালিয়াতি হল সন্ত্রাসের অন্যতম তৎপরতা, ভূমি ভাগবণ্টন হলো অধিকাংশ মামলা মোকদ্দমা সংঘাত ও রক্তপাতের কারণ। একাধিক উদ্যোগ দেখা গেলেও, কাগজপত্রে কিছু পরিবর্তন হলেও ভূমি প্রশাসনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। খাজনা, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন ভিন্ন ভিন্ন দফতরে থাকার ফলে জটিলতা, অস্বচ্ছতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জালিয়াতির সুযোগও তাই অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, এসব জটিলতা, অস্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির সুযোগ নিতে পারে কেবল গ্রাম শহরের বিত্তবান ক্ষমতাবানরাই।

ভূমিহীনদের নিজেরা সংগঠিত হয়ে প্রভাবশালীদের দখলে থাকা খাস জমি নিজেদের দখলে নিয়ে আসার কিছু কিছু ঘটনা ৭০ দশকের শেষে ও ৮০ দশকে দেখা গেছে। এর মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের নেতৃত্বে পটুয়াখালীর দশমিনায় এবং পাবনায় 'সমতা'র নেতৃত্বে ভূমিহীনদের খাসজমি দখল। প্রথমটি ছিল অধিকতর রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন এবং সেসময় ভূমিহীনদের এই উত্থান চিত্র শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল তার নমুনা পাওয়া যায় সেই সময়ে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে। সেখানে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে ভূমিহীনদের এই উদ্যোগকে এক ভয়ংকর অশনি সংকেত হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকারের কঠোর হস্ত কামনা করা হয়েছিল।

আশির দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ কৃষক ও মজুরদের বিভিন্ন সংগঠিত তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। এই দশকেই ক্ষেতমজুরদের স্বতন্ত্র সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ সংস্থাও গড়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকার কর্তৃক গঠিত ভূমি বণ্টন কমিটিতে এসব সংগঠনের প্রতিনিধি রাখার কিছু উদ্যোগ দেখা যায়। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি এনজিও সংগঠনও ভূমিহীনদের মধ্যে তাদের নানামুখী কার্যক্রম বিস্তৃত করে।

১৯৮৭ সালে এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে কৃষক ক্ষেতমজুরদের সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে গ্রামীণ মজুরদের বিশাল সমাবেশ হয়।

সেটাই রাজনীতির কেন্দ্রে গ্রামীণ মজুরদের সংগঠিত অবস্থানের সর্বশেষ ঘটনা। পরবর্তী সময়কালে নানা কারণে সিপিবি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রভাবিত এই সংগঠনগুলোর তৎপরতারও ক্ষয় ঘটে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এনজিওর সর্বব্যাপী উপস্থিতি ভূমিহীন সংগঠন, তৎপরতা এবং সমাবেশ দাবি দাওয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার : সত্তর ও আশির দশক

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৩ সালের ভূমি আইন সংশোধন করা হয়। এর আগে সিলিং ছিল ব্যক্তি মাথাপিছু, এটা পরিবর্তন করে পরিবার প্রতি সিলিং ধার্য করা হয়। প্রতি ১ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য সিলিং নির্ধারণ করা হয় ২.৫ হেক্টর, ২ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সিলিং ৫ হেক্টর। ৭ হেক্টর সর্বোচ্চ রেখে প্রতিজন অতিরিক্ত সদস্যের জন্য ০.৫ হেক্টর বরাদ্দের বিধান রাখা হয়।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি ভূমি মালিকানা সিলিং-এর বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ করে। এগুলো (১) দুই ফসলি সেচাধীন জমিতে পরিবার প্রতি ৪.০৫-৭.২৮ হেক্টর; (২) সেচাধীন এবং একফসলি জমি পরিবার প্রতি ১০.৯৩ হেক্টর। পরিবার বলতে ধরা হয়েছিল স্ত্রী, স্বামী ও ৩ জন নাবালক সন্তান। বৃহত্তম পরিবার জন্য মাথাপিছু জমিও বিবেচনা করা হয়েছে। চা, কফি, কোকো প্ল্যানটেশনের ক্ষেত্রে এই সিলিং রহিত করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ১৩টি রাজ্য সিলিং আইন পাশ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম।

দ্বিতীয় বারের মতো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় ১৯৭৭ সালে। সে সময় পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের আওতার মধ্যে শুধু কৃষিজমি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮১ সালে ভূমি সংস্কারের আওতায় অকৃষিজমিও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে মালিক কোনো উপকরণ সরবরাহ না করলে বর্গাদার চার ভাগের তিনভাগ পাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

১৯৮১ সালের এসব বিধান ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেতে লাগে দীর্ঘদিন, প্রায় ছয় বছর। এই সময়কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি বিষয়ে আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয় সেগুলো হলো : আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬; ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ হোল্ডিং অ্যাক্ট, ১৯৭৯; ওয়েস্ট বেঙ্গল একুইজিশন অব হোমস্টিড ল্যান্ড ফর এগ্রিচালচারাল লেবারারস, আর্টিজানস অ্যান্ড ফিশারম্যান অ্যাক্ট, ১৯৭৫; ক্যালকাটা ঠিকা টেনেন্সি (একুইজিশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ১৯৮১; এবং আরও কিছুদিন পরে থার্ড এমেন্ডমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট, ১৯৮৬।

১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় আসে তখন এর আগে নেওয়া ভূমি সংস্কার কার্যক্রম বেশিরভাগই বাস্তবায়ন হয়নি। ৭৭-পরবর্তী সময়েই এগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বস্তুত এগুলো বাস্তবায়ন গতি পেল তখনই যখন পঞ্চায়েত কাঠামোয় ভূমিহীন বর্গাদারদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেল।

বামফ্রন্টের নেতৃত্বে ভূমি সংস্কার কার্যক্রমে সবচাইতে আলোচিত ও প্রভাবশালী বিষয় ছিল 'অপারেশন বর্গা'। তেভাগা আন্দোলনের দাবিগুলোই এর পেছনে মূল দিকনির্দেশনা হিশেবে কাজ করেছে যার মধ্যে ছিল: ফসলের দুই তৃতীয়াংশ, জমির উপর স্বত্ব, বর্গাদারের জমিতে ধান মাড়াই নিশ্চিত করা এবং বেগার প্রথার অবসান।

১৯৭৮ সালেই অপারেশন বর্গা শুরু হয়। সে সময় ৪ লাখ বর্গাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। দশ বছরে এই সংখ্যা ১৪ লাখে পৌঁছায়। বর্গাদারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান প্রক্রিয়াও শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৮ সালে থেকে নিয়মিত নিবার্চনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও চালু হয়। পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। পঞ্চায়েত ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি গঠন করে যেখানে প্রশাসনের ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভূমি বণ্টন ও অপারেশন বর্গাই ভূমি সংস্কারের মূল কার্যক্রম হিসেবে গুরুত্ব পায়। এক্ষেত্রে কিষান সভার সদস্য সংখ্যা ছিল সাংগঠনিক ভিত্তি। ১৯৭৭-৭৮ সালে কিষান সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ, ১৯৯০ সালে এই সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫ লাখে পৌঁছায়। ১৯৭৯ এর বন্যায় বাধাগ্রস্ত হলেও ১৯৮১ সালের মধ্যে আড়াই লাখ থেকে তালিকাভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ১০ লাখ অতিক্রম করে, ১৯৯০-এর মধ্যে তা ১৫ লাখে উন্নীত হয়। শতকরা ৮৫ ভাগ বর্গাদার তাদের স্বত্ব লাভ করে । ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ এর মধ্যে পাট্টা বা খাসজমির শতকরা ৭০ ভাগ বণ্টিত হয়।

১৯৭৯ সালে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নতুন বিধি প্রবর্তন করা হয়। এতে একজন কৃষকের জমির বাজার দামের এক দশমাংশ দামের উপর রাজস্ব ধরা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী ৫০০০ রূপী পর্যন্ত মূল্যের ভূমির উপর কোনো রাজস্ব নেই। পরবর্তী ১০০০ টাকায় এই রাজস্ব রূপী প্রতি ২ পয়সা, তার পরবর্তী ১০০০ রূপী দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে রূপী প্রতি ১ পয়সা করে বৃদ্ধি পায় এবং তার পরবর্তী প্রতি ৩০০০ রূপী দাম বৃদ্ধিতে রূপীপ্রতি ১ পয়সা করে বাড়ে । ১৬ হাজার রূপীর বেশি হলে রূপী প্রতি ৮ পয়সা ধার্য হয়।

ভূমি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিনের কর্মকর্তা এবং ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো চিহ্নিত করেছেন :

১. ১৯৭৮ এর শেষে সূচিত 'অপারেশন বর্গা'র মাধ্যমে বর্গাদারদের দ্রুত তালিকাভুক্তি এবং তাদের প্রাপ্য জমির উপর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা;
২. পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ;
৩. জোতদার ও মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বর্গাদার ও ভূমিপ্রাপ্ত ভূমিহীনদের মধ্যে সহজ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করা;
৪. গ্রামীণ মজুর সংগঠন ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জালিয়াতি ও জবর দখলে থাকা জমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচি;

৫. সকল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, কারিগর ও জেলেদের জন্য ০.০৮ একর ভিটেজমি নিশ্চিত করা;
৬. সরকারি উদ্যোগে নতুন ভূমিপ্রাপ্তদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৭. ভূমি উন্নয়নের জন্য ভর্তুকি প্রদান;
৮. ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের রাজস্ব থেকে অব্যাহতি;
৯. ক্রেতা যদি গরিব বা প্রান্তিক চাষি না হয় তাহলে দুর্গতকালীন সময়ে বিক্রীত জমি পুনরুদ্ধার;
১০. গরিব প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাদারদের উদ্দেশ্য করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের গতিমুখ

ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে বাম রাজনৈতিক মহলে বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ছিল। এই বিতর্ক এতই গুরুতর ছিল যে এটি কেন্দ্র করে বিশেষত পিকিংপন্থী দলগুলোর মধ্যে বহুদফা ভাঙন হয়। আশির দশকের পর আর এ নিয়ে তেমন কোনো মনোযোগ বাম মহলে দেখা যায় না। তবে সাধারণভাবে একটা ঐকমত্য দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী সম্পর্ক এখন প্রাধান্যে আছে। সত্তরের দশক ও আশির দশকের শুরু পর্যন্ত গ্রামীণ ভূমি মালিকানা ও উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বেশকিছু গবেষণা দেখা যায়। ১৯৭৪ সালে আখলাকুর রহমান লিখেছিলেন *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ* যাতে তিনি ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদকে বিকাশমান হিশেবে সনাক্ত করেছিলেন। ভূমির কেন্দ্রীভবন নিয়ে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, এইচ কে আরেফিন এবং আতিউর রহমানসহ দেশ ও বিদেশে অনেকেই গবেষণা করেছেন। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং এইচ কে আরেফিন একটি একটি গ্রাম নিয়ে গবেষণা করেছেন। আতিউর রহমান ১৯৪৬ সালে ছয়টি গ্রামে পরিচালিত গবেষণার ধারাবহিকতায় আবারো অনুসন্ধান করেছেন ১৯৮২ সালে।

এইচ কে আরেফিন ৩৩ বছরে গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণায় ভারতবিভাগ-উত্তর চিত্রটি পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালে গ্রামে ৫৭.৮৭ ভাগ জমির মালিকানা ছিল হিন্দু পরিবারের হাতে, মুসলিম পরিবার ২৯.৯১ ভাগ। ধর্ম অনুযায়ী এই বিভাজনের মধ্যে আবার মেরুকরণ ছিল, এই ভূমি কেন্দ্রীভূত ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৫টি হিন্দু পরিবার এবং দুটো মুসলিম পরিবারের হাতে। ৩৩ বছর পর ধর্মভিত্তিক বিভাজনের চিত্র পুরো পাল্টে যায়। এ সময় সেই গ্রামের ১১.৭৯ ভাগ জমির মালিকানা ছিল হিন্দু পরিবারের হাতে। অন্যদিকে মুসলিমদের হাতে স্থানান্তরিত জমিতেও কেন্দ্রীভবন ঘটে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। ২২টি গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র কয়েকটির জমি মালিকানা বেড়েছে। এদের শতকরা ৭০ ভাগ পুরনো অভিজাতদের বাইরে থেকে এসেছে। ধনী পরিবারগুলোর শতকরা

মাত্র ৩০ ভাগ প্রথাগত খানদানদের হাতে। নতুন ধনী কৃষক পরিবার কৃষি আবাদ ছাড়াও খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা, নির্মাণ ঠিকাদারি, পরিবহন ইত্যাদির সাথেও যুক্ত। অকৃষি খাতে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

জাহাঙ্গীর ও আতিউর রহমানের গবেষণার সিদ্ধান্ত ছিল যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভূমি মালিকানার কেন্দ্রীভবন হচ্ছে এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ঘটছে। এ নিয়ে বিতর্ক ছিল এবং শাকিব আদনান খান ও আসহাবুর রহমান একই তথ্য বিশ্লেষণ করে চায়ানভীয় মডেলে ক্ষুদ্র কৃষকদের আধিপত্য লক্ষ করেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে লেনিনীয় পুঁজিবাদী নয় বরং চায়ানভীয় কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এখানে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই শুধু এটুকু বলা যায় যে, এসব বিতর্ক ও গবেষণার পর আরও বহুবছর পার হয়েছে। পরিস্থিতির মধ্যে আরও অনেক বদল ঘটেছে।

স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশ ছিল সব অর্থেই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আসতো কৃষি থেকে। কর্মসংস্থানেরও শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতেই হতো। সে সময়ের তুলনায়, আগেই বলেছি, কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়েছে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে শতকরা প্রায় ৩০০ ভাগ। কিন্তু আনুপাতিক হারে এর চাইতে অনেক বেশি বেড়েছে অকৃষি খাতের বিভিন্নমুখী তৎপরতা। সেকারণে জাতীয় আয়ে কৃষির অনুপাত অনেক কমে গেছে। সর্বশেষ হিসাবে এই হার হল শতকরা ১৮ ভাগ। মৎস্য বন ইত্যাদি ধরে এই হার শতকরা ২৫ ভাগ। স্বাধীনতার সময়ে জাতীয় আয়ে শিল্পের অনুপাত ছিল পুরনো হিসেবে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ, একই হিসেবে তা এখন হল শতকরা ১০ ভাগের কম। জাতীয় আয়ে সর্বাধিক অংশ এর মধ্যে গঠন করছে যাকে বলা হয় সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা খাত সেটি। এর মধ্যে আছে ব্যবসা, পরিবহন, হোটেল রেস্তোরাঁ, বেসরকারি খাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য তৎপরতা, দোকানপাট। নির্মাণ খাত এখন একটি বড় খাত যার সঙ্গে ইটখোলা, সিমেন্ট, রড-বালির উৎপাদন বিপণন সম্প্রসারণ সম্পর্কিতভাবে ঘটেছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া অনুধাবনে দুটো বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার। প্রথমত এই পরিবর্তনে ভূমি সংস্কারের কোনো কার্যকর ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ বাজার সম্পর্কের বিকাশ হয়েছে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা এবং ভূমি প্রশাসন অপরিবর্তিত রেখেই। তবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ভূমি মালিকানার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে। পরিবর্তন হয়েছে রাষ্ট্র, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবিধ হস্তক্ষেপ এবং সেইসঙ্গে নতুন নতুন (আমদানিকৃত) প্রযুক্তির প্রবেশ থেকে। এবং দ্বিতীয়ত এর পাশাপাশি শিল্পখাত একইভাবে গড়ে না উঠলেও কৃষিপণ্যের অনেকখানি চাহিদা গঠন করেছে নগরায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি।

ষাটের দশকে যে 'সবুজ বিপ্লব' শুরু হয়েছিল তা এখন অনেক বিস্তৃত। বাংলাদেশের আবাদি জমির বৃহৎ অংশ এই আবাদের আওতায়। এই 'সবুজ বিপ্লব' মানে একসঙ্গে চারটি তৎপরতার প্যাকেজ। এগুলো হলো : প্রথমত, ইরি

নামের উচ্চ ফলনশীল বীজ (উফশী) প্রবর্তন; দ্বিতীয়ত, এই বীজ যেহেতু অধিক পানি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল সেহেতু গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে যান্ত্রিক সেচ এর প্রবর্তন; তৃতীয়ত, এই বীজ যেহেতু অনেক পোকামাকড় আমদানি করে সুতরাং কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার শুরু; এবং চতুর্থত, এই বীজ যেহেতু জৈবিক সারে কাজ করে না সুতরাং রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু। বীজ, নলকূপ, কীটনাশক ওষুধ, সার সবই আমদানি করে উচ্চ মাত্রায় ভর্তুকি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কোনো কোনো সার এবং বীজ বাদে বাকি সবই এখনও আমদানি করা হয়।

ক্রমান্বয়ে এই চাষ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সারাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারাই অনেক বদলে দেয়। বিভিন্ন ধরনের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পও নেওয়া হয় এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই। নদী নালা খাল বিল ক্রমান্বয়ে শাসনের আওতায় আসে। বহু বাঁধ এবং কাঠামোগত নির্মাণে বহু এলাকা উফশী চাষের উপযোগী হয় আবার বহু এলাকা স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার হয়। নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করায় বহু এলাকায় উফশী ফলন ভালো হলেও অন্যান্য শস্য ও জীবজগতে স্থায়ী বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে, এই অঞ্চলের পরিবেশ ও জৈব সার উপযোগী অনেক দেশি বীজ হারিয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ পানি নির্বিচারে উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ ভারসাম্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে এর সঙ্গে যোগ আছে পানিতে আর্সেনিক দূষণের। বাংলাদেশে অধিকাংশ গ্রামের মানুষ এখন আর্সেনিক আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছেন। গত তিন দশকে গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। শ্যালো মেশিন পানি উত্তোলন ছাড়াও লাগসই নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নৌকাসহ পরিবহন এর মধ্যে অন্যতম। এই মেশিন ব্যক্তি মালিকানাধীন, বহু মালিক এখন ভাড়ায় এই মেশিন ব্যবহার করেন। চুক্তি অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে পানি দেওয়া হয়। মালিক ছাড়াও পানির মেশিন ঘিরে মেকানিক, চালক ইত্যাদি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

কীটনাশক ওষুধ আর রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষকদের মধ্যেও উন্মাদনা তৈরি হয় বাজারকে লক্ষ্য করে। বাজারের বৈরী অবস্থা মোকাবিলা করে মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য এসব উপাদানের উপর তার নির্ভরতা প্রয়োজনকেও অতিক্রম করে। স্বাধীনতার পর এসবের ব্যবহার যেহারে বেড়েছে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে সার কীটনাশক আমদানি, সংগ্রহ, বিতরণ নিজেই একটি অর্থনৈতিক তৎপরতায় পরিণত হয়েছে। এগুলোর আমদানি বিপণন ডিলারশিপে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য এবং এটি কৃষি উৎপাদনের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে বেশি লাভজনক।

বীজের ক্ষেত্রে এখনকার উদ্যোগ হচ্ছে অধিকতর 'উফশী' হিসেবে নয়া হাইব্রিড টারমিনেটর বীজ প্রবর্তন। এক্ষেত্রে সরকার, বহুজাতিক বীজ এবং রাসায়নিক কোম্পানি, বড় এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯-তে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে: 'জৈবপ্রযুক্তির প্রবর্তন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ'।

সার কীটনাশক ইত্যাদির ব্যাপক বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে জমির উপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে তা বিভিন্ন গবেষণায় ইতিমধ্যে আমরা জানি। পানির উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব আরও বেশি। দেশে পানির প্রবাহ এমনিতে বিভিন্ন প্রকল্পের আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর যে নদীনালা খালবিল অবশিষ্ট আছে সেখানকার প্রাণীজগৎ সার কীটনাশকের প্রত্যক্ষ শিকার। এটি একটি অন্যতম কারণ যার ফলে অনেক কিছুর সঙ্গে স্বাদু পানির মাছও এখন দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই মাছ এক ধরনের সাধারণ সম্পত্তিই ছিল, যা এখন আর নেই। বিভিন্ন লিজ প্রক্রিয়ায় ভাল মাছের আনাগোনা আছে এমন নদী বা খালবিল এখন প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাকি খাল-বিল-ডোবায় অঞ্চলে এই মাছের জোগান কমেছে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ বেড়েছে অনেক। প্রায় প্রতি গ্রামেই এখন মৎস্য খামার আছে। এই মাছ বেশিরভাগ আমদানি করা জাতের, যেগুলো উৎপাদন দ্রুত হয়, ওজন বেশি থাকে। কেননা এখানে লক্ষ্য বাজার ও মুনাফা। এসব পুকুর ডোবায় মাছ চাষ হয় পরিকল্পিতভাবে। এখানে বিনিয়োগ, নিয়মিত তদারকি এবং ওষুধপত্র লাগে। আর মালিকানা বা লিজ নেবার ক্ষমতা তো লাগেই। গ্রামের সচ্ছল বা মধ্যবিত্ত বা ব্যাংক ইত্যাদিতে ভালো যোগাযোগ আছে এরকম পরিবারগুলোর মধ্য থেকে গ্রামাঞ্চলে মৎস্য খামার কেন্দ্রিক একটি উদ্যোক্তা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে।

জিডিপিতে মৎস্যখাতের অনুপাত বৃদ্ধি বিশেষ মনোযোগের দাবি করে। এই অনুপাত বৃদ্ধি সরাসরি মাছের বাণিজ্যিক চাষবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বৃদ্ধি এই খাতকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে যায় যে, গত কয়েক বছর থেকে এটি কৃষির উপখাত হিসেবে পূর্ণাঙ্গ একটি খাত হিসেবে দেখানো শুরু হয়েছে। জিডিপিতে খাদ্যশস্য খাতের অনুপাত যেখানে প্রায় ১৩ শতাংশ সেখানে মৎস্যখাতের অনুপাত এখন ৫ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে দৈনিক মাছ সরবরাহের পরিমাণ ২৮ গ্রাম, ন্যূনতম প্রয়োজন নির্দেশ করা হয় ৩৫ গ্রাম। আর খেয়াল রাখা দরকার যে, যে মাথাপিছু ২৮ গ্রাম আছে তার বেশিরভাগ যেহেতু বাজারের পণ্য সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তার বাইরে। তাছাড়া চিংড়ি সহ মাছের একটি ভালো অংশ এখন বিশ্ববাজারকে লক্ষ্য করে উৎপাদিত হয়। একাজে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান এবং পৃষ্ঠপোষকতাও আছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি ঘের একদিকে দখল, জবরদস্তি, সহিংসতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে চাষের জমি ফলের গাছ বিরান করবারও একটি ক্ষেত্র।

বিভিন্ন আনুকূল্য এবং মুনাফার বিবেচনায় গ্রামে মুরগির খামারও অনেক বেড়েছে। মুরগির খামার, দ্রুত মুরগি উৎপাদনের জন্য নানা ওষুধ সামগ্রী বিপণন তৎপরতাও গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে এখন দৃশ্যমান। বিভিন্ন রকম মড়ক বিশেষত সাম্প্রতিক বার্ড ফ্লুর কারণে বহু উদ্যোক্তা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এছাড়া আছে ছোটছোট ডেইরি। আড়ং, মিল্কভিটা, প্রাণ ইত্যাদি দুধ বাজারজাতকরণের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবেই এগুলো বিকশিত হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে সবজি ও ফলচাষের উদ্যোগও ক্রমবর্ধমান। বিক্রেতা পর্যায়ে দাম না পেয়ে সংকট

ও ঋণগ্রস্ত হবার ঘটনাও একইভাবে দেখা যাচ্ছে প্রচুর। এসব সংকট এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমে ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের বিতাড়ন করে একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটাচ্ছে। শহরগুলোতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চেইন ধীরে ধীরে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে।

১৯৭২ সালে গ্রামে কৃষকেরাই, ছোট বড় মাঝারি সব মিলে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর হার তখন ছিল শতকরা ৩৩, সরকারি হিসাবে এখন এই হার ৬০ অতিক্রম করে গেছে। প্রান্তিক কৃষক যারা একটু সংকটেই ভূমিহীনদের কাতারে আসবেন কিংবা সেই কৃষকেরা যারা জমি বন্ধকী দিয়ে তা ফেরত পাবার ভুল আশায় নিজেদের এখনও জমির মালিক ভাবছেন তাদের সহ হিসাব করলে ভূমিহীন হার শতকরা ৭০ ভাগের বেশি। এরা সকলেই ক্ষেতমজুর ও দিনমজুর। ভূমিহীনদের হার বৃদ্ধি মানে আরেক দিক থেকে গ্রামীণ মজুরের জোগান বৃদ্ধি। এই জোগান বছরের অধিকাংশ সময়ে কৃষিখাতে মজুরের যে চাহিদা তার তুলনায় অনেক বেশি। আশ্বিন কার্তিক সহ কয়েক মাসে এই চাহিদা আরও অনেক কমে যায়। চাহিদা জোগানের এই ভারসাম্যহীনতায় 'উদ্বৃত্ত' গ্রামীণ মজুরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন ভাসমান, একটি অংশ স্থায়ীভাবে শহরে চলে এসেছেন আরেক অংশ বছরের কিছু সময় গ্রামে কাজ করেন কিছু সময় শহরে করেন। সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে এখন গ্রামীণ মজুর শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্গাদার পরিবারের শতকরা অনুপাত শতকরা ৩৯ থেকে বেড়ে ৪১.৬ ভাগ হয়েছে। ১৯৮৮, ২০০০ ও ২০০৪ সালে গ্রামীণ জরিপের উপর ভিত্তি করে আবদুল বায়েস ও মাহবুব হোসেন জানাচ্ছেন, 'গত প্রায় দুই দশকে বর্গা চাষীর অনুপাত প্রায ৪৪ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এবং একই সময়ে বর্গা নেওয়া জমির হিস্যা মোট চাষকৃত জমির ২৩ শতাংশ থেকে প্রায় ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।' তাঁরা আরও জানাচ্ছেন, 'বিগত বছরগুলোতে মাঝারি ও বড় চাষীরা যেন কৃষিকাজ একরকম ছেড়েই দিযেছে।...অধিকতর মুনাফামুখী অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ড গ্রামের মাঝারি ও বড় চাষীদের ক্রমাগতভাবে আকৃষ্ট করে চলেছে।'

গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাতে কাজের ক্ষেত্রগুলোও এখন সম্প্রসারিত হয়েছে। এনজিও কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রামাঞ্চলে অকৃষিখাতে ব্যক্তিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। এই ঋণের বৃদ্ধির সাথে গ্রামে ছোট দোকান, রিকশা, ভ্যান, বিক্রির জন্য হস্তশিল্প, বিক্রির জন্য হাঁস মুরগি চিড়ামুড়ি ইত্যাদির বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এছাড়া এই ঋণ অনেক খুদে মহাজনও তৈরি করেছে। এখনও বেশিরভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি। এখন শতকরা প্রায় ৩০টি গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। বিদ্যুৎ নিজেই অনেক কাজের চাহিদা তৈরি করে আবার অনেক কাজের চাহিদা কমিয়ে দেয়। বিদ্যুতায়িত গ্রামে যান্ত্রিক সেচ অনেকখানি বিদ্যুৎ-নির্ভর এবং সেহেতু কম ব্যয়বহুল। এসব গ্রামে টিভি ভিসিডি ক্যাসেট প্লেয়ার এর চাহিদা বাড়ে, এর দোকান মেকানিক কিংবা শো-নির্ভর পেশা ও তৎপরতা বাড়ে। এগুলোর বিজ্ঞাপন আবার অনেক আমদানিকৃত সহ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা তৈরি

করে যেগুলো নিয়ে ব্যবসা তৈরি হয়। গ্রাম পর্যায়ে এখন কম দোকান পাওয়া যাবে যেখানে পেপসি কোক চিপস ইত্যাদি নেই। প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেলেও বিজ্ঞাপন দেখে দেখে শখ করে একবার দুবার এসব জিনিস খাবার ঘটনা অনেক।

গ্রাম ও শহরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ এখন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। গ্রাম থেকেও বহু কিছু বাইরে যায়, জেলা শহর, রাজধানী এমনকি বিদেশেও। আবার বিদেশ বা ঢাকা শহর থেকে নিয়মিত বিভিন্ন পণ্য গ্রাম পর্যন্ত যাচ্ছে। এর ফলে পরিবহনসহ এই ব্যবসাতেও এখন অনেক বিনিয়োগ হচ্ছে। গ্রামে বাজারের টানে উৎপাদন বা কর্মতৎপরতা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। খাদ্যশস্য, সবজি, ফল, দুধ, ডিম, হস্তশিল্প, চিড়ামুড়ি, মাছ ইত্যাদি এখন প্রধানত বাজারকে লক্ষ্য করেই উৎপাদন হয়। আত্মপোষণমূলক খামারের সংখ্যা এখন দ্রুত হ্রাসমান। বাজারের চাহিদা বিবেচনা করেই এখন জমি, পুকুর, খালি জায়গা নতুন নতুন পরিকল্পনার মধ্যে আসছে। খাসজমি দখল, নদীনালা খালবিল বন্দোবস্ত নেওয়া ইত্যাদির প্রত্যক্ষ লক্ষ্য এখন মুনাফাকেন্দ্রিক কোনো তৎপরতা শুরু করা।

বাজার যেহেতু লক্ষ্য সেহেতু কিভাবে বেশি উৎপাদন করা যাবে, কিভাবে এর চেহারা ক্রেতাদের মুগ্ধ করবে সেই বিবেচনা বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। এই বেশি উৎপাদন বা আকর্ষণীয় চেহারা প্রদানের কাজেও নিয়োগ ও বিনিয়োগ ঘটে। অধিক উৎপাদনের জন্য, তাড়াতাড়ি পাকবার জন্য, অধিক ওজনের জন্য সার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, টকটকে দেখানোর জন্য রং দেওয়া ইত্যাদি তৎপরতা এখন অনেক বেড়েছে। রঙের কারখানা, সার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবসা ইত্যাদিও বেড়েছে। এগুলোর ক্ষতিকর মাত্রা ভয়াবহ এরকম তথ্য জানবার পর শহুরে সচ্ছল ব্যক্তিরা ছোট অনাকর্ষণীয় সবজি, ফল, অরগ্যানিক চাল ইত্যাদি সন্ধান করছেন। এগুলোর দাম বেশি। এই অরগ্যানিক আবাদ অর্থাৎ সার কীটনাশক কৃত্রিম রং বিহীন উৎপাদন ক্ষেত্রেও এখন আস্তে আস্তে বিনিয়োগ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবর্তনা, মীনাবাজার, প্রশিকা এক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করছে।

বাংলাদেশে ভূমি দখলের নতুন মাত্রা

বাংলাদেশে সরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমি (১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী ৮২ হাজার হেক্টর)- নগরায়ণ, অকৃষি বাণিজ্যিক তৎপরতায় চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন ২৭৩ হেক্টর বা প্রায় ৬৮০ বিঘা জমি কৃষিখাত থেকে বাইরে যাচ্ছে । এর ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের চাহিদার খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ নষ্ট হচ্ছে।

গত দশক থেকে বাংলাদেশে ভূমিদখল এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সিলিং উদ্বৃত্ত জমি, সরকারি জমি, দুর্বল কৃষকদের জমি দখল করা কোনো নতুন বিষয় নয়। কিন্তু আগে, বলা যায়, সত্তরের দশক পর্যন্ত এর প্রধান কারণ ছিল কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ ক্ষমতা অটুট রাখা আর আশির দশক থেকে প্রধান কারণ হল অকৃষি বাণিজ্যিক তৎপরতা। এএলআরডি ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন

মাস পর্যন্ত কয়েকটি সংবাদপত্রের রিপোর্ট সংকলন করেছে। এর মধ্যে থেকে কিছু সংবাদ লক্ষ্য করলেও বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

একটি সমীক্ষার সূত্র ধরে এক সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, হিসাব অনুযায়ী, দেশে ২ কোটি ১০ লাখ বিঘা সরকারি সম্পত্তি আছে। এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ বিঘা খাসজমি, ৬০ লাখ বিঘা অর্পিত সম্পত্তি এবং ৩০ লাখ বিঘা পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এর শতকরা ৯০ ভাগই ভূমিদস্যুদের দখলে। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও গাজীপুর অঞ্চলে বনবিভাগের মোট ভূমি ৬৪ হাজার ৭৫০ একর। এর মধ্যে এখনও বেদখলে আছে ১০ হাজার ৩৬৬ একর। (দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ২০০৬)

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা শহর ও আশেপাশে মোট ৭৬১২ একর অর্পিত সম্পত্তি সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১৭৯ একর অর্পিত সম্পত্তি ভূমিদস্যুদের দখলে রয়েছে। অর্পিত সম্পত্তির ৬০০ বাড়ির মধ্যে ৪৪৯ জন অবৈধ দখলদারকে সনাক্ত করা হয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০০৬)

সারাদেশে বন বিভাগের, তাদেরই দেওয়া তথ্য মতে, মোট ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫৭ দশমিক ৪৭ একর বা ৫ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭২ দশমিক ৪১ বিঘা জমি অবৈধ দখলে রয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলায় ১ লাখ ৭৫ হাজার বিঘা, ময়মনসিংহ জেলায় ১ লাখ ৮ হাজার, কক্সবাজারে ৬৩ হাজার বিঘা জমি অবৈধ দখলে। ঢাকার নিকটবর্তী জেলাগুলোতে দখলের পরিমাণ বেশি হওয়া সম্পর্কে বনবিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে অনেক ব্যবসায়ী স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহায়তায় বন বিভাগের ভূমি দখল করে শিল্প স্থাপন করেছেন। (যুগান্তর, ৩০ মার্চ ২০০৬)

বাংলাদেশ সরকারের ভূমিসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত কার্যক্রমের জাতীয় নির্বাহী কমিটির দশম সভায় জানানো হয়েছে যে, এখনও ৯০ হাজার একর সরকারি জমি বেদখলে রয়েছে। প্রভাবশালী মহল জমি দখল করে কোর্টের আশ্রয় নিচ্ছে। এতে বেদখলি সরকারি জমি উদ্ধার করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। বেদখল হওয়া জমির মধ্যে রেলওয়ে ছাড়াও খাস কৃষি ও অকৃষি জমি রয়েছে। (যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০০৬)

পারটেক্স গ্রুপের আড়াই হাজার একর জমি জবর দখল চেষ্টার অভিযোগে ফুঁসে উঠেছে গোটা ভালুকা। হবিরবাড়ি, মেহেরাবাড়ি, পাড়াগাঁও, মনোহরপুর, বড়চালা, গৌরীপুর, আওলাতলী ও নিবশাম এই নয় গ্রামের ক্ষুব্ধ মানুষ আন্দোলনে নেমেছে। এলাকায় প্রায় তিন হাজার পরিবার উচ্ছেদ ও সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে ভুগছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহর ও আশেপাশের এলাকায় ৩০ হাজার বিঘা জমি বেদখল রয়েছে। অধিকাংশ জমির দখলদার ৫৬টি কোম্পানি। এদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যেতে

পারে । সংসদীয় কমিটির ওই প্রস্তাব আর আলোর মুখ দেখেনি, সেখানেই থমকে গেছে। (জনকণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০০৬)

জোট সরকারের প্রভাবশালী নেতা কর্মীরা সারাদেশে প্রায় ২৫ হাজার একর সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী বিগত সরকার আমলেও সারাদেশে প্রায় ৮ হাজার একর খাস জমি দখল করা হয়েছিল। অবৈধ দলিলের জোরে দখলদাররা সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেওয়ানি আদালতে প্রায় ৫০০ মামলাও দায়ের করেছে। (আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০৬)

আবুল বারকাত ও প্রশান্ত কে রায় বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে এক গবেষণায় জানাচ্ছেন, বছরে ১৪ লাখ মুলতবি মামলাসহ ২৮ লাখ চলমান ভূমি মামলায় আদালতসমূহ ভারগ্রস্ত। মোট মামলার ৭৭% প্রায় ১২ কোটি মানুষ ভূমি মামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। মামলাধীন জমির মোট পরিমাণ ২৩.৫ লাখ একর । মামলাধীন পরিবারগুলোর সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ বছরে ১১,৫১৯ কোটি টাকা, মামলা সংশ্লিষ্ট আকস্মিক খরচের বার্ষিক পরিমাণ ২৪,৮৬০ কোটি টাকা যার ৫০ শতাংশই ঘুষ।

পশ্চিমবঙ্গের গতিমুখ

৬০ দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী হিশেবে কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই দ্বিধাবিভক্তি অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনকেও দুর্বল করে। এক পর্যায়ে এখানে পিকিংপন্থীদের বড় অংশ যখন সকল শ্রেণী ও গণসংগঠন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় তখন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হলেও বিপ্লবী আন্দোলনের যে বিকাশমান গতি ছিল তা অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তা এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে এ-রকম দ্বিধাবিভক্তিতে সিপিআই ভেঙে সিপিএম হয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরিপন্থী রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকবার ফলে এবং নিজেদের শ্রেণী ও গণসংগঠনভিত্তিক কাজ অব্যাহত রাখায় সিপিএম আলাদা একটি বিকাশমান ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়। কংগ্রেসের শাসন মোকাবিলা করতে গিয়ে বামদলগুলোর নিজেদের মধ্যে সমঝোতাও তৈরি হয়। বামফ্রন্ট সরকারে সিপিএম প্রাধান্যে থাকলেও সেখানে সিপিআইসহ অন্যান্য দলগুলির অংশগ্রহণও আমরা দেখি। নিজেদের মধ্যে কিছু টানাপড়েন থাকলেও তাদের এই ঐক্য কংগ্রেসের বিপরীতে গ্রাম ও শহরে তাদের অব্যাহত কাজ ও জনভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

আগেই বলেছি, ১৯৬৭ সালে সিপিএম ভেঙে, সিপিএমকে সংশোধনবাদী আখ্যায়িত করে, চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় সিপিআইএম এল। এই দল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি বিপ্লবের কর্মসূচি দেয়। 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' নামে পরিচিত এই আন্দোলনের সময়

ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ভয়ংকর নিপীড়ন ও নির্যাতনের মুখে এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ১৯৭১-৭২-৭৩ সময়কালে তাদের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন এখনও জনমনে এক ভয়ংকর স্মৃতি। অভিযোগ আছে, সে সময় কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিকে বর্ম হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে এবং অনেক অসহায় শরণার্থীকেও নিজেদের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন কর্মসূচিতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন ১৯৭৪ এর মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ে। চারু মজুমদার নিহত হবার পর পার্টি ক্রমে বহুধাবিভক্ত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে গ্রাম এমনকি শহরাঞ্চলেও কৃষি বিপ্লবের পক্ষে জনমত শক্তিশালী হয়। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট নির্বাচন ও আন্দোলনে কর্মসূচি, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণেও এর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে হলে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নয়। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশবিশেষ। সুতরাং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকলেও তার রাজনীতি, দর্শন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ সবকিছু এই রাষ্টীয় কাঠামোর অধিপতি দর্শনের সঙ্গে আপোস করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভারতের অর্থনীতিরই অংশ, ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার অধীনস্থ। ভারতের বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মূলধন সংবর্ধন ও কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কোনো বহিঃস্থ স্থান নয়।

বছর দশক আগে ভারতের এক পত্রিকায় এক বৃহৎ শিল্প-ব্যবসা গোষ্ঠীর প্রধানের সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে তো কমিউনিস্ট শাসন। এরকম শাসনের অধীনে আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন কী করে? মালিক উত্তর দিয়েছিলেন, 'কই আমরা তো টের পাই না।'

উন্নয়ন নীতি ও দর্শনে তাই ভারতের মূলধারা থেকে মৌলিক ভিন্ন ধারা পশ্চিমবঙ্গে টিকে থাকবে বা বিকশিত হতে পারবে এটা আশা করাই অসঙ্গত। তবে যে সামাজিক ভিত্তি বামফ্রন্টকে এত দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় রেখেছে, তা তৈরি হয়েছে ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়েই। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির যে সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, সেটাই সিপিএম আরও প্রসারিত করতে সক্ষম হয় ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার নিয়ে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মেহবুব জাহেদীর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সহযোগিতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আমরা বসেছিলাম। ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন পর্ব, প্রতিবন্ধকতা, ধরন ও ফলাফল বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা শুনেছিলাম তাঁদের অভিজ্ঞতা, যাঁরা হয় রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে নেতা হিসেবে অথবা প্রশাসনের ব্যক্তি হিসেবে ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন পর্বে কাজ করেছেন।

মেহবুব জাহেদী স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, ভূমি সংস্কার কার্যক্রম ১৯৬৭ থেকে শুরু হলেও তা সেভাবে কার্যকর হয়নি। বড় মালিকরা বেনামিতে সিলিং-

অতিরিক্ত জমি রেখে দিচ্ছিল, খাস জমি বণ্টনের বিষয়টিও কোনোভাবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। কারণ গ্রামীণ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল খুবই শক্তিশালী। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটিও কাজ করছিল না কারণ তার কাঠামোটাই এমন ছিল যে, তা ছিল প্রধানত বৃহৎ ভূমি মালিকদেরই প্রভাবিত।

জাহেদী বললেন, অবস্থার পরিবর্তন হল তখনই যখন গ্রামীণ মজুর, বর্গাদার ও গরিব কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের রাজনৈতিক শক্তির ভিত দাঁড় করানো গেল। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যখন তারা পঞ্চায়েতে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারলো, সিলিং-অতিরিক্ত ভূমি মালিকানা চিহ্নিত করতে পারলো এবং ক্ষেত্রবিশেষে বলপূর্বক খাসজমি দখলে উদ্যোগ গ্রহণ করলো, কেবল তখনই ভূমি সংস্কারের সিলিং আইন, বর্গাদারদের স্বত্ব প্রদান, বেগার শ্রম রহিত ইত্যাদি কার্যকর করা সম্ভব হলো।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্থার কার্যকর করার পেছনে তাই গ্রামীণ মজুর বর্গাদার ক্ষুদ্র কৃষকদের রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা ছিল মুখ্য। তার ক্ষয় কিংবা আপেক্ষিক দুর্বলতা প্রাপ্তি ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের দ্বন্দ্ব-বিরোধ সত্ত্বেও খাপ খাইয়ে চলার অনিবার্য রাজনৈতিক পরিণতি। তা সত্ত্বেও ১৯৭৭ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে ভূমি সংস্কার যতটুকু কার্যকর করা হয়েছিল তার ফলে তা দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যা হ্রাস, গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে স্থিতাবস্থা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭৭ সালে সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানে দারিদ্যসীমার নীচে জনসংখ্যার হার ছিল ৩৮.৬১, পশ্চিমবঙ্গে সে সময় ছিল ৫৬.৯০। ২০০০ সালে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮.৭৮ এবং ২২.৪৫।

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও তা যে কার্যকর হলো না, পশ্চিমবঙ্গে যে অনেক দূর হলো তার ব্যাখ্যা তাই এই রাজনৈতিক শর্তের অস্তিত্ব থাকা না থাকা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাবে। দেশের ভেতর প্রায় আদিম সংবর্ধনের কায়দায় বাংলাদেশে যেভাবে ভূমি দখল চলছে, পশ্চিমবঙ্গে তা দেখা যায় না, সেটাও রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান ও ভূমি সংস্কারের তুলনামূলকভাবে অনেক দূর সাফল্যের ফল।

আবার পশ্চিমবঙ্গে এই ভূমি সংস্কার যে এক পর্যায়ে নিয়ে আর অগ্রসর হবার পথ পেলো না সেটাও এই কেন্দ্রীয় শর্ত রাজনৈতিক শক্তির অক্ষমতা, দুর্বলতা আর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে।

কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা সত্ত্বেও বিশ্ব পুঁজির বর্তমান প্রবণতায় বাংলাদেশ ও ভারত দুটোই একইভাবে আক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন যাত্রার পর্ব সমাপ্তির দিকে, এই কাঠামোতে তার আর কিছু দেবার নেই। বরং আমরা এখন একের পর এক দেখবো পুঁজির আগ্রাসন প্রকল্প আর জনগণের লড়াই যা পুরনো নেতৃত্ব ধারণ করতে পারবে না। বাংলাদেশের ফুলবাড়ি আর পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর এরই সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত।

২০০৫ সালের ৪ঠা আগস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবার জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য সিলিং প্রত্যাহার করে ভূমি সংস্কার বিধি সংশোধন করে। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবছর ৫০ হাজার একর কৃষি জমি অকৃষিখাতে চলে যাচ্ছে। ক্রমে অধিপতি 'উন্নয়ন-দর্শন' দখল করছে সিপিএমকেও। গ্রামীণ সমাজে যে স্থিতাবস্থা এনেছিল ভূমি সংস্কার তার ভেতরে ক্ষয় হচ্ছে। তার প্রভাব গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার বিন্যাসেও হচ্ছে। ধনী কৃষকেরা বা পার্টির আমলাতন্ত্র হয়ে উঠছে পঞ্চায়েতের মূল পরিচালিকা শক্তি। দয়াবতী রায় পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, গ্রামের ভূমিহীন বা দরিদ্র কৃষক বা নিম্নবর্গের মানুষেরা কিভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন পার্টি থেকে। এর ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনও হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্টিতন্ত্র ও বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৯৭৮ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয় ৩৩৮ আসনে (শতকরা ০.৭৩ ভাগ), ২০০৩ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮০০ বা শতকরা ১১ ভাগ। এর সবগুলোই সিপিএম-এর প্রার্থী। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার দীর্ঘদিনের সঙ্গী ডি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'কেউ কেউ এটাকে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু তা ঠিক নয় কারণ সিলিং-উদ্বৃত্ত জমির চিহ্নিত ও বিতরণ এবং অপারেশন বর্গার মূল কাজ ১৯৮২ তেই শেষ হয়েছে।' ২০০৮ সালে ২০শে মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৬০০০ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। নির্বাচনে ৩৭ জন নিহত হয়েছেন। এরা সবাই কোনো না কোনো বাম দলের কর্মী। আর যখন সিপিএম পুঁজির পক্ষে অবস্থান নিয়ে এ ধরনের ভূমিকা বা নন্দীগ্রামের মতো ঘটনার জন্ম দিচ্ছে তখন পুঁজির পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি একে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারণায় ব্যবহার করছে।

লড়াইয়ের নতুন পর্ব

বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক দুর্বল দেশগুলোর খনিজ সম্পদ দখল ও লুণ্ঠন এবং তা নিশ্চিত করতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর গণহত্যা, দেশ দখল, দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসক তৈরির প্রক্রিয়ায় বহু দেশ বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য, সহিংসতা আর অনুন্নয়নের বিষচক্রে আটকে আছে। এসব অঞ্চলে কৃষিজমি বিনাশ করে অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করে খনিজ সম্পদমুখী বিদেশি বিনিয়োগ এই বিষচক্র তৈরি করেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের ফুলবাড়ি অঞ্চলের মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে ভূমি পানি ও মানুষ বিনাশী এবং জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংসের প্রকল্প ঠেকিয়েছেন, যে ঘটনা তাই শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় সারা দুনিয়ার দখলকৃত মানুষদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

জীবন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যে প্রকল্প ঠেকিয়েছেন তাকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী বিবেচনা করে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে। এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের শিকার হয়ে বাংলাদেশের তেল গ্যাস সম্পদ এখন বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দখলে, পাটশিল্প ধ্বংসের মুখে, নদীনালা আক্রান্ত, শিক্ষা চিকিৎসা বাণিজ্যের উপকরণ, খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির

সম্মুখীন। এই উন্নয়ন দর্শন মানুষকে বিচার করে মুনাফার দাস হিসেবে। পুঁজি এখানে ঈশ্বর। পুঁজির জন্য সবকিছুই জায়েজ। এই দর্শন কিভাবে মতাদর্শিক দখল বিস্তার করছে তা বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের উন্নয়ন উন্মাদনা দেখলে। এই উন্নয়ন উন্মাদনায় এই সরকার কতটা হিংস্র হতে পারে তার উদাহরণ নন্দীগ্রাম।

ফুলবাড়ি কয়লা প্রকল্পের মতো ভয়াবহ না হলেও জনউচ্ছেদ এবং কৃষি বিনাশের প্রকল্প ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই নন্দীগ্রামেও নেওয়া হয়েছিল। কৃষিজমি দখল করে যা হবে সেটা কৃষি, কর্মসংস্থান, পরিবেশ এবং মানুষের বর্তমান জীবন-জীবিকার তুলনায় গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিবেচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে পুঁজিকে ঈশ্বর বিবেচনার ফলে। কিন্তু মানুষ এখানেও প্রতিরোধ তৈরি করেছে যার মধ্য দিয়ে সেই গণরায়ই প্রকাশিত হয়েছে যে, জনগণের শক্তি যদি প্রকাশিত হয় পুঁজির ঈশ্বর ক্ষমতা সেখানে দাঁড়াতে পারে না।

বর্তমান বাংলাদেশের এমনকি ভারতের অর্থনীতির গতিমুখ আশির ও নব্বইয়ের দশকের আর্জেন্টিনা বা নাইজেরিয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এইসব দেশও সেই যাত্রা থেকে অন্য মোড় নেবার চেষ্টা করছে, তবে তা অনেক মূল্য দেবার পর, জনগণের শক্তির বলে। এখন বিশ্বব্যাপী এই প্রশ্ন জোরদার হচ্ছে যে, প্রান্তস্থ দেশগুলোর মানুষের জীবন ও সম্পদ কি তাদের নিজেদের কর্তৃত্বে থাকবে না উন্নয়নের মুখোশে আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজি বা তাদের সহযোগী দেশি বৃহৎ পুঁজির দখলে যাবে? এসব দেশের মানুষের সম্পদ কি তাদের জীবনকে বিকশিত করবার কাজে লাগবে না কতিপয় লুটেরার ভোগদখলে যাবে? উন্নয়ন নীতি কি মানুষকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হবে না দেশি বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠী দ্বারা চালিত হবে? বাংলাদেশ বা ভারত এখন যে উন্নয়ন দর্শন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তার ভয়ংকর চেহারা ও পরিণতি ল্যাটিন আমেরিকা দেখিয়েছে অনেক আগেই। আর এখন তারা আমাদের দেখাচ্ছে নতুন স্বাধীনতার পথ। আর বাংলাদেশ ও ভারতে বিভিন্নভাবে উঠে আসা জনগণের লড়াইয়ের শক্তি তৈরি করছে নতুন সম্ভাবনা।

এখানে এই কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত পরাশক্তি, ভারতকেন্দ্রিক মার্কিন আঞ্চলিক সামরিক ও অর্থনৈতিক কৌশল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্য দেশগুলো যে আক্রান্ত তাই শুধু নয়, আক্রান্ত ভারতের জনগণও। এই অঞ্চলে তাই কার্যকর পরিবর্তন আনতে গেলে চিন্তা ও সক্রিয়তায় দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ যাত্রার কোনো বিকল্প নেই। অনেক ছোটবড় উদ্যোগে তার সম্ভাবনা ক্রমে মূর্ত হয়ে উঠছে।

জুন-জুলাই ২০০৮

তথ্যপঞ্জি

A Sattar, M. *Agricultural Planning and Achievement in Bangladesh.* Dhaka-Delhi, 2001.

Alamgir, Muhiuddin Khan, ed. *Land Reform in Bangladesh.* Dhaka: CSS, 1981.

Atiur Rahman. *Peasants and Classes: A Study in Differentiation in Bangladesh.* Dhaka: UPL, 1986.

Bandyopadhyay, D. *Land, Labour and Governance.* Kolkata, 2007.

Bhatia, Bela. "The Naxalite Movement in Central Bihar." *EPW,* April 9, 2005.

Guruswamy, Mohan, Kamal Sharma and Jeevan Prakash Mohanty. "Economic Growth and Development in West Bengal." *EPW,* May 21, 2005

Lenin, V. I. *Development of Capitalism in Russia.*

Lenin, V. I. *The Agrarian Question and the Critics of Marx. CW,* Vol 5, Progress.

Roy, Dayabati. "Whither the Subaltern Domain? An Ethnographic Enquiry." *EPW*, June 7, 2008.

Siddiqui, Kamal, Imam Hossain, Zahirul Islam, Najmul Islam Chowdhury, Abdul Momen. *Land Reforms and Land Management in Bangladesh and West Bengal.* Dhaka: UPL, 1988.

Siddiqui, Kamal. *Political Economy of Land Reform.* Dhaka, 1982.

আনু মুহাম্মদ। *কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ*। ঢাকা: সংহতি, ২০০৮।

—*বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*। ঢাকা: শ্রাবণ, ২০০৬।

—*বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*। ২য় সংস্করণ। ঢাকা: মীরা, ২০০৫।

আবদুল বায়েস, মাহবুব হোসেন। *গ্রামের মানুষ গ্রামের অর্থনীতি*। ঢাকা: স্বরাজ, ২০০৭।

আবুল বারকাত, প্রশান্ত কে রায়। *বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা, ২০০৬।

আবুল বারকাত, শফিক-উজ-জামান ও সেলিম রায়হান। *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা, ২০০৬।

আসহাবুর রহমান, সম্পা.। *বাংলাদেশে কৃষিপ্রশ্ন তত্ত্ব ও বাস্তবতা*। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৭।

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্মস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)। *ভূমিদস্যুদের ভূমিগ্রাস*। ঢাকা, ২০০৬।

হোসেন, মাহবুব, রুশিদান ইসলাম রহমান। *বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন*। ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৩।

http://globetrotter.berkeley.edu/macarthur/inequality/papers/MookhBengal.pdf .

http://www.cpiml.org/liberation/year_2005/september/commentary6.htm.

অমলেন্দু দে

বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব : দেশবন্ধু, নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু

২০০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 'সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিক্ষক ফোরাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর পক্ষ থেকে হাসান আজিজুল হকের একটি চিঠি পেলাম। তাঁরা অগ্রগণ্য মনীষী অধ্যাপক সনৎকুমার সাহার প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে হাসান আজিজুল হক 'বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব : দেশবন্ধু, সুভাষ ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে একটি নিবন্ধ আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। ভয়ানক এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষক ফোরাম', তাঁদের এক সহকর্মী অধ্যাপক সাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে আয়োজন করেছেন তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার আগ্রহ থাকায় হাসান আজিজুল হকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অধ্যাপক সাহার সঙ্গে পরিচিত হবার আমার সুযোগ ঘটে। বিনম্র স্বভাবের এই পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করে গভীর আনন্দ লাভ করেছিলাম। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের জন্য যাঁরা আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে চলার নৈতিক সাহস অটুট রেখেছেন এবং নির্যাতনও ভোগ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে অধ্যাপক সাহার নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই নিবন্ধের মাধ্যমে সংকলন গ্রন্থের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ পেলাম। আমার পড়ন্ত বেলায় এক পরম প্রাপ্তি বলেই মনে করছি।

এই নিবন্ধের শিরোনাম খানিকটা পরিবর্তন করে নিচ্ছি এই কারণে যে, সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশবাসী 'নেতাজী' নামে সম্মান প্রদর্শন করতে বিশেষ আগ্রহী। চিত্তরঞ্জন দাস এবং শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে 'দেশবন্ধু' ও 'বঙ্গবন্ধু'। এই তিনজন বিশিষ্ট বাঙালি রাজনীতিবিদকে একটি নিবন্ধে মূল্যায়ন করার যে দক্ষতার প্রয়োজন তার অভাব সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই সচেতন। খুব অল্প বয়সে মাদারীপুর শহরে সুভাষচন্দ্রকে দেখেছিলাম। তাঁর আকর্ষণীয় চেহারাটি এখনও স্মৃতিপটে রয়েছে। ছাত্রজীবনে কলকাতায় মুসলিম লিগের ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তখন আমি ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় কর্মী। ফরিদপুর জেলার কমিউনিস্ট নেতাদের সান্নিধ্যে আমার মনন গড়ে ওঠে। স্বভাবতই মুসলিম লিগের রাজনীতি আমার মনকে আদৌ স্পর্শ করেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর ক্রমশ শেখ মুজিবুর

ৃ১৩মানের রূপান্তর লক্ষ্য করে তাঁর দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাতে শুরু করি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সময়ে ঢাকার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটানা কয়েক ঘণ্টা আমার ও নাসিমার তাঁকে কাছে থেকে দেখার ও তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে কথা বলার বিরল সৌভাগ্য হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুন রমনার ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে তাঁর ভাষণ শোনারও আমাদের সুযোগ ঘটে। তাঁর নির্দেশে এক সংরক্ষিত জায়গায় আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধুর তেজদৃপ্ত বলিষ্ঠ ভাষণ মুগ্ধচিত্তে শুনেছিলাম। এক নতুন দেশ গড়নে নিবেদিত এই মানুষটি যেদিন সপরিবারে নিহত হলেন সেদিন গভীর বেদনায় আমরা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম।

দেশবন্ধু, নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষিত আলাদা হলেও তাঁদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিলের জায়গা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এক আধুনিক দেশ গঠন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনকে দুটো অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে তিনি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ছিলেন কংগ্রেস মঞ্চে ভারতের সর্বভারতীয় নেতা। তা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক বন্ধন ছিল। যার পরিচয় বিভিন্ন ঘটনায় পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে বরণ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় গঠিত গুপ্ত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রমথ নাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ ও সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন যুক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ ছিলেন অনুশীলন সমিতির সহ-সভাপতি। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন প্রমথ নাথ মিত্র, আর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।[১] আলিপুর বোমার মামলায় (১৯০৮) চিত্তরঞ্জন শ্রী অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়ান। এই মামলা চলাকালীন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে বলতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন বিচারপতি বিচক্রফট এবং দুজন এসেসরের কাছে আবেদন করে শ্রী অরবিন্দ সম্বন্ধে বলেন : "My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of the court, but before the bar of the

[১] Amalendu De, *Raja Subodh Chandra Mallik and His Times* (Kolkata, 1996), p. 49.

High court of History."[২] চিত্তরঞ্জনের জোরালো সওয়ালের ফলেই শ্রী অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি লাভ করেন।[৩]

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে গেলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দায়িত্ব পালন করার পর শ্রী অরবিন্দ এক নতুন মানব সমাজ গঠনের উদ্দেশে? পণ্ডিচেরীতে সাধনায় মগ্ন হন। এই সময়কালে দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিক রচনা চিন্তার জগতে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে।[৪] তখনও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের আত্মিক বন্ধনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের ভাবনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেন। চিত্তরঞ্জন রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও করতেন। বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ'-এর প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। 'মালঞ্চ', 'সাগরসঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন চিত্তরঞ্জন ইংরেজিতে একটি নাটকের দুটি অঙ্ক লিখেছিলেন। তাঁর রচিত 'ডালিম' গল্পের নাট্যরূপ মিনার্ভায় পরিবেশন করা হয়। জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করতে শিশির ভাদুড়িকে সাহায্য করতেও তিনি উদ্যোগী হন। চিত্তরঞ্জন অনুরোধ করায় শ্রী অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন রচিত 'সাগর-সঙ্গীত' ইংরেজিতে *Songs of the Sea* শিরোনামে অনুবাদ করেন (১৯২৩)।[৫]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন চিত্তরঞ্জন দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক প্রচারের সময়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্বরাজ্য পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। চিত্তরঞ্জন শ্রী অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকাকালীন তাঁর পক্ষে যোগসাধনা করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া চিত্তরঞ্জনের শরীর তখন ভেঙে পড়েছে। শ্রী অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের উপদেশ দেন। তাঁদের আলোচনায় ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পায়। আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলেন, এই বিপজ্জনক সমস্যা সমাধনের আগে ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাক, তা তিনি চান না।[৬] উল্লেখ্য এই, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শ্রী অরবিন্দ *Karmayogin* পত্রিকায় লেখেন: "Hindu-Muhammadan unity cannot be effected by political adjustment or Congress flatteries. It must be sought deeper down, in the heart and in the mind, for where the causes

---

[২] *Court Proceedings,* C. R. Das's Speech, Alipore Bomb Case. C. R. Das (1870–1925) was Sri Aurobinda's defuse Attorney in the Alipore Bomb Trial.

[৩] Ibid., Sri Aurobinda was arrested on 2 May 1908 and released on 6 May 1909.

[৪] Ibid.

[৫] K. R. Srinivasa Iyenger, *Sri Aurobindo : A Biography and a History* (Pondichery, 1985), pp. 66, 75–76, 394.

[৬] Ibid., p. 513.

of disunion are, there the remedies must be sought. We shall do well ... to remember ... that love compels love and that strength conciliates the strong ... we must extend the unfaltering love of the patriot to our Mussalman brother, remembering always that in him to Narayan dwells and to him too our Mother has given a permanent place in her bosom; but we must cease to approach him falsely or flatter out of a selfish weakness and cowardice."[৭]

চিত্তরঞ্জন শ্রী অরবিন্দের ভাবনার সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সময় থেকেই শ্রী অরবিন্দ এই সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় অব্যহতি পাবার পর শ্রীঅরবিন্দ বাংলার 'ধর্ম্ম' ও ইংরেজিতে 'কর্মযোগিন' নামে যে দুটি কাগজ সম্পাদনা করেন তাতে এই সমস্যার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেন।[৮] এই প্রেক্ষাপট মনে রাখলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বহু সহস্র টাকার আয়ের ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। নিজের ও পরিবারবর্গের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসীসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাপন শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর পরে দেশবন্ধু সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহমাদাবাদ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সভাপতির ভাষণও রচনা করেন। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার আগেই তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁকে সেই অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে চিত্তরঞ্জন রচিত ভাষণটি প্রকাশিত হয়।[৯] মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি স্পষ্ট করেই ব্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই এই আন্দোলনের সুরের সঙ্গে নিজের সুর মেলাতে পারেনি। তিনি বলেন, "অসহযোগ নীতি সত্যকে অনর্থক আঘাত করিতেছে।"[১০] স্বদেশির নামে বস্ত্র পোড়ানো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল বর্জন কর্মসূচির বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ। 'সংগ্রাম পদ্ধতি' নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।[১১] চিত্তরঞ্জন তাঁর সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও

---

[৭] *Karmayogin*, May 1909.

[৮] Ibid.; *Dharma*. These two papers were edited by Sri Aurobindo.

[৯] Speeches of C. R. Das. at the annual congress session in December 1921. vide. *Amritabazar Patrika*, December 1921.

[১০] অমলেন্দু দে, *মহাত্মা ও গুরুদেব* (কলকাতা, ২০০৪), পৃ. ২৪–২৭।

[১১] তদেব।

চিত্তরঞ্জন দুজনেই শ্রী অরবিন্দের অনুরাগী। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উষ্ণতার অভাব লক্ষ করা যায়।[১২]

ইতিমধ্যে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। চিত্তরঞ্জন সভাপতির ভাষণে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইনসভায় প্রবেশ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ভোট গ্রহণ করা হলে দেশবন্ধু সমর্থকরা পরাজিত হন। তাঁর প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব মনে করে চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন, কিন্তু কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করেননি। চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ যেভাবে করেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুর উজ্জীবিত ইতালীয় বিপ্লব স্বরাজ অর্জনে পূর্ণতা পায়নি। ইতালি ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তার ইঙ্গিত চিত্তরঞ্জনের ভাষণে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, "The Italian revolution inspired by Mazzini and waked out by Garibaldi and Cavour, did not result in the attainment of Swaraj."[১৩] তাঁর ভাষণে চিত্তরঞ্জন রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তাও লক্ষণীয় : "The shape which it has now assumed is due to the attempt to force Marxian doctrines and dogmas on the unwilling genius of Russia. Violence will again fail .... The soul of Russia must struggle to free herself from the socialism of Karl Marx."[১৪] চিত্তরঞ্জনের ভাষণে ইতালির ও সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয় তাতে শ্রী অরবিন্দের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উল্লেখ্য এই, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সূচনা থেকেই ইতালিতে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফ্যাসিবাদের সমর্থকরা একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।[১৫] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করে। জার্মানিতে 'ন্যাশনাল সোসালিজম'-এর তত্ত্ববিদ ছিলেন ফিডার (Feder) এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। (প্রথমে এই দলের নাম ছিল 'জার্মান লেবর পার্টি')। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কুড়ি দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে 'জার্মান ন্যাশনাল সোসালিজম'-এর আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হিটলার এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিত রূপদান করেন।[১৬] সুতরাং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব এবং ইতালিতে

---

[১২] Speech of C. R. Das, op. cit.
[১৩] Ibid.
[১৪] Ibid.
[১৫] R. Palme Dutt. *Fascism and Social Revolution* (Kolkata, 1946).
[১৬] Ibid.

ফ্যাসিবাদের প্রাধান্য স্থাপন ইউরোপে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস নেতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে শ্রী অরবিন্দ সমাজউন্নয়নের মনস্তত্ত্ব, মানব ঐক্যের আদর্শ, যুদ্ধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে যেসব ভাবনা ব্যক্ত করে নিবন্ধ লেখেন তাতে ইতালি, সোভিয়েত রাশিয়ার ও জার্মানির ঘটনাবলি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। শ্রী অরবিন্দ স্পষ্ট করেই বলেন *Communist Manifesto* পুস্তিকায় ১৮৪৮ ক্রিস্টাব্দে মার্কস ও এঙ্গেলস যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাকে নতুন সমাজ গঠনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় কার্যকর করা হয়নি। স্বভাবতই এই ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙে পড়বে।[১৭]

সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা বললেও সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কমিউনিস্টদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তিনি মনে করতেন মার্কস-এর অনেক আগে গৌতম বুদ্ধ সাম্যবাদ প্রচার করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জনের দ্বারা প্রভাবিত হন। সুভাষচন্দ্রের ওপরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। সুভাষচন্দ্রের প্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের একটি সঙ্গীত—"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়"। সুভাষচন্দ্র মার্কস প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রেণি সংগ্রামকে গ্রহণ করলেও, মার্কস-এর সমস্ত রকম দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করেননি। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় : "Where communism is deficient is that it does not appreciate the value of national sentiment". সুভাষচন্দ্র এই কথাও বলেন, রাশিয়া প্রধানত শ্রমিক শ্রেণির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ভারতবর্ষ হল প্রধানত কৃষকের দেশ। তাই এখানে কৃষকদের সমস্যা শ্রমিকদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মার্কসবাদ খুব বেশি অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও সুভাষচন্দ্র অন্য বিষয়ের গুরুত্ব লাঘব করতে চাননি। সুভাষচন্দ্র 'Atheism and antireligious attitude of Communism' গ্রহণ করতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র এই কথাও বলেন, 'materialistic interpretation of history' ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ শুধু 'economic motive' ইতিহাসকে পরিচালনা করে না, 'psychic, ethical, aesthetic, etc' ইতিহাসের গতিধারা পরিচালনা করে।[১৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উজ্জীবিত করেন যদিও তিনি সংবিধানটির আধুনিক রূপ দান করেন। তাঁর সমস্ত বক্তৃতা ও কর্মসূচি লক্ষ করলেই তাঁর মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর গণপরিষদের সদস্যরা যে সংবিধানে স্বাক্ষর দান করেন তাতে চারটি আদর্শ সংযুক্ত করা হয়—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

---

[১৭] Amalendu De, *Relevance of Sri Aurobindo's Thought in Modern Times* (Kolkata).

[১৮] *Ideology of Netaji : Thesis of the All India Forward Block* (Kolkata, 1949). R. S. Paniker wrote the foreword. Dr. Atindra Nath Bose was in trusted to write the thesis.

এই সংবিধানের ম্যাধমে বাঙালি জাতিকে এক অগ্রসর জাতিরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা বাংলার সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভাব তাতে লক্ষ করা যায়। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি জাতীয় সঙ্গীত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ও শেরে বাংলার প্রভাবও শেখ মুজিবের ওপর ছিল। শেখ মুজিবের চিন্তাকে বাংলার প্রেক্ষাপটেই ভাবতে হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে তাঁকে চলতে হয়। তাঁর ভাবনাকে ধ্রুপদী মার্কসবাদের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবলে ভুল করা হবে। বিশেষ করে দেশবন্ধু ও নেতাজী ধ্রুপদী মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি। পাকিস্তান দাবির সমর্থকেরা আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বটি আধুনিক গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। শেখ মুজিব আধুনিক গণতন্ত্রকে অবলম্বন করেই জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে রূপ দিতে অগ্রসর হন।[১৯] কিন্তু বাংলাদেশের পরিবেশে তাকে রূপদান করা যে কষ্টকর ছিল তা তাঁর জীবনী লক্ষ করলেই বোঝা যায়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তাকে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। গোটা দেশে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এক নতুন রূপ দিতে তিনি উদ্যোগী হন। তাঁর বিরোধী শক্তি তাঁকে এগুতে দেয়নি। শেখ মুজিবের সব প্রয়াসই সাফল্যমণ্ডিত না হলেও তাকে বিনাশ করাও সম্ভব হয়নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন এক শক্তির আবির্ভাব ঘটবে যাঁরা মুজিব প্রবর্তিত পথকে প্রশস্ত করতে এগিয়ে আসবেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে যে সমন্বয়ী ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন দেশবন্ধু, নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু তাকেই পরিপুষ্ট করে নতুন প্রজন্মকে এগুতে হবে। বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্বে তারই প্রভাব লক্ষ করা যায়।

---

[১৯] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)।

শামসুজ্জামান খান

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

এক

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস, মুসলিম শাসন ও বাঙালির জাতিগঠন প্রক্রিয়ার ধারা গভীর বোধ, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং নির্মোহ যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে না পারলে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা কেন রাষ্ট্রীয় নীতির মূল বিষয় হয়েছিলো তা বোঝা যাবে না। বিস্ময়ের কথা ভারতবাসীর তথা বাঙালির ইতিহাস চর্চার মূল দুর্বলতা কোথায় তা চিহ্নিত করতে গিয়ে ধার্মিক এবং কিছু পরিমাণে সাম্প্রদায়িক (!) হিসাবে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতবর্ষীয়দের ইতিহাস ব্যাখ্যা আমাদেরকে একটি মোহমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> ভারতবাসীদিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব', অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। ... ['তাহারা'] দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎকর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণে ইতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোনো কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিকভাব ও দেবভক্তি অস্মজাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। (*বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ১১৭৬ সন, ফাল্গুন সংখ্যা)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাস মূল্যায়নে তাঁর ধর্মপ্রীতি নয়, দেব-দেবতা বন্দনা নয়, মানব বন্দনাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানব সমাজের যথাযথ বিকাশ ও মানবীয় কল্যাণ সাধনাকামী রাষ্ট্র নির্মাণে ধর্মনিরপেক্ষতা যে শুধুমাত্র প্রাথমিক শর্ত নয়, অপরিহার্য এক চালিকাশক্তি এ সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এটি ইতিহাসেরই কথা। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। তা হলো সাবেক ভারতবর্ষীয় (বর্তমান ভারত রাষ্ট্র নয়) বা বাংলার ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে দৈবনির্ভর বা ঈশ্বরনির্ভর বা ঈশ্বরাশ্রয়ী হলে নেহেরু-মওলানা আজাদ কেমন করে স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা

করলেন এবং শেখ মুজিব কোন ঐতিহাসিক প্রেরণায় ইহলৌকিক আদর্শকে কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরটি বেশ উদ্দীপক হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় দার্শনিক কোঁত (Comte)-প্রভাবিত ওপরের উদ্ধৃতিটি মহামূল্যবান এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ হলেও ওই বক্তব্যে ভারতবর্ষীয় সমাজের বর্ণাশ্রমবাদী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং কেন্দ্রীয় শাসনে ওই ধর্মবেত্তা পুরুত-যাজক চক্রের আধিপত্যে প্রচলিত দৈবনির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গিটি কিন্তু সর্বজনীন ছিল না। সমাজের নিচুতলায় ধর্ম বা দৈবনির্ভরতা নয়, মানবতন্ত্রী ভাবসাধনাই অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহমান ছিল। উঁচুতলার মানুষ ধর্মের মানবীয় উপাদানের গভীরতায় পৌঁছানোয় কোনো চেষ্টা না করে মোল্লা-পুরুতের অন্তঃসারশূন্য শাস্ত্রীয় কথামালাকে তোতা পাখির মতো অন্তরে ধারণ করে ধরতাই বুলি হিসাবে হরহামেশা উচ্চারণ করে গেছে। কিন্তু নিচুতলার মানুষ তাদের যাপিত জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে জীবন-জগৎ এবং মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। এবং এই সূত্রেই গ্রামীণ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে নানা জীবনমুখী ও ইহজাগতিক সাধনার ধারা। বৈষ্ণব, বাউল, নাথযোগী, সুফিদের গুহ্যতত্ত্ব ও মারেফতি ধর্ম-দর্শন ও ভাবসাধনায় (দেহতত্ত্ব ও কায়াসাধনাসহ) উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এই ইহলৌকিক ও মানবপন্থী ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় যে দৈব-নির্ভর, ধর্মপ্রবণ ও আধিপত্যবাদী ইতিহাস চর্চার কথা বলেছেন তার বিপরীতে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের বাস্তব বুদ্ধিজাত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতি অপ্রতিকূলতায় সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় সমন্বয়বাদী ও শাস্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ যে জীবনধারা বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবসাধনার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার মধ্যেই নিহিত আছে বাঙালির স্বকীয় বিশ্ববীক্ষা (Worldview) বা জীবনদর্শন।

দুই

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের নানা পর্বে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড, ভোটচীন, নেগ্রিটো এবং সেমেটিক, আর্য ইত্যাদি নানা নরগোষ্ঠী বাংলায় এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। এরা নানা আদিম আচার বিশ্বাস, ধর্মমত ও পথ-পন্থায় বিশ্বাসী। এদের রক্তধারা ও সাংস্কৃতিক ধরন-ধারণ-উপকরণও বহু বিচিত্র। তবু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও বোধ বিশ্বাস এবং কর্ম-নীতিতে কোনো অলঙ্ঘনীয় বিরোধ বা সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি না হয়ে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লক্ষ্যে সমন্বিত জীবনধারাই যে গড়ে উঠেছে সেটাই ইতিহাসের সত্য। এইখানে বাঙালি জাতির অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং বাস্তব জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মত-পথ-বিশ্বাসে ছাড় দিয়ে সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন এই ঐতিহাসিক ধারার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং মধ্যযুগের ইউরোপের তীব্র ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে গড়ে ওঠে। ফলে রেনেসাঁস, শিল্পবিপ্লব-রিফর্মেশন-আলোকায়নের (Enlighteenment) প্রজনন জাতি রাষ্ট্রের ধর্মই হয়ে ওঠে আমরা

যাকে বলি, ধর্মনিরপেক্ষতা বা পাশ্চাত্য অভিধায় সেক্যুলারিজম। এই সেক্যুলারিজমের সৃষ্টিতে দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক মিল, কোঁত, রুশো, ভলটেয়ারের অবদান বিরাট। আর আমাদের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক, নাথযোগী, বাউল-সুফি, কবিয়াল-বয়াতিদের ভূমিকাই প্রধান। পাশ্চাত্য সেক্যুলারিজম তাই বস্তুতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী আর আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা হৃদয়-সংবেদী। বাঙালির আত্মিক বিকাশের সঙ্গে এর ওতপ্রোত সংযোগ। বলা চলে, বাঙালি জাতিসত্তাই গড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আশ্রয় করে। ফলে, যে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে বাঙালির বাঙালিত্ব বা দেশগতসত্তা তার ভিত্তি ধর্ম নিরপেক্ষতায়; অন্যথায় ধর্মনিরপেক্ষ না হলে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয়।

তিন

ধর্মনিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক হওয়া যায় না। এটা একটা সর্বজনীন সত্য। বাংলার ইতিহাসেও এর প্রমাণ মিলে। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এই শিব-ভক্ত রাজার রাজত্বের শেষেই বঙ্গে দেখা দেয় মাৎস্যন্যায়। এই অবস্থার অবসানকল্পেই দেশের মানুষ 'গোপাল' নামে এক সজ্জন ব্যক্তিকে বাংলার রাজা নির্বাচিত করেন। বাংলার ইতিহাসে জনগণের পছন্দে রাজা নির্বাচিত হওয়ায় ঘটনা শুধু ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ই নয়, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চার এক প্রাচীন নিদর্শনও বটে। স্বৈরশাসক আইয়ুব খাঁ এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো সেনানায়ক যে বলেন, পাশ্চাত্য বা নির্বাচনের গণতন্ত্র আমাদের জনগণের মেধার (Genious of our people) সঙ্গে যায় না এই ঘটনা তাকে অসার প্রতিপন্ন করে। গোপালের পর পালরাজারা বাংলায় প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে বাংলার-শিল্প-সংস্কৃতি, চিত্রকলা-ভাস্কর্যের অসামান্য বিকাশ ঘটে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তিও ঘটে এই পালদের রাজত্বকালে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন কিন্তু তাঁদের আমলে ধর্মীয় উগ্রপন্থার নিপীড়ন হয়নি। কিন্তু দশম-একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের সেন রাজারা বাংলায় শাসন ক্ষমতা দখল করে সংস্কৃত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ধর্মদর্শনের বিকাশ ঘটালেও তাদের সময়েই ধর্মীয় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা দেশ ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এজন্যই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মাত্র শতাধিক বছর আগে (১৯০৭) নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্রশাসনের পরবর্তী কালে দুইশত বছরের যে 'অন্ধকার যুগে'র সৃষ্টি হয় তার দায় উগ্রহিন্দুত্ববাদী সেন রাজাদের এবং প্রথম দিকের বহিরাগত মুসলিম দখলদার উভয়ের উপরই বর্তায়। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় বহু মত-পথ-গোত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো বিকল্প নাই। ভারতবর্ষে শাসন করতে এসে মুসলিম শাসকরা এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই ইসলামীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্তে বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার উপযোগী রাষ্ট্রতত্ত্ব বা পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসননীতির উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে বহু আগে থেকেই নিচু

স্তরে নানা ধর্মমতের সহ-অবস্থান থাকলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবর্তক মুসলিম শাসকেরাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দীন বারানির ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তিন খানা বইয়ে। বইগুলির নাম : তারিখ-ই ফিরোজশাহি, ফতোয়া-ই জাহানদারি এবং শাফিয়া-ই-নাট-ই আহমদি। তারিখ-ই-ফিরোজশাহিতে বারানি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : "আমার প্রভু ইলতুৎমিশ বলতেন যে সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস মেনে (দীনদারি) রাষ্ট্রশাসন করা সম্ভব নয়। ধর্মবিশ্বাস রক্ষা (দীনপানাহি) করতে পারাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। সুলতানদের ঘোষিত আদর্শ ছিলো 'ন্যায় বিচার'। মধ্যযুগে ভারতে ন্যায় বিচারের অর্থ ছিলো : 'সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা; সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের এক অংশ যেন অন্য অংশের উপর আধিপত্য না করে এমন ব্যবস্থা'। বারানি আলাউদ্দীন খলজির (১২৯৬-১৩১৬) মত উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি বলেছিলেন, "শরিয়তে কি লেখা আছে, তার পরোয়া না করে রাষ্ট্রের স্বার্থে যা করা উচিত বলে মনে করবেন, সুলতানের তাই করা উচিত" (সৈয়দ নুরুল হাসানের বক্তব্যের অনুসরণে)। একেই বলা হয়েছে 'জাহানদারি' বা ইহজাগতিকতা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজ্য বিস্তার, ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ ও শাসন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া অন্য কোনো লাগসই বিকল্প তাঁরা খুঁজে পাননি। এমনকি রাজা ও প্রজা উভয়ই মুসলমান এমন দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিলো অপরিহার্য রাষ্ট্রনীতি। উদাহরণ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি আর শিল্প-সংস্কৃতির অপূর্ব-বিকাশ ঘটে এবং ধর্মান্ধতা এমনকি ধর্ম-প্রবণতার ফলে সামাজিক বিপর্যয় ও সংস্কৃতির অবক্ষয় লক্ষ করা যায়।

চার

আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনার বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হবে বাংলায় সুলতানি আমলের ইতিহাসের দিকে তাকালে। দিল্লীর মতো বাংলার সুলতানরাও ছিলেন বিদেশি, বিভাষী ও বিধর্মী। তবে তাঁরা শাসক হলেও শাসিতের দেশে নিজধর্মের প্রয়োগে জোরজুলুম ও জবরদস্তি করেননি। বরং বাংলা ও বাঙালিকে ভালবেসে এদেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। হোসেন শাহি আমলে বাংলায় এক নবভাববিপ্লবেরই সূচনা হয়েছিলো। একদিকে শ্রীচৈতন্য দেবের হিন্দু ধর্মের গণমুখী সংস্কারমূলক ভক্তিবাদী আন্দোলন ও ধর্মীয় ছুঁৎমার্গমুক্ত মানবপন্থী সাধনধারা, অন্যদিকে মুসলিম মরমি সুফি-সাধকদের অধ্যাত্মচেতনাপ্রসূত মানবতাবাদ বাংলার সামাজিক জীবনে এনেছিলো এক নবতর সাংস্কৃতিক উজ্জীবন। এই ভাব-আন্দোলনকে হয়তো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলায় নবজাগরণ বলে আখ্যাত করা চলে। কারণ বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। সুলতানদের উদারতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মহাভারত ও ভগবদ্গীতা এই প্রথম সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করে মালাধর বসু সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ'র কাছ

থেকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত হন। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই নীতি সমন্বয়বাদী বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, বহিরাগত এই মুসলিম সুলতানেরা বিকাশমান বাঙালি জাতি গঠনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসনিষ্ঠ কোনো বাঙালির তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে এই-জাতি গঠন প্রক্রিয়াটি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বাঙালি জাতি ও বাঙালিত্ব নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কারও বোধ করেছেন এঁরা। সেজন্যই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'শাহে বাঙালিয়ান' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবরাও বাঙালিদের দেশজ উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুলতানদের প্রবর্তিত ধারাকে আরো গভীরতা দান করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর বেড়াভাসান উৎসব, বাংলা নববর্ষ, পুণ্যাহ ইত্যাদিতে যোগদান এর প্রমাণ বহন করে। অতএব, বঙ্গদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি নির্মাণে মুসলিম শাসকদের অবদান দিকনির্দেশক। দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের এই প্রয়াসকে একটি গ্রহণযোগ্য ও চলমান ঐতিহাসিক ধারা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েই নেহেরু-মওলানা আজাদ ভারতে এবং বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দীন ও তাঁদের সহযোদ্ধারা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

মুসলিম সুলতান ও নবাবেরা বাঙালির মানস প্রবণতাকে খুব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সে-স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনো বিরূপ ধারণা বা অসূয়া পোষণ না করে বাঙালির আচার-অনুষ্ঠান উৎসবকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরে থাকা গ্রামীণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ধারার বিকাশে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। তারা সব সময়েই তাদের নানা মত-পথ ও পন্থার বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে তাই বলেছেন, "মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ-জৈন মত এদেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন মগধ বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে দেখা যায় সেই স্বাধীনতা।" বাংলার এই রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ধর্মনিরপেক্ষতাই মানবমুক্তির অনিবার্য পথ ও পন্থা হয়ে ওঠে।

এই মানসিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ চোখে পড়ে। একজন ভাষ্যকার বলেছেন,

> অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর সুবায় সুবায় নুতন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্য করিলে এই সব রাষ্ট্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব চোখে পড়ে। য়ুরোপে নতুন

বাণিজ্য পথ আবিষ্কারের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত; অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কৃপায় এই শ্রেণীটি ইতিমধ্যেই বিশেষ অর্থবান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন শহর বন্দর গড়িয়া উঠিল। গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে নিপুণ কারিগর শ্রেণী ও অনিপুণ মজুরের দল সুরাট, গুগলি, সুতানটি ও মুর্শিদাবাদে ভীড় জমাইল। বাংলাদেশে পলাশী যুদ্ধের সমকালে এই শ্রেণীর রূপটি খুব স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। মুঘল সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসে যাহা কখনো পড়ে নাই—এই সময় তাহা দেখা যায়। দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণী বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিলক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আর তাহার প্রথম ধাপ হিসাবে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য 'হাতের লোক' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাংকার জগৎ শেঠ, বণিকরাজ উমিচাঁদ, নিমকের একচেটিয়া কারবারী খোজা বাজিদ, ইংরেজ কুঠির সঙ্গে গোপন কারবারে প্রভূত বিত্তশালী ঢাকার ডেপুটি দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ এই নূতন শ্রেণীর প্রতিনিধি। উল্লেখযোগ্য যে ইহাদের একজন জৈন, একজন নানকপন্থী, একজন মুসলমান, অপরজন বাঙালি হিন্দু অর্থাৎ ইহাদের ঐক্যের ভিত্তি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ইহারা আবার বণিক পুঁজির (Mercantile Capital) প্রতিনিধি। আর এই পুঁজিই সর্বদেশে ধনতন্ত্রের অগ্রদূত। এই শ্রেণীর দ্বারা এদেশেও হয়তো বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা রচিত হইত।

কিন্তু ইংরেজরা এদেশ দখল করে নেয়ায় সৃজ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশে সূচনালগ্নেই চাপা পড়ে যায়। এবং ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকেরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে শাসন করার লক্ষে Divide and Rule Policy চালু করে। এভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ভারতবর্ষে আধুনিক জাগতিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দেয়। তারই বিষময় ফল, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, অগণন মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ত্যাগ ও দুঃসহ বাস্তুহারা জীবন গ্রহণ। একে ইতিহাসের এক বিশাল মানবিক বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যায়!

পাঁচ

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে 'দুই-পাকিস্তান' ভিত্তিক আন্দেলনে অংশ নিলেও অপরাষ্ট্র 'এক পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-বাংলার বাঙালি বুঝতে পারে তারা পরাজিত হয়েছে। এখন তারা শোষণ-নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি শুরু করে নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা ভিত্তিক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙালির সংস্কৃতি ও রাজনীতি একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বাংলাভাষা ও বাংলার ভূগোল ভিত্তিক নবচেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিবেকবান ও ইতিহাসনিষ্ঠ

বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপটি নির্ধারণ করে দেন এই ভাষায় :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন দাগ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গী-দাড়িতে তা ঢাকবার জোটি নেই। (পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, কার্জন হল ঢাকায়, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, সভাপতির ভাষণ)

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তার এই তাত্ত্বিক সূত্র ধরেই পূর্ব-বাংলার নব প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের সক্রিয়বাদীরা (Cultural Activities) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। এই ধারায় ২৩ বছরের উপনিবেশ বিরোধী স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, ১৯৬২-এ 'দেশ ও কৃষ্টি' শীর্ষক পাঠ্য বইয়ের বাঙালি জাতিসত্তা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামকে গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। এই গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ড্রেস রিহার্সাল স্বরূপ। অবশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর যোগ্য সহযোগী তাজউদ্দীন ও অন্যান্যদের নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের, সংগ্রামের, সাধনার গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। পাকিস্তানি বন্দী শিবির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : "আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।" এর আগে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও স্বাধীন সার্বভৌম, জনগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গৃহীত হয় এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় : "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হলো।"

এমন এক রাষ্ট্র গঠন ও সংবিধান রচনা বাঙালির ঐতিহাসিক বোধ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙালি জাতির এর চেয়ে বড়ো সাফল্য, বড়ো অর্জন ইতিহাসে আর নেই। বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রশংসা করে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Center for Inquiry-Transnational-এর শিক্ষা ও গবেষণা

পরিচালক ড. অস্টিন ডেইসি বলেন : "Thomas Jefferson could have learnt a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman." কিন্তু বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্র ও ধর্ম-নীতির সঙ্গে পরিচয়হীনতার জন্যই, অথবা রাজনৈতিক বোধের পশ্চাৎপদতার জন্য স্বৈরশাসক জিয়া-এরশাদ এবং পাকিস্তানের গোপন দোসর মোশতাক ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের মূল স্রষ্টা শেখ মুজিবকেই শুধু হত্যা করেনি, রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তন করে একে একটি পাকিস্তানি ধাঁচের ধর্মপ্রবণ পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। এবং শেখ মুজিব গোটা জাতিকে চার মূল রাষ্ট্রনীতির পেছনে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন তার বিপরীতে উপরোক্ত তিন শাসক তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে দুটি ক্ষতিকর ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ আজ দুঃশাসন, আর দলীয় স্বৈরাচারের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি আজ নানা প্রতিকূলতায় বিপন্ন, আর মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জিয়ার দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলাদেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ, জিয়া যেখানে গোপনে স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মব্যবসায়ী জামায়াতকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, জিয়া-পুত্র তারেক রহমান সেখানে প্রকাশ্যে বলেছেন, 'বিএনপি ও জামায়াত একই পরিবারের সদস্য।' বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (২০০১-০৬) লুটপাট, দুঃশাসন, প্রশাসন দলীয়করণ, প্রতিপক্ষকে হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে গণতন্ত্রকে এক দুঃস্বপ্নের শাসনে পরিণত করে। আর এজন্যই বাড়-বাড়ন্ত হয় অপশাসন, দুঃশাসন, স্বৈরাচার আর জঙ্গিবাদের। মুজিব-তাজউদ্দীনসহ বহু দেশপ্রেমিকের প্রাণ নিয়েও রাষ্ট্রশক্তির গোপন কুঠুরিতে স্থায়ী আসনপাতা ওই দুষ্টচক্র, ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মান্ধ ও জঙ্গি গোষ্ঠীর সহায়তায় বাংলাদেশকে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের বৃত্ত ভেঙে বের হতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল সংকট এখানেই।

সুনীতি কুমার ঘোষ

কারা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলো এবং কাদের স্বার্থে

পরিস্থিতি এমন ছিল যে বাংলার ভাগ্য বাংলার জনগণের উপর নির্ভর করছিল না, নির্ভর করছিল সম্পূর্ণ বাইরের তিনটে শক্তির উপর—তাদের মধ্যে আপস ও চুক্তি উপর। আমরা দেখবো এই তিনটি শক্তির মধ্যে দুটি শক্তি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিল বাংলাকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে পৃথক অবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করতে; কিন্তু স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না অন্য শক্তিটি অর্থাৎ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এবং তাঁদেরই চাপে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন কার্যত নাকচ করে দিল তখন নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এর বিস্তৃত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।[১] শুধু উল্লেখ করবো যে, এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল স্থির করার যে তাঁরা হিন্দুস্থানে যাবেন, না অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিলে আলাদা গ্রুপ তৈরি করবেন অথবা স্বাধীন থাকবেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বাছাই করে নেওয়ার। এই তিনটি সম্ভাবনা ছিল : (১) সমগ্র বাংলা (ও পাঞ্জাব) হিন্দুস্থানে অথবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারে; (২) বাংলা (ও পাঞ্জাব) বিভক্ত হতে রাজি হয়ে এক অংশ হিন্দুস্থানে এবং অন্য অংশ পাকিস্তানে যেতে পারে; এবং (৩) বাংলা (ও পাঞ্জাব) ঐক্যবদ্ধ থেকে পৃথক রাষ্ট্র হতে পারে।

তৃতীয় বিকল্পের বিরুদ্ধে নেহেরুর জোরালো আপত্তিতে এই পরিকল্পনাও নাকচ হয়ে যায়।[২] রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে ভার দেওয়া হয় নতুন পরিকল্পনা রচনা করার। এই পরিকল্পনার রূপরেখা আগের ডিসেম্বরে অথবা জানুয়ারিতে প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেনন তৈরি করেছিলেন।[৩] তাতে ঐ তৃতীয় সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাংলাকে (ও পাঞ্জাবকে) হয় সমগ্রভাবে হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে যেতে হবে আর নয়তো দ্বিখণ্ডিত হতে হবে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে ঐক্যবদ্ধ বাংলার (বা পাঞ্জাবের) অস্তিত্ব থাকবে না। অন্য

---

[১] See Ghosh, *India and the Raj,* II, 297–8, for a brief discussion of the plan.

[২] TOP, X, 756, 762–3.

[৩] Menon to Patel, 10th May 1947, Durga Das (ed.) op cit., V, 113–7; Menon, op cit., 358–9.

প্রদেশগুলিকেও হয় হিন্দুস্থানে নয় পাকিস্তানে যেতে হবে। এই মেনন-প্যাটেল পরিকল্পনাই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

এর আগে ১৯৪৭-এর ৪ঠা মার্চ ভারতসচিবের একটা স্মারকলিপিতে তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল : (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান; (২) আসাম-সহ হিন্দুস্থান; এবং (৩) বাংলা। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটি প্রদেশগুলিকে, বিশেষ করে বাংলাকে, যদি তারা চায় তাহলে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক থাকার অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল। ১৭ই মে ১৯৪৭ তারিখের একটি স্মারকলিপিতে ভারতসচিব লিস্টওয়েল বলেছিলেন যে, "ঐক্যবদ্ধ থাকার ও নিজের সংবিধান নিজে রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বাংলাকে এবং সম্ভবত পাঞ্জাবকেও দেবার পক্ষে যুক্তি আছে।"[৪] ২৩শে মে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটলী বলেছিলেন : "যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত সংযুক্ত সরকারের ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে—তার উজ্জ্বল আশা আছে।"[৫] (ইতিমধ্যে শরৎ বোস-আবুল হাশিম কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলার কংগ্রেস-লীগ নেতাদের চুক্তি প্রকাশিত হয়েছিল।) একই দিনে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে এটলী "উপমহাদেশে দুটি বা সম্ভবত তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের" সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬]

মাউন্টব্যাটেন নিজেও কিছুদিন ধরে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক ঐক্যবদ্ধ বাংলার কথা চিন্তা করছিলেন। ২৬শে এপ্রিল সুরাবর্দি যখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব করেন এবং বলেন যে "যথেষ্ট সময় পেলে তিনি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করেন", তখন এই প্রস্তাবের পক্ষে মাউন্টব্যাটেনের সমর্থন ছিল।[৭] ওই দিনেই তিনি জিন্নাকে সুরাবর্দির কথা জানান এবং জিন্নার সম্মতি পেয়েছিলেন।[৮] ২৮শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানালেন যে, তাঁর এবং তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের "পরিকল্পনা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে পৃথক অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। জিন্না কোনো আপত্তি করবে না।"[৯]

পৃথক স্বাধীন দেশ হবার সম্ভাবনা যাতে বেশি হয় সেইজন্য ১লা মে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, বাংলা থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্যরা প্রথমে ভোট দিয়ে ঠিক করবেন যে তাঁরা স্বাধীন বাংলার পক্ষে, না হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যোগদান করতে চান। পরে তাঁরা বাংলা ভাগ হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।[১০]

---

[৪] TOP. IX. 842; X. 834, 876–8.
[৫] Ibid., 964.
[৬] Ibid., 974.
[৭] Ibid., 459.
[৮] Ibid., 452.
[৯] Ibid., 472.
[১০] Ibid., 511–2, 539, 551.

২রা মে বারোজকে মাউন্টব্যাটেন জানালেন, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আর একটা বিকল্প হিসাবে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সমস্ত ভোটদাতাদের মতামত গ্রহণ করার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।[১১]

৩রা মে কিরণশঙ্কর রায় যখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন তখন সংবিধান সভার সদস্যদের ভোটাভুটির মাধ্যমে অথবা গণভোটের মাধ্যমে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকার অধিকার দেবার যে পরিকল্পনা মাউন্টব্যাটেন করেছিলেন তার কথা কিরণশঙ্করকে বললেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে কিরণশঙ্কর যখন শুনলেন যে সুরাবর্দি যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও সংযুক্ত মন্ত্রিসভাতে সম্মত তখন তিনি উল্লসিত হলেন।[১২]

৪ঠা মে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে চিঠির মাধ্যমে ও টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, বাংলায় জনগণের মতামত নেবার জন্য গণভোট হতে পারে, তার জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগবে।[১৩]

তখন স্থির ছিল যে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে। অতএব বাংলায় গণভোট সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, না বিভক্ত হবে—এই প্রশ্নটি শুধু সেদিনের ৬ কোটির কিছু বেশি বাঙালীর কাছে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৭ই মে'তেও মাউন্টব্যাটেন বলেছেন যে, সুরাবর্দি তাঁকে জানিয়েছেন যে জিন্না স্বাধীন বাংলাতে রাজি আছেন।[১৪] মাউন্টব্যাটেন তখন ঐ প্রশ্নে গণভোট বা সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু তার পরেই মাউন্টব্যাটেনের মত সম্পূর্ণ বদলে গেলো। ৮ই মে'তে তিনি তাঁর চিফ অব স্টাফ লর্ড ইসমে (Lord Ismay)-কে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে জানালেন, ভি. পি. মেননের মাধ্যমে প্যাটেল ও নেহরু জানিয়েছেন যে যতদিন না নতুন সংবিধান সম্পূর্ণ তৈরি হচ্ছে ততদিনের জন্য তাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস (ডোমিনিয়ন স্টেটাসের আর কোনো শোভন নাম নেই) নির্দিষ্ট সময়ের আগে চান। ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ এগিয়ে দিতে হবে। মাউন্টব্যাটেন লিখলেন : "এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যত সুযোগ এসেছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং [এই সুযোগের ব্যবহারে] আমরা অবশ্যই প্রশাসনিক বা অন্য কোনো বাধা মানবো না।"[১৫]

৯ই মে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধিকে প্যাটেল বললেন, তাঁরা চান শীঘ্র ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হোক।[১৬] ১০ই মে

[১১] Ibid., 554–5.
[১২] Ibid., 586.
[১৩] Ibid., 615, 714.
[১৪] Ibid., 657.
[১৫] Ibid., 699—emphasis added.
[১৬] Ibid., 716—emphasis added.

মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর সহকর্মীদের এক বৈঠকে নেহরু বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।[১৭]

ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ডোমিনিয়ন (অবশ্য পরিবর্তিত নামে) থাকবে এই ইচ্ছা জানিয়ে নেহরু ও প্যাটেল যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে মাউন্টব্যাটেনের উল্লাসের কারণ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে চাইছিল যে ভারত ডোমিনিয়ন বা 'কমনওয়েলথ'-এর সদস্য থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মারাত্মক পর্যায়ে, ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৩-এ, ভারতসচিব লিওরপাল্ড এমেরি (Leopold Amery) প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে লিখেছিলেন : "আগামী দশ বছর ভারতবর্ষকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখা আমাদের সামনে সব থেকে বড় কাজ... (এবং) ব্রিটিশ কূটনীতির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত।"[১৮] একই মর্মে এমেরি ৯ই মে ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেনকেও লিখেছিলেন।[১৯] ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত-বর্মা কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল—"ভারতকে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে রাখা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে।"[২০] এ থেকে কিছু আভাস পাওয়া যায়, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখার উপর কী গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা 'কমনওয়েলথের কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ' ("the linchpin in the structure of the Commonwealth") বলেই ভারতকে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা এ কথা বারবার বলেছেন।[২১] মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় মনোনীত করে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : সম্ভব হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে এককেন্দ্রিক একটি সরকার ("a unitary Government") হবে সেটাই ব্রিটিশ সরকারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। ... প্রথমত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন যাতে না হয় তার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বজায় রাখার বিরাট গুরুত্বকে আপনি ভারতীয় নেতাদের উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহযোগিতার ক্রমাগত প্রয়োজন—যার জন্য দেশের মধ্যে একটা চুক্তি হতে পারে—তার কথাও আপনি বলবেন।[২২] অনেকে মনে করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের আগে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল। এ নিছক অনুমান ও ভুল। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা পরে যোগ করবো।

কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গোপনে আরও জানিয়েছিলেন যে, সাময়িক কিছু সময়ের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বললেও তাঁদের ভারতবর্ষ কখনো

[১৭] Ibid., 732—emphasis added.
[১৮] TOP, III, 895–7—emphasis added.
[১৯] Ibid., 955.
[২০] Ibid., IV, 333–4.
[২১] Ibid., VIII, 224; VI, 561, 659–60, 666: passim. Emphasis added.
[২২] Ibid., IX, 972, 973–4—emphasis added.

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে না। তবে তাঁদের এই আশ্বাস গোপন রাখতে হবে, নাহলে কংগ্রেস সংগঠনকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে রাজি করানোতে অসুবিধা হবে। মাউন্টব্যাটেনের মত এটলিও খুবই খুশি হয়ে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন।[২৩]

মাউন্টব্যাটেন ১১ই মে টেলিগ্রাম করে লন্ডনকে জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই ১৯৪৭ সালের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে হবে। তারপর তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কি কি লাভ হবে তা তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৪]

অতএব মাউন্টব্যাটেন ঠিক করলেন যে, বাংলার জনমত জানার জন্য গণভোট বা সাধারণ নির্বাচন হবে না, এমনকি বাংলার আইনসভার সদস্যরা বাংলা অবিভক্ত পৃথক রাষ্ট্র থাকবে তার পক্ষে ভোট দেবার অধিকার পাবে না। সমগ্র বাংলা যাবে হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে, অথবা দু'টুকরো হবে এবং এক টুকরো যাবে হিন্দুস্থানে ও অন্য টুকরো যাবে পাকিস্তানে—শুধু এর উপরেই আইনসভার সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলার কোটি কোটি মানুষের স্বার্থকে বলি দিতে হবে।

বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক রাষ্ট্র হবে তাতে মুসলিম লীগ নেতাদের সম্মতি ছিল। ২৬শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাকে সুরাবর্দির স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাবের কথা বললেন তখন জিন্না একটুও ইতস্তত না করে বলেছিলেন, "আমি আনন্দিত হবো ... তারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকুক সেটাই ভালো হবে।"[২৫] ২৮শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেনের প্রধান সচিব মিয়েভিল (Miéville)-এর সঙ্গে আলোচনার সময় লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খাঁ বলেছিলেন, "বাংলা কখনও বিভক্ত হবে না এই তাঁর বিশ্বাস, তাই তিনি বাংলা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। তিনি মনে করেন যে, বাংলা হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে যোগদান করবে না এবং পৃথক রাষ্ট্র থাকবে।"[২৬]

জিন্না ও লিয়াকত তাঁদের এই সম্মতি বারবার জানিয়েছেন।[২৭] কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বরাবর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আমরা দেখেছি, পাকিস্তান হোক আর না হোক, তবু বাংলাকে ভাগ করতে হবে—এই ছিল তাঁদের অন্যতম দাবি। তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করতে। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারী বড় মুৎসুদ্দিদের ঘাঁটি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা কখনো হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না। উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে, বাংলা বয়স্ক ভোটাধিকার, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী, সম্মিলিত মন্ত্রিসভা, নিজস্ব সংবিধানসভা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তার সংহতি অটুট থাকবে এবং বাকি ভারতের সঙ্গে সে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। এই নতুন

---

[২৩] Ibid., X, 974–5—emphasis added.
[২৪] Ibid., 774.
[২৫] Ibid., 452.
[২৬] Ibid., 479.
[২৭] Ibid., 472, 512, 554–5, 625, 657.

বাংলায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের উৎখাতের জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াই শুরু হবে, অগ্রগতি ও বিকাশের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিনষ্ট করে দিল এবং অন্তহীন ট্র্যাজেডির শিকার হতে বাংলাকে বাধ্য করলো।

১৯৪৭-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি নেহরু বলেছিলেন : "পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হবে; আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই এ কথা বলছি।"[২৮] তিনি বলছেন যেন তিনি পাঞ্জাব ও বাংলার ভাগ্যবিধাতা। কেমন করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ভূমিকা পালন করতে পারলেন? তাঁরা পেরেছিলেন এই জন্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে সংকটের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের উপর—অর্থাৎ হিন্দু ও পার্শি বড় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের উপর—নির্ভর করছিল ভারতবর্ষে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। মুসলিম নেতৃত্বের অপেক্ষা এইসব ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁরা আগেই দিয়েছেন। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতে তাঁদের কাছ থেকে আগের থেকে আরও বড় ভূমিকা আশা করছিল। এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছিল। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে তার মুৎসুদ্দিদের স্বার্থের কিছু গৌণ দ্বন্দ্ব থাকলেও প্রধানত মিল ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সংকটময় দিনে যখন চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে, যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঢল নেমেছে, তখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার হিন্দু ও পার্শি বড় মুৎসুদ্দিদের স্বার্থের মিল বড় হয়ে দেখা দিল।[২৯] ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে দমন করার জন্যই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছিল।

আর. জে. মুরের (R. J. Moore-এর) কয়েকটি কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি লিখেছেন :

"The co-operation of Congress ... seemed necessary to preservation of *the now uncertain internal order and the security of the Indian Ocean area* ... The best security for commercial and financial interests lay in an orderly transfer and the continuation of the collaborative arrangements that had prospered before and during the war (when leading magnates were associated with government) ... Mountbatten's *realpolitik flowed from his recognition of Congress goodwill as essential to*

---

[২৮] Ibid., 337, fn. 2.

[২৯] See Ghosh, *India and the Raj*, II, 313–7; *India's Nationality Problem and Ruling Classes*, 36–8.

Britain's post-imperial interests. To a greater degree than has been acknowledged Congress called the cards in the last rubber of the endgame : in the accelerated transfer of power; in the severe treatment of Jinnah and his claims; in the persuasion of the princes to accede to a dominion."[৩০]

অর্থাৎ সংক্ষেপে ভারতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ... যুদ্ধের সময়ে ও তার আগে নেতৃস্থানীয় পুঁজিপতিদের ও সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তাকে টিকিয়ে রাখা—এর উপর নির্ভর করছিল ব্রিটিশরাজের বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা ... [প্রত্যক্ষ] সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের পর ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সদিচ্ছা একান্ত প্রয়োজনীয়—এই উপলব্ধি ছিল মাউন্টব্যাটেনের রাজনীতির মূলে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে নিয়ে আসা ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে কংগ্রেস তার দাবি আদায় করেছিল।

২৫শে মে লন্ডনের নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার সংবাদদাতাকে নেহরু বললেন : "[ভারতীয়] ইউনিয়নের মধ্যে যদি থাকে তবেই শুধু আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় রাজি হতে পারি।"[৩১]

মাউন্টব্যাটেন তখন লন্ডনে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটির দৃষ্টি 'নিউজ ক্রনিক্‌ল'-এর রিপোর্টের প্রতি আকর্ষণ করে তিনি বলেন : "এই ঘটনার পর বাংলার ঐক্যকে রক্ষা করার এবং তাকে ভারতবর্ষে তৃতীয় ডোমিনিয়ন-রূপে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৩২]

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করে মে মাসের শেষে মাউন্টব্যাটেন লন্ডন থেকে ফিরলেন। মন্ত্রিসভা তাঁর হাতে প্রচারের জন্য ঘোষণার দুটি খসড়া দিয়েছিল। একটি খসড়া ছিল যদি বাংলার বিভক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে; আর একটি ছিল যদি সম্ভব বলে মনে হয় যে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ৩১শে মে তারিখে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বললেন : "ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে যে সম্মত আছে তা ঘোষণা করেছে—বাস্তবিক প্রধান দলগুলি যাতে সম্মত, বাংলার জন্য এমন যে কোনো সমাধানে তারা রাজি হতে প্রস্তুত।" তিনি আরও বললেন, "পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে বাংলা স্বাধীন হবে তাতে তিনি রাজি হবেন না।"[৩৩] দুটি প্রধান দলের মধ্যে একটি দল—মুসলিম লীগ—রাজি

---

[৩০] R. J. Moore, *Endgames of Empire*, 5, 7; see also H. M. Seervai, *Partition of India : Legend and Reality*, Bombay, 1989, 124.

[৩১] TOP, X, 1041, see also ibid. 1013 for Nehru's conversation with Micville on the same day.

[৩২] Ibid., 1014.

[৩৩] Ibid., XI. 2.

ছিল; ব্রিটিশরাজও রাজি ছিল; কিন্তু প্রধান দলের মধ্যে অন্যটি—কংগ্রেস—রাজি ছিল না। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্যই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো।

জয়া চ্যাটার্জির বই *Bengal Divided*-এ বাংলার প্রতিনিধি-স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে 'অলীক স্বপ্ন' (æpipe-dream”) বলে উপহাস করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক হোক আর না হোক, এই বইয়ে বাংলা-বিভাজনে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ আড়াল করা হয়েছে।

৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত পরিকল্পনা গৃহীত হলো। স্থির হলো 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসে'র ভিত্তিতে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্র হবে। বাংলার আইনসভার সদস্যরা ভোট দিয়ে ঠিক করবেন সমগ্র বাংলা হিন্দুস্থান, না পাকিস্তানে যাবে, অথবা বাংলাকে ভাগ করে একটা অংশ হিন্দুস্থানে ও অপর অংশ পাকিস্তানে যাবে। বাংলা অবিভক্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে সেই প্রশ্নের উপর ভোট দেবার অধিকার থাকবে না। পরে যে তাঁদের ভোট হলো সেটা সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক।

অনেকের ধারণা আছে যে, অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনার প্রতি গান্ধীর সমর্থন ছিল। এই বিষয়ে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৮ই মে ১৯৪৭ ও তার পরবর্তী কয়েকদিন শরৎ বোস, আবুল হাশিম, কিরণ শঙ্কর রায়, সুরাবর্দি, মহম্মদ আলি ও সত্যরঞ্জন বক্সি ঐক্যবদ্ধ বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে সোদপুরে গিয়েছিলেন। আবুল হাশিম গান্ধীকে বলেছিলেন, "বাঙালীদের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করেছে। হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, বাঙালী বাঙালী, এবং ১০০০ মাইলেরও বেশি দূরের পাকিস্তানিদের শাসনকে ঘৃণা করে।"[৩৪]

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হবার পর শরৎ বোস তার কপি গান্ধীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাটনা থেকে ২৪শে মে গান্ধী শরৎ বোসকে লেখেন : "শুধু অধিকাংশের ভোটে কিছু হবে না এমন কিছু শর্ত খসড়া চুক্তিতে নেই। শাসন ক্ষমতায় ও যাঁরা আইনসভায় থাকবেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু সদস্যদের সমর্থন [অবিভক্ত বাংলা] সরকারের প্রতিটি কাজ (বা আইন) ("Every act of Government")-এর পিছনে থাকতে হবে।"[৩৫] শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নয়, (যেমন ভারতের বা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নে) সরকারের প্রত্যেকটা কাজ বা আইনের পিছনে দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু সদস্যের সমর্থন চাই। এই নীতির ভিত্তিতে কোনো সরকারের পক্ষে কাজ করা সম্ভব? এই

---

[৩৪] Cited in Sunil Das, "The Fateful Partition and the Plan of Independent Sovereign Bengal," *Surat Chandra Bose Commemoration Volume*, 79.

[৩৫] CWG, LXXXVII, 526— emphasis added.

সময়ে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদী'দের মুখোশ খসে পড়ে গিয়েছিল ও 'হৃদয় পরিবর্তনের তত্ত্ব' প্রভৃতি একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমগ্র ভারতের ভাষা ও লিপির মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মহাত্মার সহকর্মীরা কী ভাবে হিন্দি ও দেবনাগরীকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজের তৈরি সংবিধান সভায় হিন্দি ও দেবনাগরীর জয় হয়েছিল মাত্র এক ভোটে। তার জন্যও কারসাজির প্রয়োজন হয়েছিল।[৩৬]

যে নেতারা অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁদের জনসাধারণের কাছে হেয় করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের একটি অস্ত্র হয়েছিল। ৮ই জুন গান্ধী শরৎ বোসকে লিখেছিলেন, নেহরু ও প্যাটেল অবিভক্ত বাংলার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাঁদের মতে তফশিলী নেতাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করার এটা একটা কৌশল। এটা তাঁদের সন্দেহ নয়, প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস। ... তাঁরা আরও মনে করেন যে, তফশিলীদের ভোট কেনার জন্য জলের মত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। যে ব্যবস্থাই হোক তার জন্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আগে চুক্তি হতে হবে। আমি যা দেখছি সেটা তোমার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।" তিনি শরৎ বোসকে বাংলার ঐক্যের জন্য লড়াই বন্ধ করার ও বাংলা বিভাগের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য উপদেশ দিলেন।[৩৭] শরৎ বোসের উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই সন্ধ্যাতেই তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন যে, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যাঁরা আন্দোলন করছিলেন তাঁরা জলের মত টাকা খরচ করে ভোট কিনছেন এটা তিনি জানেন; এইসব অসৎ দুর্নীতিমূলক কাজকে তিনি সমর্থন করেন না।[৩৮] শরৎ বোস যখন তাঁকে তাঁর সংবাদদাতার নাম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য বললেন ও তদন্ত করে সত্যতা নির্ধারণ করে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাদের শাস্তি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন তখন তিনি শরৎ বোসকে তাঁর 'ক্রোধে'র জন্য তিরস্কার করলেন ও নাম (অর্থাৎ তাঁর সংবাদদাতা জহরলাল ও প্যাটেলের নাম) প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন।[৩৯] শরৎ বোসের উত্তরের থেকে সুরাবর্দির উত্তর আরও জোরালো হয়েছিল। তিনি গান্ধীকে লিখেছিলেন : "আমি দুঃখিত যে আপনার এই বিবৃতির দ্বারা বিষয়গুলিকে আপনি তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধ বাংলার পরিকল্পনা অসৎ, এই বিবৃতি সংবাদপত্রগুলি খুবই আনন্দের সঙ্গে লুফে নিয়েছে। মিঃ গান্ধী, আমাকে মাপ করবেন, আপনার বিবৃতি যে অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি বলতে চান তা নির্দিষ্ট

---

[৩৬] Selig S. Harrison, *India : The Most Dangerous Decades*, Princeton and Madras, 1960, 9–10, 282.

[৩৭] CWG, LXXXVIII, 103.

[৩৮] Ibid., 109–10.

[৩৯] Ibid., 110; also Pyarelal, op cit., II, 188, 190.

না করে যাঁরা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় বিশ্বাসী তাঁদের সবাইয়ের সম্বন্ধে আপনি কলঙ্ক রটনা করেছেন।"[৪০]

কেউ কেউ বলেছেন যে, জিন্না প্রথমে অবিভক্ত 'স্বাধীন' বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করে পরে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল। প্যারেলাল লিখেছেন, জিন্না এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন যদি তার পরিবর্তে অবিভক্ত পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের মধ্যে পান।[৪১] এটিও সম্পূর্ণ অসত্য। জিন্না অবিভক্ত 'স্বাধীন' বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীর শিষ্য এই রকম অনেক অসত্যই পরিবেশন করেছেন।

১৭ই মে জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে দাবি করেছিলেন বিভাগের প্রশ্নে বাংলা ও পাঞ্জাবে গণভোট গ্রহণ করা হোক। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটি জিন্নার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল।[৪২] ৩০শে মে মাউন্টব্যাটেন ভারতে ফিরে এলে জিন্না এই দাবি আবার করেছিলেন।[৪৩] আমরা উল্লেখ করেছি এপ্রিলের শেষের দিকে তফশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল গণভোটের প্রস্তাব তুলেছিলেন, এবং কৃষক প্রজা পার্টির হুমায়ুন কবির ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা এই প্রশ্নে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের দাবি করেছিলেন। এই প্রশ্নে বাংলার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করার দাবি সুরাবর্দিও করেছিলেন।[৪৪] মাউন্টব্যাটেনও এপ্রিলের শেষে ও মে মাসের প্রথমে বাংলায় গণভোট বা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মত নেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। বারোজ জানিয়েছিলেন বাংলায় গণভোট নেওয়া সম্ভব। ১৪ই জুন শরৎ বোস গান্ধীকে লিখেছিলেন : "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যদি গণভোট গ্রহণ করা হতো তাহলে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন।"[৪৫]

যে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নেহরু-প্যাটেলরা গ্রহণ করেছিলেন তাকে অনুমোদনের জন্য ১৪ই ও ১৫ই জুনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আবদুল গণি বলেন, "পাঠান ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান যাঁরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের প্রতি কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "পাঞ্জাব ও বাংলায় গণভোটের দাবি কেন করা হলো না?" অন্ধ্রের জগন্নাথ রাও অভিযোগ করেন যে, বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জনগণকে তাঁদের মত প্রকাশের কোনো সুযোগ দেওয়া হলো না; এমনকি সীমাবদ্ধ গণভোট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও

---

[৪০] Ibid., 190.
[৪১] Pyarelal, op cit., II, 187.
[৪২] TOP, X, 921–2.
[৪৩] Hodson, op cit., 310.
[৪৪] The Stateman, 28 Apr. 1947.
[৪৫] Quoted in Hashim, *In Retrospection*, **161**.

বেলুচিস্তানে হবে বলে স্থির হয়েছে তাতে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্ন নেই যদিও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এই প্রদেশগুলির জনসাধারণের মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[৪৬]

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওই অধিবেশনেই নেহরু বলেছিলেন : "... আমি ও আমার সহকর্মীরা একমত যে দেশবিভাগের প্রশ্ন জনগণের রায়ের জন্য তাদের কাছে পেশ করতে হবে" ("...what myself and my colleagues have agreed to is that the issue of partition should be referred to the people for verdict")।[৪৭]

ভারতবর্ষকে দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরে—যে সিদ্ধান্ত দু'মাস পরে কার্যকর হবে এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—নেহরু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন!! এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে নেহরুর জুড়ি ছিল না। সিদ্ধান্ত নেবার আগে শুধু জনগণের রায় নয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির রায়ও নেওয়া হয়নি। কাজটা সম্পন্ন করে—তর্ক যখন নিরর্থক—তখন অনুমোদনের জন্য কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল।

প্রশ্নটি সেদিনকার বাংলার ৬ কোটিরও বেশি অধিবাসী ও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অমৃতবাজার বা বার লাইব্রেরী প্রভৃতি সংগঠনগুলির এ.আই.সি.সি. অফিসে পাঠানো প্রস্তাব জনগণের মনোভাবের সার্থক প্রতিফলন নয়। শরৎ বোসের বক্তব্য ছাড়াও বারোজ জানিয়েছিলেন যে, হিন্দু জনমত দেশভাগের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই এই জীবন-মরণ সমস্যার উপর সঠিক মতামত জানা যেতো।

গণভোট হলো না কেন? নেহরু-প্যাটেল গণভোটের বিরুদ্ধে ছিলেন। ২৫শে মে নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেহরুর সেই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছিল।[৪৮] ৩০শে জুন ১৯৪৮-এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের মধ্যে 'যথাশীঘ্র সম্ভব' ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশরাজের উপর নেহরু-প্যাটেলদের ক্রমাগত চাপ (এবং বিনিময়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কখনো না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি) গণভোটকে বানচাল করারই কৌশল ছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে যে পরিকল্পনা পরিচিত তা মূলত রচনা করেছিলেন প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে ভি. পি. মেনন।[৪৯] এই পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত খসড়া ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে অথবা ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে মেনন তৈরি করেছিলেন। তাঁরা স্পষ্টই বলেছিলেন যে, খসড়া পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উঠেছিল—যাকে 'কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা' ("centrifugal tendencis") বলা হয়েছে—তাকে রোধ করার জন্য

---

[৪৬] IAR, 1947, I, 131.
[৪৭] SWN, 2nd series, III, 111.
[৪৮] TOP, X, 1040–1.
[৪৯] Menon, op cit., 364–5.

একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা।[৫০] অতএব গণভোটের মাধ্যমে বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে স্বীকার করার প্রশ্নই ছিল না নেহরু-প্যাটেলদের কাছে।

গণভোট যাতে না হতে পারে, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতাগুলি যাতে শক্তিশালী না হতে পারে, তার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল যত শীঘ্র সম্ভব ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে দিল্লীর গদি লাভ করা।

নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণ মেনন ১৯৪৭-এর ১৩ই মার্চ মাউন্টব্যাটেনকে এক দীর্ঘ চিঠিতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব দিয়ে লিখেছিলেন, বিভাগের বিরুদ্ধে বাংলার তুলনামূলকভাবে প্রবল বিরুদ্ধতা আছে। তবু স্থায়িত্বের (stability-র) জন্য দেশবিভাগ-রূপ দাম বাংলাকে দিতে হবে।[৫১] প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের স্থায়িত্ব? অবশ্যই বিড়লা-গোয়েঙ্কা প্রমুখ বড় মুৎসুদ্দিদের পুঁজির স্থায়িত্ব—তাদের শোষণের স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি। অন্যদিকে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে অসংখ্য বাঙালীর জীবন, বাসভূমি ও ভবিষ্যৎ অস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত-বর্মা কমিটিকে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন : "বাংলা পৃথক ডোমিনিয়ন হিসাবে থাকতে সক্ষম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় কমনওয়েলথের জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে শিখদের মত বাংলার ঐক্যকে অবশ্যই বলি দিতে হবে ...।"[৫২] সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুৎসুদ্দিদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলা ও পাঞ্জাবের জনগণকে বলি দেওয়া হয়েছিল।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পরে ৫ই জুন বি. এম. বিড়লা প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন : "আপনি যা চেয়েছিলেন সেভাবেই সব ঘটেছে। বাংলাকে বিভক্ত করার প্রশ্নটাও যে আপনি সমাধান করেছেন তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত।"[৫৩] বিড়লা প্রমুখ বড় মুৎসুদ্দিদের অনেক দিনের পরিকল্পনা সফল হলো। যখন অসংখ্য বাঙালীর মনে দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও গভীর নিরানন্দ তখন বড় মুৎসুদ্দিরা আনন্দিত, উৎফুল্ল, উল্লসিত।

ওই চিঠিতেই বি. এম. বিড়লা প্যাটেলের কাছে দুটি সুপারিশ করেছিলেন। এক, হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দুস্থানকে হিন্দু রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হোক। দুই, ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা (অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী) হিসাবে শ্যামাপ্রসাদকে নির্বাচন করার জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি উপযুক্ত উপদেশ পাঠান। (বলা বাহুল্য, শ্যামাপ্রসাদ সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যও ছিলেন না)।

---

[৫০] Ibid., 358–9.
[৫১] TOP, IX, 949.
[৫২] See Moore, *Endgames of Empire*, 7, 170.
[৫৩] Durga Das (ed.) op cit., IV, 55–6.

বাংলা বিভাজনের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের, বিশেষ করে নেহরুর, এবং কিছু পণ্ডিতদের একটি যুক্তি উল্লেখ করতে চাই। এঁরা বলেছেন, প্রথমে পৃথক বাংলা রাষ্ট্র হলেও পরে সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে চলে যেতো। মুসলিম লীগের তাই ছিল উদ্দেশ্য; অবিভক্ত পৃথক বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল তাদের একটি কৌশল। শরৎ বোস ও কিছু হিন্দু নেতা দূরদৃষ্টির অভাবে এই কৌশলের শিকার হয়েছিলেন। দেখা যাক এই যুক্তির কী ভিত্তি আছে।

প্রথম, বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ও লীগ নেতারা যে সংশোধিত খসড়া সংবিধান রচনা করেন তার প্রথম ধারা ছিল : স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। কোনো যুক্তরাষ্ট্রে (অর্থাৎ ভারত বা পাকিস্তানে) যোগদান করতে হলে বাংলার আইনসভার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন চাই। এই ধারা অবিভক্ত বাংলার পৃথক অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতো।

দ্বিতীয়, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে নির্বাচনের আগে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম 'শুরু হোক সংগ্রাম' ('Let us go to war') নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল : "স্বাধীন ভারত কখনও এক দেশ ছিল না। স্বাধীন ভারতীয়েরা কখনও এক জাতি ছিল না। অতীতে মোগল ও মৌর্য আধিপত্যে ভারত ছিল অখণ্ড এবং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকে আল্লাহতায়ালা যেমন সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে হতে হবে একটি উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তাঁরা যতই সুযোগ সৃষ্টি করুন, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে কোনো চক্র, গ্রুপ অথবা সংগঠনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে।"[৫৪]

ফজলুল হক প্রমুখ অনেক বাঙালী মুসলমান নেতার মত লীগেরও অনেক নেতা যেমন আবুল হাশিম দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে তিনি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হবার পরে লীগ বাংলায় আগের থেকে অনেক বেশি সংগঠিত হয়েছিল। বাংলায় লীগের বড় অংশের উপর তাঁর ছিল ব্যাপক প্রভাব। আমরা দেখেছি, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব ছিল মূলত ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলমান-প্রধান দুটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব। কিন্তু ১৯৪৬-এর প্রথমদিকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পরে বিভিন্ন আইনসভায় নব-নির্বাচিত লীগ সদস্যদের এক সম্মেলন জিন্না দিল্লীতে আহ্বান করেছিলেন। ৭ই থেকে ১০ই এপ্রিল ১৯৪৬-এ সেই সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই প্রথম জিন্না দুই নয়, এক মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রের দাবি পেশ করেন। তার বিরোধিতা করে আবুল হাশিম বলেছিলেন যে, জিন্নার প্রস্তাব 'বাতিলযোগ্য ও

---

[৫৪] আবুল হাশিম, *In Retrospection*-এর শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী কর্তৃক অনুবাদিত *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, কলিকাতা, ১৯৮৮, ১৫২।

অবৈধ' ('void and ultra vires'), কারণ এই প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী ও লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করার অধিকার আইনসভার সদস্যদের ছিল না।[৫৫]

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, শরৎ বোসের সঙ্গে ১০ই মে ১৯৪৭-এ আবুল হাশিম যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন তখন হাশিম একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল তার উপর জোর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, একজন বাঙালী বাঙালীই। উভয়েই হাজার মাইলেরও বেশি দূরের পাকিস্তানীদের শাসনকে ঘৃণা করে।[৫৬]

বাংলার ব্যাপক মুসলমান নেতা ও কর্মী চেয়েছিলেন কেন্দ্রের শাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বশাসিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যেখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সৌহার্দ্যের সঙ্গে বাস করবে। আমরা আগে বলেছি, ১৯৪৪ সালে বাংলার গভর্নর কেসি এই কথাই ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন। আমরা আরও উল্লেখ করেছি, ১লা মার্চ ১৯৪৬-এ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে লেখা অধ্যাপক হোরেস আলেকজান্ডারের চিঠির বক্তব্য। আমরা তা পুনরুল্লেখ করছি। তিনি লিখেছিলেন : উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সমগ্র বাংলাকে অথবা পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দিতে একজনও বাঙালী মুসলমান আন্তরিকভাবে চান বলে আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুদের মতই সমান দৃঢ়তার সঙ্গে বাঙালী মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত তাকে বাধা দেবেন—যদিও আগামী নির্বাচনে মুসলিম লীগ বোধ হয় প্রায় সব আসনে জয়ী হবে।[৫৭]

তৃতীয়, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, গান্ধীর কাছে আবুল হাশিমের বক্তব্য ও আলেকজান্ডারের ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। বাংলা ও ভারত-বিভাজনের কিছু পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৯৫২ সালের শুরুতে এই বিদ্রোহ কিছু বলিষ্ঠতা লাভ করে এবং ১৯৭১-এ তার পরিণতি হয় পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসনের অবসানে এবং স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়।

নেহরুদের অভিযোগ যে অবিভক্ত পৃথক বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার মুসলমান নেতাদের পাতা একটা ফাঁদ ছিল, তা বাংলার চরম দুর্গতির জন্য তাঁদের দায়িত্বকে ঢাকা দেবার একটা স্বভাবসিদ্ধ অপকৌশল ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিছু বাঙালী হিন্দু পণ্ডিত বা অপপণ্ডিত আজও যে নেহরুর সুরে সুর মেলান—সেটা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমরা আগে দেখেছি, মুসলমান বড় মুৎসুদ্দি ইস্পাহানিও অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ বলেছিলেন। নেহরুদের সঙ্গে তফাত এই

---

[৫৫] ঐ, ১০০।

[৫৬] Cited in Sunil Das, "The Fateful Partition and the Plan of United Sovereign Bengal", in *Sarat Chandra Bose Commemoration Volume*, 79; শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী কর্তৃক অনুবাদিত *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৩০।

[৫৭] TOP. VI. 109.

যে, তিনি এটিকে হিন্দুদের চক্রান্ত বলেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষায় ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের গ্রাস করে ফেলা ছিল হিন্দুদের রচিত এই ফাঁদের উদ্দেশ্য। বিড়লাদের রাজনৈতিক মুখপাত্ররা এবং ইস্পাহানি, দুই বিরোধী পক্ষ, এই পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেছিলেন—অবশ্য দুই বিপরীত দিক থেকে। সেটাই স্বাভাবিক। এই পরিকল্পনা দুই মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীরই স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। বাংলা-বিভাজনে দুইয়েরই স্বার্থ ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী হিন্দু মহাসভার নেতা বলরাজ মাধোক লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন : "কংগ্রেস ভারত-বিভাজন করেছিল আর আমি করেছিলাম পাকিস্তান-বিভাজন।"[৫৮] তিনি দাবি করেছেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে তিনিই পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাবকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এ দাবি একান্তই হাস্যকর হতো যদি বাংলা- ও পাঞ্জাব-বিভাজন তথা ভারত-বিভাজন এত মর্মান্তিক না হতো। এই বিভাজনে শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার কী গুরুত্ব ছিল সে সম্বন্ধে বেশি কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্বের পরিমাপ কিছুটা হয়েছিল ১৯৪৫-এর শেষের দিকে কেন্দ্রীয় আইনসভার এবং ১৯৪৬-এর প্রথম দিকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেনি। সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কংগ্রেস ও লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেই আপস করেছিল এবং সেই আপসের ফলেই বাংলা- ও পাঞ্জাব-বিভাজন তথা ভারত-বিভাজন হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদরা অবান্তর। আমরা দেখেছি, বিড়লা-গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলরা দীর্ঘদিন ধরে চেয়েছিলেন হয় অখণ্ড ভারত অথবা বাংলা ও পাঞ্জাবকে চিরে এই দুই প্রদেশের এক এক খণ্ড তাঁদের শাসিত ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে। দ্বিতীয়টা ছিল তাঁদের ন্যূনতম দাবি। এবং সেই দাবি তাঁরাই আদায় করেছিলেন। (পরে পাকিস্তানকে যাঁরা বিভাজন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন পূর্ব বাংলার জনগণ—১৯৭১ সালে।)

তবে শ্যামাপ্রসাদদের ভূমিকা কি কিছু ছিল না? অবশ্যই ছিল। যে বিপুল বিরাট নরমেধের আয়োজন হয়েছিল সেদিন, বিড়লা-নেহরু-প্যাটেলদের অনুগামী হয়ে এবং তাঁদের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে তাঁরা সেই যজ্ঞে কিছু ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমরা সেই প্রসঙ্গে আসছি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শ্যামাপ্রসাদ পরিচালনা করছিলেন তখন ১৯শে মার্চ ১৯৪৭-এ এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন : "প্রদেশটি যে গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছে বাংলার বিভাজন। এর ফলে যে যে অঞ্চলে বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য আছে সেখানে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিকশিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, তারা উভয়েই শীঘ্র উপলব্ধি করবে যে, দুটি (প্রস্তাবিত) প্রদেশে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ

---

[৫৮] Balraj Madhok, "Dr Shyamaprasad Mookerjee", in S. P. Sen (ed), *Dictionary of National Biography*, III, Calcutta, 1974, 173.

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল হবে।"[৫৯] (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু জাতীয়তার প্রবক্তারা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নন, যদিও রবীন্দ্রনাথ থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই ঐক্যের কথা বলে গেছেন। গান্ধী, জিন্না, নেহরুরাও সেটা স্বীকার করেছিলেন)।

পরে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (যিনি ওই সময়ে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন) এক সাক্ষাৎকারে গর্ডনকে বলেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ সেই সময়ে একান্তে বলছিলেন : এখন আমরা বিভক্ত করি এবং ইংরেজরা চলে যাক। তারপর আমরা সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেবো।[৬০] সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। কারণ, বাংলা- তথা ভারত-বিভাজন ঠিক হয়ে যাবার পরেই হিন্দু মহাসভা কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব থেকে মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ মাত্র কিছুদিন আগে (১৯শে মার্চ) বাংলা-বিভাজনের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "... যতক্ষণ না বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি আসবে না।"[৬১]

হিন্দু মহাসভা আরও বলেছিল, প্রস্তাবিত এলাকা-বন্টন ছিল অমুসলমানদের প্রতি অবিচার এবং মহাসভা তার জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। তাছাড়া, তাদের দাবি ছিল পূর্ববাংলার হিন্দুরা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হোক। তাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতীয় ইউনিয়নে পূর্ববাংলাকে ফিরিয়ে আনা মাত্র সময়ের প্রশ্ন।[৬২]

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারাও নিশ্চিত ছিলেন, পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তান হিন্দুস্থানে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। প্যাটেলও এই বক্তব্য রেখেছিলেন যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীনে ভারতবর্ষ এত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যে পাকিস্তানকে শীঘ্রই তাঁরা ফিরে পাবেন।[৬৩]

বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য ছিল, পূর্ববাংলায় তথা পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবাংলায় ও হিন্দুস্থানে মুসলমানদের জামিন (hostage) হিসাবে ব্যবহার করা হবে।[৬৪] অর্থাৎ পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে পশ্চিমবাংলা বা

---

[৫৯] LAR, 1947, 1, 48; quoted in Gordon, *Brothers against the Raj*, 574–5.

[৬০] Interview with S. M. Ghosh, New Delhi, 26 June 1972, ibid, 575.

[৬১] LAR, 1947, 1, 74 and Bengal Governor's Reports for first half of June, July and second half of July, quoted in Gordon, ibid, 586.

[৬২] Ibid., 587.

[৬৩] G. M. Mandurkar (ed.), *Sardar Patel—In Tune with the Millions, I* (Birth-Centenary Volume II), Ahmedabad, 1975, 5.9; see also Leonard Mosley, *The Last Days of the British Raj*, 107.

[৬৪] Gordon, *Brothers against the Raj*, 575.

ভারতের অন্যত্র নিরপরাধ মুসলমান অধিবাসীদের উপর তার শোধ নেওয়া হবে। এপ্রিল ১৯৪৭-এ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলন থেকে পূর্ববাংলার অমুসলমানদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, "তাঁদের পিছনে থাকবে শুধু নৈতিক নয়, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার কর্তৃক দৈহিক বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা" ("they will have the sanction, not simply moral, but in certain eventualities also physical, of the new Government of West Bengal")।[৬৫]

এখানে উল্লেখযোগ্য, সংখ্যালঘুদের জামিন রাখার তত্ত্ব কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের মুখেও শোনা গিয়েছিল। আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে খোলাখুলিই বলা হচ্ছিল যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয় করার কিছু নেই, কারণ ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমান থাকবে; পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে তার ফল ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভোগ করতে হবে। ১৯৪৭-এর জুনের মাঝামাঝি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সিন্ধুর প্রতিনিধিরা ভারত-ভাগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তাঁদের সবরকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আজাদ আরও লিখেছেন, প্রকাশ্য মঞ্চে না হলেও ঘরোয়া আলোচনায় তাঁদের একথাও কিছু লোক বলছিল যে, পাকিস্তনে তাঁদের কোনো ক্ষতি বা অমার্যাদা হলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর ভারতবর্ষ তার প্রতিশোধ নেবে। আজাদ বলেছেন, কিরণশঙ্কর রায় এই বিপজ্জনক তত্ত্বের দিকে (হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা এবং পাকিস্তানে হিন্দুরা অপর রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য জামিন—hostage—থাকবে) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রায় কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনিকে বলেছিলেন, এই তত্ত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজাদ বলেছেন, কিরণশঙ্কর রায়ের কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি। অনেকেই তাঁর আশঙ্কাকে উপহাস করেছিল।[৬৬]

একই তত্ত্ব ছিল কোনো কোনো মুসলমান নেতারও। ৭ই অক্টোবর ১৯৪২-এ জিন্নাকে একটি চিঠিতে চৌধুরী খালিকুজ্জামান লিখেছিলেন : "পাকিস্তান ধারণার পিছনে অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে, হিন্দু প্রদেশে মুসলমানদের মত মুসলমান প্রদেশেও [হিন্দুদের] জামিন (hostage) রাখতে হবে। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের [আঞ্চলিক পুনর্গঠনের ফলে] আমাদের প্রভাবের বাইরে চলে যেতে দিই তাহলে সংখ্যলঘু মুসলিম প্রদেশে মুসলমানদের নিরাপত্তা খুবই হ্রাস পাবে।"[৬৭]

সংখ্যলঘুদের জীবনকে জামিন হিসাবে ব্যবহার করার তত্ত্ব—কী পৈশাচিক ছিল! বাংলায় তার জের দীর্ঘদিন চলেছিল।

শ্যামাপ্রসাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ যাঁরা বাংলার হিন্দুদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলার দুর্গত হিন্দু জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দরদের উল্লেখ

---

[৬৫] *Amrita Bazar Patrika*, 9.4.1947, cited in Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal*, 229, fn. 90.

[৬৬] *Azad, op cit.*, 198–9.

[৬৭] Choudhry Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan*, 425.

করতে চাই। তাঁরা বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার পরে পূর্ববাংলা থেকে যে হিন্দুরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা নেহরু-প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদদের কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের কাছ থেকে কী রকম সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তার একটি নমুনা আমরা দিচ্ছি। ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৯-এ তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে লিখেছিলেন : "আপনার ধারণা 'ত্রাণ' ও পুনর্বাসনের জন্য আপনার সরকার বিরাট টাকা দান করেছে। আপনি কী উপলব্ধি করেন যে, আপনার সরকারের কাছ থেকে ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ এই দুই বছরের জন্য ওই উদ্দেশ্যে মোট অনুদান পাওয়া গেছে ৩ কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশি ও বাকি প্রায় ৫ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আমি বলছি, ২৬ লক্ষ বাস্তুহারাদের জন্য এ পর্যন্ত যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তা তুচ্ছ, কারণ দু'বছরে জনপ্রতি তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ টাকার মত।"[৬৮] এই নীতির ফলে পশ্চিমবাংলাও পঙ্গু হয়ে গেছে। নেহরুদের অন্যান্য নীতিও একই উদ্দেশ্য সাধন করেছে।[৬৯]

শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী উৎসবের আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই পার্টি শ্যামাপ্রসাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জনসংঘের নতুন সংস্করণ। পশ্চিমবাংলার 'মার্কসবাদী' উপ-মুখ্যমন্ত্রী (বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী) এই পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ 'জনগণের এক মহান নেতা' ছিলেন এবং তাঁদের 'বামফ্রন্ট' সরকার এই উপলক্ষে উৎসব পালন করবে। করাই স্বাভাবিক। তাঁদের চোখে আর একজন মহান নেতা ছিলেন বিধান চন্দ্র রায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলবো। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রধানত দু'জাতের মানুষ আছে : মুষ্টিমেয় শোষক ও শাসক এবং তাদের অনুগৃহীত জীব এক জাত এবং অন্য জাত হচ্ছে বাকি জনগণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদ কোন শিবিরে ছিলেন—বিড়লা-গোয়েঙ্কা প্রভৃতিদের এবং তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্রদের শিবিরে, না জনগণের শিবিরে? কী ছিল তাঁর রাজনীতি?

নিপীড়িত জনগণকে দমন করে রাখার জন্য শোষক ও শাসকদের হাতে পুলিশ মিলিটারি লাঠি গুলি আইন আদালত জেল ইত্যাদি ছাড়াও আরও অস্ত্র আছে। সাম্প্রদায়িকতা, 'জাতের ব্যারাম' (casteism), উগ্র জাতীয়তাবাদ তাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র। এখানে Howard Zinn-এর *A People's History of the United States* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

---

[৬৮] Quoted in Sarij Chakrabarti, With Dr B. C. Roy and other Chief Ministers, Calcutta, 1974, 140–2.

[৬৯] See, for instance, Ranajit Roy, *The Agony of West Bengal; A Study in Union-State Relations*, Calcutta, 1972 (Second Enlarged edition).

"Indeed, as the nations of Europe went to war in 1914, the governments flourished, patriotism bloomed, class struggle was stilled, and young men died in frightful numbers on the battlefields—often for a hundred yards of land, a line of trenches... Ten million were to die on the battlefield; 20 million were to die of hunger and disease related to the war. *And no one since that day has been able to show that the war brought any gain for humanity that would be worth one human life.*"[70]

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, য়ুরোপের দেশগুলো যখন ১৯১৪-তে যুদ্ধ শুরু করলো, তখন সরকারগুলোর শ্রীবৃদ্ধি হলো, দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে গেলো, শ্রেণীসংগ্রাম স্তব্ধ হলো, আর যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় তরুণেরা প্রাণ দিল—অনেক ক্ষেত্রে সামান্য একটু জমির জন্য। ...যুদ্ধে মারা গেলো এক কোটি মানুষ; দু'কোটির মৃত্যু হলো যুদ্ধ-জনিত অনাহার ও অসুখে। এখন পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেননি যে এই যুদ্ধের ফলে মানবজাতির এমন লাভ হয়েছে যার মূল্য একটি মানুষের জীবনের সমতুল্য।

রাষ্ট্রগুলির নেতাদের মধ্যে বিরোধ ছিল; বিরোধ ছিল রাষ্ট্রের সীমানা, উপনিবেশ, প্রভাবাধীন এলাকা ইত্যাদির জন্য। বিরোধ ছিল না রাষ্ট্রগুলির জনগণের মধ্যে। কিন্তু শোষক ও শাসকেরা উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে শোষক ও শাসকদের শিবিরে শোষিত জনগণকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল; তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক রাষ্ট্রের শোষিত জনগণকে অন্য রাষ্ট্রের শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের মত ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে শোষক ও শাসকেরা নিপীড়িত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাঁদের এক অংশকে আর এক অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে এবং এইভাবে শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। ধর্ম-নির্বিশেষে শোষিত জনগণের ঐক্যই শোষণ থেকে, নানাবিধ অত্যাচার থেকে, তাঁদের মুক্তির পূর্বশর্ত। (ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার।)

শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতি ছিল এই ঐক্যকে চূর্ণ করা; শ্বাপদ ও শিকারকে এক শিবিরভুক্ত করা, যার অর্থ জনগণকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা। শ্যামাপ্রসাদ নিজে ছিলেন শ্বাপদদের শিবিরে—বিড়লা-গোয়েঙ্কাদের শিবিরে। বাংলা-বিভাজনের জন্য যারা দায়ী তিনি ও হিন্দু মহাসভা তাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সেইজন্যই তিনি ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর নেহরু মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। এবং ৬ই এপ্রিল ১৯৪৮-এ মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত 'শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' ('Industrial Policy Resolution') ও তার সাথে

---

[৭০] Howard zinn. *A People's History of the United States*. New York. 1990th edn.. 350—emphasis added.

গৃহীত স্মারকলিপি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শৃঙ্খলাকেই দৃঢ় করার সংকল্প ঘোষণা করেছিল।[৭১]

আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন:

অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার,
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।

আজও এই দেশে মৃত্যুরই কারবার চলেছে। শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরিরা আজ একদিকে পারমাণবিক বোমার আস্ফালন করছেন আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেস-প্রবর্তিত নয়া অর্থনীতির রূপায়ণে মেতে উঠেছেন এবং কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাঁদের জীবনকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

আর একটি প্রশ্ন : 'জনগণের মহান নেতা' কে? নিপীড়িত জনগণ যে সব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত সেইসব শৃঙ্খলকে যিনি দৃঢ় করেন, জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন, তিনি জনগণের মহান নেতা? না, তিনি যিনি জনগণের আসল শত্রুদের চিহ্নিত করে তাঁদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সব শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনের দিক থেকে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে মহত্তর জীবনের অভিমুখে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান?

১৯৪৭-এর ৮ই আগস্ট তারিখের রিপোর্টে লন্ডনে কর্তৃপক্ষকে মাউন্টব্যাটেন জানিয়েছিলেন, বাংলার গভর্নর বারোজ, যিনি শ্যামাপ্রসাদকে ভালোভাবে জানেন, মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ এতই নীচ যে তাঁর পেটের তলা দিয়ে সাপও গলতে পারবে না। ("...Borrows who knows him [Shyamaprasad] well, described him to me recently as being so low that a snake could not crawl under his belly.")[৭২]

মাউন্টব্যাটেন নিজে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের আপন লোক; জনগণের স্বার্থের প্রতি শত্রুতা এবং নীচতা তাঁরও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

---

[৭১] See Suniti Kumar Ghosh, *The Indian Big Bourgeoisie,* 263.
[৭২] TOP, XII, 601.

রতন খাসনবিশ

সৌন্দর্যতত্ত্বের অর্থনীতি : ইসলাম, জাতিরাষ্ট্র ও পাকিস্তান

ভূমিকা

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম জড়িয়ে গেছে এই কারণে যে এই উপমহাদেশে এই রাষ্ট্রটি তৈরি হয়েছিলো হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের অর্থাৎ মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র 'পুণ্যভূমি' গড়বার উদ্দেশ্যে। এভাবে একটি রাষ্ট্র তৈরি হওয়া আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়। পাকিস্তানের সমসাময়িক ইস্রায়েল রাষ্ট্রও তৈরি হয়েছিলো একই ধরনের কারণে—নির্যাতিত ইহুদিদের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি গড়বার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের জন্যই গড়া হয়েছিলো ইস্রায়েল। ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ড ভাগ হওয়া অথবা সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে কসভো গড়ার পিছনেও আছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব স্বীকার করার তাগিদ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়া আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু এই ছকে পাকিস্তান গড়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিলো, যা একেবারেই এই উপমহাদেশের মানুষদের নির্দিষ্ট সমস্যা। এই বিশাল ভূখণ্ডে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল ছিলো যৎসামান্য। নোয়াখালির মুসলমান এবং বালুচিস্তানের মুসলমান একসঙ্গে খুব সামান্য সময়ই কাটাতে পারতো। ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার—সর্বত্রই দুই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আছে বিপুল তফাত। উলেমারা ইসলাম-ভিত্তিক ঐক্য গড়ার শত চেষ্টা করেও এ তফাত দূর করতে পারেনি। পারেনি তার কারণ এই উপমহাদেশে ইসলামের আছে একটা বিশেষ চরিত্র। এই উপমহাদেশে ইসলাম হলো সাধারণের যূথ (folk)-ধর্ম যার মধ্যে আছে স্থানীয় লোকাচার, সংস্কার, ধর্মাচার (ritual); এই ধর্মে উদারনৈতিক সুফি মতের বিপুল প্রভাব আছে, বস্তুত সুফিমতের প্রভাবেই নিচু জাতের বিপুল সংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলো। ("রিসারজেন্স অফ্ ইসলাম," হাসান এন. গ্রাভেজি রচিত, *পাকিস্তান: দি রুট্স্ অফ ডিক্‌টেটরসিপ* গ্রন্থে সংকলিত)। যত সহজে প্রাক্‌খ্রিষ্টান সেমেটিক ধর্মের প্রভাবে থাকা ইউরোপীয় একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ইস্রায়েল নামক রাষ্ট্র গড়া সম্ভব হয়েছিলো, উপমহাদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এমন একটা রাষ্ট্র গড়া ততটা সহজ ছিলো না।

ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, ভারত-ভূখণ্ডের সেই এলিট মুসলমানদের গোড়া থেকেই মোকাবেলা করতে হয়েছে এই

সমস্যাকে, এমনকি এলিট মুসলমানরা নিজেরাও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমসত্ত্বসম্পন্ন ছিলেন না। পাঞ্জাবের মুসলমান এলিট খানদানের বিচারে বাংলার এলিট মুসলমানকে কখনই সমান ভাবতেন না, বালুচ জমিদার-এর সঙ্গে করাচীবাসী এলিট সিন্ধু-এর মিলের জায়গা ছিলো যৎসামান্য। এই সমস্যাকে অতিক্রম করে ধর্মের ভিত্তিতে এই উপমহাদেশে একটি অখণ্ড জাতিসত্তা এবং সে জাতিসত্তার জন্য স্বতন্ত্র 'পুণ্যভূমি' গড়ার কাজটি যে কত কঠিন, পাকিস্তানের ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। ধর্মের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র গড়া হলেও ধর্মীয় ঐক্য এ রাষ্ট্রকে টেকাতে পারেনি। ১৯৭২ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পিছনে ভারত রাষ্ট্রের হাত ছিলো, কিন্তু সে কারণে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটলো, এ ধারণা ভ্রান্ত। বাংলাদেশের উৎস খুঁজতে হবে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের সেই দুর্বলতার মধ্যে যা কাটিয়ে ওঠার উপায় কেউ জানে না অথচ যার বোঝা বইতে হয় উপমহাদেশের তিনটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই।

কী সেই দুর্বলতা? ধর্ম হিসাবে ইসলামের সেই অংশটিকেই এই উপমহাদেশের মুসলমানরা জানে যা লোকাচারে পুষ্ট আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। এই ইসলাম এই উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে একজোট করার ক্ষমতা রাখে না, কারণ, একজোট করার কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই এই ইসলামে। ইসলামের সেই রূপটি যা মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগায়, সাম্যবোধ আনে, উৎপাদনের উপকরণে যৌথ মালিকানায় উৎসাহ দেয়, মুনাফার নামে পরশ্রম অপহরণের অনুমোদন দেয় না—তা হয়তো এই উপমহাদেশে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের চাহিদা তৈরি করতে পারতো। কিন্তু সে রাষ্ট্রে এলিট মুসলমানদের জায়গা হতো না। এলিট মুসলমানদের পাকিস্তান প্রকল্প তাই ছিলো অন্য ধরনের। পাকিস্তানপন্থী মুসলমান এলিট চেয়েছিলো সেই ইসলামের ভিত্তিতে একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা গড়তে যা শ্রেণী, গোষ্ঠী, আঞ্চলিকতা, ভাষা ইত্যাদির ব্যবধানগুলিকে পিছনে ফেলে রাখবে আবার সাম্যবোধ বিকাশের ঝুঁকিও নেবে না। অর্থাৎ পাকিস্তানপন্থী এলিট চেয়েছিলো এমন এক ইসলামকে কাজে লাগাতে, যা মানুষের সামাজিক পরিচয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিককে অস্বীকার করাতে পারে এবং পাকিস্তানি এলিট অর্থাৎ পাকিস্তানপন্থী ভূস্বামী ও দেশি বুর্জোয়ার স্বার্থবাহী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারে। দ্বিজাতিতত্ত্ব টিকিয়ে রেখে সেই ভূখণ্ডে একটি স্বতন্ত্র বুর্জোয়া-ভূস্বামী রাষ্ট্রের ন্যায্যতা রক্ষার এটাই ছিলো একমাত্র পথ। যে ইসলামের ওপর ভর দিয়ে এ রাষ্ট্র গড়া যেতে পারতো তা হলো মৌলবাদী ইসলাম। আর সে রাষ্ট্রকেও টিকিয়ে রাখতে হলে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি নেওয়া যেতো না। এই উপমহাদেশের দুর্ভাগ্য যে জিন্নার এই এলিটপন্থী দ্বিজাতিতত্ত্বর দায় বহন করতে হচ্ছে এই উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রকেই।

প্রশ্ন হলো, এটা কেন করা গেল? কেন এই এলিটপন্থী দ্বিজাতিতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো অবিভক্ত ভারতে। ইংরাজরা এটা করে গেছে বদ মতলবে, একথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু তা দিয়ে সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা খোঁজার

জন্য এই উপমহাদেশের মুসলিম মানসের বিকাশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই অধ্যায়টির প্রেক্ষাপট স্বাধীনতার সমসাময়িক ভারতবর্ষ, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যখন পাকিস্তান গড়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধে আমরা মুসলিম মানসের বিকাশের সেই অধ্যায়টি নিয়েই আলোচনা করব।

সৈয়দ আহমেদ, মুসলিম 'নবজাগরণ' ও মুসলিম এলিট

মুসলিম লিগ ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারত ভূখণ্ডের একটি বিশাল অংশের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও কোনো আন্দোলন না করেই। বস্তুত ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম লিগ নিজেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলের মর্যাদায় ভূষিত করতে কোনোদিনই উৎসাহী ছিলো না। এ দেশে যে দেশপ্রেমিক তরুণরা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের একজনও মুসলিম লিগের সদস্য ছিলেন না; ক্ষুদিরাম বা ভগৎ সিং-এর জন্য কোনো স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে মুসলিম লিগ—এমন তথ্য আমাদের জানা নেই।

মুসলিম লিগ ব্রিটিশ বিরোধী ছিলো না, কিন্তু সেজন্য একথা ভাবার কারণ নেই যে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসীরা সকলেই ব্রিটিশভক্ত ছিলেন। বস্তুত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভূখণ্ডজোড়া মুসলমানদের একটা বড় অংশ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। ব্রিটিশ শক্তি 'ওয়াহাবি' বলতে বুঝতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলমান জনগণকে। এবং এই 'ওয়াহাবি'র মোকাবেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এমন সব ন্যক্কারজনক কাজ করতে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কের ইতিহাসে যার তুলনা মেলা কঠিন। কিন্তু সে যা-ই হোক, মুসলিম লিগ কখনই এই 'ওয়াহাবি'র মর্যাদা পেতে পারে না। এটি ছিলো ইংরেজদের প্ররোচনায় গড়ে ওঠা মুসলিম এলিটদের একটি সংগঠন যার একমাত্র কর্তব্য ছিলো ভারতীয় জনগণকে এমনভাবে বিভক্ত রাখা যাতে এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন দুর্বল থাকে। এই দলটির একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ইংরেজদের দেওয়া ক্ষমতার উচ্ছিষ্টের ভাগ মুসলিম এলিটরা যাতে বেশি করে উদরস্থ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এর জন্যই দরকার হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের।

লিগের এই সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহর চরিত্র কোথা থেকে জন্ম নিলো অথবা কোথা থেকে জন্ম হলো এই দ্বিজাতিতত্ত্বের, এ বিষয়টি বুঝতে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ এবং তাঁর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় (মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ)-কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনাকে দায়ী করার একটা প্রবণতা ভারতবর্ষে বিদ্যমান। পাকিস্তানে আছে আলিগড় নিয়ে ইতিবাচক আবেগ। বিষয়টি কিছুটা জটিল। আলিগড়ের জনক সৈয়দ আহ্‌মদ ততটাই ব্রিটিশ অনুরাগী ছিলেন, যতটা ব্রিটিশ অনুরাগী ছিলেন সমসাময়িক হিন্দু সংস্কারবাদী চিন্তানায়করা। বরং এ কথা যোগ করা যায় যে হিন্দু সংস্কারবাদী চিন্তানায়করা যতটা মুসলমান-বিরোধী ছিলেন, সৈয়দ আহ্‌মদ ততটা হিন্দু বিরোধী ছিলেন না। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিলো, এটাও ঠিক নয়। তিনি এটা বিশ্বাস করতেন না যে ঈশ্বরের আদিষ্ট পুরুষ (prophet) শুধু আরব জগতে এসেছিলো এবং এশিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকাকে

ঈশ্বর অজ্ঞতার মধ্যে রেখে দিয়েছিলো (দ্রষ্টব্য : আইজাজ আহ্‌মদ রচিত *লিনিয়েজেস অফ দি প্রেজেন্ট*, পৃ. ১৭৯)। আরও উল্লেখ করা দরকার, মহাইসলাম জাতীয়তাবাদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে, এটাও সৈয়দ আহ্‌মদ ভাবতেন না। তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেননি বটে তবে তার কারণ এই নয় যে তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় মুসলমান আলাদা জাতি, তাদের জাতিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আলাদা রাষ্ট্র লাগবে। তাঁর একটা বিখ্যাত বক্তৃতার অংশবিশেষ এই রকম :

> কাইয়ুম বলতে আমি বুঝি যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমানদের। আমার কাছে এটাই জাতির সংজ্ঞা। আমার মতে, এতে কিছু এসে যায় না যে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস কী, কারণ তার সবটা আমরা প্রত্যক্ষ করি না। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হলো আমরা সবাই একই মাটিতে বসবাস করি। ভারতে যে দুই জাতিসত্তা বসবাস করে তাদের আমি 'হিন্দু'-এই নামে চিহ্নিত করতে চাই। এটাই হলো সেই জাতি (কাইয়ুম) যা ভারতে বসবাস করে। (লাহোর বক্তৃতা, ১৮৮৪; আইজাজ আহ্‌মেদ-এর পূর্বোক্ত বই-এর ১৮২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

সৈয়দ আহমদের মূল দুর্বলতা এটাই যে তাঁর মধ্যে কোনো 'ওয়াহাবি' চরিত্র ছিলো না। তিনি চাইতেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয় আর এক দুর্বলতাও তাঁর ছিলো। তিনি মুসলমান এলিটদের একেবারেই ঘাঁটাতে চাইতেন না। প্রধানত মুসলমান জমিদার ও নয়া উদ্ভূত মুসলমান বুদ্ধিজীবী, যাঁরা ছিলেন এই এলিট মুসলমান গোষ্ঠীর বনিয়াদ, তাঁদের খুশি করতে সৈয়দ আহ্‌মদ অত্যন্ত রক্ষণশীল উলেমাদের হাতে আলিগড়ের ধর্মশিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের ধর্মচিন্তা, যাতে আরব জগতের বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হতো, আলিগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে তা পড়ানো নিষেধ ছিলো। তবুও গোঁড়া মুসলমানরা আলিগড়কে চিহ্নিত করতো ইল্‌হাদ (atheism)-এর প্রশ্রয়দাতা হিসেবে।

এই রক্ষণশীল ধর্মীয় আবহাওয়া ছিলো মুসলিম সমাজের যাবতীয় প্রগতির অন্তরায়। এটি না ভেঙে এদেশে কোনো মুসলিম 'নবজাগরণ' সম্ভব ছিলো না। (তুরস্কে কামাল পাশা যা করেছিলেন) সৈয়দ আহমদ মুসলিম 'নবজাগরণ' চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাঙতে চাননি মধ্যযুগীয় ইসলামকে। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিলো ব্রিটিশ প্রেম পরাধীন দেশে যা স্বাধীন বুর্জোয়া চিন্তা বিকাশের একেবারেই পরিপন্থী। তাঁর গোটা বিষয়টাই তাই হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম জনগণের সাধারণ স্বার্থ-বিরোধী। রক্ষণশীল ধর্মীয় আবহাওয়া এবং ব্রিটিশদের ওপর তর্কাতীত আনুগত্য যে মুসলমানদের পছন্দ, শেষ বিচারে আলিগড় সেবা করেছে মুসলমানদের সেই এলিট অংশকেই।

গোঁড়া উলেমা-নির্ভর মুসলিম ধর্ম সুফি মতবাদ প্রভাবিত সাধারণের মুসলমান ধর্ম থেকে আলাদা ছিলো, ব্রিটিশদের ওপর আনুগত্য নিয়েও সাধারণ মুসলমানের মাথা ব্যথা ছিলো না—কেননা, সাধারণ মুসলমান ছিলো ভূমিনির্ভর শ্রমজীবী কৃষক, ইংরেজদের ভূমিব্যবস্থা যাদের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করেনি। এ

দুটিই দরকার ছিলো এলিট মুসলমানদের—যারা ছিলো জমিদার, যারা ছিলো উঠতি বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া, যাদের দরকার ছিলো এমন এক ইসলাম ধর্ম যা প্রমাণ করতে পারে যে এই ধর্মাশ্রিত লোকেরা হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে একেবারে আলাদা। এটা তাদের দরকার ছিলো যাতে দেশি বুর্জোয়া, দেশি জমিদার ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির সময় তারা একটা ভালো রকম বখরা পেতে পারে। সৈয়দ আহ্‌মদ-এর নিজস্ব চিন্তা যা-ই থাক, তাঁর আলিগড় কলেজ (১৯২০ সাল থেকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) শেষ পর্যন্ত সেবা করেছে এই মুসলিম এলিটকেই।

ব্রিটিশ আনুগত্যের কারণেই হোক বা জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তার কারণেই হোক, সৈয়দ আহ্‌মদ কখনও ভাবেননি যে ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের বাইরে কোথাও আনুগত্যের জায়গা আছে। এটার ভালো দিক এই যে, ভারতীয় মুসলমানরা এই চিন্তা গ্রহণ করলে, হিন্দু এলিটদের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও, খণ্ডিত জাতিরাষ্ট্র গঠনের তত্ত্বটি এদেশে আদৌ জায়গা করতে পারতো না। সৈয়দ আহ্‌মদ নিজে না চাইলেও এই 'নবজাগরণ' শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। এই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবিই জোরদার করতো। মুশকিল হলো, এদেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে হিন্দুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম একবারই যা করা গেছে সেটির ভিত্তি হলো খিলাফত, চরিত্রের দিক থেকে যা ছিলো মহাইসলামবোধ জাত, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং যা ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতির জন্য স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষাকে জোরদার করতে পারতো না। খিলাফত আন্দোলন অবশ্য খোদ তুরস্কেই পরাজিত হয়—জনগণ সুলতান আবদেল হামিদ-এর পদবন্দনা করে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে পড়ে থাকার বদলে চাইছিলো বুর্জোয়া সংস্কার, কামাল পাশার নেতৃত্বে যা মূর্ত হয়ে ওঠে। এদেশেও খিলাফতের সাফল্য পিছিয়ে দিতে পারতো মুসলমান সমাজে বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, এ সমাজকে আধুনিকতার স্পর্শদানের জন্য যা ছিলো জরুরি। খিলাফতের ঢেউ যখন ওঠে, মুসলমান সমাজ আসলে তখন মধ্যযুগের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলো। এটার ব্রিটিশবিরোধী দিকটার গুরুত্ব দিতে গিয়ে এটা যে মধ্যযুগে ফেরার চেষ্টা, এই রূঢ় বাস্তবকে অনেকে অস্বীকার করেন। সে সময় আসলে প্রয়োজন ছিলো কামাল পাশা ধরনের এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা একদিকে হবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, অন্যদিকে যা মধ্যযুগীয় মানস থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্তি দেবে। ভারতের দুর্ভাগ্য, এটা আদৌ ঘটলো না। সৈয়দ আহ্‌মদ-এর 'নবজাগরণ' এটা করতে ব্যর্থ হয়, যদিও একমাত্র সৈয়দ আহ্‌মদ বা তাঁর অনুগামীরাই মহাইসলামবোধের বিপরীতে ভারতীয়ত্ব বোধ বিকাশ করতে চাইতেন।

মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যদি 'ওয়াহাবি'র প্রেরণা পেতে আরব জগতের দিকে তাকিয়ে থাকতে না হতো, তাহলে সম্ভবত মহাইসলামবোধ বা দ্বিজাতিতত্ত্ব এদেশে জায়গা পেতো না। এটা যে ঘটলো না, এদেশে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুগপৎ

ভারতীয়ত্ববোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার স্পৃহা বিকশিত করা গেল না, তার কারণ খুঁজতে হবে পদানত দেশের জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পদানত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যাটি সাধারণভাবে আলোচনা করে এ সম্পর্কে যে সূত্রায়ণ করে, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বললে, এই সব দেশের বুর্জোয়াদের ওপরের অংশটির মধ্যে থাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করে সুবিধা আদায়ের প্রবণতা। সাম্রাজ্যবাদ, দেশি বুর্জোয়াদের ওপরের অংশ এবং সামন্তবাদের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে ওঠে। ফলত সামন্তবাদবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয় না, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও গড়ে ওঠে না—যদি না এই জোটের বিরুদ্ধে 'নয়াগণতান্ত্রিক' বিপ্লব সংগঠিত হয়, যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে কমিউনিস্টরা (তুরস্কের কামাল পাশার পরিণতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। দ্রষ্টব্য : নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে, মাও-সে-তুঙ)

এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল ছিলো, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা ছিলো আরো দুর্বল। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে এই জনগোষ্ঠীর 'নবজাগরণ'-এর নেতৃত্ব দেবেন সৈয়দ আহ্মদ কিংবা 'কায়েদে আজম' জিন্না—যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো গণ আন্দোলন করতে রাজি ছিলেন না। এই নিরিখে বিচার করলে খিলাফতপন্থীরা বরং ভালো, তাঁরা ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন। এটাও বোধ হয় একেবারে আকস্মিক নয় যে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনপন্থী মুসলমান নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিলো এই খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে থেকে। অতি রক্ষণশীল, সৈয়দ আহমদ বিরোধী মুসলমান ধর্মীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ—ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী হিসেবে যিনি ছিলেন সর্বজনস্বীকৃত, তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সে যা-ই হোক, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইংরেজবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করে একটি পদানত জাতীয়তাবাদ, যা ধর্মীয় পরিচয়কে পিছনে ফেলতে পারে—এমন একটি বোধ বিকশিত করার কাজ এদেশে দুর্বল ছিলো। সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর দেশি 'নবজাগরণ'-এর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশিতও ছিলো না। এলিট মুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং তার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের জন্ম হওয়া এদেশে তাই সহজ হয়ে গিয়েছিলো।

হিন্দু এলিট ও জাতীয় কংগ্রেস

এটি পরিস্থিতির একটি দিক—একমাত্র দিক নয়। একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর 'নবজাগরণ'-এর নেতৃত্ব ছিলো ব্রিটিশ বিরোধী এবং তারা চাইতো মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি অখণ্ড ব্রিটিশবিরোধী পদানত জাতিসত্তা বিকশিত করতে যা তারা নাকি মুসলিম এলিটদের ষড়যন্ত্রর ফলেই করে উঠতে পারেনি। এটা ঠিক যে হিন্দু জনগোষ্ঠীতে পশ্চিমের চিন্তাভাবনা তুলনামূলকভাবে আগে এসেছিলো। কিন্তু এই চিন্তাভাবনা যে 'নবজাগরণ' নিয়ে এসেছিলো, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে তা ছিলো একই রকমের রক্ষণশীল। এই 'নবজাগরণ' অনেকটাই আবার মুসলমান-বিদ্বেষীও

ছিলো। অন্তত একথা বলা যায় যে এই 'নবজাগরণ' মুসলমান জনগোষ্ঠীকে তার পরিমণ্ডলের বাইরেই রেখে দিয়েছিলো। এর বড় কারণ, ইউরোপে নবজাগরণ যে শেষ পর্যন্ত ধর্মরহিত চিন্তাকে সামনে আনতে পেরেছে যুক্তির জগতের বিস্তার ঘটিয়ে—এদেশে তা আদৌ ঘটেনি। (এই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথ সৈয়দ আহ্‌মদ-এর মতোই শিক্ষা-বিস্তারের ওপর জোর দিয়েছিলেন; তফাত এটাই যে তাঁর শিক্ষা প্রকল্পে ধর্মীয় আদর্শ অনুপ্রাণিত যে আচরণবিধি ছিলো তা 'কোরান' নির্ভর না হয়ে 'বেদ' নির্ভর ছিলো।— বেদভিত্তিক এই শিক্ষাপ্রকল্প মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করবে, যত একেশ্বরবাদী সেই বেদ চিন্তা হোক না কেন, কোনো কষ্ট কল্পনাতেও তা ভাবা যায় না)।

সে যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করবার প্রশ্নে তফাত না থাকা এই হিন্দু নবজাগরণ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও আপোসমুখী দেশি বুর্জোয়ার মতাদর্শ গঠনেই সহায়ক হয়েছে। এই মতাদর্শের সে ক্ষমতা ছিলো না যার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে পদানত দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তকে একজোট করে একটি জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা যায় যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলিকে তাদের জনগোষ্ঠীভিত্তিক সত্তার ঊর্ধ্বে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অখণ্ড জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক ভারত গড়ে তোলা তাই হিন্দু নবজাগরণের সাধ্য ছিলো না। এই মতাদর্শও পারতো কেবল একটি এলিট জাতিগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে—দেশি বুর্জোয়ার, দেশি সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধ করতে যাতে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করে ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই হিন্দু এলিট যার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিলো বুদ্ধিজীবী যারা আইসিএস হতে চায়, ব্যারিস্টারি করে সাহেবদের সমীহ আদায় করতে চায়, সরকারি কাউন্সিলে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেতে চায়, সম্পত্তির বিষয়ে ব্রিটিশসৃষ্ট স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে বিব্রত করতে চায় না—মূলগত বিচারে এদের সঙ্গে মুসলমান এলিটের কোনো তফাত নেই। শুধু বলা যায়, আগে শুরু করার জন্য এরা মুসলমান এলিটদের তুলনায় বেশি সুবিধেজনক অবস্থায় ছিলো এবং যে সুবিধা তারা পাচ্ছিলো এবং শাসন সংস্কারের নামে নূতন যে সব সুবিধা আসছিলো, তার কোনোটাই তারা মুসলমান এলিটদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে রাজি ছিলো না।

এটাই ছিলো হিন্দু এলিট ও মুসলমান এলিটদের মধ্যে বিরোধের মূল জায়গা—এর সঙ্গে 'আল্লা' বা 'ভগবান'-এর কোনো সম্পর্ক নেই। কংগ্রেস যেহেতু হিন্দু এলিট নিয়ন্ত্রিত, কংগ্রেস নামক প্লাটফরম-এ থেকে মুসলমান এলিটরা খুব সুবিধে করতে পারতো না। সৈয়দ আহ্‌মদ যে কংগ্রেসে যোগ দেননি তার কারণ এটাই এবং সে কথা তিনি অকপটে স্বীকারও করে গেছেন। (দ্রষ্টব্য: রফিক জ্যাকেরিয়া রচিত *দি রাইজ অফ মুসলিম ইন ইনডিয়ান পলিটিক্স*, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৭)। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ-এর জন্মও হয় এই প্রেক্ষাপটেই যদিও এটা মনে রাখা দরকার যে মুসলিম লিগ-এর সহায় ছিলেন স্বয়ং ভাইস রয় লর্ড মিন্টো। ১লা অক্টোবর ১৯০৬-এ ৭০ জন এলিট মুসলমানের সঙ্গে সিমলায় মিটিং করেন লর্ড

মিন্টো। মুসলমানদের পৃথক প্লাটফরম গড়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন তিনি। আইন সভায় মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বর দাবি মেনে নিয়ে ঐ প্রতিনিধি দলের নেতা আগা খাঁ পরে সঠিকভাবেই লিখেছেন, লর্ড মিন্টোর এই মুসলমান এলিটের পৃথক প্রতিনিধিত্ব মেনে নেওয়াই ছিলো মূল বনিয়াদ যার ওপরে পরবর্তী সমস্ত ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষের সংবিধান সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং তার নিশ্চিত পরিণাম হিসেবে ভারতের বিভাজন ও পাকিস্তানের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিলো। (কুলকার্নি রচিত: *পাকিস্তান-ইটস্ অরিজিন অ্যান্ড রিলেশনস উইথ ইন্ডিয়া,* পৃষ্ঠা ৭১)। কিন্তু সে যাই হোক, হিন্দু এলিট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস নামক প্লাটফরমে মুসলমান এলিট সুবিধে করতে পারলে লর্ড মিন্টোর শত প্ররোচনা সত্ত্বেও যে মুসলিম গড়ে উঠতো না, এটা সত্য। এমনকি লর্ড মিন্টোর হাতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সে জন্যই প্লাটফরম হিসেবে মুসলিম লিগ ছিলো দুর্বল। মুসলিম লিগ গঠিত হওয়ার পরেও মুসলমান রাজনীতিবিদরা কংগ্রেস ছাড়তে চাইতো না। হিন্দু এলিট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস কিন্তু এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যারা শক্তিশালী তাদের কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করতো। যে নোংরামি করে জিন্নাকে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করা হয়, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। (দ্রষ্টব্য : শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *জিন্না/পাকিস্তান : নতুন ভাবনা)*।

ব্রিটিশের সঙ্গে আপোসে সুবিধে আদায় করার জন্য হিন্দু এলিট ও মুসলমান এলিটের দুটো আলাদা দল গড়ে উঠলো এবং তারা শেষ পর্যন্ত দুটো আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে ক্ষমতা ভাগ করে নিলো—এ দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিন্তু এতটা সরল রেখায় বিকশিত হয়নি। লিগ ঘোষিতভাবেই ছিলো মুসলমানদের সংগঠন। কংগ্রেস কিন্তু কখনই নিজেকে হিন্দুদের সংগঠন হিসেবে দাবি করেনি। ঘোষিতভাবে দলটি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ (secular), বহু মুসলিম এই দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, বহু মুসলমান এলাকায় এই দলটির রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো ব্যাপক (উল্লেখ: উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনেও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩৬টি কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস বিজয়ী হয় ১৯টি কেন্দ্রে)। তবুও শেষ পর্যন্ত এই দলটি হিন্দু এলিটদের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছে। কেন এটা ঘটতে পারলো এটা বুঝতে হলে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জোরের জায়গাটা বোঝা দরকার। এ বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধে জরুরি, মুসলমান জাতীয়তাবাদের সেই দুর্বলতার জায়গাটি বোঝার জন্য, যে দুর্বলতা আজকের পাকিস্তানকেও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

মুসলিম নবজাগরণ ও হিন্দু নবজাগরণ উভয়েই যদিও ছিলো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসমুখী, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় বুর্জোয়া ও বড় জমিদার যদিও যে কোনো উপনিবেশিক দেশের সামন্ত শ্রেণী ও বড় বুর্জোয়ার মতোই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দানে অক্ষম ছিলো, ব্রিটিশের উপনিবেশিক শাসনে এদেশের জনগণের মধ্যে কিন্তু দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এই শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জন্ম নিয়েছিলো। বস্তুত সেটাই ছিলো বিদেশি শাসকের দিক থেকে দেশি এলিট-এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করতে চাওয়ার কারণ, আবার সেটাই ছিলো বিদেশি শক্তির সঙ্গে দেশি এলিটের দর কষাকষি করার শক্তির উৎস।

পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সাহায্য করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গড়ে তুলতে, যে ভাবধারার উপরেই দাঁড়ায় স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশের চিন্তাভাবনা যা ধর্মরহিত চিন্তা।

এই ধর্মরহিত বা ধর্ম থেকে বিযুক্ত বুর্জোয়া বিকাশের চিন্তাকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটা সুবিধা ছিলো, মুসলিম জনগোষ্ঠী যে সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলো। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতো এদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী কখনই এই সমস্যায় পড়েনি যে তার ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষার উৎস হয়েছে কোনো এক মহাহিন্দু আন্দোলন (খিলাফত যে ধরনের আন্দোলন ছিলো)। এদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, যা ছিলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, তার উৎস কোনো ধর্মীয় ভাবধারা ছিলো না (শিবাজী উৎসব সত্ত্বেও), তার উৎসে যা ছিলো তা হলো ভারতীয় হিসেবে স্বাধীনভাবে বিকাশের আকাঙ্ক্ষা, যে কোনো পদানত দেশেই যা জাতীয় মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা হিসেবে দেখা দেয়, যে আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার পথে বাধা ছিলো ব্রিটিশ শাসন। সুতরাং এ আকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণে বিকশিত হয়েছে সে পরিমাণে তা ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র অর্জন করেছে এবং তা করেছে ধর্মকে আশ্রয় না করেই। এই আন্দোলনের চরিত্র মূলত ব্রিটিশবিরোধী ছিলো বলেই কংগ্রেসের নেতাদের অনেককেই রাজবন্দী হিসেবে কারাবাস করতে হয়েছে, মুসলিম লিগ নেতাদের যে সম্মান কখনও জোটেনি। আর এই ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে এ আন্দোলনকে হতে হয়েছে ধর্ম রহিত জাতীয়তাবাদী। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ যে পরিমাণে ধর্মরহিত, এই চেতনাও ধীরে ধীরে সেই চরিত্র অর্জন করেছে। একদিনে তা হয়নি। এ চেতনার সঙ্গে হিন্দু জাগরণের চিন্তা বহু পর্যায়েই জড়িয়ে থেকেছে, এমন কি এ কথাও বলা যায় যে ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিশুদ্ধ রূপটি এদেশে কখনই দেখা দেয়নি। তবুও একথা সত্যি যে জাতীয়তাবাদ সে পথেই বিকশিত হয়েছে, এতটাই তা হয়েছে যে এই জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মরহিত ব্যক্তির স্থান পেতে অসুবিধা হয়নি, 'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম' নিয়ে বিতর্ক করতে সাহস দেখিয়েছে এই জাতীয়তাবাদ। এর ফলে লাভ হলো এই যে এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার আধার হিসেবে কংগ্রেসের বিকাশের ফলে কংগ্রেসও ক্রমশ গণচরিত্র অর্জন করেছে। দলটি ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো—এই ধরনের গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশি রাজাদের বিরুদ্ধে সংস্কারের আন্দোলন করেছে, আঞ্চলিক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছে, শ্রমিক আন্দোলন যুক্ত হয়েছে। তার নেতৃত্বকে ব্রিটিশদের কারাগারে দিন কাটাতে হয়েছে একাধিক্রমে বহু দিন ধরে—মুসলিম লিগ নেতৃত্ব যা কল্পনাও করেনি।

হিন্দু এলিটরা কংগ্রেসের এই রূপান্তর মেনে নিলেন কেন? কেন তাঁরা এটিকে মুসলিম লিগের মতো একটি কাগুজে সংগঠন করে রাখলেন না অথবা কংগ্রেস ত্যাগ করে অন্য একটি প্লাটফরম গড়লেন না? এই এলিটরা বুঝেছিলেন, তাঁদের দর কষাকষির রাজনীতির এই জাতীয়তাবাদই তাদেরকে অনেক বেশি সাহায্য

করবে—যদি এর নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকে। নেতৃত্ব হাতে রাখার জন্য হিন্দু এলিটরা এর সাংগঠনিক কাঠামোটিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখলেন—চাইলেও মুসলমান এলিট তা কব্জা করতে পারতো না, কমিউনিস্ট বা অন্য কোনো র‍্যাডিকালের পক্ষেও তা করায়ত্ত করা অসম্ভব ছিলো। (একভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তা বুঝেছিলেন)। নেতৃত্ব বাদে বাকি সবটাই তাঁরা দরাজভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাড়তি সুবিধে এর ফলে যা হলো তা হচ্ছে—হিন্দু এলিটদের 'আইডেনটিটি' খোঁজার জন্য বেদ-উপনিষদ ঘেঁটে কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হয়নি। কংগ্রেসকে 'জাতীয়দল'-এর মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হলো 'হিন্দুত্ব' নিয়ে তার কোনো ঘোষিত অবস্থান ছাড়াই। দল হিসেবে কংগ্রেস কতটা দৃঢ়মূল হলো তা আন্দাজ করতে এই তথ্যটি খেয়াল করাই যথেষ্ট যে স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও ঐ দলটি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার সাধ্য রাখে। বিপরীতে এটাও মনে করা যায় যে 'পাকিস্তান' তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও, মুসলিম লিগ দল হিসেবে পাকিস্তানে টিকে ছিল মাত্র ছ'বছর।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান

ভারতীয় হিসেবে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার আকাঙ্ক্ষা এবং সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আশ্রয় খোঁজা—এই প্রবণতা এ দেশে মুসলিম মানসে কোনো প্রভাব ফেলেছিলো কি? আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৫৭ সালের প্রায় ছয় দশক পরে এদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী জাতীয় স্তরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। এই আন্দোলনের প্রেরণা কিন্তু সৈয়দ আহ্মদ-এর মুসলিম 'নবজাগরণ' থেকে আসেনি। এটা এসেছিলো ইস্তাম্বুল থেকে এবং এর উৎস ছিলো অতি পশ্চাৎপদ ইসলামি চিন্তা-ভারনা। নবজাগরণ যে জাতীয়তাবোধ বিকশিত করতে চাইতো, খিলাফতের এই ব্রিটিশ বিরোধিতা সেই জাতীয়তাবোধই গড়ে তুলতো মহাইসলামের বদলে ভারতীয়ত্ববোধ যদি এই ব্রিটিশ বিরোধিতার উৎস হতো সেক্ষেত্রে সম্ভবত এই খিলাফত আন্দোলনকে ঘিরেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতো যা তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে পারতো। খিলাফত, বলা বাহুল্য, তা দিতে পারেনি। দ্বান্দ্বিক নিয়মে, উপনিবেশিক শাসনে উপনিবেশের বিরুদ্ধে যে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই স্বাদেশিকতা অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো। এবং কালক্রমে,মুসলিম লিগের অক্ষমতার কারণে এই জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক আধার হয়ে উঠলো জাতীয় কংগ্রেস কেননা জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে গণচরিত্র অর্জন করেছে এবং সেকুলার ভাবধারার প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার, খিলাফতের পরবর্তী যুগে কংগ্রেস যত বেশী করে গণচরিত্র অর্জন করেছে, আলিগড়-শিক্ষিত মুসলমানদের একাংশও ততই বেশী বেশী করে কংগ্রেস রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে। খিলাফতের ব্যর্থতা যাদের মোহমুক্ত করেছে এমনকি সেই মহাইসলাম পন্থীদের একাংশও কংগ্রেস-সংগঠিত আন্দোলনের শরিক হয়েছেন—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাঁদের অন্যতম। এটা ঘটনা যে এর

ফলে ৩০-এর দশকে লিগ রাজনীতি সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিমদের অন্য একটি জাতি হিসেবে চিত্রিত করার বদলে ভারতীয় হিসেবেই তাঁদের জাতীয় পরিচয়—এ চিন্তা মুসলিম মানসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এই পর্যায়েই। ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ ধারায় মুসলিম জনগণকেও সংগঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ আসে এই সময়ে।

জাতীয় রাজনীতিতে এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে। নির্বাচনটি যদিও সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি, এই নির্বাচনে যদিও বিত্তবানদের প্রতিনিধিত্বর গুরুত্ব ছিলো বেশি, তবুও এই ১৯৩৭ সালের আইন সভা নির্বাচনের ফলাফলে বোঝা যায়, লিগ নিশ্চিতভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলো খোদ মুসলিম ভোটদাতাদের কাছেই। নির্বাচনে পাঞ্জাবে মুসলিম লিগ জয়ী হয় মাত্র ১টি আসনে। সিন্ধু প্রদেশে লিগ পন্থীরা জয়ী হয় মাত্র ৩টি আসনে। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম সংরক্ষিত কেন্দ্রের মধ্যে লিগ জয়লাভ করে মাত্র ৩৯টি আসনে। উত্তরপ্রদেশে সংরক্ষিত ৬৭টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ২৭টি কেন্দ্রে জয়লাভ করে মুসলিম লিগ। ভারতের ১১টি প্রদেশের একটিতেও লিগ এককভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেনি। যেসব রাজ্যে মুসলিম ভোটদাতারা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলো না, সে সব রাজ্যেও লিগের বদলে জোরদার হয়ে ওঠে আঞ্চলিক দলগুলি, যার কোনোটিই লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বে আস্থা রাখতো না। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এমনকি ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনেও ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি ছিলো কংগ্রেসের দখলে। (এই সময়ের মুসলিম রাজনীতির একটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য: আয়েসা জালাল রচিত *দি সোল স্পোকসম্যান—জিন্না, দি মুসলিম অ্যান্ড দি ডিমান্ড ফর পাকিস্তান*)।

এ সময়ের মুসলিম মানসের সবচেয়ে ভালো প্রতিনিধি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। জিন্না-নিন্দিত এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিই ঠিকমতো বুঝেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের 'আইডেনটিটি'র সংকট কোথা থেকে আসে এবং 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' তাদের জন্য কী সর্বনাশা ভবিষ্যৎ নিয়ে আসতে পারে। খিলাফত থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, ভারতীয়ত্বর বাইরে ভারতীয় মুসলমানদের কোনো 'আইডেনটিটি' খোঁজার চেষ্টা মুসলিম জনগণের জন্য অলীক কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখানো ছাড়া কিছুই নয়। কারণ হলো, এক হাজার বছর ধরে এই ভারতের মাটিতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি—তার যাবতীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসহ। 'এই এক হাজার বছরের যৌথ জীবন আমাদেরকে এক অভিন্ন জাতীয়তাবাদে বেঁধে দিয়েছে। এটি কৃত্রিমভাবে করা হয়নি। প্রকৃতি তার প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই কাজ করেছে। ... কোনো অলীক কল্পনা কিংবা কৃত্রিম ছকে এটিকে ভেঙে দেওয়া যায় না।' (আজাদ : রায়গড় কংগ্রেস প্রদত্ত ভাষণ (১৯৪০); মহিরুল হাসান এর *ইন্ডিয়ান পার্টিশান* বই থেকে উদ্ধৃত; পৃষ্ঠা ৬৭-৬৪)।

ইংরাজ শাসকদের উস্কানিতে মুসলিম লিগ কিন্তু এই অলীকের পিছনেই দাঁড় করিয়ে দিলো ভারতীয় মুসলিম সমাজকে। এটা তারা করতে পারলো সেই ইসলামের জিগির তুলে বর্তমান পাকিস্তানকে যার দায় বহন করতে হচ্ছে পুরো

মাত্রায়, যে দায় থেকে কোনোমতেই অব্যাহতি পাচ্ছে না বাংলাদেশও। কী করে তা ঘটানো গেল এবং বাংলার ফজলুল হক থেকে পাঞ্জাবের সিকন্দর হায়েত খান কিংবা সিন্ধু প্রদেশের আল্লা বক্‌স কিভাবে মুসলিম রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মাত্র ৯.৫২ শতাংশের ভোটে কিভাবে বাকি নব্বই শতাংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, কংগ্রেসের হিন্দু এলিট কিভাবে সেকুলার রাজনীতির কথা বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল, কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী কিভাবে পাকিস্তান-প্রস্তাব রচনায় অংশীদার হলেন, কিভাবে যোগেন মণ্ডলকে দিয়ে হিন্দু ভোটভাগের খেলা খেলিয়ে তারপর তাকে একবস্ত্রে পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো—এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করতে সক্ষম হলো—এসব বহু আলোচিত ইতিহাস। তার পুনরাবৃত্তি সম্ভবত অপ্রয়োজনীয়। যেটা লক্ষণীয় তা হলো, মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের চকিত দিক পরিবর্তন। ১৯৩৭ সালে যে পাঞ্জাবে মুসলিম লিগকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, যে বাংলা জিন্নাকে নিরাশ করেছে সেই পাঞ্জাব, সেই বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী ১৯৪৫-৪৬ সালে বিপুল সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গেল লিগের পক্ষে। কেন এটা ঘটতে পারলো?

মসিরুল হাসান তাঁর 'লিগ্যাসি অফ এ ডিভাইডেড নেশন' পুস্তকে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নাকচ করার সেই উপাদান যা মুসলমান জনগণকে একজোট করতে পারে, তা খুঁজে নেওয়া যায় ইসলামের শিক্ষার মধ্য থেকে। ইসলামে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, ধনীর প্রতি ঘৃণা এবং সাম্যচিন্তা। হতদরিদ্র, লাঞ্ছিত অপমানিত মুসলমান জনতার কাছে ইসলাম দিতে পারে এই আশা যে, এক আশ্চর্য পুণ্যভূমিতে অচিরেই তাদের উত্তরণ ঘটবে যেখানে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচে যাবে, সবাই হবে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, সেখানে আর স্বার্থের সংঘাত থাকবে না, ক্ষুধা ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে সবাই মুক্ত হবে সেখানে। এই উত্তরণ ঘটানোর জন্য এমন কিছু কষ্ট করতে হবে না, শুধু চাই একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। লিগকে সমর্থন করতে হবে কারণ কায়েদে আজম সেই রাষ্ট্রই গড়তে চান। ১৯৪৫-৪৬ সালে মুসলমান মানস প্লাবিত হল এই চিন্তায়। এই প্লাবনের গতি ছিলো অপ্রতিরোধ্য। ইতিহাসের পরিহাস, এই মুসলিম মানস নেতা হিসেবে মানলো এমন এক ব্যক্তিকে যিনি নামাজ পড়তেন না, নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া যাঁর ব্রেকফাস্ট হতো না। আরও পরিহাস, এই মানস বাতিল করে দিলো মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে যিনি ছিলেন নামাজনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ আরবি শিক্ষিত মুসলমান।

সে যাই হোক, এই প্লাবনের কারণ কী, তা ভাবা যেতে পারে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে কমিউনিস্টরা রুখে দেয় জনগণকে এই ধরনের একটা সমাজ গড়ার কথা বলেই (চীনে হয়েছিলো চিয়াং কাইসেক বিরোধী লড়াই-এ)। পদানত দেশের কমিউনিস্টরা যদি এই কর্মসূচির সমর্থনে জনগণকে সমবেত করে সাফল্য অর্জন করতে পারেন, ইসলাম পন্থীদেরও এই ধরনের কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব ছিলো না। কারণ বঞ্চিত মানুষ অন্তর থেকে চায় এই ধরনের একটি শোষণ মুক্ত সমাজ। এটা হতে পারতো এক ধরনের 'নয়া গণতন্ত্র', যা বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি র‍্যাডিকাল। কিন্তু সমস্যা হলো একশ' বার কোরান পড়েও ধনীকে তার ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে ফকির হওয়ার শিক্ষা দেওয়া যায় না—ধনীর বিরুদ্ধে গড়তে হয় সংগ্রাম, প্রয়োজনে রক্তপাতময় সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামে ইসলাম-আশ্রিত ধনীকেও টার্গেট করতে হয়। অন্যথায় এসব প্রতিশ্রুতিই হয়ে পড়ে একটা বিশাল ধাপ্পা। বলা বাহুল্য, লিগের এ টার্গেট ছিলো না; টার্গেট ছিলো, ভারতবর্ষ থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে ভারতের মতোই আর একটা রাষ্ট্র কায়েম করা। এই রাষ্ট্রে মুসলিম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কোনো অতিরিক্ত সুবিধে হতে পারতো না।

এক কথায় বললে, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে লিগ ইসলামের নাম করে যা দিয়েছিলো তা হলো একটি নিছক ধাপ্পা।

প্রশ্ন হলো, মুসলিম জনগোষ্ঠী এ ধাপ্পার শিকার হলো কেন? এটা ঘটনা যে এর পিছনে কাজ করেছে একটি সাময়িক উন্মাদনা। বলা যায় যে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫-৪৬ সালের সময়সীমায় লিগকে এক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে এই উন্মাদনা সৃষ্টি করার জন্য। এর জন্য সচেতনভাবে কাজে লাগানো হয়েছে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের রোমান্টিক ইসলাম চিন্তাকে—মহম্মদ ইকবালের তৎকালীন রচনাবলীতে যার প্রমাণ আছে। মুসলিম তরুণ সমাজকে কংগ্রেস সম্পর্কে বিষিয়ে তোলা হয়েছে সত্য-মিথ্যা-অর্ধসত্য প্রচারের মাধ্যমে। কাজে লাগানো হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই উদ্ভট প্রস্তাবকে যে মুসলমান (দুর্বল) জাতীয় বুর্জোয়ার 'আন্দোলন'কে সমর্থন করা উচিত (যদিও এই আন্দোলন আদৌ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলো না)। সর্বোপরি কাজে লাগানো হলো মুসলমান পীর এবং উলেমাদের যাতে বিষয়টি একটি ধর্মযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করতে পারে। এগুলোর কোনোটা করতেই লিগ নেতৃত্বের সংকোচ বা লজ্জা হয়নি। জিন্নার মতো মানুষ, যিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে দেবার জন্য খিলাফতপন্থীদের নিন্দা করেছিলেন, তিনিই অসংকোচে মুসলিম ধর্মউন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান গড়ার জন্য জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুললেন, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান'-এর নামে গুণ্ডা লেলিয়ে দিলেন সুবাবর্দির শাসন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে। দ্বিজাতিতত্ত্ব তার কুৎসিত রূপ নিয়ে আবির্ভাব হলো এই উপমহাদেশে।

এর একটা দাম দিতে হলো এই উপমহাদেশের মুসলিম জনগণকে, জিন্নাকে যার দায় বইতে হয়নি। মুসলিম জনগণকে অস্বীকার করতে হলো হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অভিন্ন ভারতীয়ত্বকে—তাঁরা হয়ে গেলেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বদলে মুসলিম জাতি। বলা বাহুল্য, এই রূপান্তরের দায় তাঁদের বইতে হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, হয় 'সংখ্যাগুরু' নয় 'সংখ্যালঘু' হিসেবে। এর দরুন গুজরাটে তাঁরা নিগৃহীত হবেন, করাচির রাস্তায় মার খাবেন লক্ষ্ণৌ থেকে আসা বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে। উল্টো দিকে 'হিন্দু' হবার দায় বহন করবেন ফরিদপুরের 'ভট্টাচার্য' থেকে 'গায়েন' উপাধিযুক্ত মানুষেরা—যাঁরা সেখানে সংখ্যালঘু। উপমহাদেশ পড়লো এক চিরস্থায়ী আত্মপরিচয়ের সংকটে।

প্রশ্ন হলো, ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সেই বিকাশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেন হলো না, যা তাঁদের এই ধর্মাশ্রিত দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে

বাঁচাতে পারতো? প্রশ্নটিকে হালকাভাবে নেবার কোনো কারণ নেই। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা পর্যায় পর্যন্ত ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ যে ঘটেছে তা প্রমাণিত। এই জনগোষ্ঠীকে হিন্দু মহাসভা দ্বিজাতিতত্ত্বে বাঁধতে পারেনি। বিজেপি-কেও এই খণ্ডিত ভারতে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশের বেশি নয়, সেখানে সতর্কতার সঙ্গে তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে হয়। এই ভারতে 'সাম্প্রদায়িকতা' এখনও রাজনৈতিক নিন্দাসূচক শব্দ; খুব রাজনৈতিক দলই নিজেকে প্রকাশ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে পরিচয় দিতে রাজি থাকে। রাষ্ট্রকে ধর্মাশ্রিত ঘোষণা করার সাহস এদেশে এখনও রাষ্ট্রনেতাদের নেই। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কিন্তু উল্টো জিনিসটা ঘটেছে। রাষ্ট্র সেখানে ধর্মকে ত্যাগ করতে সাহস পায় না।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মরহিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ না ঘটার পিছনে কি আছে অশিক্ষা, দরিদ্র ও বঞ্চনা? এগুলো অবশ্যই পশ্চাদপদ চিন্তাভাবনা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৩৫-৪৫-এর সময়সীমায় ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির পিছনে এগুলোই সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই পশ্চাদপদতার উপাদান হিন্দু সমাজেও সে সময় প্রবলভাবেই বিদ্যমান ছিলো। তবুও হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ হিন্দু মহাসভার আশ্রয় নেয়নি। সাভারকর কিংবা গডসে এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও কংগ্রেসে বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

মুসলিম ধর্মাশ্রয়ী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ইতিহাস কেন উল্টোপথে হাঁটলো সম্ভবতঃ এর উত্তর আছে ধর্ম হিসাবে ইসলামের সংগঠন গড়ার বিপুল ক্ষমতার মধ্যে। হিন্দুদের মতো ভারতীয় মুসলমানরাও নানা জাতে বিভক্ত। হিন্দুদের মতোই জনগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদের মধ্যেও আছে। বিপুল আঞ্চলিক বৈষম্য। মুসলিম সমাজেও আছে ধনী দরিদ্রের বিপুল ব্যবধান। এইসব সত্ত্বেও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ এই জনগোষ্ঠীকে একজোট করতে পারে। সেটা সম্ভব হয় এই কারণে যে এই ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই ধর্মাবলম্বীদের একজোট করতে পারে প্রবল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার জোরে (শিখ ধর্মও যে কাজ করতে পারে)। হিন্দু ধর্ম তা পারে না, কারণ এই ধর্মের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ভালো মন্দ দুটি দিকই আছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের খারাপ দিকটিকে, কাজে লাগানো হয়েছে কৃত্রিম দ্বিজাতিতত্ত্ব বিকাশের জন্য, যা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মুসলিম জনগোষ্ঠীকেই।

উপসংহার : জিন্নার দায় ও আজকের উপমহাদেশ

জিন্নার কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিলো না। ধর্মকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন পাকিস্তানপন্থী এলিটদের স্বার্থে ভারতকে খণ্ডিত করার জন্য। জিন্না নিজে কিন্তু জানতেন, এই ধর্মাশ্রয়ী উন্মাদনা দিয়ে পাকিস্তানে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়া অসম্ভব। তাই পাকিস্তান গঠিত হবার পরই তিনি 'সেকুলার' রাষ্ট্রের সওয়াল করতে শুরু করেন। কিন্তু জিন্না বোধ হয় জানতেন না, এটা ছিলো ইতিহাসের চাকাকে

উল্টো দিকে ঘোরাবার চেষ্টা। পাকিস্তান তৈরি হয়েছে একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে, সে জাতির জাতীয় রাষ্ট্র'র দাবিকে মূর্ত রূপ দিতে। সুতরাং তাকে থাকতে হবে সেই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকেই একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

কিন্তু সমস্যা এই যে, এটা ছিলো একটা অলীক চিন্তাকে বাস্তব হিসেবে চালানোর চেষ্টা, যে প্রচেষ্টার অসারতা ব্যাখ্যা করেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে তার ক্ষতিকারক পরিণাম বর্ণনা করে বহু পূর্বেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। পাকিস্তান গঠনের পরই বোঝা গেল, এই হুঁশিয়ারির বাস্তব মূল্য কতটা। সাময়িক উন্মাদনা কাটবার পর স্পষ্ট হলো যে ধর্ম দিয়ে এই বিপুল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনগোষ্ঠীগুলিকে একটি অখণ্ড জাতিরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ রাখা এমন একটি কঠিন কাজ, যা করে ওঠার ক্ষমতা জিন্না কেন, কোনো পাকিস্তান রাষ্ট্রনেতার নেই। কোন জাদুমন্ত্রে নোয়াখালির মুসলমানকে বালুচ মুসলমানের বাড়িতে দাওয়াতে বসানো যায়, দেখা গেল কেউ তা জানে না। জিন্না দেখে যাননি, তবে ঢাকায় উর্দুর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, ধর্ম দিয়ে এ রাষ্ট্রকে টেকানো যাবে না। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাঁর এ আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করলো ১৯৭২ সালে।

সমস্যা কিন্তু তাতেও মিটলো না। খণ্ডিত পাকিস্তান নতুন করে যাত্রা শুরু করে ভুট্টোর হাত ধরে। ভুট্টো উত্তরাধিকার সূত্রে যে রাষ্ট্র পেলেন সে রাষ্ট্র রক্ষার জন্যও দরকার ছিলো মতাদর্শ। দ্বিখণ্ডিত হবার পর ইসলামাবাদ-কেন্দ্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হয়েছে সেই মতাদর্শ খুঁজতে যা দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা অতিক্রম করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি 'জাতিতত্ত্ব' সরবরাহ করতে পারে। পাকিস্তান তখন আর এই উপমহাদেশে মুসলিম 'জাতি'র স্বাভাবিক আশ্রয় নয়। পাকিস্তানের চেয়ে ভারতে আছেন বেশি সংখ্যক মুসলমান। বাংলাদেশও এই উপমহাদেশেরই একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের চেয়ে পাকিস্তানকে তার ন্যায্যতা খোঁজার জন্য অনেক বেশি করে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার দিকে—মহাইসলাম বোধের সাহায্যে জাতি রাষ্ট্রের সমস্যা মেটাবার জন্য।

বলা বাহুল্য পাকিস্তানবাসীর কাছে তা সুখের বিষয় নয়। মহাইসলামবোধ কখনই জাতীয়তাবাদের বিকল্প নয়। এই রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তাই তীব্র হয়ে উঠেছে। অলীক উন্মাদনা তাঁদের না দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুত স্বর্গলোক, না আনতে পেরেছে জাতিগত সংহতি। পাকিস্তানের এলিটকে তাই নূতন করে ভাবতে হচ্ছে, জাতি হিসেবে পাক জনগণের অস্তিত্বের চাহিদা পূরণ করতে পারে, এমন মতাদর্শ কিভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচ, মুজাহদিন ও পাকতুন জনগণকে এক রাষ্ট্রের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করা যায়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা বা পাকভুক্তির দাবি অথবা ভারতবিরোধী যুদ্ধ জিগির—জাতীয়তাবাদের এই সমস্যা এসব কিছু দিয়ে যে মিটবে না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাকি থাকে ধর্মীয় মৌলবাদ। ইসলামের যে দিকটি সত্যই দেশটিকে অস্তিত্বের সংকট কাটাতে সাহায্য করতে পারে তা হলো সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ, উৎপাদনের উপকরণে যৌথ মালিকানার চিন্তা, ধনীর বৈভব দূর করে 'জাকর'-এর মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানি মুসলিম এলিটের পক্ষে এই কঠিন ইসলামের পথ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। সহজ বিকল্প হলো মৌলবাদী ইসলামের জিগির তোলা যা শরিয়ত আইনের নামে মধ্যযুগীয় বীভৎসতা আনতে পারে, নারীকে কুৎসিততম অমর্যাদার পাত্রীতে রূপান্তরিত করতে পারে এবং হতদরিদ্র মানুষের গায়ে উর্দি চাপিয়ে কাশ্মীরে 'জেহাদ' সংগঠিত করতে পারে। পাকিস্তান গ্রহণ করে সেই সহজ বিকল্প যতক্ষণ না পর্যন্ত তার দাম দিতে গিয়ে রাষ্ট্রই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, এভাবে সমস্যা মেটে না। জিন্নার দায় মেটানোর সমস্যা মেটাতে ধর্মরহিত জাতীয়তাবাদের পথ তাকে ধরতেই হবে। কিভাবে ধরা যায় আজকের পাকিস্তানের কাছে সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ কিছু পরিমাণে আছে বাংলাদেশেও। গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে বাংলাদেশ সম্ভবত এ সমস্যা কাটিয়ে তুলবে অদূর ভবিষ্যতে। পাকিস্তানে কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ

ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ

গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বাঙালি সংস্কৃতির একনিষ্ঠ ধারক আমার পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহাকে উৎসর্গিত।

গণতন্ত্র এমন একটি শব্দ যা আমরা অহরহ ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা মোটেই স্পষ্ট নয়। বস্তুত গণতন্ত্র শব্দটি কেউ কেউ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে থাকে তাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুবিধামতো। এমনকি কোনো ডিক্টেটর ছলচাতুরী বা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর যে সরকার গঠন করেন, সেটাকে গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের পর সমরনায়ক নেপোলিয়ন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর গণভোট আয়োজন করে দাবি করেছিলেন, তিনি জনসমর্থন লাভ করেছেন। এভাবে নেপোলিয়ন তাঁর অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর ঠিক ওই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' আসলে মুখোশধারী সামরিকতন্ত্র, তা প্রকাশ হতে বেশি দেরি হয়নি। আমাদের বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসেও এ ধরনের নজির পাওয়া যাবে। অবৈধ উপায়ে দুই সেনাপতি জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং রাতারাতি লেবাস পাল্টে নিজেদের গণতন্ত্রের ধারক বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমরা তো ভালোভাবেই পরিচিত। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কী? কোনো সরকার প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রী কি-না, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে প্রধান মাপকাঠি হলো, সে সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা দেশের জনগণের হাতে রয়েছে, না কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষ নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

গণতন্ত্রের পেছনে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা রয়েছে। যেমন–গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ আত্মনির্ভরশীল এবং তারা তাদের বিবিধ সমস্যা অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই সমাধান করতে পারে। এ বিশ্বাস তারা পোষণ করে। অবশ্য জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি কোন পথে আসবে–ওই প্রশ্ন নিয়ে মতবিরোধ বা মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে ওই মতবিরোধ বা মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়ে থাকে, হিংসাত্মক বা অসাংবিধানিক মাধ্যমে নয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজে যারা নিপীড়িত-সর্বহারা শ্রেণী, তারা গণতন্ত্রের সূচনা করেনি; অত্যাচারিত বা নিঃস্ব হলেই মানুষ বিপ্লবী হয়–এ ধারণা ঠিক নয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লব তারাই করে এবং করেছে, যাদের

কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে অর্থাৎ যারা একেবারে নিঃস্ব বা সর্বহারা নয় এবং যারা সমাজে শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার সম্বন্ধে কেবল সচেতন নয়, একে প্রতিহত ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেও বদ্ধপরিকর। এই শ্রেণী শিক্ষিত, সচেতন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে বিশ শতকের রুশ ও চীন বিপ্লব এবং পরবর্তী কালের সব বিপ্লবের নেতৃত্ব এসেছে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীমাত্রই বিপ্লবী হয়-এ কথাও ঠিক নয়। মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় তখনই, যখন ওই শ্রেণী নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আঠারো শতকের আমেরিকার বিপ্লবের নেতা টমাস জেফারসন ও টম পেইন কিংবা ফরাসি বিপ্লবের নায়ক রোবসপিয়ার বা দান্তন কিংবা উনিশ শতকের কার্ল মার্কস ও অ্যাঙ্গেল্স এবং বিশ শতকের লেনিন, মাও সে তুং, হো-চি-মিন ও কাস্ত্রো, এমনকি আমাদের উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা, যেমন-মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানরা সবাই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান। কিন্তু তাঁরা তাঁদের শ্রেণীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে সাধারণ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই জননেতা হতে পেরেছিলেন।

এরিখ ফ্রোম প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর মতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন একটা অস্বাভাবিক ভীতি রয়েছে, যার ফলে তারা চিরাচরিত সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার-বিচারের বেড়াজাল বা বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ভয় পায়। ওই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকে স্বার্থান্বেষী নেতারা, যারা জনগণের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সমর্থন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়াস পায়। এ কারণে গণতন্ত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য। সব ধরনের কুশাসন ও শোষণ এবং কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো গণতন্ত্রের মূল আদর্শ। ওই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বহু মানুষ আত্মাহুতি দিয়ে এসেছে।

গণতন্ত্রের কথা বলতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা এসে যায়। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ধর্ম হলো মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা ধর্মীয় পরিচয়ের দিক দিয়ে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন-কেউ মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ অথবা খ্রিস্টান, এমনকি কেউ কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী নাও হতে পারে; কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় অভিন্ন অর্থাৎ তারা একই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সে হিসেবে সবক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। ঠিক এ কথা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ উপলব্ধি করেছিলেন; যদিও বড়ো দেরিতে। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করলে তা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে-এ কথা বুঝতে পেরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক দিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদের উদ্বোধনী সভায় জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে নীতিনির্ধারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হয়, তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তান হবে একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-যেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সবাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করবে। জিন্নাহ সাহেবের নিজের ভাষায় : 'You may belong to any religion, caste or creed, that has nothing to do with the business of the state.'

পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে 'ইসলামি জোশ'-এর নামে যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার সামনে কোনো ধরনের যুক্তি বা যাকে common sense অর্থাৎ সহজাত বুদ্ধি বলা হয়, টিকতে পারেনি। যে সাম্প্রদায়িক তরঙ্গকে পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ তাঁর নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সেই উত্তাল তরঙ্গকে তিনি রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এমনিতে তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমস্যাজর্জরিত অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে বাঙালি মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এই নয়া রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু হলো। তারা উপলব্ধি করতে লাগল যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী–যারা ছিল অধিকাংশই অবাঙালি, তারা ইসলাম ও জাতীয় সংহতির নামে এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে তাদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে চরমভাবে উপেক্ষা করে তারা বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা ও 'ইসলামি তমদ্দুন' চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করলো। এর বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের বাঙালিরা প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। বস্তুত ১৯৪৮–৫২ এই সময়ের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই জাতিসত্তা যে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ, সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সেই ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে। ওই ভাষণে তিনি পরিষ্কার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' এই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে নিহিত ছিল আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবাণী। মনে রাখা প্রয়োজন, এই অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, আমাদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এসবেরই পরিণতি। একটা কথা এখানে বার বার জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন, সেটা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল আদর্শগত ভিত্তি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশকে পাকিস্তানি কায়দায় ইসলামীকরণ করার ফলে আমাদের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। দেশের অমুসলমান জনসাধারণকে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। বস্তুত তাদের মধ্যে অসন্তোষ,

হতাশা, নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব দানা বেঁধে উঠছে। গোটা জাতির জন্য এ পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ও রাষ্ট্রের ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া যদি এভাবে জোরদার হতে থাকে, তাহলে প্রতিবেশী ভারতেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে–এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ফলে ভারতের মুসলমানরাও বিপন্ন বোধ করবে।

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত ও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরপরই। হিংসাত্মক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাঙালির স্বাধীন সত্তাকে বিকৃত করে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। পাকিস্তান আমলের ধ্যানধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা শুরু হলো। যে 'জয় বাংলা' ধ্বনি ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়ধ্বনি, একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের 'হায়দারি হাঁক'–সেটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো। তার বদলে চালু করা হলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর অনুকরণে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইসলামকে কখনো এমনভাবে অপব্যবহার করা হয়নি, যেমনটি ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের 'ইসলাম-পছন্দ' ও 'পাকিস্তান-পছন্দ' সমরনায়করা করতে শুরু করলেন। এই হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই। তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যুক্ত করা হলো। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হলো। জিয়ার আমলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, পরে এরশাদের আমলে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার ফলে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে খালেদা জিয়ার আমলে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বেঁধে এই ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়াকে আরো জোরেশোরে চালিত করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় হলো, বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও এই অশুভ প্রক্রিয়াকে অতি উৎসাহের সঙ্গে বহাল রাখা হয়েছিল।

দেশ আজ এক ভয়াবহ অবস্থান সম্মুখীন। ধর্মব্যবসায়ী, মতলববাজ, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের হাতে পড়ে গোটা দেশের মানুষ আজ দিশেহারা। এই সময়ে আমি আশা করি, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ, সুশাসিত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

মিহির সেনগুপ্ত

পন্থহারার দেশ-সন্তাপ

মননশীল প্রবন্ধ নিবন্ধ বা সুখপাঠ্য গল্প উপন্যাস লেখার সাধ্য আমার নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই স্মৃতি-আলেখ্য রচনাতেই আশ্রয় নিতে হয়। তার ফাঁকে ফোকড়ে হয়ত মিশে যায় নানান আশ পাশ কথা। কথা বাসি না হলে আবার আমার পছন্দ হয় না। জন্ম কাঙাল কিনা, তাই এই অভ্যাসটি চিন্তা চেতনে বড় জাঁকিয়ে রাজত্ব করে। ভাবছি, দেশছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হবার কথা নিয়ে খানিক জাবর কাটলে কেমন হয়। অধুনা তাৎক্ষণিক ব্যাপার-স্যাপারের বড় দাপট। কিন্তু সেসব নিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারব না। দেশ ত্যাগের ব্যাপারটা নিয়েই তাই শুরু করছি। বলা বাহুল্য, এর সিংহভাগ জুড়েই থাকবে ব্যক্তিগত কথাবার্তা। তবে চেষ্টা করব তার মধ্য দিয়েই আমার মত জনেদের দেশ ছাড়ার মানসিকতার একটি সাধারণ চিত্র উপস্থিত করতে। বিষয়টি নিয়ে নানান জন নানান ভাবে লিখেছেন, বলেছেন, গবেষণাদিও করে চলেছেন। আমার কথাটিই বা বাদ যায় কেন?

আজ মনে হয় আমার দেশ ছাড়ার আয়োজন শুরু হয়েছিল বোধ হয় আমার জন্মেরও বহু বহু কাল আগে। বাঙালি অভিধাযুক্ত মানুষদের দেশত্যাগের ক্রমান্বয় প্রায় জন্মসূত্রে। আমি বাংলাদেশের নাগরিক নই। তথাপি নিজেকে বাঙালি-সন্তান বলেই পরিচয় দিই। পারিবারিক এবং গোষ্ঠীগত ইতিকথায় জানি যে দেশত্যাগ করার পৌনঃপুনিকতাটা আমাদের পুরুষানুক্রমেই বিধিলিপি। হয়ত গোটা মানবজাতিরই তাই। তবে সে আলোচনায় গেলে কথন তার গতিপথ হারাবে। বিগত-কালের তাবৎ কাহিনীও এই আলেখ্যে বলা যাবে না। এ কাহিনী দেশভাগ পরবর্তী নির্বোধ কর্মকাণ্ডের ফল হিসাবে যে দেশত্যাগ, তারই আলাপ-বিলাপ মাত্র।

জ্ঞান হবার পর থেকে নিজগ্রাম এবং আশপাশ গ্রামগুলোতে, গৃহস্থশূন্য তালাবদ্ধ বাড়ি অথবা পোড়ো ভিটে দেখে দেখে, একের পর এক আতঙ্কিত পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে প্রথমে গঞ্জের ভাড়া ঘরে এবং সেখান থেকে অজানা-অনির্দিষ্ট ঠিকানায় পাড়ি দিতে দেখতে দেখতে, আর অভিভাবকদের উন্নাসিক আচরণ এবং মুসলমানদের প্রতিনিয়ত কাটব্য শুনতে শুনতে, দেশছাড়ার অনিবার্যতা যেন হাড়ে মজ্জায় মিশে স্বতঃসিদ্ধ একটা ধারণায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অভিভাবকদের মানসিকতায় বলাবাহুল্য, আমাদেরও মানসিক পুষ্টি হয়ে চলছিল। হবে নাই বা কেন? এটা যে পরম্পরার প্রতি আদ্যন্ত অনুরক্ত এবং মোহযুক্ত একটি দেশ। পরম্পরার শিক্ষা, তা ভাল হোক বা মন্দ, তা নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন তোলার কথা সেকালে ভাবেনি। আজও যে তেমন ভাবে, তাও নয়। এটা অবশ্য হিন্দু

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মজ্জাগত। ভাল বা মন্দ, সব পরম্পরাই আমাদের কাছে বড় আদরের।

'বিষাদ-বৃক্ষ' নামে বছর দশেকের স্মৃতি নির্ভর একখানা বই লিখেছিলাম। আমাদের মত, দেশে থেকে যাওয়া মানুষেরাও কেন ক্রমে ক্রমে দেশ ছাড়ল তার প্রেক্ষাপট নিয়ে সেখানে, নিজের বোধ বুদ্ধিমত অনেক কথা লিখেছি। সেই কাহিনীর শেষে আভাস দিয়েছিলাম যে আমি 'হিন্দুস্থান' যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি শেষ পর্যন্ত। দেশ ছাড়ার মোক্ষম সময়টির কথা, বা এক জ্বলন্ত চুলো থেকে বাঁচতে, অন্য এক তপ্ত 'তাবালে' এসে পড়ার অভিজ্ঞতাটার কথা নিয়ে কিছু সেখানে বলা হয়নি। সেসব নিয়েও একখানা স্মৃতি আলেখ্যের ইচ্ছে আছে। সংস্কৃতিগর্বী বাঙালির অহংকারের বেলুনটায়, সেই আলেখ্য হয়ত একটা আহাম্মকি আলপিন ফুটিয়ে কেলেঙ্কারি বাঁধাবে, এই ভেবে এখনও সেই ইচ্ছেটা মনে মনে রেখেছি। বর্তমান মওকায় ভাবছি, তার সামান্য আভাস দিয়ে রাখি না কেন। এওতো বাঙালিরই কথা।

আমার সম্প্রদায়ের বাস্তু-ঠাকুর যেন তাঁর আসন উঠিয়ে নিয়েছিলেন তখন আমাদের সেইসব গ্রামগুলো থেকে। দেশ ছাড়ার আগে অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল কয়েকটা মাস। সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। অথচ মনে মনে বুঝেছিলাম যেতে হবেই। অভিভাবকেরাও কিছু বলছিলেন না। তাঁদের তখন আর নিজস্ব উদ্যোগ বা ক্ষমতাও এমন ছিল না যে আমাকে হিন্দুস্থান পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তার সম্যক কারণও ছিল। মধ্যস্বত্ব লোপ হলে, কোলকাতায় মামাদের যৌথ আস্তানাটি ছত্রখান হয়ে গিয়ে আমার অগ্রজরা উদ্বাস্তুরও অধম জীবন যাপন করছিল। সুতরাং আমাকে কোথায়ই বা পাঠাবেন? আবার পর হয়ে যাওয়া নিজ দেশে আমার কিছু করার বা হওয়ারও উপায় নেই। সুতরাং অস্থিরতা। বিষাদবৃক্ষে এর বিস্তারিত কথা আছে। অসম্ভব হতাশায়, এই সময়টাতে, প্রায় মাসখানেক গোটা বরিশাল জেলা ভবঘুরের মত ঘুরেছি। কিন্তু সঠিক কোনো পথ পাইনি।

সেই ঘোরার সময় নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, এই মাটিকে যতই ভালবাসি না কেন, বাস্তবিকই এখানে আর থাকতে পারব না। এক্ষেত্রে এই দেশ পরিত্যাগকারী অন্য অনেকের সঙ্গেই এখানে থাকতে না পারার ব্যাপারে আমার বক্তব্যের কিছু ভিন্নতা আছে। আমার অঞ্চলে পঞ্চাশের হাঙ্গামার পর সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাচার কখনোই এমন হিংস্র হয়নি যে সে কারণে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্যবাধকতা ছিল। তাহলে 'এখানে থাকতে পারব না' এ রকম একটা কথা মনে এল কেন, সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আসলে ভালবাসার ব্যাপারটা, নিজের কাছে, দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তটা পাকাপাকি নেওয়ার আগে পর্যন্ত বোধে ছিল না। বাল্যাবধি জেনেছি হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ এবং পাকিস্তান মুসলমানদের। একথা আমাদের অভিভাবকেরা যেমন বুঝিয়েছেন, তেমনি হাটে, মাঠে, বাটে, ইস্কুল কলেজে, সর্বত্র সেই যুগে অনেকেই বুঝিয়ে ছেড়েছেন। তখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল 'সসেমিরা' গোছের। বয়স তখন খুবই কম। স্বাধীনতা বা আজাদি অর্থে ঠিক কী বোঝায় জানি না। বড়রা বলে তাই শুনি। চৌদ্দই আগস্ট উৎসব হয়, আজাদি হাসিল করার। ইস্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ হয়। পতাকা উত্তোলন হয়। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি

ওঠে। সবার সঙ্গে আমরাও যোগ দিই। ঐ পর্যন্ত। কেউ বক্তৃতা করলে, সেখানে দেশ এবং জাতির বিষয়ে যে কথা বলা হয় তা শুধুমাত্র মুসলমানদের বিষয়ে। হিন্দুদের কথা কিছু হয় না। গ্রামগুলো শূন্য হয়ে যাবার বৃত্তান্ত নিয়ে কোনো সভায় কোনো আলোচনা হয় না। আল্লাহর গুণগান প্রভূত হয়। কায়েদই আজম, কায়েদই মিল্লাত বা ক্ষমতায় থাকা রাষ্ট্র পুরুষদের কথা, শুকুর-গুজার এস্তের হয়। মানুষের অর্থাৎ সাধারণের কথা কিছু হয় না। আমরাও পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাক্‌সার জামিন্ সাদ্‌বাদ বলি এবং গাই, অথচ অন্তরে জানি আমরা নাগরিক হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর। এখন বড় হচ্ছি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অনিশ্চয়তা চেপে বসতে শুরু করেছে মন মগজে। ছটফটানি বাড়ছে।

শিশুকাল থেকে এক অলীক ভূখণ্ডের কথা নিয়ত কানের কাছে বলে বলে, পারিবারিক এবং সমাজ জ্যেষ্ঠরা, তার একটা মোহময় আকৃতির নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন সেই অলীক দেশ নাকি আমাদের নিজস্ব। তার নাম হিন্দুস্থান। সুতরাং জ্ঞানত জানতামই না, যে দেশে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে, তাকে ভালবাসি কিনা। আমরা আজাদির ক্ষণের আওলাদ। পরাধীনতার জ্বালা কী, সে বিষয়ের ধারণা শুধু গালগল্প মারফত এবং পুঁথিগত। বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং স্বাধীনতা বা আজাদির আস্বাদই বা কী, তাও জ্ঞানগোচর নয়।

আজাদির একটা আস্বাদই আমার কাছে দিনে দিনে প্রকট হচ্ছিল, সেটা আদৌ আনন্দের নয়, বিষণ্ণতার। তার আভাস আগেই দিয়েছি। দিন দিন যেমন হিন্দুগ্রামগুলো শূন্য হচ্ছিল, তাতে এটা বুঝতে পারছিলাম এই গ্রামীণ-দেশ তার প্রাক্তন মুখরতায়, মোহময়তায় আর কোনোদিন ফিরে যাবে না। যেসব অনুষঙ্গ নিয়ে এই গ্রামগুলো একদিন বর্ণাঢ্য ছিল, প্রাণবন্ত ছিল, যে আকর্ষণে প্রবাসে কর্মরত জনেরা উৎসব পার্বণে বা ছুটি-ছাটায় 'দেশের বাড়িতে' আসত এবং গ্রামীণ জনেদের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রেখে গ্রাম-শহরের সংযোগ রক্ষা করত, তা ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছিল। সেই পরিবস্থায় প্রস্থানের জন্য যে বা যারাই দায়ী হোক না কেন, অথবা তা যদি সংখ্যালঘুদের অন্তর্গত উচ্চ-বর্ণীয়দের দুষ্কর্মের ফলও হয়, বা একান্ত দৈব-নির্বন্ধও, জনপদগুলো যে মৃতগ্রহের মত রসশূন্য হয়ে গেছে, এখানে যে আর কোনও দিনও কোনও অঙ্কুরের উদ্গম হবে না, তা আমার অনুভবে একান্তই ধ্রুব হয়ে গিয়েছিল। সারা জিলাটায় ঘোরার সময় যে যে গ্রামগুলোতে গেছি, সেই সেই স্থানের শূন্যতা দেখে, এই অনুভব আমার মানসিক ভিত্তিতে ধস নামালে আমি দেশ ছাড়তে কৃত সংকল্প হয়েছিলাম।

ঐ সময়টায় মুসলমান এবং হিন্দু গ্রামগুলোয় কিছু ভিন্নতা দেখেছিলাম। আজ আর তা নেই। সেই সময় কিছুকালের জন্য অন্তত মুসলমান গ্রামগুলোর মধ্যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্যাপারটা, অনেক হিন্দুদের ধারণায়, তাদের ফেলে আসা, ছেড়ে আসা সম্পত্তির নানা উপায়ে দখলদারির কল্যাণে সাময়িক রক্ত সঞ্চারের ফল। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে (এখন বাংলাদেশ বলাই উচিত) এ রকম একটা ধারণার বিলক্ষণ বাস্তবতা আছে। তবে এটাকেই একমাত্র সত্য বলে ধরলে, আর একটা বড় সত্যকে বোধ হয় এড়িয়ে যাওয়া হয়। দেশত্যাগের ফলে হিন্দু বাঙালি যতই

ক্ষতিগ্রস্ত হোক, মুসলমান বাঙালি বিলক্ষণ লাভবান হয়েছিল। বিভিন্ন গ্রামে ঘোরার সময় আমার এরকম ধারণা হয়েছিল। তখন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহ, চাকরি বাকরির সংস্থান এবং নিজেদের অবস্থা ফেরাবার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা যোগের সুফলও তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটার জন্য যে সহায়ক হয়েছিল এই বড় সত্যটা বাঙালি হিন্দুর নজরে যেন পড়তেই চায় না। অবশ্য এই লাভটা তৃণমূল স্তরের মুসলমানদের যে খুব কিছু হয়েছিল এমন নয়। হিন্দুদের জমিবাড়ির দখলদারি, যাদের কিছু আছে তাদেরই সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। সাধারণেরা ছিটেফোটা যেটুকু পেয়েছিল, তা শাসনে রাখার ক্ষমতা বা চাষ করার মত আর্থিক সঙ্গতি তাদের সেদিনও ছিল না, আজও নেই। আর এই স্তরে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে, চাকরি বাকরির সুযোগ তারা কেনোদিনই কী পেয়েছে? তবু গোটা পঞ্চাশ দশক ধরে এই শ্রীবৃদ্ধি তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। ব্যাপারটা সাময়িক রিলিফের মত, যদি আর্থিক দিক দিয়ে তার বিচার করি।

হিন্দুর সম্পত্তি দখলদারির প্রচলিত কাহিনীর হয়ত বারো আনায়ই সত্য, কিন্তু এই কর্মে যে থেকে যাওয়া হিন্দুদের লোভের থাবা নেই, এমন বলতে পারব না। এ বিষয়ে আমার ভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। আমার পরিচিত খুব কম ছিন্নমূল পরিবারকে জানি, যারা কোনো সাম্প্রদায়িক প্লবতা অথবা তার আতঙ্কে বিষয় আশয় পরিত্যাগ করে এলেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেসব পরে বিক্রি বাটা করে আসেনি। এমনও জানি যে কেউ কেউ একই সম্পত্তি একাধিক জনকে বিক্রি করেছে। এর সংখ্যা হয়ত কম, কিন্তু তাতে এই মানসিকতাটার মর্যাদা বাড়ে না। অথচ এরাই বেশি বেশি কাঁদুনী গায় যে তাদের সবকিছু ছেড়ে প্রায় একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছে। তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে স্থায়িত্বের বিনাশ, অর্থমূল্যে (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামমাত্র) যার কখনোই পূরণ হয় না। আবার বাধ্যতার নিরুপায়তার গস্নানি, বা চৌদ্দ পুরুষের ভিটের মোহ এসব প্রশ্নও তো থাকেই।

ধান ভানতে শিবের গীত বেশি হয়ে যাচ্ছে। বলছিলাম, দেশটাকে যে আদৌ ভালবাসি এই সব কিছু সত্ত্বেও, তা বুঝলাম হিন্দুস্তান যাত্রার দিন কয়েক আগে থেকে। যতই জনহীন, সহায়হীন, আনন্দহীন, আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ুক না কেন, সেই ভূমি ছেড়ে আমার সময়টাতে যে কষ্ট আর যন্ত্রণা শরীর মনকে একেবারে ওলোট-পালট করে দিয়েছিল, তার ধাক্কা জীবনভর সামলানো যায়নি। বিচ্ছেদ না ঘটলে বোধ হয় ভালবাসার অস্তিত্ব বা গভীরতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না। যেমন আমার আশপাশ মুসলমান গাঁয়ের জনেদের সঙ্গে আমার বা আমার সমাজের যে আদৌ গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল একথা কী আমি কোনোদিন জানতাম? পারিবারিক এবং সামাজিক শিক্ষা বা কুশিক্ষায় তো শিশুকাল থেকে জেনেছি আমাদের মধ্যে রয়েছে এক ঘৃণার পরম্পরা। ভালবাসার ঐতিহ্যের কথাও কেউ বলেনি বা পরম্পরার নির্বোধ অনুশীলন নিয়ে বিচারও কেউ করেনি। বস্তুত, ঐতিহ্য ও পরম্পরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাও বোধ হয় আমরা সঠিক ভাবে কোনোদিন চিন্তা করে দেখিনি। সে কারণেই আমাদের এই আঞ্চলিক প্রবাদটির জন্ম হয়েছিল,—

শ্যাহের লগে করবা দোস্তি

মুগইর রাখবা মইদ্যস্থি
যদি শ্যাখ রোহে
মুগইর মারবা কোহে।

এটাই মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ছিল হিন্দু সমাজের শিক্ষাদানের পরম্পরা। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে তারা একত্রে যখন মানুষ, তখনই সে আস্বাদ পেয়েছে ভালবাসার, কেননা, মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার ঐতিহ্য আছে তার সাধনায়। সেই ঐতিহ্যের প্রকাশ কখনো কখনো ঘটে। আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল বোধ হয় সেই চূড়ান্ত সময়টায়, যখন সব ছেড়ে চলে আসি। আমার দেশ ছাড়ার আগের দিনটা ছিল অসীম শূন্যতা আর বিষাদ দিয়ে মোড়া। সেদিনের একটা ছবি আজ পর্যন্ত আমার কাছে অসম্ভব মেদুর হয়ে আছে। এই অধ্যায়ে সেই ছবিটার একটা বাক্‌রূপ দেবার চেষ্টা করব। ব্যাপারটা ব্যক্তিগতই, কিন্তু ঐ সময়টার প্রেক্ষিতে তার সামাজিক ব্যাপ্তিটাও ইতিহাসগতভাবে তুচ্ছ নয়।

ঐ দিনটা ছিল ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসের এক বিকেল। আমার বয়স তখন বছর পনেরো। কিন্তু বিষণ্ণতার অভিজ্ঞতা শতবর্ষীয় যেন। আমার ঐ বয়সের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং সহপাঠী, যার নাম দুলাল (ইসলামি নামটা উহ্য রাখলাম), সে এসেছিল। কলেজের ছুটিতে বাড়িতে এসে কারও কাছে বোধ হয় শুনেছিল যে আমি চলে যাচ্ছি। স্কুলে মাত্র বছর দেড়েক ওর সঙ্গে পড়েছিলাম। তখন ওদের গ্রামে একটা নতুন ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইস্কুলটা ওদের বাড়ির সামনেই। সেভেন এইট এই দুটো ক্লাশে আমরা সহপাঠী ছিলাম। বস্তুত ঐ সময়টাতেই আমি প্রথম সম্পন্ন পরিবারের মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পাই। সম্পন্ন বলতে একটু অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবার, বা জোতদার গোছের গৃহস্থ। এর আগে যেসব মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা ব্যাপকভাবে ছিল, তারা প্রায় সবাই প্রান্তিক এবং ভূমিহীন চাষি ঘরের। তখন মধ্যস্বত্ব বিলোপ হয়ে গেছে। আর্থিক দীনতায় আমাদের মত পরিবার ভূমিহীন, খেতমজুর বা সামান্য চাষি গেরস্তের চাইতেও করুণ অবস্থায়। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির শতকরা পচানব্বই ভাগই তখন দেশছাড়া। সুতরাং ঐ যুগে যাদের ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির ছেলেপুলে হতো, খেলাধুলোর সঙ্গী হিসাবে তারা কেউ আর ওখানে নেই। বরাবর যাদের ছোটলোক বলা হোত, সেইসব রাখাল, বাগাল, হালিয়া ইত্যাদি 'অশিক্ষিতদের' ছেলেপুলেরা তখন আমার মত "শিক্ষিত ভদ্রলোক"দের ঝরতি পরতি বাড়ির সমবয়সীদের সাথী। কাছাকাছি মুসলমান গ্রামগুলোতে সমশ্রেণীর যারা ছিল, তারা তখন আর্থিক দিক দিয়ে হঠাৎ বড়লোক। শহর গঞ্জেই বেশিরভাগ সময় থাকে। অর্থাৎ আমরা এককালের উন্নাসিকস্য উন্নাসিকেরা যখন পরিস্থিতির প্রয়োজনে বাধ্য হলেও সাধারণবর্গের সঙ্গে মানুষের মত মেলামেশা করতে শিখছি, তারা তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভদ্দরলোক-ছোটলোক ইত্যাদি মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুসুলভ আচারগুলো রপ্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ঐ বয়সেই ব্যাপারটা আমার নজরে পড়েছিল, যদিও তার ব্যাখ্যাটা তখনও বুঝিনি, যেমন এখন বুঝি। অর্থকৌলীন্য প্রকৃত শিক্ষার সাহচর্য না পেলে মানবতার বিকাশ বোধ হয় অবধারিতভাবেই বিকৃত হয়।

দুলালদের পরিবার আমাদের ঐ অঞ্চলের সাধারণ জনেদের তুলনায় যথেষ্ট বনেদি এবং সচ্ছল। হিন্দু বা মুসলমান সাধারণ বর্গের সঙ্গে তাদের ওঠা বসার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সচ্ছল মুসলমান পরিবারের মধ্যে, যারা ঠিক হঠাৎ পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনায় বড়লোক নয়, বনেদি, তাদের আদব কায়দা খুবই উন্নত মানের বলে আমার মনে হত। খুব কম বনেদি হিন্দু পরিবারকে অনুরূপ শিষ্টাচার এবং আদব কায়দা সম্পন্ন দেখেছি। কিন্তু সে বর্গের মধ্যে সাধারণ বর্গের সঙ্গে তাদের আচরণেও বর্ণহিন্দুদের মতই নিষ্ঠুরতা দেখেছি। নিজেদের গণ্ডির বাইরে তারাও যেত না। আসলে এইসব আদব কায়দা সামন্ত-সংস্কৃতির মধ্যে যেটুকু উজ্জ্বল দিক, তারই তলানি বলে সাধারণ বর্গ তার প্রসাদ বঞ্চিত। আমার রক্তেও ছিটেফোঁটা সামন্ত গুণ থাকার কারণেই বোধ হয় ঐ সব আদব কায়দা এক সময় আমার বেশ মনে হত। পরে এর মেকিত্ব ধরা পড়েছে।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন দুলালের সঙ্গে গ্রামের এদিক ওদিকের নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে, ওকে এক হিন্দু গেরস্থালির রকম-সকম দেখাচ্ছিলাম। ও আগে কখনোও হিন্দু গ্রাম দেখেনি। ওদের গ্রামে কোনো হিন্দু বসতিও ছিল না। ও খুব অবাক বিস্ময়ে সব দেখছিল। বেশিরভাগ বাড়িঘরই ছিল তালাবদ্ধ। কোথাও হয়ত বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, ভিতটা পড়ে আছে। বাড়ির সামনে বাঁধানো ঘাটটা বা ঘর থেকে উঠোনে নামার জন্য বাহারী পাকা, লাল রঙের পাড়-ওয়ালা সিঁড়ির ধাপগুলো তুলসী মঞ্চ বা ঘরের ভিত থেকে খানিক দূরের সমাধি মন্দিরগুলো রয়ে গেছে। শুধু মানুষগুলো নেই। যারা ছিল, তারা হয়ত খুব বেশিদিন আগে যায়নি, তাই বাগ-বাগিচা, বাড়ির আনাচ কানাচের ঝকঝকে ভাবটা এখনও বজায় আছে। যেসব বাড়িতে এখনো গেরস্থরা আছে, তাদের সব কীরকম বে-আব্রুন্ন খোলামেলা। মেয়ে বৌদের বোরকার বালাই নেই। বাড়ির চারধারে, অবস্থা অনুযায়ী, সুপারি, নারকোল পাতা বা কারো বা ঢেউ টিনের আব্রুন্ন নেই যেমন দুলালদের থাকে। ওর বেশ অদ্ভুতই লাগছিল এসব দেখে।

আমাদের সঙ্গে ওর গাঁয়ের অন্য একজন ছিল। বয়সে আমাদের চাইতে বেশ খানিকটা বড়। সে দুলালকে, তার বাড়ির পরিচয়ে চিনত, কিন্তু দুলাল তাকে চিনত না। হিন্দু গাঁয়ের রীতি নীতি দুলাল না জানলেও, সে জানত। সে ছিল একান্তই গতর খাটা কিষাণ। নাম ছিল নুরুল। নুরুদা বলে ডাকতাম তাকে। মধ্যস্বত্ব লোপে আমাদের পরিবার আর্থিকভাবে দীন হলে, এদের সাহায্যে এক সময় আমি কায়িক শ্রমের জগৎটা চিনেছিলাম। পরিবারের কর্তারা প্রাচীন আভিজাত্যের দম্ভকে আঁকড়ে থাকলেও, আমি বা আমার মত ছেলেরা এদের জগৎটা আশ্রয় করেছিলাম প্রয়োজনের তাগিদে। তখন যে শুরুতে মনে কোনো গস্নানি বোধ করিনি তা নয়, তবে পরে বুঝেছি, এটা আমাদের পক্ষে একটা আশীর্বাদই ছিল। নুরুদার সঙ্গে ব্যবহারে কিন্তু সেদিন আমি দুলালের মধ্যে উচ্চবর্ণগর্বী হিন্দুদের, বিশেষত মধ্যস্বত্বভোগী বা অন্য পরিশ্রমজীবীদের আচরণের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম এই পরম্পরাটা, যেমন বলা হয়, শুধু হিন্দু উচ্চবর্গ/ বর্ণেরই নয়। মুসলমানদের মধ্যেও তা যথেষ্টই প্রকট। ইসলামি সৌভ্রাতৃত্বের যেসব গুণগান ইস্কুলের দিনগুলোতে আমরা মাস্টার সাহেবদের কাছ থেকে জেনেছি, তার বাস্তব

ব্যবহার ওর মধ্যে নজরে এলো না। অথচ এই ব্যাপারটা, যখন ওদের ইস্কুলে, মাস্টার সাহেবরা তুলনামূলকভাবে, হিন্দু ধর্ম বা সমাজের বিষয়ে আলোচনা করতেন, তখন বড় গস্নানি বোধ করতাম। হিন্দু বলে নিজেকে বেশ ছোট মনে হত। পরে বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র পড়ার সময় জেনেছি যে, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথা সব ধর্মীয় পুঁথি পত্রেই আছে কোনো না কোনো ভাবে। কিন্তু সেটা নেহাতই সম্প্রদায় গৌরব বা শোভা বর্ধনের জন্য। তার প্রায়োগিক ব্যবহার কোনো সম্প্রদায়েই অনুসৃত হয় না। সব সম্প্রদায়ই ছুঁতোনাতায় Holier than thou মনোভাবই প্রকাশ করে থাকে। দুলাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা বলছি বটে, কিন্তু ক্রমশ জেনেছি যে এটা কোনো সম্প্রদায় বিশেষের অভ্যাস বা পরম্পরা নয়; এটা বাঙালি বর্গ এবং বর্ণ ভেদের নিজস্ব ধরন, যা উপমহাদেশের চতুর্বর্ণীয় বর্ণভেদের থেকে কিছুটা আলাদা হলেও, তারই আদলে উদ্ভূত আচরণের একটি কদর্য পরম্পরা। নিঃসন্দেহে, বর্গভেদ তাকে পুষ্ট করেছে। এইসব কথা অবশ্য পরিণত বয়সের উপলব্ধি। সেই সুদূর কিশোরকালে শুধু ঘটনা প্রতিঘটনার অভিজ্ঞতাগুলিই মনের মধ্যে জমা হচ্ছিল, যার ফলে কখনো গস্নানি, কখনো ক্রোধ এবং কখনো অভিমানে বড় হয়রান হতাম। শেষতক সবটাই একটা আক্রোশ হয়ে অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইত। তখনতো এরকম বুঝতাম না যে, ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো সম্প্রদায় বা শ্রেণী পছন্দ করার উপায় নেই, আবার সম্প্রদায়ও কোনো একক ব্যক্তি গঠন করে না। অভিভাবকেরাও শুধু অন্ধভাবে পরম্পরাই বহন করেছে। একমাত্র ঐতিহ্য অনুসারে সৃষ্টিকালীন সংস্কৃতি সাধনার দ্বারাই মানুষ তাবৎ পুঞ্জীভূত তামসকে পরাহত করতে পারে বলেই আজ মনে হয়। সেটাই সব সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। হিন্দু, মুসলমান বা বাঙালি হওয়ার সাধনার পরম্পরা ছেড়ে এবার শুধু মানুষ হবার সাধনা করলেই বোধ হয় সেটা ঐতিহ্যসম্মত হবে।

এইসব কল্পনা আপাত-কল্পে বর্তমান কাহিনীর উপজীব্য হয়ত মনে নাও হতে পারে, তবু অতীত অভিজ্ঞতাগুলোর কার্যকারণের উপলব্ধির কথাতো বলতেই হয়। ক্রমশ হয়ত আরো বলতে হবে। আপাতত দুলাল আর আমার সেদিনের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া যাক। দুলাল আর আমি, সেদিন বেলা শেষে, হাঁটতে হাঁটতে এসে আমাদের বাড়ির বড় দিঘিটার শান বাঁধানো চাতালের বেদিতে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। দিঘিটা আর আগের মতো কাকচক্ষু স্বচ্ছ নেই। শ্যাওলা, কচুরিপানা, কলমিদাম সব জমতে শুরু করেছে। পূব-উত্তর কোণে যে 'জান্‌টা' বড় খালের সঙ্গে সংযুক্তি রেখে দিঘির জলে জোয়ার ভাটার নিয়ত সজীবতার ছন্দ রাখত, সেটা যে কবে মরে গেছে খবর রাখিনি। জানটার কিণার ঘেঁষে ডাকঘরের পাকা বাড়িটারও সারা গায়ে কালের ঝুল-কালি যেন অবহেলার সরব উপস্থিতি। ঘাটলার পশ্চিম আলিসের বেদির ঠিক পাশে যে নধর-ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা বকুল গাছটি আমার জন্মেরও বহু ইস্তক আগে থেকেই, প্রত্যেক মরশুমে নিয়মিত ফুল ঝরিয়ে রূপে, গন্ধে, জায়গাটা আমোদিত করে রাখত, সৌভাগ্যক্রমে সেটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সেদিনের যেসব কিশোর-কিশোরীরা এই ঘাটের প্রশস্তে, সকাল-সন্ধ্যেয়, তার ফুলগুলো নিয়ে মালা গাঁথত, তারা হিন্দুস্তানের কোন বকুলবিহীন

পৃথিবীতে যেন চলে গেছে। কে জানে, তাদের অথবা তাদের সন্তানদের জীবনে আর কোনোদিন বকুল বিছানো ঘাট বা পথ এসেছিল কিনা! তারা হয়ত অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অসম্মানের প্রান্তর পেরিয়ে সুদৃশ্য বাড়িঘর বা সম্পন্ন জীবন কখনো পেয়ে থাকবে। সেখানে অনেক ভোগ, অনেক সুখ হয়তো তারা কালক্রমে পেয়ে থাকবে। কিন্তু তারই মধ্যে কোনও এক অবসরে কী এই বকুল-স্মৃতি তাদের আলোড়িত, উন্মনা বা ব্যথাতুর করছে না?

দিঘির পুবপাড়ে, ডাকঘরের বাড়িটার খানিক তফাতে, এ বাড়ির প্রাচীন কর্তারা যে পাঠশালাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেটি বহুকালই নেই। সেখানে এখন নুরুদার বাবা, এন্তাজ কাকা শাক সব্জির ক্ষেত করেন, মরশুম অনুযায়ী। শুধু পাঠশালা বলেই বোধহয় ভিতটি এখনও একটু উঁচু স্পর্ধায় আত্মঘোষণা করছে। ঘাটলার ধাপ এবং চাতালের জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে। দিঘির পশ্চিম পাড়ের পঞ্চরত্ন এবং সমাধি মন্দির বা সৌন্দর্য্যদ্যোতক মঠগুলিতেও ফাটল, আর তার মধ্য থেকে কালের কুলীন তথা স্থাপত্য সংহারক বট পাকুড়ের শেকড় ক্রুদ্ধ অজগরের মত পেশি ফুলিয়ে রয়েছে। স্থানটা যে একসময় রম্য বাগান ছিল, তার স্মৃতি বহন করার জন্য এখনও জবা, গন্ধরাজ, টগড়, করবী, ঝুমকোর কিছু নমুনা আছে। তবে সবই জরাগ্রস্ত। নারকোল, সুপারি, আম, জাম, জামরুল, বেল এবং আরো নানান স্থানীয় ফলের বাগিচাতে কিছু গাছ এখনও আছে। কিন্তু সবাই যেন আমার মতই হিন্দুস্থান যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে।

দুলালকে এইসব বাসবসতির, তার অনুষঙ্গ, যা বাঙালির আবহমানকালের কামনা বাসনা এবং ঐতিহ্য, সেই সবের সৃজন বর্ধন এবং ক্রমবিলয়ের সম্ভব অসম্ভব পরণকথা, যা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কাছে আশৈশব শুনে এসেছি, সবিস্তারে বলছিলাম। ও মুগ্ধবৎ শুনে যাচ্ছিল। করুণতা আর বেদনা খুব স্বাভাবিক উৎসারে ঢেকে ফেলছিল ওর মুখ। এই গৃহস্থালির কিছুই প্রায় ওর মত ছেলেরা জানে না। ওরা দূর থেকেই শুধু হিন্দুদের বিষয়ে শুনেছে আর দেখেছে। ওর মত পরিবেশে হিন্দুরা যখন ছিল, তারাও, মুসলমানদের সম্বন্ধে, তাদের গাঁও গেরস্থালি সম্বন্ধে কিছুই জানত না, হয়ত আরো অনেক বেশি মাত্রাই জানত না। জানত একসময় তাদের পূর্বজরা, যেমন, এখনও দুলালের বাবা, চাচারা জানেন, বা নুরুদায়েরা বরাবর জানে।

দুলালেরা আমার মতই দেশভাগকালীন জাতক। কিন্তু সেটাই তার শ্রেণীর ছেলেদের হিন্দুদের বিষয় না জানার একমাত্র কারণ নয়। হিন্দুরা শ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীন তথা উন্নাসিক ছিল বহুকাল ধরে। সম্ভবত, এর বাড়াবাড়িটার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে, যে শিক্ষায় হিন্দু উপরিতলের মানুষেরা প্রথম শিক্ষিত হয়েছিল এবং গোটা সমাজকে সেইভাবে ক্রমশ সাজিয়েছিল। মুসলমানেরা অনেক পরে সেই শিক্ষা অনুসরণ করে। আগে পরে হলেও এর ফল উভয় সমাজের ক্ষেত্রে একই হয়েছে। পাকিস্তান হাসিলের পর, যখন নতুন করে নিজেদের সমাজ গঠন শুরু হয়, তখন একটা 'বদলা' নেওয়ার মানসিকতা সমাজ সংগঠকদের ভিতরে কাজ করে। এই ছিদ্র পথেই, মনে হয়, মৌলবাদ তার শিকড় দৃঢ়ীভূত করতে সক্ষম হয়। এখানেও

ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে বা উপেক্ষা করে পরম্পরাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে, মানবতার সাধনা মার খায়, আর সে কারণেই বাঙালি হিসাবেই তাদের সংগ্রাম আংশিক আকারেই থেকে যায়।

প্রাক-ঔপনিবেশিক হিন্দু মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য আর ঔপনিবেশিক শিক্ষা চেতনায় উদ্ভূত অনৈক্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সেই অনৈক্যের স্বরূপ হিন্দুর দ্বারা এক সময় মুসলমান সমাজকে প্রত্যাখ্যান এবং তার বদলা হিসাবে, পাকিস্তান প্রাপ্তির পর মুসলমান কর্তৃক হিন্দু সমাজকে প্রত্যাখ্যান; আমাদের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে, পারস্পরিক এই প্রতাখ্যান, দীর্ঘকাল ধরে, প্রথমে হিন্দুরা এবং পরে মুসলমান সমাজ অভ্যাস করেছিল খুব ধীর গতিতে। শুধু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কেন, গোটা গ্রামীণ পূব বাংলায়ই ব্যাপারটা সেইরকম বলেই পরে আমার মনে হয়েছে। এই ধীর গতিটা হঠাৎ মাত্রা পায় এবং নজরে পড়তে শুরু করে পাকিস্তান কায়েমের পর। দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক গণহত্যা তার প্রত্যক্ষ ফল। পরোক্ষ ফল হচ্ছে থেকে যাওয়া সংখ্যালঘুদের প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা। ব্যাপারটা যতই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে পরবর্তী কালে আলোচিত হোক না কেন ঐতিহাসিকভাবে এই বদলার ফল ভাল হয়নি, বিশেষ করে বাঙালির জাতি হিসাবে আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে।

দুলালের সঙ্গে সেই সেদিনের বৈকালিক বিষণ্ণতাটুকু বলতে গিয়ে নানান বিতর্কে ঢুকে পরলাম বটে, কিন্তু সেসব আমার মূল বিষয় নয়। আমার আসল কথা হচ্ছে সেই ক্ষণের অনুভূতি, যা সারাজীবন আমাকে দগ্ধ করেছে, যা হিন্দুস্থান বা ভারতকে নিজের দেশ ভাবতে কিম্বা নিজেকে ভারতীয় একজন নাগরিক হিসাবে গণ্য করতে প্রতিহত করেছে। মানুষ কেন যে এরকম ঘোষণা করে যে, সে হিন্দু না মুসলমান বা বাঙাল, ভারতীয় বা পাকিস্তানি ইত্যাদি হিসাবে গঠিত, আমি তার কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাই না। এরকম কোনো অস্মিতাই কোনোদিন আমার মধ্যে কোনো গর্বভাবের বা অহংকারের জন্ম দেয়নি। বোধহয়, গ্রামীণ প্রাচীন কৌম-সংস্কৃতির যে পরম্পরা আমরা গ্রামীণেরা এখনও বয়ে বেড়াই, এটা তারই প্রভাব। এবং সত্যই আমি নিজেকে একজন দেশের মানুষ ছাড়া আর কোনো অস্মিতায় ভাবতেই পারি না। তারই মধ্যে আমার জাতীয়তা, তারই মধ্যে আমার বিশ্ববোধ নিহিত রয়ে গেছে।

দুলালকে আমি আমাদের সেই ছোট্ট গ্রাম, আমাদের বাড়িঘর, তার তাবৎ শান্ততামণ্ডিত সৌকর্য, সৌষ্ঠব ইত্যাদি দেখিয়ে বলেছিলাম, দ্যাখ্, এইসব ছেড়ে আমাকে কোন্ এক অজানা হিন্দুস্থানে যেতে হবে, যেখানের কিছুই আমি চিনি না, জানি না বা বুঝি না। আমার গোটা শরীর রগড়ে ঘা করে ফেললেও, তার থেকে সেখানের এককণা মাটি বা ধুলো পাওয়া যাবে না। ও ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, চলে যাবি? হিন্দুস্থানে? আর কী কোনো উপায় নেই?—আসলে ওকে আমি যা যা বলেছিলাম, তার থেকে ও আসল ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতেই পারছিল না। এবং সেটাই স্বাভাবিক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলো, সংখ্যাগুরুরা যে বুঝতে পারে না সেদিন ওর প্রশ্ন শুনে তা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম ও অজ্ঞতার ভান করছে। ব্যাপার পরিষ্কার হয়েছিল অনেক পরে পশ্চিম বঙ্গে এসে। এখানের

সংখ্যাগুরুরাও সংখ্যালঘুদের সমস্যা বুঝতে পারে না। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য এই দৈন্যটা আমার অনেকটাই কম। এরমধ্যে একটা তীব্র হীনম্মন্যতা ওতপ্রোত। সেটা যে বা যারা না ভুগেছে, তারা শুধুমাত্র বৌদ্ধিক উপায়ে বুঝতে পারবে না। এর জন্য খুবই তীব্র অনুভূতির প্রয়োজন আছে।

দুলালের প্রশ্নের মধ্যে—আমাদের তখনকার বয়সোচিত আকুলতা ছিল। বোঝা, না বোঝা এবং ভুল বোঝার গণ্ডি পেরিয়ে কৈশোরিক বন্ধুতা তার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিতে আচ্ছন্ন করেছিল আমাদের দুজনকেই। বলেছিলাম, উপায় আর কী আছে বল? সবকিছু বাদ দিলেও একটা কথাতো থাকেই যে, আমাদের আর্থিক বুনিয়াদে একটা প্রবল ধস নেমেছে। জৈবিকভাবে বাঁচতে গেলেও, তার থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন। আমার বাবা চল্লিশ টাকার অনিয়মিত বেতনের একজন শিক্ষক। তাও মধ্যস্বত্ব বিলোপের (তখনকার ভাষায় বললে, জমিদারি/তালুকদারি) পর প্রায় প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে ঐ চাকরিটি তিনি সুহৃদজনের দয়ার দান হিসাবে পেয়েছেন। সংসারে আমরা ন'জন মানুষ। সুতরাং এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বসে থাকলে কী বাঁচব? বিশেষত, এই রাষ্ট্র আমাদের প্রায় জিম্মি করেইতো রেখেছে। এই দেখনা, সারা গ্রাম ঘুরে তো শূন্য ভিটে ছাড়া বিশেষ বসতি কিছু দেখলি না। আমারই মত নিরুপায় হয়ে, তারা সবাই নিরুদ্দেশ যাত্রায় কোথায় যে চলে গেছে! কোথায় গিয়ে যে তারা পায়ের তলায় একটু মাটি, বা মাথার উপরে একখানা চালা পেয়েছে, অথবা পায়নি, কে জানে? আমার অবস্থা সেরকমই কিছু হবে ধরেনে।—তখনও উভয়ের ধারণা হিন্দুস্থান হিন্দুর এবং পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ। এই ধারণার পিছনে সত্য এবং মিথ্যে দুটোই খুব জোরদার। তার বিচার করা আমাদের সেই বয়সে সম্ভব ছিল না। অনেক কিছুই আমরা তখন বুঝি না। আবার যেটুকু যা বুঝি, ভুল বুঝি। আমি তবু ঠেকায় পড়ে কিছু খবর জানি, কিন্তু বুঝি না। দুলাল কিছু জানেও না বোঝেও না। ও কেমন করে জানবে? ওর না জানা বা না বোঝার কারণটা আর একটু বয়স হলে বুঝেছি। যে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে মৌলবাদ নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান রাষ্ট্র দুলালদের মত ছেলেদের খাঁটি ইসলামি নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে চাইছিল, তখনও তারা সেই স্বার্থবুদ্ধিতে দীক্ষিত হতে পারেনি। স্কুলের দিনগুলিতে দেখেছি, কী অপরিসীম উদ্যমে ওদের প্রকৃত মুসলমান তৈরি করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি নীতি নির্দেশ ওদের পালন করানো হতো। কট্টরপন্থী মৌলবাদীরা এ ব্যাপারে কোনোদিনই তাদের মুঠি আলগা করেনি। অবশ্য উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে বরাবরই সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন, যা আজও জারি আছে। তবু বলব, মৌলবাদীরা গ্রামীণস্তরে, তাদের মতাদর্শ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে যতটা সক্রিয় ও সফল, বুদ্ধিজীবীরা তার ধারে কাছেও নেই।

ওদের মধ্যে তখনও এরকম স্বার্থবুদ্ধি জাগেনি যে, হিন্দুরা যত চলে যায় ততই ভাল। তাহলে তাদের বাড়িঘর, জমি, সব তাদের হবে। এরকম মানসিকতার মানুষ যে তাদের সমাজে আছে, যারা অহরহ, কারণে বা অকারণে আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুদের দেশ ছাড়তে হুমকি দেয়, অথবা বন্ধুর ছদ্মবেশে পরামর্শ দেয়, সহায়তা করে, এ বিষয়ে তাদের মত ছেলেদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু

নুরুদার মত শ্রেণীর মানুষদের আছে। কেন আছে, সে বিষয়ে হাজার কথা বলা যায়, কিন্তু সেই বিষয়ান্তরে যাবার পরিসর এখানে নেই।

ও বলছিল, তোদের বাড়ির এত নামডাক, এত প্রতিপত্তির কথা বাবা চাচার কাছে শুনেছি, কিন্তু ভেতরে যে এত অনটন এবং অসহায়তা, সেটাতো জানতাম না। এত বড় অট্টালিকা, বৈঠকখানার দরবারি কায়দা, সবাই জানে যে, যা-ই হোক, জমিদারি, তালুক মুলুক না থাকলেও মরা হাতি লাখ টাকা। বলতে পারতাম যে ব্যাপারটা শুধু আমাদেরই নয়, একদার মধ্যবিত্ত, ভূমিনির্ভর সব হিন্দু পরিবার, যারা এখনও এখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছে, সবারই এই একই হাল। হয়ত সামান্য কিছু ইতর-বিশেষ থাকতে পারে। এর জন্য দায়ী দেশভাগ। দেশভাগ ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবে শেষ করে দিয়েছে। হিংস্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যদি প্রাণে নাও মারে, অন্নাভাবে মারার ব্যবস্থা তো রাষ্ট্রের হাতে আছেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকতো বটি। দেশভাগ ছাড়া অন্য যে কারণগুলো আছে, সেগুলো অনুষঙ্গ মাত্র। কিন্তু এসব কথা ওর বোঝার বিষয় নয়। এই সমস্যাটা তো সংখ্যালঘুদের সমস্যা, যেমন আগে বলেছি। দেশভাগতো মুসলমানদের জন্য তখন আশীর্বাদ। এর অভিশাপটা তারা বুঝবে কেন? এটা যে হিন্দু, মুসলমান, অর্থাৎ গোটা বাঙালি জাতির পক্ষেই অভিশাপ, তা বুঝতে উভয় সমাজকে তো আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তারপর একদিন তারা ভাববে যে তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, বাঙালি। কিন্তু যে সময়ের কথা, তখন বাঙালিত্বের বোধের ভ্রূণ তো পুষ্ট হয়নি। একাত্তরের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হচ্ছে শুধু বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের আর তার পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের উপল-বন্ধুর পথ ধরে। তারপর রক্তমাখা একাত্তর শেষ হলে কিছুদিন বাঙালিত্বের গরমাগরম উচ্ছাস, গর্ব এবং আত্মসন্তুষ্টি, কিন্তু রক্তস্রোত থামে কই? হায়, তার জন্য তো সেই বোধের আবির্ভাব প্রয়োজন, যার মারফতে জানব যে, আমরা হিন্দু, মুসলমান বা বাঙালি কোনোটাই নই, আমরা মানুষ এবং মানুষ হিসাবে উত্থিত হতে পারলেই আমাদের বাঙালিত্ব সার্থক হবে, পূর্ণ হবে। নচেৎ আবার বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব, আবার রক্তপাত।

বেলা পড়ে এসেছিল। দুলালকে এগিয়ে দিতে গিয়ে, আমরা বড় খাল পাড়ের রেইন-ট্রি গাছটার তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম এটাই সেই বিষাদ বৃক্ষ, যাকে নিয়ে আমার গোটা জীবনের উথাল-পাথাল। শীতের প্রদোষের মলিন আলো আমাদের বিষণ্ণতাকে যেন আরো অসহনীয়, আরো গভীর করে তুলছিল। সামনে খালের উপরে একটা লোহার ব্রিজ। জীবনের ষোলটা বছর, অথবা কয়েকশো বা কয়েক হাজার বছর এই মাটিতে কেটেছে আমার। কত ছোট বয়স থেকে এই ব্রিজটার উপরেই তো খেলাধুলো, খালে ঝাঁপাঝাঁপি, গালগল্প। ব্রিজের ওপারের শুরু থেকে গঞ্জ অবধি তিন মাইল লম্বা বড় কাঁচা রাস্তাটার ডানদিকে দুলালদের, অর্থাৎ মুসলমানদের গ্রাম—তো বাঁদিকে হিন্দুদের গ্রাম। দুপাশেই প্রথমে বিস্তীর্ণ এবং নিবিড় শস্যক্ষেত, তারপর গ্রামগুলির বসতি। ধর্মে আলাদা এবং কখনও কখনও জমি জিরেত নিয়ে মন কষাকষি বা সামান্য সাধারণ বিরোধ থাকলেও, কোনোদিন ধর্ম বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দাঙ্গা ফ্যাসাদ কিছু ঘটেনি। অবস্থার

দিক দিয়ে, হিন্দু মুসলমান সবার আর্থিক স্থিতিই মোটামুটি সমান। কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সবাই ভূমিনির্ভর বা ফসলের ব্যবসায়ী। আমার পরিবার, বা এর চাইতে বড় তালুকদার/জমিদার পরিবার গোনাগুন্তি, তিন কী চারটি, এককালে ছিল আমার জন্মের আগেই তাদের ইতি হয়েছে। দুলালদের মত পরিবারের সংখ্যাও নগণ্য। নুরুদাদের শ্রেণীর জনেদেরই বসবাস এ অঞ্চলে সর্বাধিক এবং সেই কারণেই পঞ্চাশের বরিশাল রায়টের ফলস্বরূপ ব্যাপকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হলেও, এখানে অর্থাৎ যে অঞ্চলের কথা এখন বলছি, সেখানে একজন মানুষও সাম্প্রদায়িক ক্রোধে নিহত হয়নি, একটা বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়নি, বা একজন নারীও ধর্ষিতা হয়নি। নুরুদাদের মত মানুষেরাই তা হতে দেয়নি।

দুলাল খুবই বিষণ্নচিত্তে, আমার বলা এবং না বলা বেবাক কথার বোঝা মাথায় নিয়ে, আলপথ ধরে তার গ্রামের দিকে চলে গেলে, সেই করুণ খালের কিণারে বিষাদরূপী রেইন-ট্রি গাছটির তলায়, নুরুদা ও আমি আরও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। এই স্থানে, বহুকালের অভ্যস্থ এই পরিবেশে, আমার শেষ এই সন্ধ্যাটির গাঢ় বিষণ্নতা সমস্ত শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রাণ দিয়ে আমি গ্রহণ করছিলাম। নুরুদা প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকলেও, একটিও কথা এতক্ষণ উচ্চারণ করেনি। অথচ আমি অনুভব করছিলাম যে সে প্রকৃতভাবেই আমার বেদনার অংশী। দুলালের দুঃখবোধের সঙ্গে নুরুদার বেদনার তফাত আছে। সেকথা জানাতেই যেন এতক্ষণে সে কথা কয়ে উঠল। বলল, দুলাল ভাই আইজ বাদে কাইল ঢাকায় চল্‌ইয়া গ্যালে, শহরের রহটে, এত্‌খুন যা কইলা বেয়াক ভুল্‌ইয়া যাইবেন হ্যানে। কিন্তুক মুই, বা মোর ল্যাহান য্যারা তোমার দোস্তালিতে আছেলাম, মোরগো আপছোস্‌ কী কোনোদিন যাইবে? মোরগো ব্যাফারডা ক্যাতো আলাক্‌, হেয়া বোজবে কেডা?

সত্যই তাই। তাদের ব্যাপারটা যে আলাদা, সেই বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। তাদের সঙ্গে এই সম্পর্কটা অনেক দুঃখমূল্যে আমি অর্জন করেছি। এটা আমার অহংকার। নুরুদাকে বললাম, কাল বিকেল নাগাদ শেখেরহাট থেকে স্টিমার ধরব। তুলে দিতে যাবে না?— নুরুদা বোধহয় জীবনে এই প্রথমবার, আমার কোনো অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করল। আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, পারমুনা ভাইডি, মোরে মাফ করইয়া দেও। তোমারে ইস্টিমারে উডাইয়া দিয়া, মুই হেলে আর ফির্‌ইয়া আইতে পারমু না। মোরে মাফ করো।

অন্ধকারে খালপাড়ের ঝোপঝাড়ে জোনাকির বিন্দুগুলো জ্বলছিল নিবছিল। ঝিঁঝিঁ পোকাদের বৃন্দ-তাল শোনা যাচ্ছিল। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে নাপিত ও যুগি পাড়ায়, যেসব পরিবার এখনও আছে, তাদের হরিসভায় খোলকর্তাল সহযোগে কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা শুরু হয়েছে। এরপর হয়ত তারা নিমাই সন্ন্যাস পালা গাইবে। তারই সংলগ্ন মুসলমান গ্রামের মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসছে মগরবের আজানের ধ্বনি। অদ্ভুত, অপূর্ব সুরময় শান্ত সমাহিতি। অথচ কী নির্মম বিষণ্নতা। পদাবলী কীর্তনের মূল গায়কের কণ্ঠে, একসময় শোনা

গায়, শচী মাতা করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, সন্ন্যাসী না হইও নিমাই, বৈরাগী না হইও। ঘরে বসে অভাগীরে মা বলে ডাকিও।

মনে হল, এই দৃশ্য, এই প্রকৃতি, এই মানুষ আর শান্তস্নিগ্ধ এই পরিবেশ, এই করুণ পদাবলির সুর আর আজানের দিগন্ত-মথিত দূরাগত ধ্বনি, আর কোনোদিনই দেখতে, শুনতে বা অনুভব করতে পারব না। আমিই যেন নিমাই এবং ভালবাসার এই সর্বস্ব ছেড়ে আমি সন্ন্যাসেতে যাচ্ছি। আমি কাল হিন্দুস্থান যাব।

১৯৬৩-র জানুয়ারি। শেখের হাটের স্টিমারঘাটা ঠিক প্রথাসম্মত স্টেশন নয়। তবে বরিশাল এক্সপ্রেস এখানে একটা হল্ট দেয়। সামান্য কিছু যাত্রী ওঠে, এখান থেকে নামেও। কেউ কেউ কাছাকাছির, কেউবা খুলনা পর্যন্ত যায় বা সেখান থেকে ফেরে। খুলনার ঘাট পর্যন্তই বরিশাল এক্সপ্রেসের গতি। খুলনা থেকে দূরে যারা যাবে, তারা, বিশেষ করে যারা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রী, তাদের কেউ ট্রেনে কেউ বা বাসে করে বেনাপোল বর্ডার পর্যন্ত যায়। তখনও ট্রেনটির গতি শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত। গাড়ির নামও বরিশাল এক্সপ্রেস। পাসপোর্ট বা মাইগ্রেশান করে যারা যাতায়াত করে তারা ট্রেনেই যায় বেশি। বহুবছর আগে, তখন আমি নিতান্ত শিশু একবার বাবা-মার সঙ্গে এই গাড়িতে গিয়েছিলাম। বাবা বহুদিন ধরে বিকলাই ইনফেক্শান না কি যেন এক রোগে ভুগছিলেন তার চিকিৎসার কারণে সেবার যাওয়া। সেই প্রথম আমার রেলগাড়িতে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়। তারপর এই যাওয়া। প্রথমবারের সফরের স্মৃতির টুকরো-টাকরাই কিছু মনে আছে। সম্ভবত সেটা পঞ্চাশের কোনও একটা সময়। তখন পাসপোর্ট মাইগ্রেশনের বালাই ছিল না। দাঙ্গা শুরু না হলেও, তখন অনেক লোকই পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে শুরু করেছিল। সেই সফরের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছিল—প্রথম স্টিমার এবং রেলে চড়ার উত্তেজনা। বৃহত্তর জগৎ, অনেক মানুষজন দেখার উত্তেজনা। সাথে আমার দিদি এবং আমার পরের ভাইটা আর বোনটা ছিল। তারা তখন একেবারেই শিশু, দুগ্ধপোষ্য বলা যায়।

তারপর এই যাত্রা। শেখের হাটের এই ঘাটে কোনও জেটি নেই। স্টিমার থেকে একটা বড় লম্বা খাঁজওয়ালা তক্তা নদীর কিনারে ফেলে দেওয়া হতো। একটা লম্বা বাঁশও থাকত সঙ্গে। দুজন লোক তার দুই প্রান্ত ধরে থাকত। সেটা হাতলের কাজ করত। যাত্রীরা তার উপর দিয়েই উঠে যেত।

আমরা তিনজন যাত্রী সেখান থেকে স্টিমার ধরব বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিলাম। যেহেতু এটি প্রথাসম্মত স্টিমার ঘাট নয়, তাই তীরে কোনও শেড বা বসার ব্যবস্থা ছিল না। শুধু একটা প্রকাণ্ড বট গাছ সেখানে ছিল তার ছড় ও শিকড় বিস্তার করে। আমরা তিনজন যাত্রী, আমি, বাচ্চু এবং সুরো পিসি সেই গাছটির শিকড়ের উপর বসেছিলাম। গাছটি বেশ প্রাচীন, আর তার শিকড় বাকর এবং ঝুড়িগুলি আমাদের বসার এবং ছায়া দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছিল।

সুরো পিসিকে আমাদের গ্রাম সুবাদে পিসি ডাকি। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর যাতায়াত প্রায় নিয়মিত। এজন্যে তাঁর পাসপোর্ট ভিসার দরকার হতো না। তাঁর কে এক ভাইপো ওখানকার অশোকনগরের কল্যাণগড় কলোনি নামে একটা প্রায় সদ্যোজাত কলোনিতে থাকত। সুরো পিসিরা কর্মকার জাতের। ভাইপোর নাম

পরান কর্মকার। পঞ্চাশের দাঙ্গার উদ্বাস্তু এরা সব। সুরো পিসির সঙ্গে আমরা যাচ্ছি, তিনিই আমাদের চলনদার। পিসি আবার ফিরে আসবেন। আমরা চিরদিনের মত এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যেমন আগের হাজার হাজার লোকেরা গিয়েছে। ভাগ্যান্বেষণের যাত্রা। আমাদের রাষ্ট্রপুরুষেরা তাদের ক্ষমতালাভ করার অধীরতার জন্য আমাদেরকে অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এখন ক্ষমতা ভোগে মত্ত।

আমার এই দেশ ছাড়ার ব্যাপারটা হঠাৎই ঠিক হয়েছিল। যখন বোঝার মত বয়স হয়নি, যখন আমার দাদাদিদিদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হয়েছিল, তখন খুব বায়না ধরেছিলাম তাদের সঙ্গে চলে আসার। কিন্তু তারপর তো বহুদিন গত হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি প্রয়োজন যত তীব্রই হোক, দেশ ছেড়ে আসা মানে কি। এটা মোটামুটি বোঝা গিয়েছিল এই দেশে আমার বা আমাদের মত ছেলেদের কিছু হবার নেই। রাষ্ট্র কিছু সুযোগ দিলেও নয়। কারণ বাল্যাবধি যে পারিবারিক শিক্ষায় বড় হয়েছি, তাতে ঐ সময়, এই দেশটিকে আমরা আর সত্যিকারের নিজের দেশ বলে ভাবতে পারছিলাম না। এর কারণ একটা নয়, নানাবিধ। সে কথা আগে অনেক বলেছি। এর জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, রাষ্ট্র যেমন দায়ী, দায়ী আমাদের হিন্দুসমাজের মানুষেরাও। কেউই সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেনি। ফলে আমার বা আমাদের মত ছেলেদেরও মানসিকতা দোদুল্যমানতার মধ্যেই ছিল। আমাকে বাস্তবে যে সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেগুলোই সাতকাহন বলছি বটে, কিন্তু পরিস্থিতির গভীরে যে সত্য আছে তার উদ্‌ঘাটন খুব সহজ নয়, সহজ নয় বলেই নানাভাবে নিজেকে খুঁড়তে হয়।

মেট্রিক পাশ করে, একবছর কলেজে পড়াশোনার চেষ্টা চালিয়েও যে, নানা কারণে সুবিধে করতে পারিনি, তার জন্য আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা, অভিভাবকদের উদাসীনতা, বাহ্যিক কারণগুলোর চাইতে কম দায়ী ছিল না। কিন্তু সময়টাই তখন ছিল একটা অদ্ভুত ছিষ্টিছাড়া ধরনের। একেই বোধহয় সার্বিক অবক্ষয় বলে, যা ভেতর এবং বাইরে থেকে যুগপৎ আক্রমণে সব উদ্যমকে বিষণ্ণতার তামসে ঢেকে দিতে চায়। তাই সিদ্ধান্ত ওদেশে গিয়ে যদি কিছু ভাগ্য পরিবর্তন হয়। কারণ ঘরে বাইরে তো এটাই শুনেছি এবং শিখেছি যে হিন্দুস্তান হিন্দুর এবং পাকিস্তান মুসলমানদের। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর বুঝতে পারছিলাম, চিরদিনের মত জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার মানসিকতাটা কখন যেন অন্তর্হিত হয়েছে। যদিও গ্রামগুলি শূন্যপ্রায়, ভাললাগার মত, মনে আনন্দ সৃষ্টি করার মত কিছুই আর এখানে অবশিষ্ট নেই, তথাপি মাঠ, মাটি, গাছপালা, হতভাগ্য মানুষজনের যারা অবশিষ্ট আছে, তারা কি ভীষণভাবেই না আমার সঙ্গে ওতপ্রোত। তারা যে কেউই ছাড়তে চাইছে না। তাছাড়া অনিশ্চিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির মধ্যে মা, বাবা, ভাইবোনদের ফেলে চলে যাওয়া, ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাব্য ব্যবস্থা ব্যতিরিকেই, সে যে কি মর্মান্তিক এবং স্বার্থপর! কিন্তু উপায় নেই। এই বিচ্ছেদ, চিরবিচ্ছেদ কি না, তাও তো জানি না। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা আর ছোট ছোট ভাইবোনগুলো আছাড়িবিছাড়ি কাঁদছিল। ছোটগুলো আমার জামা ধরে টেনে রাখতে চাইছিল আর বলছিল, ও দাদা, তুই যদি যাও, তয় আমাগো কেডা

দ্যাখফে? আমাগো লইয়া মেলা দ্যাখথে যাইবে কেডা? পড়া দ্যাহাইয়া দেবে কেডা? আমরা খামু কি? আমাগো এডা ওডা কেডা আন্‌ইয়া দেবে?—আশ্চর্য ঐটুকু সব বাচ্চারা, তাদের খাওয়া কে জোটাবে সেই ভাবনায় ভাবিত! হে ঈশ্বর, হে পৃথিবী, হে বিধাতাপুরুষ তোমরা সাক্ষী, আমি ওদের অকারণে অনিশ্চয়তার হাতে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছি না। আমার মনে ওদের ভবিষ্যতের জন্য একটা চিন্তা আছে বলেই আমি চলে যাচ্ছি। দোহাই মহাকালের, দোহাই চন্দ্রসূর্য আকাশপটে বিরাজমান নক্ষত্রমণ্ডলির এবং দোহাই এই ছেড়ে যাওয়া প্রকৃতিসমুচ্চয়ের—আমি নিজের স্বার্থে পালিয়ে যাচ্ছি না। ওদের কথা, ওদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হয়েই আমি এই অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রগাঢ় প্রস্থানের পথে ব্রাজক হয়েছি। শেষ বিদায় নিয়ে মায়ের আলিঙ্গনচ্যুত আমি, আশ পাশ সমগ্র বস্তু অবস্তু, প্রাণী অপ্রাণীকে প্রণাম জানাচ্ছিলাম, মনে মনে বলছিলাম, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। হে গৃহ, হে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ, হে লতাগুল্মের ঝোপ, হে দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্র এবং তৃণশষ্প, তোমরা এই পলায়নপর, অক্ষম জাতককে করুণা কর, ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। আমি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে ওদের বাঁচাবার জন্য দেশ ত্যাগ করছি।

কিন্তু তথাপি যেন পরিপার্শ্বস্থ সুজন বৃক্ষেরা, ঝোপঝাড়, দীঘির ঘাটের বিস্তীর্ণ চত্বর, পারের মন্দিরগুলো, ফুলের বাগান, পথ, পথমধ্যস্থ নানা বন্ধুরতা, গর্ত, বাঁক এবং পরিপার্শ্বের প্রতিটি রজকণা, যেন আমাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছিল। ঠাকুর্দা ঠাকুমার মাটির চিতা দুটি, ঠাকুর্দামশাইয়ের আশ্রম, বাড়ি, বাগান, যেন বলছিল, তিষ্ঠ ক্ষণমিহ। কোথায় যাবে? কিসের আশায়? যেখানে যাবে, সেখানে সুস্থিতি আছে? সুখ, স্বস্তি আছে আরও, ঢের? অনিশ্চয়তা, অসম্মান, গস্নানি, সেখানেও নেই না কি? কিন্তু সব কিছু তুচ্ছ করে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম এবং ভেসে পড়েছিলাম অজানার পথে। আসার সময় কেউ উচ্চারণ করেনি সেই পরিচিত মন্ত্রগীতি—ধেনুর্বৎস্য প্রযুক্তা, পুষ্পমালা পতাকা সদ্যোমাংস ঘৃতং বা দক্ষিণাবর্ত্ম বহ্নি। না এরকম আয়োজনের দিন তখন শেষ। সর্বস্তরের একমাত্র চোখের জলই আমার পাথেয় হলো। আমি হিন্দুস্থান চললাম।

এখন আত্মীয় বলতে এই বটবৃক্ষটিই একমাত্র, যে আমাকে শেষ বিদায় জানাবে। তারও আর দেরি নেই। স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে। সেই স্টিমারে একবার ঢুকলেই আমিও হাজার উদ্বাস্তুর একজন হয়ে যাব। আমার নিজস্ব কোনও পরিচিতি আর থাকবে না। তখন আমি অমুক গ্রামের অমুক বাড়ির একজন বলে পরিচয় দিলে কেউ আমাকে চিনবে না। আরও অজস্র ছিন্নমূল মানুষের মত আমি একটা প্রকাণ্ড 'না' এর মধ্যে মিলিয়ে যাব।

বেলা প্রায় একটা কি দেড়টা হবে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ভোঁওও আওয়াজ শুনে বুকের মধ্যে যে প্রবল আলোড়ন শুরু হলো, তার বর্ণনা দিতে পারব না। একমাত্র যারা জীবনে একবার সেই আওয়াজ শুনেছে, তারাই সেটা বুঝবে। আর খানিক ক্ষণের মধ্যেই স্টিমার এসে নোঙর ফেলল এবং আমার নিজস্ব মাটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে, ঘোর গর্জায়মান জলযানের ভিতরে আমরা হারিয়ে গেলাম। বরিশাল এক্সপ্রেস আর একবার প্রবল নাদে ভোঁওও বাজিয়ে তার যাত্রাপথ ধরল।

একটা মানুষ যখন তার চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, তার আবাল্য সঙ্গী সাথী, আত্মীয়, মা, বাপ, ভাইবোনদের ছেড়ে, তার তাবৎ শিকড় ছিঁড়ে অনির্দেশ যাত্রায় ভেসে পড়ে, তখন জাহাজের এই ভোঁ শব্দটা তার মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে, যে আলোড়ন তোলে, তা কি কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে? অন্তত আমার সেই ভাষা আয়ত্তে নেই। অথচ এই কালকেও তো, শত বিষণ্ণতার মধ্যেও একটা আশার শিখা মনের মধ্যে ঝিলিক মারছিল—কি? না, আমি হিন্দুস্তান যাচ্ছি। সেখানে আমার কিছু আত্মজন আছেন। তাঁরা কতদিন আমায় দেখেননি। আমি সেই কোন্ ছোটবেলায় পঞ্চাশ, একান্নর দাঙ্গার সময় তাঁদের শেষবার দেখেছি। তাঁদের দেখলে আমি ঠিক চিনতে পারব তো? তাঁরা? আমার কি তাঁদের মুখ মনে আছে? আমার মুখ তাঁদের? এইসব নানাকথার আনাগোনা তো কালকেও ছিল। আর এখন? ওঃ জেনারেটরের শব্দটা কি কানফাটানো! আর কি ভীষণ শব্দ করেই না জাহাজটা ঘোষণা করল, যে, তুমি আর এ মাটির কেউ নও। তোমার নিজস্ব মাটি আর তোমাকে আশ্রয় দেবে না। এই মাঠ, এই গাছ, এই খাল বিল বাওড়, এই নদী, আকাশ পশু পাখি কীট পতঙ্গ কিছুই আর তোমার অস্তিত্বের অনুষঙ্গ নয়। তুমি এখন থেকে অনিকেত, উদ্বাস্তু। এই সব চিন্তার জটিলতাগুলো মনের মধ্যে জট পাকিয়ে এই অনিশ্চিত যাত্রাকে আদৌ রোমাঞ্চকর করল না। বরং এই ঘনীভূত তীব্র বিষণ্ণতা মনকে এমন আচ্ছন্ন করে রইল যে, আমি বাইরের বিলীয়মান, পশ্চাদপসারী বৃক্ষ, মাটি, শস্যক্ষেত্র কোনও কিছুই শেষ বারের মত দেখে নিতে পারছিলাম না।

মৌজালি তালুকদার নামের জনৈক ব্যক্তি তখন কীর্তিপাশা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। সুরোপিসি তাঁকে খুব চেনেন। বেনাপোল সীমান্তের কাস্টম আধিকারিক তাঁর আত্মীয়। পিসি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কারুরই বৈধ কাগজপত্র নেই। সুতরাং যেতে হবে গলাধাক্কা পাসপোর্টে। ব্যাপারটা গলাধাক্কার হলেও সীমান্তের কোনও কর্তাব্যক্তির সিফারিশ থাকা আবশ্যক। একমাত্র দাঙ্গাজনিত কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সীমান্ত অতিক্রম ছাড়া, স্বাভাবিক সময়ে গলাধাক্কাটা ওখানে কর্মরত কাস্টমস্, ইমিগ্রেশন পুলিশ ইত্যাদিদের একটা শাঁসালো রোজগারের পথ। দুই দেশের রাষ্ট্রপুরুষরা যখন উদ্বাস্তু সমস্যা আর সামাল দিতে পারছিল না, তখনই পাসপোর্ট মাইগ্রেশনের ব্যবস্থার সৃষ্টি করে উভয় পারের মানুষদের সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থাটার ইতি হয়। সংখ্যালঘুদের প্রাণ মান বাঁচানোর শেষ উপায়টিকেও এভাবে আইনের কাঁটাতার দিয়ে আটকে দেয়া হয়। আমাদের কারুর কাছেই পথ খরচ ছাড়া বাড়তি পয়সা নেই। সুতরাং উপযুক্ত দক্ষিণা ছাড়া, শুধুমাত্র এটা চিঠির দৌলতে আমাদের এই গলাধাক্কার নমুনাটা কতদূর ফলপ্রদ হবে সেটা নিয়ে সারা পথই দুশ্চিন্তা আমাদের তিনজনেরই ছিল।

স্টিমার খুলনায় এসে পৌঁছতে সুরোপিসি জানালেন যে রেল গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ নয়। চোদ্দজায়গায় রকমারি চেকিং। সুতরাং বাসে করে যাওয়াই খানিকটা নিরাপদ। কোথায় গন্তব্য জানাতে হলে কাস্টমস আধিকারিকের বাসার কথা বললে, পার পাওয়া যাবে। অতএব, বাসই উত্তম। কিন্তু সমস্যা পোশাক।

সুরোপিসি হিন্দু বিধবা। সাদা শাড়ি সাদা সায়ায় এবং তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে তিনি মানানসই। বাচ্চুর পোশাকআশাকও খুব একটা দুচ্ছাই গোছের কিছু নয়। মুশকিল হয়েছে আমার রাজবেশ নিয়ে। পায়ে মিলিটারি বুট, পরনে মার্কিন কাপড়ের পাজামা এবং গায়ে ডোরাকাটা একটা সস্তা ছিট কাপড়ের চাইনিজ শার্ট এবং সবই মায়ের হাতের তৈরি। এরকম পোশাকে ঠিকমত শ্রেণী চরিত্র বোঝা অসম্ভব। সে এক বিচিত্র ব্যবস্থা। সুবিধের মধ্যে এই যে ব্যাপারটা শোভন না অশোভন, সুশ্রী কি বিদ্ঘুটে, তা নিয়ে আমার কোনও ধারণা নেই মাথা ব্যথাও নেই।

যথাস্থানে নেমে সুরোপিসি এক হাঁড়ি রসগোল্লা এবং আমাদের নিয়ে যখন সাহেবের বাসায় পৌঁছলেন, তাঁর বিবিসাহেবরা বেশ যত্নআত্তি করলেন। কিন্তু দুপুরে সাহেব যখন লাঞ্চে এলেন তখন আমাদের বেশভূষা, উদ্দেশ্য, চিঠির বয়ান ইত্যাদি যে কিছু মাত্রায় তাঁকে আহ্লাদিত করল, একথা বলা যায় না। এইসব কাজে মবলগ দুপয়সা না হলে, উচ্চ বা নিম্নপদস্থ কেউই আদৌ উৎসাহ দেখায় না। তখন তারা নানারকম আইনের, বিপদের বা অসুবিধের কথা বলে। আধিকারিক সাহেবও তাইই করতে থাকলেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। সুরোপিসি তাঁর অচেনা নন। কিছু কটুবাক্য করার পর, তাঁর আর্দালির হাতে সঁপে দিয়ে তিনি বললেন, দ্যাখ্তো এদের নিয়ে কি করতে পারিস। যত্তো ঝামেলা। সুরোপিসি এসব ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তিনি জানেন, সাহেব যাই বলুন, আর্দালি নিজের পাওনাগণ্ডা ঠিক হিসেব করে নেবে যথাসময়ে। আমাদের কাছে যত কম রেস্তই থাকুক, তাকে খুশি করতেই হবে।

সারা রাত স্টিমারে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়। ঘুমোবার প্রশ্নই ছিল না। খাওয়া দাওয়া বলতে পোঁটলাবাঁধা চিড়েমুড়ি। সুরোপিসিই নিয়ে এসেছিলেন। সকালে বাস দৌড়, রিক্সা দৌড় করে কাস্টমস আধিকারিকের বাসা। তাঁর বেগম সুরোপিসির আনা রসগোল্লায় অতিথি আপদ সৎকার করেছেন। দুটি করে রসগোল্লা আর এক গেলাস পানি। তাঁর দোষ নেই। দেশাচারে মুসলমানের অন্ন আমরা খেতে পারি না। কেউ দেখে ফেললে জাত নিয়ে টানাটানি। এখানে অবশ্য দেখার কেউ নেই। কিন্তু সুরোপিসি বিধবা মানুষ, অনাচার হতে দেবেন না। তাছাড়া, সাহেবের বিবি তাঁর পাশের গাঁয়ের। তিনিও এ ব্যবস্থায় রাজি হবেন না। তাই পেটের খিদে পেটেই থাকল। জাতটাতো বাঁচল। এখন সমস্যা কতক্ষণে গলাধাক্কায় ওপারে পৌঁছনো যায়। সুরোপিসি বলে দিয়েছেন, ওপারে সুখেলাভে পৌঁছতে পারলে, সব ঝামেলা মিটে গেলে, খাবারের দোকানে স্বস্তিমত পেট পুরে খেয়ে নেয়া যাবে। তবে পকেটের রেস্ত যদি কিছু বাকি থাকে তখনও। কারণ আর্দালি-বিদায় ইত্যাদি ব্যাপারে তাবৎ ঝঞ্ঝাট বাকি। তাতে ঠিক কত লাগবে, কত থাকবে সে এক চিন্তা।

তারপর শুরু হলো হাঁটা। সরাসরি বর্ডার দিয়ে যাওয়া যাবে না। সেটা বেআইনির থেকেও একটু বেশি। ঘুরপথে গ্রাম এলাকার মধ্য দিয়ে গেলে সেটাও বেআইনি বটে, তবে ঐ আমাদের জাত যাওয়ার মত। কত্তাদের চোখে না পড়লেই হলো। এ যেন সেই ভাসুর ঠাকুরের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাদ্দর বৌয়ের লজ্জায়

মরে যাওয়া। ধন্য দেশভাগ, ধন্য এই স্বাধীনতা এবং ধন্য এই লুকোচুরি খেলার আইন। আর্দালি সাহেব শুধু তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। আমাদের পা আর বাকি গা গতর, বিশেষ করে জঠর জ্বালা, তাঁর আদেশ মানতে চাইছে না। জঠরে বিচিত্রবীর্য থেকে থেকেই মোচড় মারছে। এইসব অনুষঙ্গ নিয়ে বনবাদার, ঝোপঝাড়, জঙ্গল, গাছপালা ভেদ করে আমাদের পরিক্রমণ। আহা সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

কিছুদূর গিয়ে আর্দালি সাহেবের নির্দেশ, নেও, এখানে বইসে আমরা এটটু জিরেন দি, আর হিসেব পত্তরডা মিডোয়ে ফেলি। কতাডা বুজিছ? সুরোপিসি হিসেবের কথায় একটু সন্ত্রস্ত। পুরোনো অভিজ্ঞতা তাঁর আছে বটে তবে এখানে নাকি নিত্য নিয়ম পাল্টায়। কে জানে, এ আবার কি হিসেব দাখিল করে। কিন্তু আর্দালি সাহেব বর্তমানে আমাদের ভবপারের কাণ্ডারি। তাঁর কথার মান্যতা তো দিতেই হবে। অতএব আমাদের জিরেন দেওন এবং তাঁর আজ্ঞামতন যথা আদিষ্টকরণ। আর্দালি সাহেব যশোর জেলার মানুষ। বাগ্‌বিধিতে তাঁর অভিজ্ঞান প্রবল। কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা বলে ওপারের অনেক স্থানই তাঁর চেনা। বললেন, শোনো, যা যা জানতি চাই সাফ সাফ কবা। ডাক্তার মোক্তারের কাছে বাত গোপন করার ধাত যদি থাকে, তালি আখেরে পস্তাবা, একথাডা কয়ে দেলাম। পেত্থমে শুধোই, শেষতক যাবা কনে?—তাঁর জিজ্ঞাসা সুরোপিসির উদ্দেশে, তাছাড়া তিনিই যখন চলনদার, জবাব তিনিই দেবেন। পিসি বললেন, আপাতক অশোকনগর, কল্যাণগড়। কাইল অ্যারা কইলকাতায় যাইবে। পয়সাকড়ি কত আনিছ বাইর কর। এহানে ট্যাকা একচেন করার ব্যবস্থা আছে। এহানে না করলি, ওপারে যেয়ে তকলিফ হবেনে। বাইর কইরে দেও যার যা আছে।—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যা বলবে করতে হবে। পিসির কাছেই আমাদের যথা এবং সর্বস্ব। তা যে কিছুমাত্র লোভনীয় এমন নয়। আমি আসার সময় সাকুল্যে কুড়ি টাকা নিয়ে এসেছি। তার কিছু স্টিমার, বাস, রিক্সায় খরচ হয়েছে। সুরোপিসিই সব করেছেন। পরে হিসেব হবে। পিসির কাছেই আমাদের যাবতীয় পাথেয় দিয়ে রেখেছিলাম আগে থেকেই। তিনি আর্দালি সাহেবের আদেশমত একটি কাপড়ে বাঁধা পুটুলি তাঁর সামনে রাখেন, বলেন, এই লয়েন, আর কিছু নাই। আর্দালি সাহেব পয়সাকড়ি গুণেটুনে বলেন, এই? আর নাই? এতেতো এক ঠিলা পানিও গরম করতি পারবা না। বডার পার করাডা কি মুখের কথা? চারে আমারে এ কেমন কাস্টমার জুডোয়ে দেলেন? মোর খাড়নির পয়সাডাও তো ওডবে না। না, তোমার ধারে আরও যা আছে, দেও দিনি, নালি কাম হবে না। ভালোয় ভালোয় দেও, নয়তো সার্চ করতি হবেনে। সে মেলা হুজ্জত। এই নিয়ে টানা হেঁচড়া। সুরোপিসি নানাভাবে তাঁকে বোঝাতে প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি অনড়। শেষ পর্যন্ত সার্চ। প্রথমে ব্যাগ, পোঁটলাপুটলি সব। কিন্তু নেই, কিছুই নেই। অবশেষে শরীর তল্লাসি। বাচ্চু আর আমার প্রথমে। কিন্তু কিছুই নেই। শেষতক্ সুরোপিসি, কিন্তু সেখানে পয়সা খোঁজের নামে যা করা হলো তাকে আর যাই হোক, সার্চ করা বলা চলে না। পাওয়া গেল আরও গোটা দশেক টাকা। চরিত্রবতী বলে সুরোপিসির যদিও বিশেষ সুনাম গাঁয়ের বাড়িতে

ছিল না, তবু এরকম লাঞ্ছনা কোনও রমণীই সহ্য করতে পারে না। উপরন্তু আমরা দু-দুজন তাঁর সন্তানতুল্য যেখানে উপস্থিত এবং হায়! কি নিরুপায় আমাদের সহন আর দহন! কিন্তু নির্বিকার আর্দালি সাহেব, যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাবে আদেশ করলেন—তোমরা এখেনে বসো। আমি একচেন করে নিয়ে আসি। বিশ্বাস করতেই হবে। কেননা, তার বিকল্প কিছু নেই। এমনকি ঐ লোকটি যদি সব পয়সা নিয়ে ফিরে নাও আসে, আমাদের কিছু করার নেই। এই স্থানের পথঘাট, গ্রাম, লোকজন কিছুই আমাদের চেনাজানা নেই। আমরা কেউই বিশেষ করে সুরোপিসি, কারুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে পারছিলাম না। পিসি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

এসব অনেককাল আগের কথা। আমাদের মানে আমার এবং সেথো বাচ্চুর বয়স তখন পনেরো ষোলোর কোঠায়। সঠিক স্মরণ নেই, তবে মনে হয়, তখন সুরোপিসির বয়স চল্লিশের কোঠায়। কিন্তু আমাদের ঐ বয়সেও মনে হতো, অসামান্যা রূপবতী সুরোপিসি সর্বার্থেই দেবভোগ্য। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন এবং স্থানীয় এক ভূস্বামীর রুগ্না স্ত্রীকে সেবাযত্ন করতে গিয়ে একসময় প্রায় রক্ষিতা হিসেবেই স্থানীয় নিন্দুক এবং হিংসুকদের আলোচনার খোরাক হয়েছিলেন। গ্রামগাঁয়ে সেসব দিনে ব্যাপারটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সেই ভূস্বামী শেষ পর্যন্ত তাঁকে আইনসম্মতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেই যুগে এব্যাপারটা বেশ দুঃসাহসিক ছিল বলতে হবে। তখন অবশ্য ভদ্রলোক কোনও একটা দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। পিসি শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শাঁখা সিঁদুর পরেননি কখনও এবং ভদ্রলোককে বরাবর আপনি আজ্ঞে করে উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতা বজায় রেখেছেন। প্রেমের বিচিত্র গতি। আমার জানা নেই, ঐ ভূস্বামী তাঁর মৃত্যুকালে সুরোপিসির ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা। যতদূর জানি, তেমন কিছু করেননি। এই বিবাহটি অবশ্য ভদ্রলোকের স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই হয়েছিল।

একটা ব্যাপার অবশ্য পরবর্তীকালে ঘটেছিল যে, ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর সুরোপিসি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করতেন। সে যাই হোক আমরা তাঁকে বরাবরই খুব সমীহ করতাম। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা বা আলাপ ব্যবহার খুবই ভদ্রজনোচিত ছিল। এখন এই নির্বান্ধব বিভুঁইএ তাঁর লাঞ্ছনা আমাদের কাছে ভীষণ বেদনা এবং অসম্মানের বলে মনে হচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আর্দালি সাহেব এসে জানালেন যে ভারতীয় মুদ্রামান পাকিস্তানি মুদ্রার তুলনায় খুবই পড়ে গেছে, অতএব নিজের ক্ষতি করেও তিনি, আমরা যাতে
অন্তত শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি তার খরচ দিয়ে তাঁর নিজস্ব দস্তুরি হিসেবে খুব সামান্য পয়সাই নিচ্ছেন। সুরোপিসি পয়সা গুণে নিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আর্দালি সাহেব প্রায় ছাগল-খেদা করে আমাদের একটা গ্রামের কিনারে এনে বললেন, এখন আর সময় নাই। তোমাগোতো যাতি হবেনে মেলা দূর। আমি আর জানিনে। মেলা পথ হাঁটতি লাগবেনে তোমাদের। এখন আর কথা

বাড়ায়ি সময় নষ্ট করলি চলবে না। এইখানদে সরাসরি কাট্ মাইরে সোজা যাও। হুই যে গেরামডা দেখতিছ, ওডার নাম পিরিচপুর। ওখানে পৌঁছে, ডানহাতি হাঁটতি থাকলি ঘণ্টাখানিকের মদ্যি যাইয়ে যশোর রোড পড়বানে। সেখানদে রিসক্য় বনগাঁ বাস স্ট্যান্ড চইলে যাও। বাঁসে করে অশোকনগর সামাইন্যা পথডা। তালে যেমন কয়েছি তেমন করো, মুই চললাম।— তাহলে এরই নাম হচ্ছে গলা ধাক্কায় হিন্দুস্তান যাওয়া।

তারপর কিছুদূর হেঁটে কিছু দূর ছুটে পৌঁছনো গেল সেই পিরিচপুর গ্রামে। এই গ্রামটা হিন্দুস্তান। কয়েক কদম আগেই পাকিস্তানের মাটি পেরিয়ে এসেছি। আকারে প্রকারে কিছুই তফাত বুঝছি না। তাহলে কি এখন আর ভয় নেই? আমরা শেষতক হিন্দুস্তান এসে পৌঁছতে পেরেছি? কিন্তু সুরোপিসি সতর্ক করেই চলছিলেন যেন আমরা যথাসম্ভব কম কথা বলি। ভাষা একটা সমস্যা। আমরা নিম্নবঙ্গের বাঙাল। যশোর জেলা আর এখানের ভাষায় বিশেষ তফাত বুঝছি না। আমাদের ওখানের ভাষা অবশ্য একেবারেই আলাদা। কথা সাবধানে না বললে নাকি ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এখানেও পুলিশ, কাস্টমস এইসব আছে। সুরোপিসি বলছিলেন। তাদের হাতে পড়লে বিপদ আছে। গ্রামের মেয়ে বৌরা ছেলেপুলে কোলেকাঁখে নিয়ে আমাদের সন্ত্রস্তভাবে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিল। কেউ কেউ একটু বসে জিরিয়ে যেতেও বলছিল। কিন্তু সুরোপিসি রাজি হননি। কারণ তখন যদিও আমাদের কাছে টাকা পয়সা বা জিনিসপত্র খুবই সামান্য ছিল, তবু সেটুকুও যদি কেড়েকুড়ে রেখে দেয় কেউ, এরকম একটা আতঙ্ক কাজ করছিল তার মধ্যে। আসলে আমরা কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এবং মনের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভয় আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে প্রায় তাড়া খাওয়া জন্তু জানোয়ারের মত ছুটতে ছুটতে আমরা যশোর রোডে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে রিক্সা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে চললাম। বাচ্চু এবং আমি একটায় আর সুরোপিসি অন্য একটা রিকসায় চলছিলাম। এভাবেই আমাদের হিন্দুস্তানে আসা। তখনও আমরা দেশটাকে হিন্দুস্তান নামেই জানি। ভারত নামটা তখনও রপ্ত হয়নি। রপ্ত হয়নি রাষ্ট্র বা নাগরিকতার ধারণাও। হিন্দুস্তানে হিন্দু হিসেবে বসবাস করার ব্যাপারটা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। যেমন পাকিস্তানে মুসলমানদের। এরকম একটা ধারণা নিয়েইতো বড় হয়েছি এবং আমাদের বাল্যাবধি শিক্ষাতো সেটাই। তাই সুরোপিসি যাই বলুন, এখন যশোর রোডের এই বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এবং রিকসার করে আসার সময় বাচ্চুর সঙ্গে বলাবলি করছিলাম যে আমরা এখন মুক্ত। যে স্বাধীনতা আমাদের এতদিন ছিল না বলে এতকাল কেন্নোর মত গুটিয়ে ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের যে অসম্মান আমাদের শামুকের মত খোলার মধ্যে সংকুচিত হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল, এখন তার থেকে আমরা মুক্ত। সুরোপিসির সতর্কীকরণ নিতান্তই অযৌক্তিক বোধ হচ্ছিল। ভারত যে ঘোষিতভাবে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবারই জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তা জানতাম না। পাকিস্তানে ইস্কুল কলেজে পড়বার সময় একথা কেউ আমাদের বলেনি। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ এই পদবন্ধটিও কোনও দিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

আমরা জানতাম হিন্দুস্তান হিন্দুর। তাই সেখানে যখন চলে এসেছি, তখন আর ভয়ের কি থাকতে পারে? এখানে যদি ভয় থাকে তো সেটা থাকবে মুসলমানের। হিন্দু হিসেবে এটা এখন আমার নিজের জায়গা। এই ধারণা বা বোধগুলো শুধু যে পাকিস্তানে বাস করে সেখানকার আচার ও শিক্ষা অনুসারেই আমাদের হয়েছিল, তাই নয়। আমাদের বাবা, জেঠা বা অন্যান্য বড়দের কাছে থেকেও পারিবারিক বা সামাজিক শিক্ষাক্রমেও আমরা তাই জেনেছি। তারাও যদিও পাকিস্তান এবং ভারতের সাংবিধানিক ভিন্নতা বিষয়ে জানতেন, কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে সে বিষয় কোনও শিক্ষা পাইনি। এখন বুঝি এটা যেমন সেখানকার রাষ্ট্রের, তেমনি আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের সাম্প্রদায়িক ভেদাচারের শিক্ষারই কুফল। সামাজিক ক্ষেত্রেও, জ্ঞান হওয়ার পর এই ধারণাই প্রবল হয়েছে, যখন দেখেছি যে, ওখানকার সংখ্যালঘু নেতারা যে কোনও প্লবতায় এদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতেন বা পাকাপাকিভাবেই চলে আসতেন। পরবর্তী কালে জেনেছি, সামান্য, হাতে গোনা যায়, এরকম দু একজন ছাড়া, সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে এদেশে পাকাপাকিই আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার ঐটুকু বয়সের মধ্যে এমনটা প্রায় কখনওই দেখিনি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও রাজনৈতিক নেতা তাদের স্বার্থে কোনরকম ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছেন। একমাত্র পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষ করে ১৯৫৪-র নির্বাচনে, যুক্তফ্রন্ট নেতারা দু-একবার গ্রামে গঞ্জে গেছেন, কিছু গরম গরম কথা বলেছেন। এছাড়া বরাবরই তাদের কর্মকাণ্ড শহর নগরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

গ্রামীণ স্তরে আমি বা আমার মত যারা, তারা কোনওদিন জানিই নি যে, আমাদের নাগরিকত্ব কি, বা নাগরিকত্ব কাকে বলে। এখন যে ভারতে এসেছি, এখানেই কি আমরা নাগরিকত্ব পাব? এইসব বোধ জন্মাবার জন্য আমাদের তখনও অনেক ঘাটের জল খাওয়া বাকি ছিল। যে যাহোক, সাথের সেথো বাচ্চু বলে যাচ্ছিল, না বোজজো, কি জানো এট্টা উদ্বাগ আছে। পিসি কৈলাম সাবধান করতেই আছে। আমাগো লগে তো পাসপোর্ট, মাইগ্রেশন আশন কিছু নাই। আমরা যে পলাইয়া আইছি। বেআইনি রাস্তায়। হেকারণ সাবধান থাকন দরকার।

না, আমাদের কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই। আমরা দাঙ্গা উৎপীড়িত হয়ে, উৎখাত হয়েও আসিনি। আমাদের কেউ প্রত্যক্ষত এখানে আসতে বাধ্য করেনি। তথাপি আমরা কেন এসেছি তার কোনও জবাব আমাদের নেই। কিন্তু আমরা যে ওদেশে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করার আধিকারিক নই, আমাদের যে ওখানে রুজিরোজগারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তার কি? তখন যা বয়স তাতে তো সব কিছু জানতামও না বুঝতামও না। ওখানে আমি স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করতে পারব না, যদিও বা পারি সরকারি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেসরকারি চাকরিও পাবার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। আমাদের জমিজমা বেদখল হয়ে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলেও নানান ফৈজত। তাহলে আমরা কি করব। দেশভাগ, দাঙ্গা, পাসপোর্ট, মাইগ্রেশানের হুজ্জোত—এসবের আমরা কি জানি? যখন একবার এসেই পড়েছি, তখন সহজে হাল ছাড়ছি না। এরকম একটা ভাব এখন আমার মনে। আর শুধু আমরাই নই, নিত্য রোজ হাজার লোক এভাবেই তো

আসছে। কে ঠেকাবে তাদের? তারা যদি এখানে ঠাঁই পায় আমরাও পাব, পেতেই হবে। নইলে কোথায় যাব? সুরোপিসি যেখানে আমাদের এনে ফেললেন, সেই রাস্তাটা কি বিশাল দৌড়ের এবং বিস্তারই যে কি পর্যন্ত ব্যাপক, সেকথা কাকে বোঝাই? আমি কি কোনওদিন এতবড় লম্বা চওড়া রাস্তা দেখেছি? এ রাস্তার নাম যশোর রোড। সুরোপিসি ধমকান, চুপ এহন কথা কওন নাই। বেয়াকে বুজইয়া ফ্যালাইবে যে আমরা পাকিস্তান থিহা আইছি, বাঙ্গাল। এহানে কৈলাম আবার বাঙ্গাল ঘডির এট্টা কাজইয়া আছে। এদেশিরা কিন্তু পছন্দ করে না যে আমরা এহানে আর আই। আবার যদি ধরইয়া ফেরত পাডাইয়া দে, করমু হ্যানে কি?

রাস্তায় যেসব সেথো জুটেছে তারা সব আমাদেরই মত হিন্দু এবং তাদেরও বিশ্বাস যে হিন্দুস্থানে তাদের থাকার ষোলআনা হক আছে। তারা এদেশে থাকতে চায় বলেই না এসেছে। কিন্তু হিন্দুস্থান তাদের চায় কি না সে এক ধন্দ। একটা ব্যাপার অবশ্য লক্ষ করলাম যে এসব নিয়ে কেউ কিছু প্রশ্ন করছে না। সম্ভবত করার সাহসও নেই এদেশি কারুর এখনও। কারণ, দাঙ্গা ইত্যাদি এখনও অনেক দিনের ঘটনা নয় এবং তার ক্রমান্বয়তা জারি আছে। উভয় পারের উদ্বাস্তুদেরই মাথা বেশ গরম। রাষ্ট্রনেতাদের তারা খুব একটা খাতির করবে এমন ভরসা নেই। অনেকেই সরবে অনেক কথাই বলছে বলে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারি। শুধু সুরোপিসিই দেখছি ভয়ে আতঙ্কে মরছে।

আবার ভীষণ অবাক লাগছিল ভাবতে। যেখানে জন্মকর্ম, যেখানে শৈশব, কৈশোর, প্রথম যৌবনের স্ফুরণ, যেখানের মাটি, কাদা, জল, রোদ, বিষ্টি গায়ে মেখে এতকালের অভ্যেস গড়ে উঠল, সেই মাটিতে আমি, আমরা বিদেশি হলাম। আর যেখানের মাটির এক কণা ধূলিও সারা গতর রগড়ে পাওয়া যাবে না, সেখানে আমি দেশ খুঁজে পাব? এই যে মহাকায় রেইনট্রি বা অন্যান্য মহাবৃক্ষগুলো যশোর রোডের দুপাশে দাঁড়িয়ে, জাতিগতভাবে আমি যে তাদের চিনি না তাতো নয়। কিন্তু আমার বড় খাল পাড়ের তাঁদের মত এরা কি আমায় চেনে! এদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা কি আছে? এই যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, শ্রান্ত ক্লান্ত অভুক্ত অবস্থায় বাসের জন্য অপেক্ষা করে আছি, কই, এদের কারুর তরফ থেকে তো সেই অনুভব-তরঙ্গের সাড়া পাচ্ছি না, যা নিমেষে আমার বোধে এই বাক্য হবে, আয়ো, যাও কই, এট্টু বইয়া যাও—আশ্চর্য নয়? কই কেউ তো দুপশলা পাতা ঝরিয়ে বলল না, সুখে থাক। যেমন খাল পাড়ের তাঁরা বলতেন। তাঁরা তো কতপুরুষ আগে থেকেই এরকম আশীর্বাদ আমাদের করে এসেছেন। নাকি আমি কোথাও ভুল করছি?

হুড়মুড়িয়ে একটা বাস এসে পড়ায় চিন্তাসূত্র এলামেলো হয়ে যায়। সুরোপিসি প্রায় খেদিয়ে বাসে তোলেন। তিলার্ধ স্থান নেই। যদিও বাসের টার্মিনাস এখানেই কিন্তু এতক্ষণ কোনও বাস সেখানে ছিল না। তাই বাস আসতে না আসতেই হুড়োহুড়ি করে সবাই উঠে পড়েছে। আমরা অভ্যস্ত নই বলে অতটা ক্ষিপ্রতায় উঠতে পারিনি। সুতরাং দাঁড়ানো ছাড়া গতি নেই। সুরোপিসি যাহোক একটা গাঁটটির উপর বসে পড়েছেন। কত মানুষ রে বাবা, আর তাদের নানান কেসেমের বাক্‌রীতি। খানিক বুঝি, বেশিটা বুঝি না। এখানে ওখানে হিন্দিভাষায় লেখা এবং

তেরঙার বাহুল্যে বুঝতে পারি এখানে 'চাঁদ তারা সাদা আর সবুজ মিশান'-এর কোনও আয়োজন নেই। সেটাই দেখতে দেখাতে বড় হয়েছি কি না। ইস্কুলে পড়ার সময় মৌলভি হুজুর কুচকাওয়াজ করাবার সময় গাওয়াতেন, চাঁদ তারা সাদা আর সবুজ মিশান, আমাদের কওমি নিশান, কওমি নিশান, কওমি নিশান। এখানে বাসের জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি ভারতের জাতীয় পতাকা। তেরঙা, গৈরিক, সাদা আর সবুজ। কয়েকদিন আগে ছাব্বিশে জানুয়ারির সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে, তারই চিহ্ন। কৌতূহলী জিজ্ঞাসু এবং ওয়াকিবহাল যাত্রিদের প্রশ্নোত্তরে জ্ঞানলাভ করতে পারি। পাকিস্তানে সাধারণতন্ত্র দিবস বলে কিছু ধারণা ছিল না। সুরোপিসি টিকিট কাটেন অশোকনগরের। সেখানে থাকে তাঁর ভাইয়ের ছেলে পরান কর্মকার। কল্যাণগড়ে।

কল্যাণগড় কলোনি তৈরি হয়েছে জবরদখল জমিতে। ছেঁচা বাঁশের বেড়া আর খোলার চালার ঘর বানিয়েছে পরান। কথা চলছে সরকার এইসব উদ্বাস্তুদের জবরদখলি জমির পাট্টা দিয়ে দেবে শিগগিরই। ঘরে আছে পরানের লক্ষী লক্ষী 'লগতে'র একটি বৌ, আর কুল্যে একগণ্ডা 'ছাওয়াল পান'। কিন্তু কাদের জমি জবর দখল হয়েছে? এটাও ভাবছি।

বৌটি আমাদের বেশ আদর আপ্যায়ন করল। বয়স বেশি নয়। রাতে ডাল ভাত, বেগুন বাজা, ট্যাংড়া মাছের ঝোল আর কড়াইশুটি দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি। উদোম আহার। ঠাট্টা ইয়ারকি আর মশকরাও করলে ঢের। বৌটির গা থেকে বাঙাল গন্ধ তখনও যায়নি। বাচ্চু এসব ব্যাপারে, আমার থেকে ঢের বেশি তালেবর। সে এসেই দিব্য দেওর বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছে। পিসির সুবাদে আমরা তার দেওর হওয়ার হক অবশ্য রাখি। আমার মুশকিল, মেয়েদের ব্যাপারে একটু অধিক সমীহভাব। আসলে আড়ষ্টতা। চট্ করে মাসিমা, পিসিমা, রাঙাবৌদি পাতাতে পারি না। সময় লাগে। তা বৌটি দেখলাম আমার লাজলজ্জার বারোটা বাজিয়ে, চুল টেনে, গাল টিপে, বেশ একটি ছোট্‌ঠাকুরপো বানিয়ে তুললে। সুরোপিসি তার পিসশাশুড়ি। সুতরাং আমরা তার পর নই। অতএব ঠাট্টা বুটকিরি তো চলতেই পারে। তদুপরি তার বয়সের তুলনায় পরান একটু বেহিসেবি বয়স্ক এবং হাঁপানি রোগে ক্লিষ্ট। হিসেবমত কর্মকারের পক্ষে বৌটির শ্বশুর না হলেও, বট্‌ঠাকুর হওয়াই সঙ্গত ছিল। তাই বোধহয় হঠাৎ পড়ে পাওয়া আঠারো আনার মত এই দুই উঠতি বয়সি 'আচুক্‌কা' দেওরদের সঙ্গে তার থোড়বড়িখাড়া দাম্পত্য অভ্যাসে একটু ভিন্নাচারী রসসম্পর্ক। আবার সেখানে পিস্‌শাশুড়ির রক্তচক্ষুর ভীতিও নেই। কারণ সুরোপিসির বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখানেও যে পৌঁছায়নি তা নয়। একথা পরানতো জানতোই, বৌটিও নিশ্চয় জানত। তবে কিনা কোথাকার কাদা কেইবা ঘাটে? সুরোপিসির অর্থবল বিষয়ে কিংবদন্তি ছিল, আর পরানের ছিল তার উপর ষোল আনা হক। কারণ সুরোপিসি নিঃসন্তান। অতএব তাদের অতসব ব্যাপারে দরকারই বা কি? ফলত হিন্দুস্তানের প্রথম রজনীটি আমাদের বেশ রসেবসেই কেটেছিল।

সুরোপিসি সাতসকালে তুলে দিয়ে তাড়া দিচ্ছিলেন, যাতে আমরা বেলা বাড়ার আগেই রওনা করি। বলছিলেন, এবার য্যার য্যামন ঠিকানা হেইমত

সাবধানে যাও বেয়ান বেয়ান। অচেনা অজানা দ্যাশ। দিনাদিনি পৌঁছনোই মঙ্গল। যাইয়া এখান চিডি কর্‌ইও। নাইলে দ্যাশে ফিরইয়া মাবাপেরে কমু কি? কথা সত্য। দায়িত্ব নিয়ে এ পারে নিয়ে এসেছেন। এতো সরলমার্গী সফর নয় যে সরাসরি পৌঁছনো গেল। এ হলো গলাধাক্কার পারাপার। আত্মজনদের কাছে সহিসালামত পৌঁছলাম কিনা, সেকথা জানাবার দায়তো চলনদারের থাকেই।

কিন্তু বাড়ির গিন্নি অত তাড়াতাড়ি ছাড়তে নারাজ। তার বক্তব্য সরল। যাইবে তো কইলকাতা, এহান দিয়া এহানে। অসবিদা কি? কাইল রাইতে খাওন লওনের কিছু কঁরন যায় নায়। আইজ বেয়ান বেয়ান কম্মকারে বাজারে গেছে। কইয়া গেছে দুফইরের খাওন লওন সারইয়া বাইর অইলেও, সয়ন্ধ্যার আগেই পৌঁছাইয়া যাইবে হ্যানে। এ্যাতো উফাল তাফালের কি আছে?—অতএব তথাকরণ, নচেৎ গেরস্তের অকল্যাণ। দেশ ছেড়ে বিভুঁইয়ে এসেও এইসব দেশাচার আত্মীয়তা তখনও ছিল। আজকের অবস্থায় সেসব ভাবলেও বুকে মোচড় লাগে।

সুরোপিসির চিন্তা ভিন্নাচার। তাঁর সঙ্গে আমরা এসেছি। তিনি নিজে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন না। তাঁর চেনা জানার পরিধি পরিমিত, কল্যাণগড়, অশোকনগর পর্যন্তই তাঁর দৌড়। দেশের বাড়ির ধ্যানধারণা সেসব দিনে বড় মজাদার, অদ্ভুত। অমুকে অমুক দিন কইলকাতায় যাইবে। তো মোর পোলাডারে এট্টু লইয়া যাবা? অর মাউসায় বাদাম পাহাড়ে থাহে। বড় চাক্‌রিদার মানুষ। পোলাডা ওহানে গেলে এট্টা গতি অইয়া যাইবে। সে মাউসা না হয়ে লতায় পাতায় যে কোনও আত্মীয় হতে পারে। যে-ই হোক, সেতো আর পোলাডারে ফ্যালাইয়া দেতে পারবে না।—সবাইতো জানে, এ পোড়ার দেশের হালচাল। এই যেমন একটা দিক, তেমনি আরেকটা ধারণা আরও চমৎকার। যেন, বনগাঁ, অশোকনগর, বাদাম পাহাড় অথবা হিন্দুস্তানের যেকোনও স্থানই কইলকাতা। যে যেখানেই যাক, সে কইলকাতায়ই যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে পোলাডারে পাঠানো চলতে পারে। গোটা হিন্দুস্তানই তাদের কাছে কলকাতা। বাচ্চু যাবে যাদবপুরে, আমি গোবরায়। বাচ্চু হুঁশিয়ার, হুনিয়ার ছেলে। তাছাড়া তার বাবা মা তাকে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা আমার কর্তাদের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন নন। বাচ্চু হিসেবিও। সে যাদবপুরে কোথায় যাবে, কিভাবে যাবে, খরচপত্তর এ বাবদে কিরকম লাগতে পারে, তার সব ব্যবস্থা সে করে এনেছে। তার অভিভাবকেরা তা করে দিয়েছেন? বুঝিয়েও দিয়েছেন সব। আর আমার গার্জেনরা যে সুরোপিসির সঙ্গে আসতে অনুমতিটুকু দিয়েছেন, তাতেই আমি ধন্য এবং কৃতজ্ঞ। বেঁকে বসলে কি করতাম? আসার সময় কুল্যে কুড়িটি টাকা সঙ্গে ছিল, পাথেয় হিসেবে। মনে নেই, বোধহয় বাবাই দিয়েছিলেন, ধারকর্জ করে। তখনকার বাজারে তার মূল্য অনেক। সীমান্তে গলাধাক্কার দাম দিতে না হলে, ওতেই দিব্য কুলিয়ে যেত। এখন হাতে গোটা দুয়েক টাকা আছে। সুরোপিসি বা বাচ্চুর কাছে ধার নেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। তাদের অবস্থা এমন কিছু হিংসে করার মত নয়। মনের মধ্যে সেজন্য একটা খিচ্‌ লেগেই আছে। আবার গোবরার অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ, অথবা সে স্থানে যাবার হালহদিশ কিছুই আমার জানা নেই। ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি, এই পর্যন্ত। সেটার অবস্থান কোথায় তা জানি না।

কর্মকার বাজার সেরে আসতে তার কাছে খানিকটা আন্দাজ পেলাম বটে, তবে তাতে যে কিছু বিশেষ সুবিধে করতে পারব, এমন মনে হলো না। সেখানে যাদের কাছে যাব, তাদেরও জানানো হয়নি যে, আমি যাচ্ছি তাদের কাছে। যে ঠিকানাটি নিয়ে আসলে সহজে মুশকিল আসান হতো, সেটি আনিনি। সেটি বারাসাতে, আমার দিদির বাসার ঠিকানা। অশোকনগর থেকে বারাসাত সেসব দিনেও খুব দীর্ঘ যাত্রার পথ নয়, যদিও তখনও এমু কোচ চালু হতে বেশ কিছুকাল বাকি। এব্‌লা গিয়ে ওব্‌লা ফেরা যেত। কয়লার ইঞ্জিনের গাড়ি, বাসতো ছিলই। এমনকি ওটুকু রাস্তা আমরা বাঙাল রীতিতে হেঁটেও মেরে দিতে পারতাম। কিন্তু ঠিকানা আনিনি। শুধু বারাসাত, নবপল্লী এটুকুই জানা ছিল।

দুপুরের ভূরি ভোজ শেষে, সুরোপিসির একরাশ উপদেশ এবং সাবধানবাণী, আর নয়া বৌদির সঙ্গে হাসি মস্করা সেরে, দুই কাষ্ঠবাঙ্গাল যখন অশোকনগর বাস স্ট্যান্ডে এলাম, বুঝলাম, হিন্দুস্তান ব্যাপারটা গতরে কইলকাতার চাইতে বড়। আবার একে তাকে পুছতাছ করে এও বুঝলাম, কইলকাতা ব্যাপারটাও ক্ষেত্র বিশেষে গোটা হিন্দুস্তানের চাইতে ঢের ঢের ডাঙর। দুই সাঙাতে অনেক হিসেব করে সিদ্ধান্ত করলাম যে, সময় যা হাতে আছে তাতে বারাসতে দিদির বাড়িতে রাত কাটানোই উচিত কাজ হবে। নবপল্লীতে দিদিদের একান্নবর্তী বড় পরিবার। জামাইবাবুর নামটাও জানা আছে। ঠিক খুঁজে পাব। তবে অতি বাল্যকালে দেখা দিদির মুখটা আব্‌ছা মনে থাকা ছাড়া, সে বাড়ির কাউকেই কোনওদিন দেখিনি আগে। এমনকি জামাইবাবুকেও না।

কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে পকেট। দুজনেরই তৎস্থানে রেস্তর অবস্থা যা লোভনীয়, তাতে কোনও পকেটমারও যদি সেদিকে হাত বাড়ায়, তবে, হয় লজ্জা পেয়ে নিজেই দুচার পয়সা সেখানে রেখে দেবে, নয়তো রেগে গিয়ে, একটু আড়ালে ডেকে কান ধরে ওঠবস করাবে। ভাড়া মিটিয়ে পকেটে পড়েছিল একটা পাঁচ নয়া পয়সা, একথা মনে আছে বেশ।

বারাসাত স্ট্যান্ডে নেমে, লোকজনদের কাছে থেকে নবপল্লীর অবস্থানটা জেনে নিলাম। কিন্তু শুধু জামাইবাবুর নামটা মাত্র সম্বল করে দিদির বাড়ির হাতায় পৌঁছতে, সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দশটা বেজে গেল, যদিও সেখান থেকে দিদির বাড়ির দূরত্ব পায়ে হেঁটেও বড় জোর মিনিট কুড়ির।

তা দিদিদের বাড়িটা বেশ বড়সড় ব্যাপার। গাছপালা, বাগান, পুকুর, সস্তাগণ্ডার দীয়তাং ভূজ্যতাং'এর যুগে গড়ে ওঠা বেশ হিসেবি বন্দোবস্ত। চৌখোস, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের গোছালো গেরস্থালি। একটা দেশের বাড়ি দেশের বাড়ি ভাব আছে। হয়ত তার থেকেও বহুগুণ ঠাটে বাটে রাজপাট তাদের এখানে। দেশভাগের সম্ভাবনা দেখা দিতেই যেসব হিসেবি, দূরদর্শী মানুষেরা আখেরের কথা চিন্তায় রেখে ব্যবস্থা নিতে পেরেছিল, এরা তাদেরই দলের। সেই রাজ্যপাটে, ধূলিধূসর দুই বিচিত্র বেশধারী, ছন্নছাড়া দেশত্যাগী ভাটিকুমার, মাঝরাত্তিরে অতিথি হলে, এপারের তৎকালীন আত্মীয় গেরস্তদের খুব একটা আহ্লাদ হবার কথা নয়। প্রথমে তো কেউ কাউকে চিনতে পারে না। অতঃপর, ওমা, মেজবৌ দেখ, বলে কিনা তোমার নাকি ভাই, পাকিস্তানের লোক ইত্যাদি। অতএব, মেজবৌয়ের

আগমন এবং কে, কি নাম, কার পরের জন, ইত্যাদি এবং তারপর কান্না। কিন্তু এর সবকিছুরই কারণ দীর্ঘ অদর্শন, ভাইবোনদের একসঙ্গে বেড়ে উঠতে না পারা, অর্থাৎ, কেউ হেথায় কেউ হোথায়। দেশভাগের জন্য ভিন্ন আশ্রয়ে, ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অসহায়তা। কিন্তু তার মধ্যেও কথা আছে। যেখানে ভাগটা একই পরিবারের ভাইবোন, বাবা-মা ইত্যাদিদের মধ্যে, সেখানে ধরনটা একরকম। রক্তের সম্পর্কজনিত, একদার স্মৃতিজনিত টান। সেক্ষেত্রে কান্নাটা তৎনগদ ফেটে পড়া একটা প্রবল আবেগ। এক্ষেত্রে যেমন দিদির এবং আমার। কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে-তা ভিন্ন। বিশেষ করে যাদের একেবারেই চিনি না, জানি না। সেখানে কৌতূহল, রগড়। কে আর মাটি খুঁড়ে জল খোঁজে? তাছাড়া জলের আত্মীয় সম-জলে বাস না করলে বোধেই বা আসে কি করে। এজন্যে কাউকে ইতিহাসসম্মতভাবে দায়ী করা যায় কিনা জানি না। আর দায়ী করেই বা কি লাভ? আবার সদ্য ছিন্নমূল হয়ে দেশ থেকে আসা দুঃস্থ আত্মীয় হিসেবে, অসংস্কৃত গ্রাম্যতার স্বাভাবিক দৈন্যের হাত থেকে বাঁচার উপায়ই বা কি?

আমাদের দুই আকাট আবোড় বাঙালের বেশবাস, চেহারা, ভিন্ন বাগ্‌ধারার কথাবার্তা, দিদির বাড়ির ছেলেপুলেদের তুলনায় যে অতিমাত্রায় অমার্জিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দিদির ভাসুরপো, যে প্রায় আমাদেরই সমবয়সি, সে খুব অবাক বিস্ময়ে, আমাদের ঐ অদ্ভুত পোশাকআসাক দেখে উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে জানাল যে পাকিস্তান থেকে দুজন মামা না কারা এসেছে, তাদের পরনে হাওয়াই সার্ট আর পাজামা এবং পায়ে মিলিটারি বুট। কিরকম যেন মুসলমান মুসলমান দেখতে। আমাদের ধারণাই ছিল না, অথবা শিক্ষা, যে, এরকম পোশাকে নাগরিক সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে পোশাকের চাকচিক্য এবং পারিপাট্য একটা ব্যাপার। সেখানে যা খুশি তাই পরা যায় না। পোশাক সেখানে লজ্জা নিবারণের জন্য যতটা, তার অনেক বেশি দেহ সৌষ্ঠব বাড়ানো। সামর্থ্য ব্যাপারটাও বিবেচ্য নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে এরা বা এদের জ্যেষ্ঠরাও আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখান থেকেই এসেছিল। কিন্তু তারা বহু আগে এসেছে বলে নাগরিক কিছু কায়দা কানুন শিখে নিয়েছে। তারা যখন দেশ গাঁয়ে ছিল, তখন সেখানে বাহুল্য না থাকলেও দৈন্য ছিল না। তখন দিনকাল আলাদা ছিল। গ্রামীণ মানুষেরা তখন অবস্থা অনুযায়ী গ্রামীণ ভদ্রস্থ পোশাক আসাক পরত। কিন্তু সেখানে যারা আমাদের মত রয়ে গিয়েছিল, বিগত পনেরো ষোল বছরের মধ্যে তারা কি অবস্থায় পৌঁছেছে, দৈন্য, সামাজিক অবক্ষয় এবং তথাকার রাষ্ট্রীয় একচোখোমি তাদের কোথায় নিয়ে গেছে, সে নিয়ে কোনও ভাবনা তাদের মধ্যে দেখা গেল না। বরং দিদির ভাসুরপোর ঐ কুরুচিকর উচ্চারণে বড়রাও যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করছিল, এরকমই আমার বোধ হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, তারা যেন সংস্কৃতিগতভাবেই একটা ভিন্ন মানসিকতায় অবস্থান নিয়েছে এবং ওদেশে রয়ে যাওয়া অবশিষ্টদের সঙ্গে আদৌ কোনও আত্মীয়তা বোধ করছে না। ব্যাপারটা তুচ্ছ একটা কথার প্রসঙ্গেই আমি বলছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন ফেলে আসা সেই দীন জনপদের দীনতর মানুষদের কাছে ফিরে যাওয়ার আকুলতাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালেও, অর্থাৎ এপারের রীতিনীতি,

আচার, আচরণে যথেষ্ট ধাতস্থ এবং অভ্যস্থ হবার পরেও 'বাঙালঘটি' বিসংবাদের কদর্য আর নিষ্ঠুর বিতণ্ডা তথা রঙ্গব্যঙ্গে মনে হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটা শুধু হিন্দুমুসলমানের ধর্মীয় গণ্ডিতেই আবদ্ধ নেই, এদেশেও আমাদের আশ্রয় নেই, আমরা আমাদের আত্মীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। এদেশেও আমরা অবাঞ্ছিত, এমনকি আত্মীয়কুটুম্বদের কাছেও। একথাটা একটু খোলসা করে না বললে বোঝা যাবে না।

যেখান থেকে এসেছি সেখানে সেই সময়ে গ্রামীণ জীবনে পোশাক শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য। এমনিতেই গ্রাম গাঁয়ে পোশাকের চাকচিক্য বা আতিশয্য থাকে না। তাদের কাছে প্রয়োজন বস্তুটা বড় সীমাবদ্ধ এবং সেটাকে তারা আদর্শই মনে করে। তার উপর, আগে যেমন আভাস দিয়েছি, ওখানে থেকে যাওয়া সংখ্যালঘুদের আর্থিক অসাচ্ছল্য, আনন্দ উদ্যমহীন জীবন যাপন, তাদের জীবনে এনে দিয়েছে এক অপরিসীম ঔদাসীন্য। তাই যার যা জোটে সেটাকেই লজ্জা নিবারণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে তাদের বাধে না। শহর নগরের রীতি কানুন সেখানেও আলাদা, এখানকার মতই। কিন্তু সেখানে এটাকে দারিদ্র্য অথবা গ্রাম্যতা হিসেবে মনে করা হতো, সেটা ছোট বড় সবার কাছে পরিহাসের বিষয় হতে পারে এমন কখনও মনে হয়নি। এটা নিয়ে বড়জোর কাউকে একটু হালকা ঠাট্টা করা যেতে পারে, অবশ্যই শালীনতার মাত্রা বজায় রেখে। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম ছিল না আদৌ।

ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে গেল যে দিদি পরের দিনই জামাইবাবুকে আমার জন্যে একটা শার্ট কিনে আনতে বলেন। বাচ্চু সেদিন ভোর বেলাই চলে গিয়েছিল বলে তাকে আর বস্ত্রবিভ্রাটের নাগরিক রঙ্গের মোকাবেলা করতে হয়নি। আমার ব্যাপারটা সহজে মেটেনি কিন্তু সেই রগড় নিবারণের প্রচেষ্টাটা অত্যন্ত আত্মগ্লানিকর হয়েছিল আমার পক্ষে। দিদির অস্বস্তির কারণ না বোঝার কিছু ছিল না। কিন্তু কিরকম যেন অপরাধী লাগছিল নিজেকে, তাঁকে এই অস্বস্তিতে ফেলার জন্য এবং তার চাইতেও বেশি এজন্য যে, জামাইবাবুকে তাঁর অনুরোধ করতে হয়েছিল এই দীনতার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য। জামাইবাবু আমাকে নিয়ে দরজির দোকানে গিয়ে, মাপজোক করিয়ে জামা বানাতে দিলেন। তখনও কাপড়ের মাপ গজফুটে হতো। মনে আছে জামার ছিট কাপড়টি বারো আনা গজ দরে কিনেছিলেন তিনি। অধোবস্ত্রের জন্য তাঁরই পরিত্যক্ত একটি পুরনো প্যান্টালুন বরাদ্দ হলো। সেটির বহর এবং কোমরের মাপ, আমার তখনকার চেহারা অনুযায়ী প্রায় আড়াই গুণ অতিরিক্ত। শার্টটি তৈরি হয়েছিল ধুতির সঙ্গে পরিধেয় হিসেবে যেমন হয় তেমনি (এ তথ্যটা পরে জেনেছি, তখন জানতাম না)। অতএব তাকে প্যান্টালুনের মধ্যে গুঁজে, বেল্ট অভাবে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে, আমি দিব্য নাগরিক মূর্তি ধারণ করেছিলাম। মিলিটারি বুটটার অদলবদল কিছু করা যায়নি। বেল্টের অভাবে দড়ি বাঁধার পরামর্শটা জামাইবাবুরই এবং সেই দড়িটি একটি রঙিন শাড়ির পাড়।

অথচ এদেশে আসার আগে, পরিধেয় বস্ত্র অনটনের জন্য, আমার মনে যে দৈন্য এবং উঞ্ছতামাখানো স্বপ্নকল্পনাগুলো ছিল, তা বর্ণনা করতেও এখন লজ্জা

পেতে হয়। সেকথা মুখে বলা যায় না, তাই লিখে জানাতে হয়। যেমন আমি সেইসব দিনে ভাবতাম, কলকাতা গেলে, আমি তো নিশ্চয় এর তার বাসায় নিমন্ত্রিত হবো, অথবা তারা জানতে পারলে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যাবে। তখন অবশ্যই আমাকে তারা জামা কাপড়, এটা ওটা দেবে। কারণ আমি তো তাদের আত্মীয়। এযেন বিভূতিভূষণের অপরাজিত'র অপুর সেই ভাবনার মত। এই দুপুরে জেঠাইমার বাসায় গেলে, নিশ্চয়ই তিনি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অপুকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু জেঠাইমা তাকে খেয়ে যেতে বলেননি।

ভ্যান্‌তারা ছেড়ে মোদ্দা কথাটাই বলে ফেলি না কেন? আমি যে খুব সাদরে গৃহীত হবো তার এমন কি হেতু আছে? এরা এখন আর আমার সদ্য ফেলে আসা ভূখণ্ডের কেউ? কেনই বা হবে? এখন এদের রীতিকানুন আলাদা। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক তিতিক্ষায়, এরা সবে পুকুরটা, বেগুন খেতটা, এটা ওটা তরিবৎ করে সাজিয়ে বসেছে। এখানে আমার মত অতিথিজনের নৈমিত্তিক আগমনে তারা আহ্লাদে গলে পড়বে, তাও কখনও হয় নাকি? সেসব পরম্পরা তো দেশভাগ আর দাঙ্গায় কবেই লোপাট। বর্তমান ক্ষেত্রে আড়ম্বরটাই শুধু দেশের বাড়ির আঙ্গিকে। তার লোকাচারি 'আইসনজন', বইসজন' বিন্যাসটাতো এদের কাছে এখন যুবনাশ্বেরও বাপের আমলের গল্প।

অথবা সেসবের অভ্যেস এখনও বজায় রাখছে তারা, যারা সেখানে আছে, আমি পুনরুক্তি করছি, যারা সেখানে আছে মাটি কামড়ে। কালেভদ্রে এখনও যদি খালের ঘাটে কোনও নৌকো লাগে তো গোটা গ্রাম খালপাড়ে। 'আরে কেডা আইছে? আহা কদ্দিন পর। আহা, আয়ো আয়ো। আছো তো ভাল? পোলাপানগো আনলা না যে'! অবস্থান্তরে সেসব মাখামাখি একদিন এদেরও নিশ্চয় ছিল, যখন এরা গ্রামীণতায় ছিলেন। দেশ যখন রাষ্ট্র হয়নি তখনকার কথা। সে অভ্যেস এখন তাদের থাকবে কি করে? এখানে এখন আমাদের মত হতভাগা যারা এসে পড়ে পুরনো অভ্যেস নিয়ে, তাদের আকাঙ্ক্ষা মিটবে কি করে? এজন্য আমাদের খাবি খেতেই হয়। ভয় হয়, এই নাগরিকতায় আমিও একদিন এমনটি হয়ে যাব নাতো? আমার এই আত্মা, যা, শত দারিদ্র্য বা দৈন্যে এতকাল নিত্যবহা খালের মতই স্নিগ্ধ সরসতায় ছিল, তা শুকিয়ে যাবে নাতো?

কিন্তু আমার দিদি তো স্নেহময়ী। স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়ে কোলে কাঁখে করে, গানে ছড়ায়, শোলোকে, সেইসব দিনগুলোতো সেই পার করিয়ে ছিল। সে স্মৃতিও মনের মণিকোঠায় পদ্মরাগ মণির মতন। কিন্তু দিদিতো মেয়ে। এটাতো তার শ্বশুর বাড়ি। মেয়েরা তাদের ইচ্ছেকে কখনও রূপ দিতে পারে ইচ্ছেমত? সেই দিদির স্মৃতি লক্ষ হাজার বছর আগের কথা। সে সব তো কাজলা দীঘির অতলে শোলোক হয়ে এতকাল নিঃঝুম ছিল, এখন হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দীঘির জলের আলোড়নে লালশালুক, নীলশালুক হয়ে দোলন দিচ্ছে। আমি হিন্দুস্থানে এসেছি। কিন্তু এখনও অনিকেত পন্থহারা। আমাকে আরো কতদিন পন্থের সন্ধানে চলতে হবে জানি না। হয়ত অনন্তকাল। সুরম্য নিকেতনইতো আর বাস্তু-দেশ নয়। তার সংজ্ঞা, তার ভূগোলতো আলাদা। তাকে আর কোথায় পাব?

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা

একটি জাতির সভ্যতার মানদণ্ড সে দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষার দিক-নির্দেশনা আসে দেশের সংবিধান থেকে। কেননা সংবিধানই হলো একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। একাত্তরে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের যে সংবিধান প্রণীত হয়েছে তাতেও আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চারটি মূলনীতিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল আমাদের সংবিধান। জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও এই চারটি আদর্শকে সামনে রেখে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানই আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির উৎস। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রথমেই নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য একই পদ্ধতির একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় আর মৌলনীতির আদর্শেই রচিত হয়েছিল কমিশনের রিপোর্ট। প্রারম্ভেই কমিশন বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত হয় এবং বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য কমিশন যেসব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হলো :

ক. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন।

খ. শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন।

গ. মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন।

ঘ. সমাজের উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার প্রয়োগ।

৬. ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসরণে মাধ্যমিক স্তরে নীতি ও সাধারণ ধর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা, এবং একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত বৈষম্যহীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

স্পষ্টতই এই সুপারিশমালা সংবিধানের প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, খুদা কমিশনের এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। কিন্তু তার পর তেত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেছি। অথচ আজও আমরা শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট বাস্তবায়িত করতে পারিনি। কেননা রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরই পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন ঘটে এবং সংবিধানেরও আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র বিলোপ করে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার ফলে খুদা কমিশনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়। এর পর আর কোনো সরকারই গ্রহণযোগ্য কোনো শিক্ষনীতি দিতে পারেন নাই। মাঝে মধ্যে অন্তবর্তীকালীন শিক্ষাব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তা ছিল স্বাধীনতার আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। শ্রেণীভিত্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্তমানে আমাদের কোনো শিক্ষনীতি নেই। তবে শিক্ষাব্যবস্থা একটা আছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের মোট পাঁচটি স্তর: প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মূলত তিনটি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন, এবং সমাজের কল্যাণে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ। অর্থাৎ দেশের জন্য বিপুল কর্মীবাহিনী তৈরি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, জাতিগত মেধা এবং মননের বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, কারিগরি বা ব্যবসা বণিজ্য শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো কিরূপ হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নিম্নস্তরের শিক্ষা কাঠামো নির্মিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরই বোধ করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আসে নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে। পারিবারিকভাবে লব্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান ধারণা ও জীবন দর্শন নিয়ে তারা ক্লাসে আসে। তাই শিক্ষাদানের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক এবং উপযুক্ত শিক্ষা কাঠামো। প্রাথমিক স্তরে এমন সব বিষয়ে শিক্ষদান করা প্রয়োজন যাতে শিশুদের মৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ে, শিশুদের করে তোলে যুক্তিবাদী। পাঠ্যসূচি ছাড়াও এখানে শিক্ষাদানের একটি ভূমিকা আছে। কেননা মা বাবার পরেই শিশুদের কাছে শিক্ষকদের স্থান। শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুরা যা কিছু শোনে তাই তারা সত্য বলে গ্রহণ করে। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের দেশে তিনটি ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া

হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বৈষম্য উচ্চ শিক্ষায় ঈপ্সিত ফল লাভের অন্তরায়। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যারা পড়ে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতের কেতাদুরস্ত চটকদার জীবন যাপনে। মৌলিক জ্ঞান অর্জন তাদের লক্ষ্য নয়। সাধারণত উচ্চবিত্তদের সন্তানরাই এখানে পড়তে আসে। দরিদ্র অবহেলিতদের সন্তানরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত ধর্মভিত্তিক। ধর্ম শিশুকে বিশ্বাসে আবদ্ধ করে। ধর্ম কখনো যুক্তিবাদ শেখায় না। ফলে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উঠে এসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে অনেকে ভাল ফল করতেও পারে। কিন্তু মৌলিক কোনো অবদান রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধর্মের নামে প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা হল বিদেশি ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু দুর্বোধ্য আয়াত বা শ্লোক এবং সেই সঙ্গে পৌরাণিক কিচ্ছা বা কাহিনী। ফলে শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের মনে অলৌকিক ও ভৌতিক শক্তিতে একটা অন্ধবিশ্বাস ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকে। ভবিষ্যতে এই অন্ধবিশ্বাসই যুক্তিবাদী শিক্ষার পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেন যে প্রাথমিক স্তর থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান ভিত্তিক করা হয়েছে। ওঁরা বোধ হয় জানেন না বা বোঝেন না যে বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকলেই শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক হয় না। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা 'কি' এবং 'কেন' প্রশ্ন করতে শেখে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে না এবং যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করতে শেখে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বাসের আবর্তে বন্দী হয়ে পড়ে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। কাজেই ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞান ভিত্তিক না হলে পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা অর্থবহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে দু'ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত বেশ কিছুকাল থেকেই সবার অভিযোগ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিকমত চলছে না। লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই। চলছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। তার উপর সেশন জট। চার বছরের কোর্স শেষ করতে লেগে যাচ্ছে প্রায় আট বছর। এ হেন পরিস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা বিপুল অর্থের বিনিময়ে নির্ঝঞ্ঝাট ডিগ্রি লাভের জন্য সেশন-জট বিহীন এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়। বেসরকারি এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য যন্ত্রবৎ প্রশিক্ষণে পেশাগত শিক্ষায় পারদর্শী করা। মেধা বা মননের বিকাশের সুযোগ এখানে অনুপস্থিত। প্রাথমিক লক্ষ্য যা-ই থাকুক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পরিণত হয়েছে এক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তার দুপাশে যে ভাবে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাতে মনে হয় এগুলো যেন এক একটি দোকান; ডিগ্রি বিক্রির দোকান। প্রত্যেকটি দোকানে

একাধিক ডিগ্রি কিনতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ডিগ্রির দামও আলাদা। ঢাকা শহরের এ ধরনের প্রায় অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলোকে অবশ্য 'বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য বলা যায় না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 'আউটার ক্যাম্পাস' নামে ঢাকা শহরের বাইরেও এক একটি ভাড়া বাড়ি ও জনাকয়েক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়ে এক একটি শাখা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার কোনো প্রয়োজন নেই। বন্ধুত্ব এবং দলীয় আনুগত্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। তাতে ব্যবসার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।

স্বায়ত্ত-শাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও আজ আর মানসম্মত লেখাপড়া হচ্ছে না। প্রত্যেক বিভাগে ছাত্র আছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক আছে, ক্লাসরুম আছে, লাইব্রেরি আছে, গবেষণাগার আছে, জীবন গড়নের সব ব্যবস্থাই আছে, অথচ হচ্ছে না। যে কোনো উপবৃত্তের দুটি 'ফোকাস' থাকে। ফোকাস দুটি যদি মিলিত হয় তাহলে উপবৃত্তটি পরিণত হয় একটি নিঃযুত বৃত্তে। বিশ্ববিদ্যালয় নামক উপবৃত্তেরও দুটি ফোকাস: ছাত্র এবং শিক্ষক। ছাত্রশিক্ষক সম্মিলিতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় নামক শিক্ষাক্ষেত্রটিকে সার্থক করে তুলতে পারে। কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ একটি নয়, বহুবিধ। একটি কারণ হল, ছাত্রসংখ্যার আধিক্য। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র বিশ জন লোক শিক্ষিত। অথচ উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যারা ছাত্রছাত্রীদের অস্বাভাবিক ভিড়। দেশে বেকার সমস্যা প্রকট। সবারই ভাবনা, 'এমএ' টা পাশ করলে হয়তো একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। ডিগ্রি পাশ করে তাই সবাই এসে হাজির হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য। অথচ এইসব ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশেরই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোনো যোগ্যতা নেই। তা সত্ত্বেও তাদের ভর্তি করতে হয়। ভাল মন্দ এই সব ছাত্রছাত্রীদের এক কাতারে রেখে মানসম্মত শিক্ষা দান সম্ভব হয় না। শিক্ষকরা তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তার উপর আছে ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক দলীয় মস্তান। ওরাই নিয়ন্ত্রণে রাখে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। অবস্থার চাপে 'সহজ করে পড়ানো এবং সহজ করে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নেওয়ার' ভিত্তিতে চলতে থাকে পড়াশোনা। ফলে শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নেমে যেতে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়া যায়। উন্নত বিশ্বের কোথাও এমন সহজ ব্যবস্থা নেই। উন্নত বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হল পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি এবং গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। অর্থাৎ শিক্ষকতার প্রবেশ মুখেই একটা বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তার উপর আছে দলীয়করণ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আজকাল মেধার মূল্যায়ন হয় না। দলীয় আনুগত্য সেখানে প্রাধান্য পায়। একবার এক উপ-উপাচার্য দম্ভ করে বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে "থার্ড ক্লাস" প্রার্থী নেব। তবু শতকরা একশ ভাগ দলীয় হতে হবে।' এ কথার প্রমাণ মেলে যখন দেখি যে তাঁরই আমলে নিয়োগ পাওয়া এক লেকচারার প্রথম ক্লাসে গিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের পড়াতে আসিনি। আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে "পলিটিক্স" করার জন্য। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। মাঝে মাঝে আসব ক্লাসে।' ভিন্ন মতের প্রার্থী মেধার বিচারে শ্রেষ্ঠ হলেও তাঁকে বাদ দিয়ে দলীয় অযোগ্য প্রার্থীকে

নিয়োগ দেয়ার প্রভূত উদাহরণ আছে। সম্প্রতি আবার নিয়োগ-বাণিজ্যের কথাও শোনা যায়। আমাদের মনে রাখা দরকার শিক্ষকতা কোনো চাকরি বা কায়িক পরিশ্রমের কাজ নয়। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা একটি নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন মেধা ও পাণ্ডিত্যের। দলীয় মস্তান দ্বারা আর যা-ই হোক শিক্ষকতা হতে পারে না। জাতির জন্য তা ভয়ানক ক্ষতিকর। একবার আমার এক বন্ধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। দেখা গেল ক্ষমতা পেয়েই তিনি একটি সিলেকশন বোর্ডে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে তাঁর আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন, যিনি সবেমাত্র বছর গুণে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছেন। অথচ সেই বিভাগেই তখন তাঁর উপরে আরো ১২ জন পূর্ণ প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সাহেবরা তো ছিলেনই। এই নিয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উপাচার্যের নিয়োগ পরিকল্পনায় অন্ধভাবে সমর্থন দেওয়া। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্নীতির এটি একটি নমুনা মাত্র।

উচ্চশিক্ষার অবনতির আরেকটি কারণ হলো শিক্ষকদের পদোন্নতির নীতিমালা। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। প্রত্যেক নিয়োগ ছিল নতুন নিয়োগ। প্রত্যেক ক্যাডারে পদ ছিল সীমিত সংখ্যক। এক ক্যাডার থেকে আরেক ক্যাডারে নিয়োগ পেতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি বিধান ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতির এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে একজন লেকচারারও বছর গুণে প্রফেসর হয়ে যেতে পারবেন। কাজেই লেকচারার পদে একবার নিয়োগ পেলেই নিশ্চিত। তাঁর আর কোনো কিছুই করার প্রয়োজন হলো না। যদি পিএইচডি ডিগ্রি বা প্রকাশনা থাকে তাহলে অতি অল্প কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রফেসর পদে উন্নীত হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সব পিএইচডি-র মূল্য সমান, তা সে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বা হার্ভার্ড-এর হোক অথবা বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই হোক। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েই সরাসরি পিএইচডি-তে ভর্তি হওয়া যায় এবং দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সাধারণত ডিগ্রি হয়ে যায়। অথচ এঁরাই যখন উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত বিশ্বে গমন করেন তখন সেখানে গিয়ে আগে এমএস বা এমফিল করে তবে পিএইচ-ডি-তে ভর্তির সুযোগ পান। তারপরেও ডিগ্রির অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এমনও দেখা গেছে যে অনেকেই ডিগ্রি না করে ফেরত এসেছেন। কাজেই দেশি ও বিদেশি পিএইচডি ডিগ্রির মধ্যে যে মানগত একটা পার্থক্য আছে তা সহজেই অনুমেয়। গবেষণার দিক থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছে। তবে তার মধ্যে মৌলিক গবেষণা খুব একটা দেখা যায় না। সুতরাং যোগ্যতার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের স্থান অনেক নিচে। বলতে লজ্জা নেই, আমরা অনেকেই আছি যারা পাশ্চাত্যের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার উপযুক্ত নই, অথচ এখানে আমরা এক একজন সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে আছি বা ছিলাম। নীতিমালার বদৌলতে শিক্ষকদের মধ্যে সবাই প্রফেসর হতে পারছেন। এখানে কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নন। ফলে

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রফেসরের সংখ্যাই অধিক। এমনও বিভাগ আছে যেখানে লেকচারার প্রায় নেই বললেই চলে। প্রফেসরদের সংখ্যাধিক্য শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আরেকটি কারণ। বিধি অনুযায়ী প্রফেসর সাহেবরা কম ক্লাস নিয়ে থাকেন। কেননা একজন প্রফেসর অধিকাংশ সময় ব্যয় করবেন গবেষণা কর্মে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা প্রফেসর হওয়ার সুবাদে ক্লাস কম নেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই গবেষণা করার কিছু থাকে না। ফলে জুনিয়র শিক্ষকদের উপর চাপ পড়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে 'প্রফেসর' পদ প্রাপ্তির পর অনেকের আর কোনো 'একাডেমিক' প্রত্যাশা থাকে না। জীবনের বাকি সময়টা কাটে ক্ষমতাসীনদের লেজুরবৃত্তি করে। তাতে অবশ্য কিছু প্রাপ্তিও ঘটে। সাধারণভাবে যাঁরা কখনো সহকারী অধ্যাপকের উপরে উন্নীত হতে পারতেন না, নীতিমালার বদৌলতে তাঁরা আজ প্রফেসর হয়ে ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদে কেউ উপাচার্য, কেউ উপ-উপাচার্য হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন ডীন, বিভিন্ন কমিশনের মেম্বার, কেউ বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য। যাঁদের সত্যিকার শিক্ষাগত উৎকর্ষ (academic excellence) আছে তাঁরা কিন্তু থেকে যাচ্ছেন পর্দার আড়ালে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সবাই কি সব কাজের যোগ্য? কাগজে কলমে 'প্রফেসর' খেতাব পেলেই কি জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে যায়? যিনি কোনো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি, দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যাঁর কোনো ধারণা নেই, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পরিষদের সদস্য হয়ে কী অবদান রাখতে পারেন? আসলে সঠিক ব্যক্তি যদি সঠিক জায়গায় (right man in the right place) না থাকে তাহলে প্রশাসনের জন্য তা সুফল বয়ে আনতে পারে না। তাতে শুধু ভবিষ্যতের জন্য জটিলতারই সৃষ্টি করে।

নীতিমালার ঢেউ প্রশাসনেও লেগেছে। দেখা যাচ্ছে, অফিসারদের নীতিমালার বলে একজন অফিস-পিয়নও অফিসার পদে উন্নীত হচ্ছেন। তার উপরে আছে প্রশাসনিক অনিয়ম ও দলীয়করণ। দলীয়করণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিএ বা বিকম পাস ব্যক্তিকে কারিগরি বিদ্যা ও হিসাব বিজ্ঞান শাখার বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ দিতে তাঁরা ইতস্তত করেন না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও যোগ্য এবং দক্ষ প্রশাসকের অভাব দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা এবং প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি সেজন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার প্রথমেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার। পাকিস্তানি কালাকানুন বাতিল করে প্রণয়ন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়ে থাকে সাধারণত সংসদে। তবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলেও তা হতে পারে। আইনের চোখে উভয়েই সমতুল্য। ১৯৭৩ সালে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় আইন (৭৩) পাস করা হয়। এ আইনের মৌলিক ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র। কেননা এক নিদারুণ গণতান্ত্রিক স্পৃহা থেকেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সর্বত্র গণতন্ত্রের

প্রতিফলন ছিল প্রত্যাশিত। বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও তাই গণতন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ আইনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কয়েকটি কমিটি বা সংস্থাকে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হল সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল। সিনেটে সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সিনেটের সদস্যসংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে আলাদা, প্রায় একশ'র কাছাকাছি। এর অধিকাংশই নির্বাচিত সদস্য। এর মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন ৩৩ জন। শিক্ষক প্রতিনিধিরাই প্রকৃতপক্ষে সিনেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সিনেটের একটি প্রধান কাজ হলো উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচন। সিনেটে যেহেতু শিক্ষকদের প্রাধান্য তাই প্রায় প্রত্যক্ষ সিনিয়র শিক্ষক অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখেন সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য হওয়ার। কেননা যদি শিক্ষকদের মধ্যে নিজ দল ভারী করা যায় এবং ক্ষমতাসীনদের লেজুরবৃত্তি করে 'হিস মাস্টার্স ভয়েস' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায় তাহলে উপাচার্য হওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। উপাচার্যের পদটি একবার পেলে তখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হয় নিজের পদটি ধরে রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় শাসন পাকাপোক্ত করা। তাতে উপাচার্যের সমর্থকদের ভাগেও কিছু প্রাপ্তি ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী পদসমূহ দলীয় অনুগতদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনাই প্রাধান্য পায়। শিক্ষক নিয়োগের নামে প্রকৃতপক্ষে ভোটার নিয়োগ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সংস্থা সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের সদস্যসংখ্যা কমবেশি ১৬ থেকে ১৮। এখানেও শিক্ষকদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কেননা কমিটিতে উপাচার্য উপউপাচার্য ছাড়া আরো ৬ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন। তাছাড়া সিনেটের প্রতিনিধি কিংবা বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধিরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। সুতরাং বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা শিক্ষকদের উপরেই ন্যস্ত। আশা করা গিয়েছিল যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাবিদদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবে এবং উচ্চশিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু তা হয়নি। আমরা প্রমাণ করেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও আমরা লোভ-লালসা বা গোষ্ঠী স্বার্থের ঊর্ধ্বে নই। ক্ষমতা হাতে পেয়েই আমরা নীতিমালা প্রণয়ন করে আমাদের পদোন্নতির পথ সহজ করে নিয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে তার যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ সংস্থা হলো 'একাডেমিক কাউন্সিল', একাডেমিক কাউন্সিল গঠনে নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে মেধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রফেসর এর সদস্য। এছাড়া অন্যান্য সদস্যও আছেন। নীতিমালার ফলে বর্তমানে একাডেমিক কাউন্সিলের প্রফেসর সদস্য সংখ্যা এত বেশি যে সভাগৃহে সকলের স্থান সংকুলান হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বিরাট হল ঘরে অথবা খোলা মাঠে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনেক সময়ই প্রকৃত 'একাডেমিক' সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময়ে দেখা যায় সংখ্যাধিক্যের জোরে উপাচার্যের সহায়তায়

প্রয়োজনে অ্যাক্ট উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, তা সে বিভাগীয় পাঠ্যসূচি নির্ধারণই হোক অথবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আগেই বলেছি যে, অ্যাক্ট ৭৩-এর বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় কয়েকটি কমিটি বা সংস্থা দ্বারা। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, প্ল্যানিং কমিটি, কমিটি অব কোর্সেস, ফ্যাকাল্টি এবং একাডেমিক কাউন্সিল। অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য রয়েছে সিনেট, সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি, প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইত্যাদি। আমরা যদি প্রত্যেক কমিটির গঠন ও ক্রিয়া পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই এক সুচিন্তিত দর্শন কাজ করেছে। এই দর্শন হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রায়ন এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব। এক কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু আমরা এই অ্যাক্টের অপব্যবহার করেছি এবং কখনো কখনো প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নে অ্যাক্টকে উপেক্ষা করেছি। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন যদি অ্যাক্ট বহাল থাকা অবস্থায় একজন নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ করে অ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একজন দলীয় ব্যক্তিকে পূর্ণ চার বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত করেন, তবে তাকে প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আজ যে দেশে উচ্চশিক্ষার অবনতি ঘটেছে তার প্রকৃত কারণ এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের অপব্যবহার। আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন রাজনীতিমুক্ত করা এবং ছাত্রশিক্ষকদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনা। এজন্য প্রয়োজনে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ হয় এবং শিক্ষক ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

১। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির সুপারিশকৃত প্যানেল থেকেই উপাচার্য নিয়োগ করা হবে। তবে কোনো শিক্ষক নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারবেন না।

২। শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে তাহলে জাতীয় কমিটির ক্ষমতা থাকবে সে বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

৩। পদোন্নতির নীতিমালা বন্ধ করতে হবে। উচ্চতর পদে নিয়োগের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে মেধা এবং যোগ্যতা। বিশেষ করে প্রফেসর নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর আইন আরোপ করতে হবে। গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি না থাকলে তিনি প্রফেসর হতে পারবেন না।

৪। শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। একজন শিক্ষক উচ্চতর পদ না পেলেও তিনি যাতে উচ্চতর বেতন স্কেলে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। একাডেমিক কাউন্সিল হবে সীমিত আকারের। অন্যান্য সদস্য ছাড়া বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য থাকবেন শুধুমাত্র সভাপতি এবং জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন প্রথা পরিহার করে যথাসম্ভব 'রোটেশন' পদ্ধতি চালু করা বাঞ্ছনীয়।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ হতে হবে রাজনীতি মুক্ত। আপাতত পাঁচ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্রশিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

৮। উচ্চশিক্ষা সীমিতকরণ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়। স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা হবে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম অবশ্য ইংরেজি হতে হবে।

৯। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে সেজন্য একমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হতে পারে মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে।

১০। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বেঁধে দেওয়া সময় সীমার মধ্যে সব শর্ত পূরণ করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হবে। Outer campus-এর নামে বিভিন্ন শহরে শাখা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কেননা শাখা বিশ্ববিদালয়ের নামে যা চলছে তা শিক্ষাক্ষেত্রে স্রেফ প্রহসন এবং শিক্ষার নামে ব্যবসা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিন্ন হতে হবে।

১

দেবেশ রায়

সামান্য অমান্যতা

হাসান ভাই,

আপনার সঙ্গে আমার একটা তর্ক মুলতুবি আছে। এ-বছরের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একটি আলোচনা সভায় আপনার নেতৃত্বে আমি কিছু কথা বলেছিলাম। তাতে এমন কিছু কথাও বলেছিলাম যে মান্য ভাষা বলতে কোনো কিছু থাকতে পারে না। পরে সভামুখ্য হিসেবে আপনি জানিয়েছিলেন—আমার সব কথার সঙ্গেই আপনি একমত, এক মান্যভাষা ছাড়া। আপনি আপনার সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসার আকারেই কথাটা তুলেছিলেন—সে কী করে হবে, যদি আমার কথার সঙ্গে আর-একজনের কথার মিল না থাকে তাহলে আমার কথা আমি তাকে জানাব কী করে?

ক্ল্যাসিকাল থেকে সমকালের পাশ্চাত্য দর্শনে আপনার দখল, কণামাত্র আন্দাজের কোনো নিরিখ আমার হাতে নেই। যখনই বাংলাদেশে যাই তখনই বিমূর্ত তত্ত্ব নিয়েও আপনাদের জিজ্ঞাসার এই জোর আমাকে মুগ্ধ করে, যেন তখনই সেই তত্ত্বের নিরসন না হলেই নয়। বন্ধুদের মধ্যে আপনি আর হায়াৎই তত্ত্বের তর্ককে এমন রক্ত-মাংসের করে তুলে থাকেন। তাতে অপর পক্ষের অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু জোটে—যাক, তাহলে কথাটাকে শরীর দেয়া গেছে।

বাড়িতে ও শহরে ঝগড়ুটে বলে আমার নাম আছে। অরুণ (সেন) সেটাকে বাড়িয়ে বলে আমি নাকি রেগে না গেলে সত্যি কথা বলি না। সেই ফেব্রুয়ারি থেকেই আমি রেগে ওঠার চেষ্টায় ছিলাম কিন্তু আপনার দুহাতের আঙুলগুলি শূন্যে খেলিয়ে, 'মান্য-ভাষা না হলে কী করে হবে' বলার পরও হাঁ বন্ধ না করার চেহারা দেখতে পাই। এমন মানুষের ওপর রাগব কী করে? তাহলে আমাকে এই বুড়ো বয়সে শিখতে হবে—রাগ না করলেও সত্যি কথা সত্যই থাকে। সুশীল সাহা যখন আপনার হয়ে অধ্যাপক সনৎ সাহার সংবর্ধনা গ্রন্থে আমার দেয়া লেখাটির জন্য তাগিদ দিলেন, চকিতেই আমার মনে এল এই চিঠিটাই লিখে ফেলি। চিঠিতে তো আর রাগ করা যায় না। সব চিঠিই প্রেমপত্র। চিঠিটা লিখতে-লিখতে আপনার সরল বিস্মিত মুখটা বারবার মনে পড়বে।

এমন একটা চিঠিচাপাটির উপলক্ষ হিসেবে সনৎ সাহার মত ঘটক (মান্য বাংলায় যাকে আজকাল অনুঘটকও বলে) পাওয়া তো সোনায় সোহাগা। শিক্ষায় অর্থনীতিবিদ আর প্রয়োগে চেতনাকর্মী—মার্ক্সবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম-সমাজ-পরিবার থেকে শিল্প-সাহিত্য ঘটিত তত্ত্বে তাঁর সহজ বিচরণ।

আচ্ছা, আজকাল বেশ শুনতে পাই—আমাদের মত সর্বজ্ঞ ডিলাট্যান্টদের যুগ আর নেই, এখন নাকি একদর্শী বিশেষজ্ঞদের যুগ। আপনারও কি তাই মনে হয়? আমার কিন্তু শুনে অভিমান হয়। রাগও হয়। অভিমান করে ভাবি—যে-সমাজ তাদের মোল্লা নাসিরুদ্দিন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে তরিবত দিতে জানে না, সে সমাজের কী হবে? রাগ করে ভাবি—আমাদের মত সর্বজ্ঞ ডিলাট্যান্ট না-হলে দেশ স্বাধীন হত? কোনো দেশ? ডিলাট্যান্ট ছাড়া আর-কেউ পারে—মরতে, মারতে, পালাতে ও বাঁচতে? (অমান্য ভাষায় যোগ করছি—মারাতে ও ছাড়াতে?) আর, দেশ স্বাধীন না হলে এত বিষয় ছপ্পর ভেঙে পড়ত? না-পড়লে বিশেষজ্ঞদের ডালভাত জুটত কী করে। বাঙালি যদি ডিল্যাটান্টই না-হল, তাহলে বাঙালির আর থাকল কী? সনৎ সাহাকে উপলক্ষ করে আপনাকে এই চিঠি লেখা যেত?

না, হাসান ভাই, আমি কথান্তরে পালাচ্ছি না। ডিলাট্যানটিজমের কথাটা তুলে রাখলাম—পালাবার পথ হিসেবে। পালাবার পথ খোলা না-রেখে যে-যুদ্ধে এগোয়, সে আর যাই হোক, ডিলাট্যান্ট নয়।

আপনি মান্যভাষা বলতে এমন একটা ভাষার কথা কল্পনা করেছেন যে-ভাষার তুমি-আমি-কথা আছে। আমি বলছি—এমন কোনো একটা ভাষায় বিশ্বাস অস্তিত্বে চারিয়ে দেওয়া হয় সমাজ ও শাসনের পক্ষে মান্য কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে। সে-কর্তৃপক্ষ বামুন হতে পারে, উলেমা হতে পারে, সরকার হতে পারে। বামুনরা 'ভাষা' বলতেই বোঝাত মুখের ভাষা। এক-এক দেশের উলেমারা এক-এক ভাষাকে ঈশ্বরের ভাষা বলে। আমাদের দেশে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির ওতপ্রোত করে যে-উর্দুভাষা নিয়ে এত আন্দোলন, সেটা নিশ্চিতভাবেই হিন্দি-পারসি বিনিময়ের ভাষা হিসেবে মানুষেরই মুখে তৈরি হয়েছিল। ইংরেজি নিশ্চয়ই এই উপমহাদেশের ভাষা, অক্সফোর্ড ডিকশনারি তো আজকাল নানা দেশের নানা ইংরেজিকে একটা ভাষা না বলে ইন্ডিয়ান ইংলিশ, পাকিস্তানি ইংলিশ, শ্রীলঙ্কান ইংলিশ বলে আলাদা পরিশিষ্ট যোগ করছে।

আপনার সঙ্গে আমার প্রধানতম পার্থক্য এই জায়গাতে। একটা বিশিষ্ট ভূখণ্ডে প্রধানত প্রচল ভাষাকে সেই ভূখণ্ডের ভাষা বলে মেনে নেয়ার সংজ্ঞা সাহেবরা আমাদের শিখিয়ে এল সেই সতের শতক থেকে। আর, শেখাতে-শেখাতেই তাদের কলোনিগুলির ভূখণ্ডের ভাষা ধ্বংস করতে লাগল। চার-পাঁচশ বছর পরে, এখন হয়তো বলার সময় এসেছে—একটি অখণ্ড ভাষার জন্য একটি অখণ্ড দেশ দরকার নেই। দেশ ও তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ভাষার অখণ্ডতার সাপেক্ষ নয়। এর উল্টোটাও একই রকম সত্য।

আমার এই কথার সমর্থনে কোনো উদাহরণ বা প্রমাণ দিচ্ছি না। আমি তো তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখছি না, আপনাকে একটা চিঠি লিখছি। তা ছাড়াও—এই প্রমাণ ও উদাহরণগুলো আপনার নখাগ্রে। এর সবচেয়ে জলজ্যান্ত সাক্ষী পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য ইউরোপ। সরকারি ভাষা নয়—এক-এক সরকারি ভাষা কত-কত ভাষাকে আড়াল করে রাখে তার অতি সামান্য ঘটনা আমরা হালে দেখলাম যুগোশ্লাভিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায় আর বোসনিয়ায়। ভাবুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাৎসি-প্রতিরোধের গৌরব নিয়ে যে-যুগোশ্লাভিয়ার জন্ম, বছর ষাট পেরতে না-পেরতেই সেটা হয়ে

গেল যেন ভাষাপ্রভুত্বের দেশ। অখণ্ড বাংলার উদারমনা যে-বুদ্ধিজীবীরা তত্ত্ব সাজিয়ে বলেছিলেন—বাঙালি মুসলমানের স্বাভাবিক ভাষা উর্দু, তাঁরাই বছর তিন পরেই তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে বললেন—প্রভুত্বের ভাষা। আমার ধারণা ছিল, আফ্রিকায় বুঝি সব আদিভাষাই ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে। সেদিন ঙঙ্গো ভয় থোঙ্গো-র একটি লেখাতে পড়লাম—কেনিয়ার চাষীরা তাদের ভাষাকে মরতে দেয়নি। মানে, অনেকটা আমাদের বাংলারই মত।

খুব বেশি ইতিহাসের ভিতর যেতে চাই না। আমাদের সমস্যার শিকড়টা হয়তো ইতিহাসে খোঁজা যায়। সমস্যাটা তো জানতে হয় প্রতিদিন। বাংলায় যেটাকে মান্য ভাষা বা প্রমিত ভাষা বলি, তার দরকার হয়েছিল যখন—সাহেবদেরও দরকারে, আমাদেরও দরকারে—তখন কোত্থেকে একটা ক্রিয়াপদের ধরন এল, বলুন তো, যেটাকে সাধুভাষা বলা হত, লেখার ভাষা বোঝাতে, তার মানে যারা লিখতে-পড়তে জানবে তাদের ভাষা। যারা লিখতে পড়তে জানে না, অর্থাৎ যাদের রোজকার জীবনে লিখে বা পড়ে কোনো কাজ করতে হয় না—তাদের আর ক্রিয়াপদের সাধুতা বা অসাধুতা দিয়ে কী হবে?

জানি, আপনি এখানে আমার একটা ফাঁক ধরে ফেলবেন। হইল, করিল, খাইল, চাহিল, এই যেগুলিকে সাধুক্রিয়াপদ বলে ইঙ্গিত করেছি সেটা কিন্তু সাহেব ও আমাদের কোনো বিনিময়ের দরকারে তৈরি হয়নি। সাহেবদের অনেক অনেক আগেই এমন ছিল ব্যবহারে—চঞ্চল চিয়ে পৈঠা কাল, রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খায়ে। কে না বাঁশি বাত্র বড়ায়ি সে বা কোন জনা। দিনে-দিনে বাড়ে কালকেতু, জিনিয়া মাতঙ্গগতি। দেবী পৃষ্ঠে দিয়া প্রদক্ষিণ করে বালা/ইঙ্গিতে গ্রীবায় ছিণ্ডে রত্নময় মালা/এই ছলে লোর রূপ দেখয় সুন্দরী (লোরচন্দ্রানী)।

আমার দুটো আন্দাজ আমি নিজেই ভেস্তে দিলাম—এতে দাবারু প্রতিপক্ষের মত হাসার মানুষ আপনি নন। কিন্তু দেখা তো যাচ্ছে, সাধুভাষা বা প্রমিত বাংলার সঙ্গে সাধু ক্রিয়াপদের কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বা, প্রাগিংরেজ বাংলায় ক্রিয়ার কাল বেশির ভাগটাই বোঝানো যেত অনির্দিষ্ট বর্তমান ব্যবহার করে, যেখানে সাধু-চলিতের ভেদ খুব ছিল না।

আপনি অনুমতি করলে আমার ঐ আন্দাজ দুটি একটু শুধরে নেয়া যায়। বাংলায় ক্রিয়া কালনির্দেশ করেছে বটে কখনো-সখনো কিন্তু তাতেও প্রথম শর্ত : ক্রিয়ারূপে পয়ারের মাত্রা মিলছে তো? উদাহরণ দি একটা—যতটা যুক্তির দরকারে, তার চাইতে অনেক বেশি আপনার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলনের বর্ণনা পড়ার গোপন রগড়ে।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর   খর শর জরজর
তর তর থর থর অঙ্গে॥
রতিমদ পাগর   নাগরী নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর   রতি রতি নায়ক
কুলুপিল কুলুম কপাটে।

আমার কাজ এইটুকু উদ্ধৃতিতেই হত। কিন্তু আপনার সঙ্গে আরো একটু পড়তে ইচ্ছে করছে—নরনারীর শরীর-মিলনের কেমন একটা যুদ্ধ প্রক্রিয়া-তুল্য বর্ণনা দিতেন কবিরা তার মজা পেতে। আপনি সাধুপ্রকৃতির মানুষ। তবু, আমার মত লাম্পট্যলোভী বন্ধুর খাতিরে খেয়াল করবেন যে বিদ্যা ও সুন্দরের এই রতিক্রিয়া যদিও ক্রিয়াই, তবু, ভারতচন্দ্রের মত বোলচালওয়ালা কবিও বর্ণনায় কোনো ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেন না, পাছে রতিযুদ্ধের যুদ্ধের জোর কমে যায়।

জঘন ঘনপয়   হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে।
ঝন ঝন কঙ্কণ   রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লটপট কুন্তল   কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে।

নরনারীর শরীরমিলনের মত সাদাসিধে কাজের বা ক্রিয়ার বর্ণনা যদি এমন বানাতে হয়, তাহলে সেখানে মাত্রাছুট হবে কী করে? পয়ার ঠিক মানিয়ে নেবে, যদি ৮/৬ মাত্রার চরণের দুটি পর্বের ভিতরেও অন্ত্য মিলকে যৌন চমকের মত ব্যবহার করা হয়। যদিও সুনীতিকুমার বলেছেন—'পয়ার এসেছে চৌপদী' থেকে, তা হলেও বলা যায়—মিলন যখন বর্ণনা করা হচ্ছে এমনই ভাষায় যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলছে, তখন পয়ার বা চৌপদী কোনো কিছুতেই আটকায় না। যা বলবেন সেটা ঠিক হয়ে আছে, কেমন তাল বদলে-বদলে বলবেন, তাও ঠিক হয়ে আছে। তাহলে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আর দৌলত কাজির লোরচন্দ্রানীর মাঝখানে শ-দেড়েক বছরের ব্যবধান ও কৃষ্ণনগর-রোসাঙ্গের মধ্যে নবাবি বাংলার বিস্তৃততম পায়ে-হাঁটা দূরত্ব সত্ত্বেও ও ধর্মবিশ্বাসে-সংস্কৃতি-আনুগত্যে ভারতচন্দ্র ও দৌলত কাজির মধ্যে হিন্দুয়ানি-ইসলামির বৈপরীত্য সত্ত্বেও লোর ও চন্দ্রানীর মিলন বর্ণনায় সেই একই যুদ্ধ-উদ্যম—

করে ধরি কোলে করি বসাইল কুমার।
প্রথম দর্শনে দোঁহে আনন্দ অপার ॥
দোহো উনমত্ত দোহ রসিক সুজান।
কামরসে রতিশাস্ত্রে দোহান বিদ্বান ॥
কি কহিব দোহানের মনোরথ রঙ্গ।
কিছু শুনাইতে যুয়ায় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥
প্রথমে মদন কেলি ঘন আলিঙ্গন।
কামতাপে ভয় লজ্জা ধৈর্য পলায়ন ॥
দন্তে দন্তে ঘরিষণ বদনে বদন।
পুলকে পুলকে তনু সঘন চুম্বন ॥
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতিরঙ্গে দুইজনে মল্ল জড়াজড়ি ॥

দৌলত কাজি ও ভারতচন্দ্র যে একই মান্য বাংলায় একই গোপন রতির বর্ণনা দিচ্ছেন সেটাকে যুক্তিতে দাঁড় করাতে এতটা উদ্ধৃতি না দিলেও হত। আপনার মত

মান্য মানুষকে লজ্জা দেয়ার দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়াও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল, দৌলত কাজি একবার 'যুদ্ধ' শব্দটি ও শেষে 'মল্ল' শব্দটি ব্যবহার করে নিজেই এই মান্য রতির দুরবস্থা ধরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু তাতে আমার কী সুবিধে হল?

সুবিধে যে হল না—সেটাই তো আপত্তি। বিদ্যা আর চন্দ্রানীর দেশ ও জাত আলাদা কিন্তু দেখুন রভসকালে সেই পার্থক্যের ফলে আলাদা রকম কিছু ঘটার সুযোগই মিলল না। সাধুভাষা বা মান্যভাষার পাঁজিতে তো দাগিয়ে দেয়া আছে—কোন-কোন তিথিতে সহবাস নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত তিথিতে শিয়র কোনদিকে থাকবে।

মান্য বা প্রমিত বাংলায় এমন একজন আদেশকর্তা থাকেন, তিনি রামমোহন রায়ের মত মহামানবও হতে পারেন, যিনি আমাকে শেখান ছাপার লাইন কী করে পড়তে হয়, কমা-চিহ্নে কতক্ষণ থামতে হয়, দাঁড়িতেই-বা কতক্ষণ? আমাদের না-হয় ছাপাখানা ছিল না, কিন্তু হাতে লেখা পুঁথি কি পড়তে হত না, শুনতে হত না। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মত কাব্য বৃন্দাবনে লেখা হয়ে, অনেকগুলি পুথি হয়ে, ডাকাতিতে লুট হয়ে কী করে বাংলায় এসে পৌঁছুল—সেটাতো বেশ রোমাঞ্চ জাগানো গল্প। সেসব ভুলে গিয়ে রামমোহন আমাদের আধুনিক বাংলা গদ্য পড়ার পদ্ধতি শেখালেন? মান্য বাংলার বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় প্রত্যাখ্যান এটাই। মান্য বাংলা মানে একজন মাননীয় কর্তা আছেন, যিনি ঠিক করে দেন কী মান্য ও কী অমান্য। যে কথা বলছে বা লিখছে আর যে কথা শুনছে বা পড়ছে তারা কী করে পরস্পরের কথা বুঝবে—এটা একেবারেই সেই দু-জনের ব্যাপার। তাতে কখনো কখনো শর্ট সারকিট হতে পারে, ভুল বোঝা ঘটতে পারে। হোক ও ঘটুক। একটা ভাষা যদি এমন সব দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে পথ করে না নেয়, তাহলে সেটা তো হয়ে থাকবে মাত্র কয়েকজনের ভাষা। হাসানভাই, আমি আপনার প্রধান আপত্তির ন্যায়শাস্ত্রীয় বিচ্যুতিতে পৌঁছে গেছি। আপনি বলেছিলেন তো—মান্যভাষা না-থাকলে একজনের কথা আরেকজন বুঝবে কী করে? সেই কারণে একটি ভাষার বিশেষ একটি ধরন-গড়নকে মান্য বা মান বা প্রমিত ভাষা বলতে হবে? যেমন কঙ্কণ বললেই তো হাতের গয়না বোঝায়—তাতে কুলচ্ছে না ভেবে বলতে হবে করকঙ্কণ? একেই তো বলে করকঙ্কণ-ন্যায়?

হাসানভাই, তর্ক থাক। আপনি আমি হয়তো মজা করে তর্ক চালাতে পারি। কিন্তু মজা না-থাকলে তর্ক করব কেন? ধরুন, বছর বিশ হল আমার মনে হচ্ছে—পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার মান্যতা যদি ভেঙে খানখান করে দেয়া না যায়, তাহলে এ ভাষা দিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা, শিল্পসাহিত্য রচনা করা যাবে না। এখানকার বাংলা ভাষা রক্ত পাচ্ছে কোথা থেকে। কাজকর্মের ভাষা ইংরেজি বা হিন্দি। চাষবাসের ভাষার সঙ্গে মান্য-বাংলার কোনো সম্বন্ধ নেই। বরং উল্টো অসম্বন্ধ আছে—চাষবাসের লোক শহরে এসে মান্য বাংলা বলে। মাঝিমাল্লা তো লোকসঙ্গীতের লোক। সুন্দরবনের কুলতলী বলে একটি জায়গায় বাঘ এসে একটা লোককে আঁচড়ে-কামড়ে দিল। টিভিতে দেখালও। প্রথমে চমকে উঠেছিলাম—সে কী? ক্যামেরা পৌঁছুল কী করে? পরে বুঝলাম, মানে বুঝে নিলাম—পুরনো একটা

ছবি ছিল একটা পথভোলা বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়ার ছবি। সেটা। আর লোকটা? সেটাও একটা পুরনো ছবি—ঘুমিয়ে পড়া বাঘতে খোঁচাতে গিয়েছিল একটি লোক। ঘুমন্ত বাঘ তাকে একটা থাবা মেরেছিল। এই দুটো ছবি পর পর যদি দেখা যায় ঐ সংবাদের সঙ্গে, তা হলেই তো পুরনো ছবি আধুনিক সঙ্গতি পেয়ে যায়। পেয়ে গেলও তো। কুলতলির আসল লোকটিকে পরে হাসপাতালের বেডে সত্যি-সত্যি দেখা গেল—লোকটির চোখদুটো গোল হয়ে ঘুরছে আর সে কিছুতেই বাঘটাকে ভুলতে পারছে না। মাথা ঘোরাতে-ঘোরাতে গোঙাচ্ছে—'উরে বাপ্, কেমনে বাঁচলাম গা। বাঁচলাম তো? বাঁচলাম?'

টিভির সংবাদ ও সংবাদচিত্র সবই কিন্তু দেখাল যথার্থ মানক (স্ট্যান্ডার্ড)। টিভির সংবাদ দেয়া নিয়ে যে-মানক সকলেরই জানা। ঘটনাটাই শুধু মানক ছিল না। পুরনো ছবিটবি থেকে সেই জালি মানক এক সিনথেটিক বা কৃত্রিম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঢুকিয়ে দেয়া হল। রি মিক্স। হাসপাতালের অমানক প্রলাপটুকু পূর্ববর্তী জালি মানকের ধারাবাহিকতায়, তার অমানক গুণটা হারিয়ে ফেলল।

এবার আমি শেষ করব। আমি তো আর পত্রপ্রবন্ধ লিখছি না। সুশীল এসেছেন। ওঁর মত ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষকে বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

আমাদের দিক থেকে এই শেষ কথাটাই আসল কথা। এখন এক নতুন সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে চলে এসেছে। ভারত-বাংলাদেশি-পাকিস্তানি-শ্রীলাঙ্কিক লেখকদের মৌলিক ইংরেজি লেখা। উপন্যাস-স্মৃতিকথা-ভ্রমণ বিবরণ মেশানো বটে কিন্তু মূলত উপন্যাস বা গল্পই। এঁদের অনেকেরই লেখা বেশ ভাল। প্রায় প্রত্যেকেই গল্পটা তৈরি করছেন উপমহাদেশ নিয়ে। তার মধ্যে আত্মস্মৃতিও বড় জায়গা নিয়ে আছে।

এঁদের কারো-কারো কোনো-কোনো লেখা শিল্পগত কারণেই আমাকে মুগ্ধ করেছে—রুশদি-র 'মিডলাইটস চিলড্রেন', মণিকা আলি-র 'ব্রিক লেন', অরুন্ধতী রায়-এর গড অব স্থল থিঙ্স্'। এর পরেই যে-কথাটা তুলব, তা থেকে এঁদের এই তিনটি বই বাদ দেবেন।

এই ধরনের বাকি সব লেখার বেলায় বা এঁদেরই অন্য লেখায় একটা উদ্ভট ও কৃত্রিম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে। লিখছেন উপমহাদেশীয় জীবন নিয়ে। শুধু তাই নয়—তা হলেও তো একরকম হত। সেই জীবনটাকে লেখক তাঁর বয়সের কোনো এক স্তরে নিজের ভিতরে পুঁজি করেছিলেন—উপমহাদেশে প্রচল ভাষায়। এখন তিনি নিজেকে খুঁড়ে যখন সেই জীবনের গল্প লিখতে চেষ্টা করছেন তখন ভাষাটা যদি ইংরেজি হয়—তা হলে অভিজ্ঞতার যে শিল্পরূপকে আমরা ফর্ম বলি তাতে অনুবাদ ঘটে যাচ্ছে না? নিজেদের অভিজ্ঞতার অনুবাদ।

এই একটা কারণ—গল্প-উপন্যাসের ভাষার মানক-দেয়াল ভেঙে ফেলতে চাইবার। মানকহীন বা অমানক বাংলা ভাষা তা হলে হয়ে উঠবে দুর্ভেদ্য দুর্গ। যার কোনো অর্গল বা দেয়াল নেই—যেমন সমুদ্র বা এভারেস্ট বা সুমেরু। সেটাই তো দুর্গমতম। আপনি বলেছিলেন—মান্যভাষা ছাড়া বোঝা যাবে কী করে? এবার আমার শেষ উত্তর—ইঙ্গিতে সঙ্কেতে। সেটা যে জানে না, তার কী দরকার গল্প-উপন্যাস লেখার বা পড়ার?

মান্যতা ভাঙলে বাংলা গদ্য কেমন প্রাণবান হয়ে ওঠে তা একটু শোনাই আপনাকে। একটা উপন্যাসে লেখা হচ্ছে—

> আগুন লাগার খবর ঠিকই জানতে পারলাম। এগনেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলম আগুন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যেচে, পটপট ধুমধাম আওয়াজ হচে। পেথম যি লোক দেখেছিল, সে চেঁচাতে যেয়েও চেঁচাতে পারে নাই। তাকে বোবায় ধরেছিল। আগুন পেথমে যি দেখে সে কিকিনি গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারে না। (হাসান আজিজুল হক, আগুনপাখি)

হায়াৎ মামুদ

বাংলা ভাষা : অশনিসংকেত

এক

ভাষা যদি বাঁচতে চায় তো তাকে বেঁচে থাকতে হয় জ্যান্ত মানুষের মুখে। অর্থাৎ সমাজের মানুষজন একটা ভাষায় কথা বলছে, তার মানে হল ভাষাটি জীবন্ত আছে, টিকে আছে, তার চলৎশক্তি রয়েছে, চলাফেরা করে, প্রবহমান। খুবই শক্তিশালী ভাষা কিন্তু মরে গেছে, এমন ভাষার কথা আমরা সকলেই জানি : সংস্কৃত ও লাতিন। লোকের মুখে-মুখে চালু থাকতে পারে নি বলেই অবধারিত মৃত্যু এসে তাকে নির্বাক নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। মৃত ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়ে আমাদের ক্ষণমাত্র চিন্তার জন্য দেরি করতে হয় না, জিভের ডগায় যেন বসেই আছে টুপ করে ঝরে পড়ার জন্যে, বলে ফেলি ঐ দুটি প্রাচীন ভাষার নাম : সংস্কৃত ও লাতিন। মানে কি এই যে প্রাচীন হওয়ায়, বুড়ো হয়েছে বলেই, মরে গেল? এমন সিদ্ধান্তের অনুকূলে সায় দিতে গেলে যুক্তিসঙ্গত কৌতূহল নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়—অপ্রাচীন বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা তবে কি মরে না? তাৎক্ষণিক জবাবও তৈরি হয়ে থাকে, বলি যে—না, মরে না। আসলে এই উত্তর অজ্ঞানতাপ্রসূত, আমরা খোঁজখবর রাখি না বলে এ-রকম বলি। ১৮০০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষ তাদের মাতৃভাষা বলতে ভুলে গেল, ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরল এবং এখনো ধরে আছে। যে-সব দেশ ফরাশি উপনিবেশ ছিল সেখানে ফরাশি ভাষার চাপে কোনো দেশীয় মাতৃভাষা বাঁচতে পারে নি। ইসরাইলে হিব্রু ভাষার ঘটনাটি অনন্য; দু'হাজার বছর ধরে মরে-থাকা একটি ভাষাকে ফের জাগিয়ে তোলা হয়েছে। পাকিস্তানে যে-ক'টি প্রদেশ রয়েছে তার কোনোটিতেই মাতৃভাষা হিসেবে উর্দু ব্যবহৃত হয় না, সব প্রদেশেই তাদের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা চালু আছে, অথচ এখন তারা রাষ্ট্রের চাপিয়ে-দেওয়া উর্দুর (যা ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে আগত সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের মাতৃভাষা) শাসনে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু, একসময়ে মরে যাবে। ফলে ভাষার বাঁচন-মরণের বিষয়টি জটিল ও রহস্যময়। মানুষের অভিবাসন, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংমিশ্রণ, রাষ্ট্রশাসন, শিক্ষানীতি, ধর্মাচারের ভাষা-নিয়ন্ত্রণ, মানুষের মাতৃভাষাকেন্দ্রিক ভাবাবেগ ও সংস্কৃতিধারণা ইত্যাদি অজস্র উপাদানের প্রভাব-সংঘর্ষ-মিশ্রণ এতে সক্রিয় থাকে। মূল কথা দাঁড়াল—ভাষার জন্ম-মৃত্যু আছে, ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক।

কিন্তু ভাষা তো দু'রকমের। সকল ভাষার ক্ষেত্রেই। একটি মুখের ভাষা, আরেকটি লেখার ভাষা। মুখের ভাষা হাজারটা রকমফের আছে। আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ উপভাষাই শুধু নয়, সে তো রয়েইছে। তার বাইরে একই কথ্য ভাষাতেই তারতম্য ঘটে বক্তার অভিপ্রায়ের কারণে। যিনি শ্রোতা তাঁর বোধগম্যতা ও ভাষাবোধের অভ্যাসকে মান্য করতে বক্তা বাধ্য, নইলে ভুল বোঝাবুঝিতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ জন্যই আমরা হাট-বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে, কি রিকশায় বসে চালকের সঙ্গে গল্প করার সময়ে, কি বাসের কন্ডাক্টারের সঙ্গে একই ভাষায় কথা বলি না,—যদিও ঐ ভাষা কথ্য ভাষাই, তবু বাচনভঙ্গি ভিন্ন রকমের হয়, শব্দ নির্বাচন পাল্টে যায়। আমি এখানে আমাদের মাতৃভাষার কথা বললাম বটে, তবে সম্ভবত সব ভাষার জন্যই এ-কথা সত্যি। এক বইয়ে সেদিন পড়লাম, ইংরেজি ভাষাই নাকি অন্তত পঁচিশ রকম ভাবে পৃথিবীতে নানা স্থানে চালু আছে। ইংরেজির কথ্য রূপ নিয়েই নিশ্চয় বলা হচ্ছে, নইলে বইকেতাবে গোটা চারেকের বেশি লিখনভঙ্গি তো দেখি না।

ভাষা বাঁচে, ঠিকই, মানুষের মুখে। কিন্তু চিরস্থায়িত্ব পায় মুখে নয়, লেখায়। ব্যক্তিমানুষই কথা বলে, আমৃত্যু জীবন্ত অবস্থায়, বাক্‌শক্তি রহিত মূক না হলে। আর সেই ব্যক্তিমানুষ যেহেতু পরিবার-সংলগ্ন জীব, সে বাস করে তার ভাষাভাষী সমাজে, সে-সমাজের আয়তন বড়ো বা ছোট যেমনই হোক। তাই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলেও যে-ভাষায় সে কথা বলেছে তা মরে না, পরিবার ও সমাজের অন্য জীবিত মানুষদের ভিতরে তা বেঁচে থাকে সময়বাহিত হয়ে, পরম্পরাগত হয়ে। তবু ভাষা মরে, যখন চলিষ্ণুতার প্রবাহ স্তব্ধ হয়, পরম্পরা ছিন্ন হয়। কারণসমূহ এখানে বিবেচনায় আনছি না, শেষ ফলাফলের কথা বলছি। যে-হিব্রু ভাষা বহুকাল পূর্বে, সেই ঘোরতর প্রাচীন সময়ে, এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্যাপী চালু ছিল, ১৯১০ সাল নাগাদ দেখা গেল মাতৃভাষা রূপে দু-একটি পরিবারের ভিতরে তা সংরক্ষিত হচ্ছে; তাকে মরে যাওয়াই বলে।

কিন্তু কোনো লিপির মাধ্যমে ভাষাটি যদি লিখিত অবয়ব নিয়ে থাকে, তাহলে সেই লেখ্যরূপের ভিতরেই সে-ভাষা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। আধার (যেমন প্যাপিরাস, বা শিলাখণ্ড, কিংবা বৃক্ষবল্কল কি তালপাতা, ও আধুনিক যুগে কাগজ) নষ্ট না হলে লিপি নষ্ট হয় না। আর লিপিকে কেন্দ্র করে ভাষা টিকে যায়, এমনকি ব্যক্তি ও সমাজ থেকে তা অপসৃত হলেও। এখানে আমরা অবশ্য যে-সব ভাষার লেখ্যরূপ রয়েছে তাদের কথাই ভাবছি। অজস্র ভাষা রয়েছে যা লোকে বলে, কিন্তু লিখতে পারে না, কারণ সেসব ভাষার বর্ণমালা তৈরি হয় নি। Ethnologue নামে একটি জরিপ নিয়মিতভাবে Summer Institute of Linguistics ও Wycliffe Bible Translators-এর পৌরোহিত্যে প্রকাশিত হয়; তাতে বিশ্বে ৬৭০৩টি উল্লেখযোগ্য ভাষার অস্তিত্ব তাঁরা হিসেব করে পেয়েছেন। ফলে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, লেখ্যরূপ আছে যত ভাষার তার চেয়ে অনেক বেশি ভাষা লেখা যায় না। আমরা অ-লিখনসম্ভব ভাষা নিয়ে ভাবছি না।

লেখ্য ভাষা ও ভাষার লিখিত রূপ এই পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার কারণে এত জরুরি। তাছাড়া, মুখের ভাষা পাল্টায়। শব্দের প্রস্থান ও পুনরাবির্ভাব আছে,

উচ্চারণে তারতম্য আসে, নতুন শব্দের উদ্ভাবন ঘটে, বাক্‌ভঙ্গিতেও ভিন্নতা দেখা দেয়। সমাজ এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে চলে বলেই এমন ঘটে। যন্ত্রে ধারণকৃত রবীন্দ্রকণ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুঝি সে-সময়ের উচ্চারণ থেকে আমরা কতখানি সরে গেছি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মৃদু এবং পরিমাণে যৎসামান্য হলেও এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কথা বলায় পরিবর্তন কানে ধরা পড়ে, অর্থাৎ প্রতি পঁচিশ বছরের ব্যবধানে কথ্যভাষায় একটু-আধটু পরিবর্তন দেখা যাবেই। অথচ লেখ্যরূপটিই যখন লিপিবদ্ধ হয়ে গেল তখন তা স্থায়িত্ব পেয়ে গেল : শব্দনির্বাচন, শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনা বা অনুষঙ্গ, বাক্যের অভ্যন্তরে শব্দের বিন্যাস, শব্দপরম্পরার সংস্থাপনাগত ধ্বনিচারিত্র্য, বাক্যগঠন ইত্যাদি সবকিছুই।

স্থায়িত্বলাভ যেহেতু লেখ্য ভাষার নিয়তি, তাই সেই ভাষারূপ কখনোই কথ্যভাষার মতো তাৎক্ষণিকতা-স্পৃষ্ট, এলোমেলো, অপূর্ণ, অর্ধব্যক্ত, ব্যাকরণগতভাবে ত্রুটিময় হলে চলে না। ভাষার লিখিত রূপের ক্ষেত্রে কথ্য-লেখ্যর এই পার্থক্য বিস্মৃত হলে সর্বনাশ অনিবার্য। সংরক্ষিত থেকে যাওয়াই যেখানে লেখ্যরূপের ভাগ্যলিপি, সেখানে শৈথিল্য, অমনোযোগ, ঔদাসীন্য বা অবহেলা, কিংবা অবিমৃষ্যকারিতার কোনো ক্ষমা নেই।

এ-মুহূর্তে আমাদের বিবেচনার বিষয় বাংলা ভাষার বর্তমান লেখ্যরূপ। উপরন্তু কাব্যভাষা নয়, গদ্যের উপরে আমাদের দৃষ্টি থাকবে।

দুই

বাংলা গদ্যের যে-কাঠামো তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্র ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে বের করে ১৮৭৬-এর মার্চ মাস পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। এক বৎসর প্রকাশনা বন্ধ থাকলে তাঁর মেজ ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত পত্রিকার হাল ধরেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নিয়ে প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সব লেখা অনুধাবন করলে বোঝা যায় ভাষার উপকরণ বিশ্লেষণ, ভাষাদেহে কৃতঋণ শব্দের সাঙ্গীকরণ, সংস্কৃত শব্দের বশ্যতা মান্য করা বা না-করা ইত্যাদি বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত আলোচনা। 'বঙ্গদর্শনে'র ১ম সংখ্যায় "পত্রসূচনা" নামে দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বঙ্কিমচন্দ্র অসম্ভব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিছু পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য করেছিলেন। সে-সব নিশ্চিতই তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, অথচ তাঁর তিরোধানের শতবর্ষ পরেও অবস্থার তেমন কোনো হেরফের হয়নি। তিনি লিখেছিলেন :

> যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরেজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি

কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ...

এক্ষণে আমাদিগের ভিতর উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। ...

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। ...

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনা কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটী বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। ...

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালির অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ। ...

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

বাংলা ১২৭৯ সনের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত এ-রচনা আমার কাছে এখনো প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার কারণ—প্রথমত, জাতির মানসগঠন ও উন্নতিতে মাতৃভাষার অপরিহার্য ভূমিকা অত পূর্বেই তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন; দ্বিতীয়ত, লেখক ও পাঠকের পারস্পরিক সহমর্মিতার লেনদেনে লেখ্য ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন; এবং তৃতীয়ত, রুচি নির্মাণ ও লেখ্য ভাষার অনন্যোনির্ভরতায় তিনি বিশ্বাস করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক সাধনাতেই বাংলা গদ্যভাষাকে যে-পরিণতিতে উন্নীত করেছিলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে কোনো একজন মাত্র সাহিত্যিক নিজ মাতৃভাষার এতখানি উন্নতি করতে

পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর দীর্ঘ আয়ু অবশ্য একটি কারণ, কিন্তু মেধা ও সৃজনশক্তি ব্যতীত আয়ু তো নিষ্ফলা। পরবর্তী সময়ে ১৯৩০-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় গদ্যচর্চায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, রীতি ও শৈলীতে বহু বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, এবং সে-সব শিল্পরুচিকে আহত না করেই। এ-কথা মানতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, বাংলা সাহিত্যের অগ্রসরমাণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ভাষা চলে নি। চলে নি যে তার প্রমাণ, বাংলা ব্যাকরণ এখনো সুসম্পূর্ণ নয়, ভাষার কলকব্জা অদ্যোপান্ত সেখানে ব্যাখ্যাত হয় নি, অমীমাংসিত বহু প্রশ্ন রয়েছে যার কোনো উত্তর বাংলা ব্যাকরণে মেলে না। বাংলা লেখ্য গদ্যের যে কাঠামোগত ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গেছে তা থেকে বিচ্যুতি অন্তত এখন পর্যন্ত ঘটে নি। রাজনৈতিক কারণে গৃহীত ভ্রান্ত ভাষানীতি, যেমন পাকিস্তানি আমলে পূর্ববঙ্গে, কিছু সাময়িক অনাসৃষ্টির জন্ম দিয়েছিল বটে। আরবি হরফে বাংলা লেখা কিংবা বাংলা বাক্যগঠনে গায়ের জোরে আরবি-ফার্সি অনুপ্রবেশের প্রবক্তারা হয়তো ভেবেছিলেন যে তাঁরা 'বিপ্লব' করছেন। কে জানে! ভাষার এই এক রহস্য। সেখানে শব্দহননের কোনো প্রক্রিয়ায় বিপ্লব ঘটানো যায় না। রুচি লঙ্ঘন করেও নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যভাষা স্মরণে আনলে বোঝা যায়, কত বড়ো মাপের বিপ্লব। কিন্তু তার জন্য মাইকেলকে কোনো ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করতে হয় নি।

গদ্যের কাঠামোর প্রসঙ্গ বারবার আসছে। এই 'কাঠামো' বলতে ঠিক কী বুঝব? বৈয়াকরণের দৃষ্টিকোণ জানি না, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের সেবক এক নগণ্য মসীজীবী হিসেবে আমার কাণ্ডজ্ঞান বলে : কাঠামোর অর্থ হল প্রধানত বাক্যগঠনের নির্মাণশৈলী, আর পরক্ষণেই বিবেচ্য শব্দনির্মাণ ও শব্দসংস্থাপনা ঐ বাক্যের ভিতরেই। আমার বিশ্বাস, এক কমলকুমার মজুমদার ব্যতীত বাংলা গদ্য-কাঠামো অস্বীকারের আর কোনো কালাপাহাড়ি নজির মিলবে না। অমিয়ভূষণ মজুমদার ও দেবেশ রায় খুবই স্বাতন্ত্রিক, কিন্তু তাঁরাও কাঠামোর চৌহদ্দিতেই থাকেন। বাংলা গদ্যের গঠনকৌশল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-কল্লোলোত্তর যুগ থেকে এখন অনেক বেশি জটিল, বহুকৌণিক ও বহুস্তরবিশিষ্ট হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু কাঠামো ভেঙে নয়, শিল্পরুচি জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

আমাদের ভাষা-ভাবনায় এক বড়ো ধরনের ভ্রান্তি কাজ করে। সেটি হল : মুখে যেমন বলি তেমনই লিখব, লেখা উচিত। এমন বিবেচনার প্রাথমিক ত্রুটি এখানে যে, স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে যে আমরা সকলে একভাবে কথা বলি। আসলে বলি না। এককে জন এককেভাবে বলেন, এবং প্রধানত বলেন অঞ্চলভিত্তিক ভাষা অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। এটি সহজাতভাবে অভ্যাস হয়ে যায় পরিবারের সকলের মৌখিক বুলির অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে; বিদ্যা শিক্ষা বা অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং শিশুর প্রাথমিক ভাষা-অর্জন নিতান্তই শ্রুতিনির্ভর। সকলের একভাবে কথা বলার অর্থ দাঁড়ায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও মান্য এমন কোনো সাধারণ (common) ভাষা যা সবাই বলে। তা হলে চর্চা করেই সে-ভাষা শিখতে হবে, নইলে আয়ত্তে আসবে না। আমরা যাকে প্রমিত (standard) কথ্য বাংলা নামে চিহ্নিত করি, তা তো এই

ভাষাই। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, সকলে অমন ভাষাতেই কথা বলছি বা বলে থাকি—অর্থাৎ প্রমিত কথ্য বাংলাই আমাদের মুখের ভাষা, তো সেভাবে লিখলেই তো সব মুশকিল আসান। এই দ্বিতীয় বিবেচনাও অভ্রান্ত নয়। কারণ কথা বলার সময় কত রকমের ভুলভাল বলি—অসতর্ক বাক্যবিন্যাস, ভুল শব্দ নির্বাচন, শব্দের ভুল প্রয়োগ, বাচনিক মুদ্রাদোষ ইত্যাদি কত কিছুই-না; লেখার সময় কি অমনভাবে লেখা যাবে, লেখা উচিত? মনে হয়, এমন ফলাফলে সকলেরই আপত্তি হবে। আপত্তির কারণ কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত এক সিদ্ধান্ত : যেমন-তেমন ভাবে আমরা কথা বলতে পারি, বলেও থাকি বৈকি, কিন্তু লেখায় কি তা কখনো করে কেউ, না, করা উচিত! উচিত তো নয় বটেই, কারণ লেখা মানে শিল্প। 'শব্দব্রহ্ম' কথাটির মূল দিঙ্‌নির্দেশনা নিশ্চয়ই লেখ্য ও লিখিত শব্দের পানে; মুখের কথা বিবেচনায় আনলে অমন শাশ্বত বাণী বলা সম্ভব নয়।

লেখা যে-ভাবে তৈরি হয়ে ওঠে, অন্তরালে যত প্রকার মনস্ক্রিয়া কাজ করে—শব্দ গঠন, শব্দ যোজনা, শব্দের ধ্বনিসাম্য, ধ্বনির ওজন-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ে অনুভবশক্তি, বাক্যের অভ্যন্তরীণ ছন্দ ইত্যাদির সম্মিলন 'শিল্প' না হলে তবে কী?

তিন

সম্প্রতি আমরা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে কথ্য ও লেখ্য ভাষার ভিতরে ইচ্ছাকৃত নানা ধরনের বিপর্যয় সাধনের চেষ্টা হচ্ছে। (বাংলাভাষী আরেকটি দেশ ত্রিপুরায় এখনও আমি লক্ষ করি নি; তাঁদের সংক্রমিত না হওয়ার কারণ আমার অজ্ঞাত)। দু-দেশেই মিডিয়ার বদৌলতে টেলিভিশনে অত কর্ণভেদী ভুল উচ্চারণ শোনা যায় যে বিশ্বাস করা কঠিন। সেইসঙ্গে আছে ব্যাকরণদুষ্ট ভুল শব্দ প্রয়োগ। এমনকি বি.বি.সি.-র বাংলা অনুষ্ঠানেও এদের সংক্রমণ কানে ধরা পড়েছে। প্রথমত, প্রমিত ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতা ঢুকে যাচ্ছে; দ্বিতীয়ত বহু বাক্‌ভঙ্গি ইংরেজি রীতির সাদৃশ্যে তৈরি করা হচ্ছে। 'ফোন দেওয়া' কখন 'টেলিফোন করা'র জায়গা দখল করল বাংলাদেশে, নিশ্চিত বলতে পারব না; তবে বছর দশেক আগে তো শুনি নি। স্পষ্টতই, give me a call-এর অনুবাদ। জয়ী হওয়া বা জয়লাভ করা বোঝাতে (ইদানীং সম্ভবত বৎসরখানেকের বেশি নয়) বি.বি.সি. এবং আমাদের রেডিও ফুর্তি আর রেডিও টুডে-কে বলতে শুনছি 'জয় পাওয়া'। বাংলায় এমন শব্দবন্ধ হয় না। আমার ধারণা, এই অভিনব বাংলাটিও to get victory বা to achieve ধরনের কোনো ইংরেজি-সন্তান। আজকালকার তরুণ-তরুণীদের মুখে সম্ভবত এরকম অদ্ভুত ও যুক্তিবিহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীনও বটে, বুলি শোনা যাবে। শোনা যেতেই পারে। আমাদের কালে কি রকবাজদের নিজস্ব ভাষা, রংতামাশা, নিজস্ব খিস্তিখেউড় ছিল না? অবশ্যই ছিল এবং সব সমাজেই থাকে। কিন্তু এসব যেন ভাষার ঘরগেরস্থিতে নিতান্ত অন্দরমহলের ব্যাপার, অন্যে দেখে ফেললে বা শুনে ফেললে মান যায়। ফলে সে-সব বুলি প্রমিত ভাষার ভিতরে আসত না, নিয়ে আসার কথাও কেউ ভাবতও না।

এখন যে আসছে তার মূল কারণ আমাদের রুচির মান নিম্নগামী হচ্ছে। আরো বহু উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। 'সহসা' শব্দটি গত বিশ বছর ধরে ভুল অর্থে লেখা হচ্ছে খবরের কাগজে, এমনকি লেখকের লেখাতেও। কোনো অভিধান বলবে না যে, 'সহসা'র অর্থ দ্রুত, তাড়াতাড়ি; অথচ মানুষজন এদেশে এই অর্থেই প্রয়োগ করছে কারণ এই আঞ্চলিক প্রয়োগটিই তার জানা। তা হলে 'সহসা ডালপালা তোর উতলা যে, ও চাঁপা, ও করবী' রবীন্দ্রগানের কলির কী অর্থ করব 'সহসা' যদি জলদি হয়?

এর বাইরে নতুন ধরনের এক উচ্চারণ শোনা যাচ্ছে বেতারে এবং দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায়। সেখানে বাংলা ধ্বনি মার্কিন ইংরেজির কায়দায় উচ্চারিত হচ্ছে। সে-উচ্চারণে র-ধ্বনির অস্তিত্ব নেই, চন্দ্রবিন্দু জিভে ফুটছে না। কলকাতার প্রায় সবখানেই ও পুরো পশ্চিমবঙ্গ শ (sh) ধ্বনি প্রায় উঠেই গেল, সর্বত্র স(s) উচ্চারণ কানে চপেটাঘাত করছে। এই উচ্চারণ স্যাম্‌বাজারের সসিবাবুদের ব'লে আমরা আমাদের যৌবনে কত রসিকতা করেছি। তখন কি জানা ছিল যে দর্পহারী মধুসূদন শোধ তুলবার জন্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন!

সম্প্রতি নতুন দু'টি কথা শোনা যাচ্ছে। দুটোই মর্মান্তিক, ধ্বংসাত্মক ও আপত্তিকর। কলকাতায় কেউ কেউ দাবি করছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু 'বাঙাল' জনগোষ্ঠীর কথ্য বুলির অভিঘাত ও প্রভাবে সেখানকার ভাষার আদিরূপ পরিবর্তিত হয়েছে এবং নিজস্ব চরিত্র অনেকখানি হারিয়েছে ও ভবিষ্যতে আরো হারাবে, অতএব ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। ভাষার শুদ্ধতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। তবে এমন তর্ক তোলায় কোনো পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই আসবে না, কেননা দুই বা ততোধিক ভাষার নিত্য আদানপ্রদান ও তাদের সম্মিলনে সার্বক্ষণিক ভাববিনিময় হচ্ছে তখন অজ্ঞাতেই ভাষাসাংকর্যে ভাষা পাল্টে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সেটিই 'প্রমিত' অবয়ব ধারণ করছে। ১৯৪৭-এর পর থেকে বিগত ষাট বৎসরে এক ঘরের নিচে এক বিছানায় শুয়ে সংসার করে যে-সন্তানাদি বংশধর এসেছে তারা নিজেরই সম্পত্তি ও সম্পদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রমিত লেখ্য রূপে যদি কোনো বিশেষ ভাষাচারিত্র্য প্রকাশিত হয়েই থাকে তবে সেটাই স্বতঃস্ফূর্ত, কারণ স্বাভাবিক নিয়মে আত্তীকরণের ভিতর দিয়ে তা ঘটেছে। ভাষাবিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসু দল বিচারবিশ্লেষণ করে তার ভিতরে পশ্চিমবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয় উপাদান পৃথক যদি করেন, তো তাতে নতুন অনেক তথ্য হয়তো জানা যাবে, ভাষাসংশ্লেষণ বিষয়ে নতুন কোনো তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়তো-বা করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের বিযুক্ত করাও যাবে না, 'কলঙ্কিত' ভাষা হিসেবে দূরছাই করাও অনৈতিক হবে, কেননা ঐ ভাষাই বর্তমানের ভাষা। অতএব, বিচ্ছিন্ন দু-চারজন অত্যুৎসাহী ব্যক্তির অলীক কল্পনা কখনোই বাস্তবে ঘটে উঠবে না।

বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি আরো সঙ্গিন। এখানে একদল তরুণ সাহিত্যকর্মী চাইছেন পূর্ববঙ্গের উপভাষাকেই 'প্রমিত' হিসেবে গণ্য করা হোক। যৎকিঞ্চিৎ নজির উপস্থিত করি :

ফাহাদের বিসনায় শইয়া ইস। ফাহাদ খাদ্য যোগাইতে গেসে। মাথাটা ঘুরতেসে। মনে হয় বমি হবে। বিসনায় বমি করলে ফাহাদ আমারে কতল করবে। তাড়াতাড়ি বাইরে আসি। বাথরুম ঘরের সমীপে। ঢুইকা আলো জ্বালাই। দেখি যে, আরেকটা ঘরে প্রবেশিত হইসি। মেঘলার ঘর। পড়ার টেবিল। অনেক বই। ড্রেসিং টেবিল। বিসনা। চেস্ট অব ড্রয়ারস ইত্যাদি। আমি বিসনাটা ছুঁই। এইখানে মেঘলা শোয়। গন্ধই অন্যরকম। আমি ওর মেকআপের দ্রব্যাদিগুলি ছুঁই। কলজে ধুকপুক কইরা মনে হয় এখন শরীর থেইকা বাহির হইয়া যাবে। মেঘলা ও ফাহাদ কথা বলতেসে। ওদের কণ্ঠস্বর নিকটে আসতেসে। আমার এইঘর থেইকা নির্গত হওয়া উচিত। পারি না। আস্তে গিয়া চেস্ট অফ ড্রয়ারস খুলি। কাপড়গুলি স্পর্শ কইরা কইরা দেখি। সবচেয়ে নিচের ড্রয়ার থেইকা একটা দ্রব্য নিয়া পকেটে ঢুকাই। কাউরে কিছু না বইলা ওদের বাড়ি থেইকা নির্গত হইয়া যাই। ...
টলটল ইকটু কাঁপতেসে। এহিনে, শুইয়া আসে আমার সাথে। কাঁথা গায় দিয়া। নিজে নিজে কথা বলে, মুখ গোঁজ কইরা, মৃদু ভ্যলুমে বস্ন্যাক স্যাবাথ শুনি। ছোট মা টেলিফোওন কইরা জানায় যে, তার আসতে দেরি হবে। সেবা আন্টি এমন সাজগোজ কইরা মরা বাড়িতে গেসে, মনে হইতেসে বিয়েবাড়ি-গহনা, মেকআপ, একদম দ্যা হোল নাইন ইয়ার্ডস, ছোট মা জানায় আমারে।

এই উদ্ধৃতি কিন্তু কোনো চরিত্রের সংলাপ নয়। এটি ন্যারেশন, বর্ণনা। আমি জ্ঞাত নই—নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা এটি, নাকি এর শব্দসম্ভারে ও ক্রিয়াপদে একাধিক অঞ্চলের সহাবস্থান রয়েছে? আমরা কি বাংলাদেশের জন্য এমন গদ্যভাষাকে প্রমিত (standard) বলে মেনে নিতে আগ্রহী? সকলকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি।

প্রকৃতপক্ষে ভাষা মনুষ্যদেহের মতোই। সেখানে অঙ্গসংস্থান একটি পরীক্ষিত ও মান্য নিয়মবিধি দাবি করে এবং সার্বিক সুষমাও যার ফলে সৌন্দর্য স্বতঃপ্রকাশিত হবে। মনে কি হয় যে, উল্লিখিত উদাহরণ এমন প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম?

যাঁরা এমন এক্সপেরিমেন্টের ধ্বজাবাহক তাঁদের ঘোষিত পর্যবেক্ষণ হল এবং যুক্তিও : বাংলা প্রমিত গদ্যভাষা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; আমরা পূর্ববঙ্গে তা কেন মানব, আমরা আমাদের আঞ্চলিক ভাষার ওপর ভিত্তি করে আমাদের জন্য নতুন প্রমিত ভাষা তৈরি করব। আপাতদৃষ্টে মনে হবে, খুবই যুক্তিসহ কথা তো! আমি শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভাষা ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য এবং সংস্কৃতির নিয়ামক হল ভাষা। অর্থাৎ সোজাসাপটা প্রশ্ন: আমরা তা হলে কি বাঙালি-সংস্কৃতির বিভাজন, দ্বিখণ্ডিত রূপ, চাইছি—যেমন জনগোষ্ঠী দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ১৯৪৭-এ? শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের জীবদ্দশায়—যাঁরা এখন সপ্ততিস্পর্শী—পাকিস্তানি যুগে দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বাভাবিক ফল হিসেবে বঙ্গসংস্কৃতির বিভাজনই শুধু নয়, অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের (যদিও কাল্পনিক) প্রতিকার হিসেবে

প্রতিষ্ঠা করার কত চেষ্টাই-না করেছিল। লাভ তো হয় নি। সেই স্বাধীন বাংলাদেশ তো হলই।

তা হলে, বঙ্গভাষার ভবিতব্য আমরা সজ্ঞানে কী নির্ধারণ করতে চাইছি?

চার

কিন্তু আরো ভয়াবহ বাস্তবতা—বিশ্বায়ন। অধিক কথন নিষ্প্রয়োজন। আমি পাঠক, দর্শক ও সংবেদনশীল বঙ্গসন্তানদের প্রতি করজোড়ে নিবেদন করি : আপনারা দয়া করে কলকাতা দূরদর্শনের সব ক'টি বাংলা চ্যানেল এবং বাংলাদেশের টেলিভিশনের সব ক'টি চ্যানেল মনোনিবেশ সহকারে দেখুন, অধিকন্তু বর্তমান রচনালেখকের প্রতি কৃপাবশত ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাটে হোর্ডিংয়ের বিজ্ঞাপনে বাংরেজি (বাংলা + ইংরেজি) ভাষার যে-দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষ করুন। করলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, আমরা আধুনিক হবার আপ্রাণ চেষ্টায় ইংরেজি ভাষার চুমকিতে বাংলাকে সাজাচ্ছি এবং মাতৃভাষার চরিত্র নষ্ট করছি।

আমাদের দেশের ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মানুষজনের নিত্যদিনের মুখের বুলিতে ইংরেজি ও হিন্দি শব্দের (বাংলাদেশে বসে টিভি হিন্দি চ্যানেলের প্রসাদে) মিশ্রণ রোমহর্ষক রূপ নিয়েছে। এ প্রবণতা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু লেখ্য ভাষাতে তার অনুকরণের ছাপ পড়লে ভাষার শিল্পগুণের যে-হানি ঘটে তাতে ভাষাবিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং তা যদি অভ্যাসের কারণে ক্রমশ স্বাভাবিক ও সহনীয় হয়ে ওঠে তা হলে বাংলা গদ্যের অধোগতি রোধ করা অসম্ভব হবে।

পুনরায় বলি, ভাষা এক বিশেষ শিল্প, লেখ্য ভাষা তারও অধিক। বঙ্কিমচন্দ্র কী অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই-না লিখেছিলেন :

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যে সকল রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। ... বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না; ...

আমাদের গূঢ়তর সন্দেহ এই যে, বাংলা গদ্যভাষার শরীরে যে-রুচিবৈকল্য ক্রমশ মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসছে তাতে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ক্রমশ অশ্লীল করে তুলছি।

স্বরোচিষ সরকার

একুশের প্রবন্ধের মূল চেতনা ও চেতনার সম্প্রসারণ

১. সূচনা

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বা শহিদ দিবস উপলক্ষে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়, পঠিত হয়, স্মরণিকা-স্মারকগ্রন্থ ও দৈনিক পত্রিকার ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়, এককথায় সেগুলোই একুশের প্রবন্ধ হিসেবে পরিচিত। ভাষা আন্দোলনের সমকালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা কেন গ্রহণযোগ্য সেই সম্পর্কিত প্রবন্ধই ছিলো একুশের প্রবন্ধের মূল আলোচ্য। অভিন্ন কারণে বাংলা ভাষার এবং এক পর্যায়ে বাংলা লিপির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কেও প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে উর্দু এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পর একুশের প্রবন্ধ থেকে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গের আলোচনা গুরুত্ব হারায়।[১] অতঃপর একুশের মূল চেতনা, তথা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসঙ্গ একুশের প্রবন্ধে বেশি জায়গা পেতে শুরু করে। শুধু ভাষার অধিকারের মধ্যেই তখন একুশের প্রবন্ধের আলোচনা আর সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টিও একুশের প্রবন্ধে স্থান পায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রায় সকল প্রাবন্ধিকই একবাক্যে স্বীকার করেন, ভাষা আন্দোলনই ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক ভিত্তি। এক পর্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তথা আত্মপরিচয় বিষয়ক আলোচনাও একুশের প্রবন্ধের সমার্থক হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে বাংলা একাডেমীতে পঠিত প্রবন্ধগুলোর দিকে তাকিয়ে তা মনে হয়। আবার ২০০০ সাল থেকে শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা

---

[১] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাকিস্তানের বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। মজার বিষয় হলো, এই সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার ধারণাই পরিত্যক্ত। ২৫১ নং অনুচ্ছেদে উর্দুকে বলা হয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা। ১৫ বছরের মধ্যে সেটিকে দাপ্তরিক ভাষায় পরিণত করার অঙ্গীকার থাকলেও জাতীয় ভাষার পাশাপাশি প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের বিধান রাখা হয়েছে। একটি অনুচ্ছেদে (২৮ নং) স্বতন্ত্র ভাষা-লিপির ধারক জনগোষ্ঠী যাতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে পারে, তার বিধানও রয়েছে।

লাভ করায়, মানুষের ভাষিক অধিকারের প্রসঙ্গ একুশের প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ ছয় দশক ধরে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরের অসংখ্য লেখকের হাতে একুশের মূল চেতনা এবং সেই চেতনা থেকে উদ্ভূত ও সম্প্রসারিত একাধিক চেতনা কিভাবে একুশের প্রবন্ধকে ধারণ করে, তা এই প্রবন্ধের বিবেচ্য।

২. প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার

একুশের প্রবন্ধ বলতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন অনুষঙ্গের প্রবন্ধকে বোঝানোর জন্য ১৯৫২ সালের পূর্বে অথচ ১৯৪৭ সালের পরে রচিত প্রবন্ধকেও একুশের প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আবার একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় উত্তরণের ফলে বাংলাদেশে এবং বিশ্বের সর্বত্র মাতৃভাষার অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধকেও একুশের প্রবন্ধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। একুশের প্রবন্ধের এই কালগত ও স্থানগত বিস্তৃতির ফলে গত ছয় দশকে দেশের এবং বিদেশের পত্রপত্রিকায়, সংকলনে, স্মরণিকায় হাজার হাজার প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত একুশের প্রবন্ধের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন আমিরুল মোমেনীন।[২] এই সময়ের মধ্যে তিনি ২২৮২টি স্মরণিকার সন্ধান পান, তাতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ সহ যেসব প্রবন্ধের তালিকা প্রদান করা হয়, তা এই সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ঢাকা এবং মফস্বল শহরগুলো থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার সাময়িকীতে একুশে সংক্রান্ত যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, আমিরুল মোমেনিন তা সংকলন করেননি।[৩] সেগুলো সংকলিত হলে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো বৃদ্ধি পেতো।

একুশের প্রবন্ধের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। মূল কারণ এ সময়ে ঢাকা এবং মফস্বল শহরগুলো থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি। বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় এবং আসামে; অন্যদিকে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকেও ভাষা-আন্দোলন নিয়ে স্মরণিকা-সংকলন প্রকাশ পায়।[৪] সর্বোপরি,

---

[২] আমিরুল মোমেনীন, *একুশের সংকলন: গ্রন্থপঞ্জি (১৯৫৩–১৯৮৯)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)।

[৩] শুধু 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার ১৯৭৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি এর ব্যতিক্রম, দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ১৫১।

[৪] বাংলাদেশে ঢাকা ও মফস্বল শহরগুলো থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে বাংলা দৈনিক 'সংবাদ', 'যুগান্তর', 'প্রথম আলো', 'ইত্তেফাক', 'বাংলার বাণী', 'ভোরের কাগজ', 'জনকণ্ঠ', 'সমকাল', 'আমার দেশ', 'যায়যায়দিন', 'ইনকিলাব' ইত্যাদি; এবং ইংরেজি দৈনিকের মধ্যে 'ডেইলি স্টার',

উনিশশো ষাটের দশক থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলা একাডেমী যেসব আলোচনাসভার আয়োজন করে, সেখানেও প্রচুর সংখ্যক প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধসমূহ সংকলন করেছেন মোবারক হোসেন।[৫] ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগেই একুশের অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধাবলি বর্ষসংখ্যাসহ 'একুশের প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম দিকে একুশের অনুষ্ঠান হতো সপ্তাহব্যাপী, আশির দশক থেকে তা মাসব্যাপী প্রসারিত হয়। অর্থাৎ এক বাংলা একাডেমীতে পঠিত একুশের প্রবন্ধ ও আলোচনার সংখ্যাই প্রায় এক হাজার হতে পারে।

বাংলা একাডেমী ছাড়া বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতোগুলো একুশের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ সংকলনের নাম 'মহান একুশে: সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ'।[৬] এ-ফোর সাইজের পৃষ্ঠা সংবলিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে ১৭৬০। এই সংকলনে শুধু প্রবন্ধই রয়েছে তিন শতাধিক, যার মধ্যে বেশ বড়ো একটি অংশ সরাসরি ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ক।

একুশের প্রবন্ধের যাঁরা লেখক, তাঁদের সংখ্যাও প্রবন্ধের সংখ্যার মতো ক্রমবর্ধমান। স্বভাবতই দীর্ঘ এঁদের তালিকা। সে তালিকা প্রণয়ন করা হয়তো কঠিন নয়, যেমন আমিরুল মোমেনীনের সংকলনে এঁদের অনেকের নাম রয়েছে। অতিরিক্ত কিছু নাম পাওয়া যায় মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মোবারক হোসেন, মাহবুব উল্লাহ, নীতীশ বিশ্বাস, মজহারুল ইসলাম ও চিত্ত মণ্ডল সংকলিত

'ইনডিপেনডেন্ট', 'বাংলাদেশ টাইমস', 'বাংলাদেশ অবজারভার', 'নিউ ন্যাশান' ইত্যাদি পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী বিশেষ জনপ্রিয়, যেখানে খুব উন্নত মানের একুশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের 'দেশ', 'বিচিত্রা', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'সত্যযুগ', 'প্রতিদিন', 'আজকাল', 'গণশক্তি' 'ঐকতান' প্রভৃতি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ২০০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার একটি একুশে সংকলন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার অনেক লেখকের রচনা সংকলিত হয়। দ্রষ্টব্য, মজহারুল ইসলাম ও চিত্ত মণ্ডল সম্পাদিত, *মহান একুশে: সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন* (কলকাতা: নবজাতক, ২০০২)। আসামের শিলচর থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, *ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার* (শিলচর: আজমল হোসেন মজুমদার, ১৯৯৭)।

[৫] মোবারক হোসেন সম্পাদিত, *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ: ১৯৬৩–১৯৭৬* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪); একই ব্যক্তির, *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ: ১৯৭৭–১৯৭৯* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধগুলোও প্রকাশিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ মোবারক হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

[৬] মাহবুব উল্লাহ্ সম্পাদিত, *মহান একুশে: সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৮)।

সংকলনগ্রন্থগুলোতে। তবে একুশের প্রবন্ধ রচনার প্রক্রিয়া যেহেতু চলিষ্ণু, তাই এই তালিকা যতোবারই করা হোক না কেন, ততোবারই তাতে অনেক লেখক বাদ পড়বেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সবচেয়ে অসুবিধা হলো এই শত শত নামের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা। এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের নাম বাদ পড়তে পারে। তা সত্ত্বেও প্রবন্ধের শিরোনামের দাবি মেটাতে গিয়ে গত ছয় দশকের মধ্যে একুশের প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আবুল ফজল, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবুল হাশিম, মুহম্মদ এনামুল হক, সত্যেন সেন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, অজিতকুমার গুহ, আবদুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল কাসেম, নীলিমা ইব্রাহীম, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, সালাহ্উদ্দীন আহমদ, খান সারওয়ার মুরশিদ, সন্তোষ গুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মাহবুব জামাল জাহেদী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, আহমদ রফিক, আবদুল্লাহ আল-মুতী, বদরুদ্দীন উমর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবুল কাশেম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বশীর আল্হেলাল, আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক, হায়াৎ মামুদ, গোলাম মুরশিদ, শামসুজ্জামান খান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মনসুর মুসা, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সেলিনা হোসেন, আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ।[৭]

পশ্চিমবঙ্গের যেসব প্রাবন্ধিক ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার প্রাসঙ্গিক সংকট নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোক দাশগুপ্ত, এষা দে, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, কান্তি বিশ্বাস, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, চিত্ত মণ্ডল, জিয়াদ আলী, জীবনানন্দ দাশ, দিলীপ মজুমদার, দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম, নীতীশ বিশ্বাস, নেপাল মজুমদার, পবিত্র সরকার, পান্নালাল রায়, প্রথমা রায় মণ্ডল, প্রফুল্ল রায়, বাঁধন সেনগুপ্ত, বীরেন চন্দ, মজহারুল ইসলাম, রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সিং, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।[৮]

---

[৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত, *অমর একুশে প্রবন্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০) গ্রন্থে এঁদের অনেকের প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। অনেকের প্রবন্ধ এখানে মুদ্রিত না হলেও তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের এই তালিকা তাঁদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

[৮] নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'ঐকতান' পত্রিকার 'বাংলা ভাষা ও মাতৃভাষা সংখ্যা' (২০০৫) ও 'আক্রান্ত মাতৃভাষা: আসুন প্রতিরোধ করি সংখ্যা' (২০১০); এবং মজহারুল

বাংলাদেশে ইংরেজি দৈনিকগুলোর একুশে সংখ্যায় যাঁদের রচনা মুদ্রিত দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবুল মাল আবদুল মুহিত, আবুল হুসেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আলমগীর মহিউদ্দিন, আশরাফ সিদ্দিকী, এ ইউ এম ফকরুদ্দীন, ওবায়েদ-উল হক, কবীর চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী, কাজী সিরাজ, কামাল হোসেন, গোলাম কিবরিয়া, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বদরুদ্দীন উমর, মিজানুর রহমান শেলী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আশরাফ আলী, সৈয়দ বদরুল আহসান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, হাসনাত আবদুল হাই প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৯]

৩. একুশের প্রবন্ধের মূল চেতনা

ভাষা আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিলো বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা। ১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকেই এই ধরনের লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণির লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি আবদুল হক। সম্ভাব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হবে, সে সম্পর্কে যখন আলাপ-আলোচনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখন তিনি বাংলা ভাষাকেই পাকিস্তানের অবিকল্প রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথমে 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় এবং পরে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় তাঁর এই অভিমত তিনি তুলে ধরেছিলেন। বিশেষভাবে শেষোক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ভাষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসঙ্গ তোলা হয়, বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদার কথা বলা হয়, উপমহাদেশীয় অন্য যে কোনো ভাষার সাহিত্যের চেয়ে বাংলা ভাষার সাহিত্যকে উন্নত বর্ণনা করা হয়, সর্বোপরি ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার অধিক যোগ্যতা রয়েছে বলেও প্রবন্ধটিকে দাবি করা হয়। সবশেষে আবদুল হক বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্য একমাত্র বাংলা ভাষাই।"[১০]

এই প্রবন্ধ প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, সম্ভাব্য

ইসলাম ও চিত্ত মণ্ডল সম্পাদিত 'মহান একুশে: সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন' গ্রন্থে এঁদের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তালিকাটি লেখকদের নামের আদ্যক্ষরের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

[৯] কয়েকটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নামগুলো সংকলিত। তালিকাটি লেখকদের নামের আদ্যক্ষরের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

[১০] আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ৩৪। বস্তুত, রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক এই বিতর্ক সূচিত হয়েছিলো ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে তারিখে হায়দরাবাদের এক উর্দু সম্মেলনে, যেখানে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামান ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু। আনিসুজ্জামান, "ভাষা-আন্দোলন: কিছু কথা," *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১২৩।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু।[১১] যে কোনো কারণে হোক জিয়াউদ্দীনের এই বিবৃতি বাঙালি মুসলমানকে প্রভাবিত করে। ফলে আবদুল হকের মতো অন্য কোনো লেখক আর ততোটা জোরের সঙ্গে একমাত্র বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন না। হতে পারে বাঙালি তার স্বভাবজাত পরমতসহিষ্ণুতার কারণে পাকিস্তানের অন্য ভাষাগুলোর কথাও বিবেচনায় রেখেছিলো। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যে অন্তত তেমনটাই মনে হয়। তিনি বলেন, "যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।"[১২] বিভিন্ন দিক বিচার করে শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য চারটি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তা হলোঃ ইংরেজি, বাংলা, উর্দু এবং আরবি।[১৩]

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের মনোভাব অনুকূল না থাকায় সমকালীন বাঙালি লেখকগণ তাঁদের এই দাবি অব্যাহত রাখতে পারেননি। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, সম্পূর্ণ পাকিস্তান তো দূরের কথা পূর্ব পাকিস্তানের দাপ্তরিক ভাষাও বাংলা থাকবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রথম প্রতিফলন ঘটে মাহবুব জামাল জাহেদীর বক্তব্যে (*ইত্তেহাদ*, ২০শে জুলাই ১৯৪৭)। তিনি দাবি করেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা হলেই সুবিচার হবে।" অনুরূপ মন্তব্য লক্ষণীয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ফররুখ আহমদের লেখায়, নভেম্বর মাসে মুহম্মদ এনামুল হকের লেখায়, এবং ডিসেম্বর মাসে কাজী মোতাহার হোসেনের লেখায়।[১৪] 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরীও প্রায় অভিন্ন বক্তব্য পেশ করেন।[১৫] ১৯৪৯ সালে একই পত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধেও অভিন্ন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ সকলে তখন উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।[১৬]

এভাবে যে জনসংখ্যার বিচার ভারত বিভক্তি, এমনকি, সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের মূল চালিকা শক্তি ছিলো, নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার

---

[১১] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড (২য় সং; ঢাকাঃ সুবর্ণ, ১৯৭৯), পৃ. ১৯।

[১২] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ১৩–১৪।

[১৩] তদেব।

[১৪] আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, পৃ. ৩৭–৩৮।

[১৫] মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ১৯–২৮।

[১৬] আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, পৃ. ৩৯।

জোর বাঙালিদের পক্ষে গেলো না। এতে বোঝা যায়, ভারতীয় মুসলমানের জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুর গ্রহণযোগ্যতা ততোদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। সেদিক দিয়ে ভাবলে সাতচল্লিশ পরবর্তী ভাষা আন্দোলনকে মনে হবে, সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের বাস্তবসম্মত বিষয়বুদ্ধির একটি সাধারণ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, উর্দু যতোই মুসলমানি ভাষা হোক, বাঙালি মুসলমানের পক্ষে তা সহজে আয়ত্ত করা অসম্ভব। অন্যদিকে সেই সুযোগে 'উর্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার চেষ্টা করবে।'[১৭] বিষয়টি সৈয়দ মুজতবা আলী সহ সমকালের বেশ কয়েকজন লেখককে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে।

৪. একুশের প্রবন্ধের সম্প্রসারিত চেতনা

১৯৭৮ সালে আবুল ফজলের একটি বই প্রকাশ পায়, যার নাম 'একুশ মানে মাথা নত না করা'। সমকালে বইটি খুব জনপ্রিয়তা পায়। নামপ্রবন্ধটির উপসংহারে আবুল ফজল লিখেছিলেন, 'আমরা কখনো মিথ্যার কাছে, অন্যায়ের কাছে, শক্তির কাছে, বন্দুক-বেয়নেটের সামনে নতি স্বীকার করবো না, করবো না মাথা নত।'[১৮] আবুল ফজলের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী একুশের চেতনা হলো: সত্যের জন্য আপোসহীনতা। তবে একুশের চেতনাকে সকলে একভাবে দেখেননি। কারো কাছে মনে হয়েছে, একুশের চেতনা হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি তথা গণমানুষের মুক্তির চেতনা, কারো কাছে মনে হয়েছে একুশের চেতনা হলো অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা, কারো কাছে মনে হয়েছে এই চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার, আবার অনেকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন: একুশের চেতনার সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের চেতনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমনকি বাঙালি মুসলমানের সত্যিকারের জাগরণের পর্বকেও উনিশশো বায়ান্ন সাল থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব বলে অনেকের মনে হয়। একুশের চেতনার এইসব ভাষ্য একুশের প্রবন্ধকারদের মধ্যে ঘুরেফিরে আসে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর লেখা একুশের প্রবন্ধগুলোতে একুশের চেতনার এইসব দিক হামেশা চোখে পড়ে।

একুশের চেতনাকে যাঁরা জাতীয় জাগরণের সঙ্গে তুলনা করে দেখেন, তাঁদের মধ্যে খান সারওয়ার মুরশিদ একজন। তিনি লক্ষ করেন, একুশে ফেব্রুয়ারির পূর্বে বাঙালি মুসলমানের মনে আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে গ্রহণ করা নিয়ে ছিলো এক

---

[১৭] সৈয়দ মুজতবা আলী, "পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ৯০।

[১৮] প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৯৭৬ সালে। লেখক তখন আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম-এর উপদেষ্টা হিসেবে (মন্ত্রীর পদমর্যাদায়) কর্তব্যরত ছিলেন।

ধরনের দ্বিধা ও পিছুটান। তাঁর ভাষায় 'আমাদের আত্মসম্ভ্রমে যেমন শূন্যতা ছিল তেমনি আমাদের চিত্তভূমিও ছিল অনুর্বর।'[১৯] আর তাই 'একুশের প্রাণদান এক চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা, বিভাগোত্তর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক চূড়ান্ত বিভাজনরেখা, যা দুদিকে যেন দুটি আলাদা চেতনা ও মূল্যবোধের জগৎ।'[২০]

একুশের চেতনাকে সরাসরি ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি বলেন, "ফরাসি বিপ্লবের চেতনা যেমন সমগ্র ইউরোপকে, ক্রমে গোটা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির বিকাশশীল চেতনাও তেমনি আমাদেরকে বদলে দিয়েছে।"[২১]

একুশের চেতনার মধ্যে জাতীয়চেতনা অনুসন্ধান করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান, যখন বাঙালি বুঝতে পারে যে, সে বাঙালি হিসেবেই প্রতারিত হচ্ছে, তখন তাকে বাঙালি হিসেবেই প্রতিরোধের পথ খুঁজতে হয়। এভাবে তৈরি হয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবোধ তথা জাতীয়তাবাদ। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ করেন, বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতাও একুশের চেতনার সঙ্গে অভিন্নভাবে গ্রথিত হয়ে যায়। তাঁর ধারণা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে বাংলার মানুষ যে অসাম্প্রদায়িক ছিলো, তা ছিলো তার অবুঝ স্তরের অসাম্প্রদায়িকতা, একুশের চেতনা তাকে সচেতনভাবেই অসাম্প্রদায়িক করে তোলে।[২২]

একুশের চেতনার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চেতনার কথা উল্লেখ করেন আনিসুজ্জামান। তাঁর ধারণা একুশের আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ছিলো একেবারেই সাময়িক, এর সঙ্গে জড়িত ছিলো সুদূরপ্রসারী যে মূল্যবোধ, তার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো 'গণতন্ত্রের চেতনা, বাঙালিত্বের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা।'[২৩]

ভাষা আন্দোলনের চেতনার মধ্যে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের সূত্র খুঁজে পান হাসান আজিজুল হক। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, 'বাংলাদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের অশেষ গুরুত্ব আছে' কারণ 'শোষণ ও নিপীড়নের

---

[১৯] খান সারওয়ার মুরশিদ, "একুশে অমর কেন," *কালের কথা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃ. ১০৫।

[২০] তদেব।

[২১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, "একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মর্মকথা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ২৬৯।

[২২] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন," তদেব, পৃ. ২৪৬।

[২৩] আনিসুজ্জামান, "একুশের চেতনা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ২৫৮।

দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিষম সমাজকে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন অবিরাম প্রবৃত্তি ও প্রেরণা' জোগায়।[২৪]

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হোক, এই চেতনাও একুশের চেতনার বড়ো একটি দিক। ষাটের দশক থেকে শুরু হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে বিষয়টি একুশের প্রবন্ধে বারে বারে উঠে আসে। যদিও সর্বত্রই লক্ষ করা যায় হতাশার সুর। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বত্র বাংলা ভাষায় কাজ হচ্ছে না, উচ্চশিক্ষায় বাংলা অবহেলিত, সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কাজ হয় না—ইত্যাদি। এই জাতীয় হতাশা অবশ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে। যেমন পরিভাষার প্রশ্ন উঠলে ষাটের দশকে শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাঙ্লা উন্নয়ন বোর্ডের পরিভাষা প্রণয়ন প্রকল্প, স্বাধীন বাংলাদেশেও তা অব্যাহত থাকে।[২৫] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সর্বত্র বাংলা ভাষায় কাজ শুরু হয়। একুশের প্রবন্ধের মধ্যে এই হতাশা ও অপূর্ণতার বোধ অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ই-গভরনেন্স-এর মতো বিষয়ও বাংলা ভাষায় চালু হবে, সর্বোচ্চ আদালতে বাংলা ভাষায় রায় হবে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা আর অবহেলিত থাকবে না।[২৬]

২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি লাভ করে আন্তর্জাতিক মাত্রা। এর ফলে একুশের চেতনা পায় নবতর মাত্রা। বাংলাদেশের শহিদ দিবস ভাষাদিবসে পরিণত হয়, একুশে ফেব্রুয়ারি হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু দেশ এটি সরকারিভাবে পালন করতে শুরু করে। তবে ২০০০ সালে যেভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিলো, বাস্তব অবস্থা ততোটা সুখকর হয় না। ভাবা হয়েছিলো এর ফলে বাংলা ভাষার গুরুত্ব আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু

---

[২৪] হাসান আজিজুল হক, "বায়ান্নর একুশ: ঢাকার বাইরে," *হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ ৪* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ৩৪১।

[২৫] সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু বিষয়ে পরিভাষা সমস্যার সমাধান ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি চিরস্মরণীয়, যেখানে তিনি বলেছিলেন, "আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, তা হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয় তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।" উদ্ধৃত, শামসুজ্জামান খান, "বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে," *বাংলার বাণী*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

[২৬] সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ হতাশা লক্ষ করা যায়। তাই সেক্ষেত্রেও আশা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, তাঁরাও হয়তো মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করবেন। এ জাতীয় প্রবন্ধ, যেমন, দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস, "বাংলা ভাষা বিপন্ন"; সুকুমার সিং, "বাংলায় বাঙালি নেই" প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য, *ঐকতান*, আক্রান্ত মাতৃভাষা: আসুন প্রতিরোধ করি সংখ্যা, পৃ. ১৭, ৭৩।

তা হয়নি। আন্তর্জাতিকভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি স্মারক দিন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র। তা আবার এমনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যাতে মনে হবে, ভাষা আন্দোলনের সময়ে বাংলা ভাষা ছিলো পাকিস্তানের একটি গৌণ ভাষা, এবং সেই ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাঙালিরা আন্দোলন করেছিলো। জাতিসংঘের মহাসচিব ও ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বাণীগুলো থেকে এমন ধারণাই হয়। জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইটে অনেকগুলো ভাষার বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার বর্ণমালা না থাকা এর একটা প্রতীকী উদাহরণমাত্র।[২৭]

তবে বাংলা ভাষা পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া ভাষাগুলোর প্রতীক ও অনুপ্রেরণা যাই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূত্রে বাংলা ভাষা নিয়ে নতুনভাবে ভাবার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। অসংখ্য প্রাবন্ধিক এ নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ বোধ করছেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাও প্রাবন্ধিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বরাক অঞ্চলের লেখকগণ ২০০০ সালের পূর্বে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লিখতে গিয়ে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ভুগতেন, এমনকি ঐসব অঞ্চলে বাংলা ভাষার সংকট নিয়ে কথা বলতেও তাঁরা দ্বিধান্বিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূত্রে তাঁদের লেখনী সেসব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।[২৮]

৫. উপসংহার

১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী একুশের একটি মর্মবাণী মনোনীত করেছিলো, তা হলো: 'একুশ আমাদের পরিচয়'। শামসুজ্জামান খানের ভাষায় 'কথাটা ব্যঞ্জনাধর্মী, তাৎপর্যময়, বহুমাত্রিক। ইতিহাসের অনেক গলিঘুঁজি এবং বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে একটা সুস্পষ্ট উচ্চারণ।'[২৯] প্রায় অভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করেন সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ। তাঁর মনে হয়, 'ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাঙালিরা তাদের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। সূচনা হল আমাদের সময়কালের বাঙালির নবজাগরণের।'[৩০] সালাহ্উদ্দীন

---

[২৭] গোলাম মুরশিদ, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: গৌরব ও বাস্তব," *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৯২।

[২৮] নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত পূর্বোক্ত 'ঐকতান' পত্রিকার বিভিন্ন লেখা থেকে তা বোঝা যায়।

[২৯] শামসুজ্জামান খান, "একুশের প্রবন্ধ," *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৫৯।

[৩০] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, "আমাদের ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির নবজাগরণ," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ১৭২।

আহ্‌মদের এই বক্তব্য বিশ শতকের শেষার্ধের অনেকের রচনাতেই পাওয়া যায়। তাঁরা দেখতে পান, বায়ান্নর একুশের পরে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে, তা আধুনিক ও ইহজাগতিক; ধর্মপরিচয় সেখানে গৌণ। সব দিক দিয়ে নতুন সৃষ্টির জোয়ার বইতে শুরু করে।[৩১] শুধু যে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই উচ্চারিত হয়, তাই নয়, এর সঙ্গে নবসৃষ্ট জাতীয়তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে চায়। বিশেষভাবে ষাটের দশকে তা ফুলেফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—যার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ—সেই বাংলাদেশের সংবিধানে তাই শোভিত হয় জাগ্রত বাঙালির নতুন পরিচয়-ধারণকারী চারটি মূল আদর্শ: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের মানুষের এই পরিচয় একুশের অধিকাংশ প্রাবন্ধিক ধারণ করেন। শুধু ধারণ করেন বললে হয়তো লেখকদের প্রতি সুবিচার করা হয় না, কারণ তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশে এই আদর্শের সত্যিকার বাস্তবায়নও প্রত্যাশা করেন।

---

[৩১] আনিসুজ্জামান, "একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা," *অমর একুশের প্রবন্ধ*, পৃ. ২৫৩।

দিনেন্দ্র চৌধুরী

লোকায়তিক

এক

চোখ মেললেই প্রকৃতি। গাছ-পালা, নদী-সাগর, পাহাড়-ঝর্না, প্রজাপতি-ফড়িং, কীট-পতঙ্গের বর্ণিল বিচিত্র সমারোহ। তার মধ্যে মানুষ। পাহাড় বেয়ে ঝর্না থেকে ছুটন্ত নদী গিয়ে পড়ছে সাগরের বুকে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। সভ্যতার উষাকাল থেকে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বিচিত্র জনপদ। বহিরাগত বহু জনজাতির আগমনে সঙ্করায়নে একসাথে সমাজবদ্ধ হয়ে চলার সংকল্পে মানুষ তার সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। তাতে লেগেছে গতির ছোঁয়া। গতিরই তো অন্য নাম জীবন। গতির উত্তরণেই প্রগতি।

জীবন যা দেখছে তার অনুকরণ অনুসরণ করেই গড়ে তুলেছে সংস্কৃতির আবহমান ধারা। ধারা থেকে ধারাবাহিকতা এক একটি অঞ্চলকে পুষ্ট করেছে, গড়ে তুলেছে পারম্পর্য ও তার ঐতিহ্য। তেমন করেই কথা বলার স্বরকেই গানের সুরে রূপান্তরের এই যে প্রবহমান প্রক্রিয়া, এতো প্রকৃতির পাঠশালা থেকেই মানুষ একদিন আহরণ করেছে এবং এভাবেই বিভিন্ন জনপদে গড়ে তুলেছে ভিন্ন ভাষা, তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা, যাকে ভিত্তি করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন আর কল্পনার বাস্তবায়ন তাকে অগ্রগতির সোপান বেয়ে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। সেটা কেমন? ভাল কি মন্দ তার মাপকাঠি কারো হাতে নেই। যুগের দাবি অনুযায়ী কতগুলি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা সম্পাদিত হয়েছে। সেই পদ্ধতিগত সংস্কারে আছে বৈচিত্র্য ও মেনে চলার অভ্যাস। সমাজ বাড়ছে, যৌথ জীবনের মর্মমূলে আছে তাই নানা ধর্ম। ধর্ম একটি শৃঙ্খলা ছাড়া কি? কোনো ধর্মে কঠোর কঠিন অনুশাসন, কোনো ধর্ম পরবর্তী সময়ে চেতনার স্ফুরণে, প্রয়োজনে অনমনীয়তা পরিহার করে সহজিয়া পথের পথিক। অর্থাৎ যুগে যুগে প্রয়োজন মত মানুষের কল্যাণে ভেঙেছে গড়েছে। সকল ধর্মের মূলেই রয়েছে কল্যাণকামী ভূমিকা। তাতে আছে আকার-নিরাকারের প্রশ্ন। অথচ বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তারা বা নিরীশ্বরবাদীরা মানবিকতাকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন।

বিভিন্ন জনপদে বিচিত্রতর মতবাদের মানুষেরা তার সংগীত সংস্কৃতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন চিরন্তন এক মরমি মনের ভাষা। আঞ্চলিক সুর-ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয়ে গোটা সমাজকে চালনা করেছে। যেখানে মানুষ সেখানে ধর্ম আচার বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডার, তার টিকে থাকার অন্যতম শক্তি সেই জনপদের গান ক্রমে হয়ে উঠেছে জনতার গান।

একসময় শঙ্কা ছিলো যুগপ্রগতি আর বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের ফলে গ্রামজীবন যেভাবে শহর-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, তাতে তার মূল সংস্কৃতি আর বোধ হয় রক্ষা করা যাবে না, তার সুস্থিতি নষ্ট হবে। সর্বাংশে রক্ষা করা যে যায়নি, তা তো তার বিচ্যুতিতেই স্পষ্ট। তবে তা বিবিধ কারণেও। লোক-সংগীত এখন গ্রামীণ পরিবেশ ছেড়ে শহরে চর্চিত হচ্ছে বেশি। এর জন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার ভূমিকা আছে নিশ্চিতই। বলা ভালো কলকাতাই বাংলা লোকসংগীত সংস্কৃতি চর্চার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা যাঁরা গ্রামে বাস করে লোকসংগীত চর্চা করতেন, লোকসংগীত সাধনাই যাদের জীবন জীবিকার স্বপ্ন ছিলো, স্থানীয়ভাবে যাঁরা জনগণের স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হয়ে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ ব্যাপ্ত পরিধির মোহে, উন্নত জীবন-জীবিকার তাগিদে শহর কলকাতায় এসে যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন এ কথা সুবিদিত। কেননা, কলকাতায় আছে আকাশবাণীর ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে দেখা-শোনার যুগপৎ নবপ্রযুক্তির সাক্ষর দূরদর্শন-ভবন, রেকর্ড-ক্যাসেটের শত-কোম্পানি, মঞ্চ, হলো কত কি!

সেখানে দৈনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিচিত্র রসের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি। এ ছাড়া নিজের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দেবার এবং চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডি-ভিসিডি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার এই বিশাল আয়োজন ও প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা শক্ত। এ সুযোগ গ্রামে নেই। সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপেক্ষা করে গ্রামে পড়ে থাকা অর্থহীন।

অন্যান্য গানের তুলনায় লোক-সংগীতের বাজার ভালো, পরিধিও বিস্তৃত। শহরে যেমন, প্রত্যন্ত গ্রামেও তার চাহিদা বহুল। বিদেশেও 'হোমসিক' বাঙালির সব ছেড়ে একাকী অবস্থানে নস্টালজিয়া তৈরিতে লোকগানের জুড়ি নেই। তাতে নাড়ির টান অনুভূত হয়। লোকগানের শিল্পীদের বারংবার বিদেশযাত্রা সে কথাই প্রমাণ করে। বেচাকেনার বিস্তৃতির পৃষ্ঠপোষণায় গ্রামের মানুষ যথেষ্ট উদার। প্রত্নসম্পদের চাইতে পণ্যসম্পদরূপে এর চাহিদার এই মূল্যায়ন করে নিয়েছেন কোম্পানির কর্তারা। এরূপ পদক্ষেপে ছোট ছোট কোম্পানিগুলিই পথ-প্রদর্শক। ব্যানার-বেইসড় বড় কোম্পানিগুলি ক্রমে বাজার দখলের লড়াইয়ে নিজেদের সামিল করে নিয়েছেন। শহরের ছোট্ট পরিধি ভেঙে গ্রামে নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিলে মুনাফায় ঘাটতি হয় না।

ক্যাসেট কারবারি যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাজারে যোগান ঠিক রাখতে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে মৌচাকের মতই স্টুডিওর জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে ডবল-শিফ্‌টে দিনরাত ডিজিটাল্-কম্পিউটিং সিস্টেমে রেকর্ডিং ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে। ডাবিং-মিক্সিং-এর সুচারু ক্রিয়া কৌশলের রাজসূয় কর্মযজ্ঞ লেগেই রয়েছে। ডেট পাওয়া ভার। লাইন লাগানো শিল্পীরা গুণগত মানের নিরিখে (?) অনুমোদিত হচ্ছেন কেউ কেউ কোম্পানির কবলে থেকে। যাঁরা পারছেন না, নিজের সম্ভাবনার কথা ভেবে পকেট থেকে টাকা ঢালতেও কার্পণ্য করছেন না। সংক্রামক ব্যাধির মত এই ব্যবস্থার হার বাড়ছে। যাবতীয় খরচ-পত্তর শিল্পীরা

অক্লেশে দিয়ে প্রলোভনের ফাঁদে পা-রাখছেন। লটারি খেলার মত একবার যদি গান লেগে যায় বা ধরানো যায় কোন কৌশলে, তবে ভবিষ্যতের বুনিয়াদ বেশ পোক্ত ভিতের ওপর গড়ে উঠতে পারে। পারে বৈকি! কথায় বলে স্বপ্নের পোলাউ রান্নাতে যত খুশি ঘি ঢালা যায়! অথচ কোম্পানিগুলি বসিং-অ্যাটিচুড দেখিয়ে বেশ বলেন, বিক্রিপাটা নেই। পার্টির থেকে টাকা না নিয়ে উপায় কি? ব্যাপারটা সাধারণ্যে গোপন রাখা হতো। কিন্তু বিক্রি না-হওয়া গানের শিল্পীরাই তখন কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে তৎপর হয়ে পড়েন। কেননা, এতোগুলো টাকা তো তাঁকেই যোগান দিতে হলো। পি-এফ লোন সেভেন্টি পার্সেন্ট তুলেছেন অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে—তা কে জানে? (এটা পুরুষ শিল্পীর ক্ষেত্রে)। মহিলা শিল্পী যিনি লাইনে নবাগতা, তাঁর ক্ষেত্রে স্বামীর প্ররোচনা থেকেই—অর্থাৎ একবার বাজিমাৎ করতে পারলে অল্ইন্ডিয়া কেমন! আটকায় কে? তাতে বিয়েতে পাওয়া গহনা ও ব্যাঙ্কের ডিপোজিটে হাত পড়ে, পড়ুক না। ফাংশনের রেট বাড়িয়ে একবছরে দ্বিগুণ উত্তল হয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার নয়।

হে স্বপ্ন বিলাসীগণ ভেবে দেখেছো কি, তোমাকে ঘিরে যে রেকর্ডিং-এর ব্যাপক আয়োজন, সেখানে তোমার ভূমিকা অতি নগণ্য! খরচাপাতি সব তোমার, যেহেতু তুমি কনভেনার, অথচ নেপোয় মারে দই!

আনুমানিক হিসাব

১. স্টুডিও ভাড়া তিন শিফ্ট : (ট্র্যাক-ডাবিং-মিক্সিং)	৯,০০০·০০
২. দশজন যন্ত্রী (কমপক্ষে) :	১০, ০০০·০০
৩. ইন্লে কার্ড :	৪,০০০·০০
৪. টি-লাঞ্চ স্ন্যাকস :	২,০০০·০০
৫. ট্যাক্সি ভাড়া :	২,০০০·০০
৬. বিবিধ খাতে :	১,০০০·০০
৭. যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনা :	১০,০০০·০০
৮. পাঁচশ পিস্ ক্যাসেটের দাম :	১৫,৫০০·০০
(অর্থাৎ বিক্রির দায়ভার)	৫৩,৫০০·০০

সব শুদ্ধ ৫৩,৫০০ হাজারের ধাক্কা।

এখন ইলেকট্রনিকের যুগ। পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন প্রযুক্তি এসে গেছে, সেই মত বদল তো হতেই হবে। ফ্ল্যারিটি আনতে হবে রেকর্ডিং-এ। ক্যাসেট, সিডির যুগে গানের সংখ্যা দুই থেকে দশে উত্তীর্ণ হয়েছে। গানের ভাষা-সুরেও অভিনবত্ব আরোপ আর স্টান্ড-গিমিক-এর খেলা তো থাকবেই। এক্সপেরিমেন্টশনের ল্যাব থেকে যা আসছে আপনাদের তা অগোচর বা শোনার বাইরে থাকার কথা নয়। গানে গ্রান্জার আনতে গেলে এই প্রতিযোগিতার যুগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অনেক সুদক্ষ যন্ত্রী এর ফলে আমরা পেয়েছি, এটা গৌরবের বিষয় বৈ-কি! বিদেশী যন্ত্রে পারঙ্গমতা অর্জন নিশ্চিতই শ্লাঘনীয়। শুধু বাঁশি, দোতারা, একতারা, মন্দিরা, খঞ্জরীতে আর

লোকগানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নেই। তাতে অন্য শ্রেণীর গানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। যেভাবেই হোক গান বাজারে ধরাতে হবে। শুরু হয়ে গেল ফোক-ধামাকা আর ফোক-হাঙ্গামা।

এসব দেখেশুনে গ্রামের গান পল্লীগীতি এখন লোকগীতি, লোকগান, লোকসংগীতের অভিধা পেয়ে গেছে এবং জায়গা ছেড়ে পালিয়েছে। নিরুদ্দেশ যাত্রাতেই তার সান্ত্বনা। এখন আমরা এরকম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হাঁটছি। উপরন্তু ফিউশন আর ব্যান্ডের ঘেরাটোপে লোকসংগীতের স্বতঃস্ফূর্ততা বা চরিত্র বা সংবেদনশীলতা কতটা অবশিষ্ট আছে, তাতেই প্রকট হয়ে আছে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। শিল্প-টিল্প নেই, নেই তেমন নীতিবোধ, বিচারবোধ। আছে উগ্র-উচ্চকিত ৬৫-ডেসিব্‌ল ভঙ্গের আস্ফালন, কুশলী বিপণন, অর্থহীন চটকদার বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞান-বিজ্ঞাপনের হাত ধরাধরি করে চলা। তাই লোকগানে জাতপাতের বিচার না করাই ভালো। ভূমি সন্তান বা সন অফ দ্য সয়েল ছাড়া লোকগীতির যথার্থ পরিবেশন হয় না, এ সব থিয়োরি বস্তা-পচা, অচল হয়েছে অনেক দিন।

তিন

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সংগীত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে ফোকসঙের পূর্ণ মাস্টারডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। এটি সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ। সংগীতে বিভিন্ন শাখায় সুসংগঠিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতা বিষয়ে অনেকে উষ্মা প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু মনে হয় তা অমূলক। লোকসংগীতের পাঠ নিতে শহরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষার্থীরা আর কোথায় যেতে পারেন। শিক্ষিত মানুষের হাতে আগামী দিনে লোকসংগীতের দায়িত্ব আসা খুব জরুরি। গ্রামীণ শিল্পীরা অনেকেই এখন শহরের বাসিন্দা। তাঁদের অনেকেই ঐসব প্রতিষ্ঠানে গান শিখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রাণরক্ষার এর চেয়ে সুরক্ষিত নিরাপদ স্থান আর কোথায়? পঠন-পাঠন রীতির সঙ্গে সংগীত ব্যবস্থাটি যুক্ত হওয়ায় সুফল এটুকুই যে, গ্রাম্য সংগীতের মূল কাঠামো বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা এতে কমে যেতে পারে। ব্যবস্থাটির পত্তন বেশি দিন না হলেও, ফল সুদূরপ্রসারী এবং নির্ভরযোগ্য হতে পারে। কেননা, লোকসংগীতের ঐতিহ্য, পরম্পরা, পটভূমি, ভাষানীতি, আঞ্চলিকতা, সুরের বিশুদ্ধতা, বাগ্‌ভঙ্গি, কণ্ঠের কিছু প্রযুক্তিগত কৌশল বা টেকনিক্যালিটিস সম্পর্কে এইসব প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থীরা যতটা ওয়াকিবহাল হতে পারবেন, গ্রামে লোকগীতি চর্চাকারীদের সে সুযোগ অনেক কম। যেহেতু বিষয়টি হল অ্যাকাডেমিক। তবে সে শিক্ষা প্রণালী আরও থিয়োরি-ওরিয়েন্টেড হতে হবে। পাঠ্যক্রম হতে হবে শক্ত সবল। শিক্ষাদানে নিয়োগ করতে হবে নিপুণ শিক্ষক, যিনি উপপত্তিক এবং ফলিত দু'শাখায় পারঙ্গম। যদিও লোকসংগীতে মেথডিকাল বা প্রণালীগত শিক্ষা ছিলো না। শুনে শুনে ওরাল ট্রাডিশানের মাধ্যমে তা আত্মস্থ মর্মাস্থ করার রীতি ছিলো। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে তা না হলে কম্প্রোমাইজ করে চলতে হবে। কারণ এই যে, লোকসংগীত সংরক্ষণে, পুনরুজ্জীবনে আর প্রসারের যাবতীয়

প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতাকেন্দ্রিক। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা স্টাডি ট্যুর অথবা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে তার মূল চেহারা কেমন ছিলো তার সুলুক-সন্ধান করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর বৃত্তি দিয়ে থাকেন ফিল্ডওয়ার্ক বা ফেলোশিপের জন্য। তার অর্থ মূল্যত অকিঞ্চিৎকর নয়। কতটুকু বিচ্যুতি ঘটেছে প্রকৃত অর্থে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষকগণ তা নির্ণয় করেছেন সাধ্যমত এবং গ্রন্থাদিতে তা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রের দায় বর্তাচ্ছে তাঁদের উপর, যাঁরা বিষয়টি নিয়ে যথার্থ শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁরা মনোযোগী হয়ে এ কাজে ব্রতী হলে সুর-বিচ্যুতি, সুরকাঠামো সব কিছুই পুনরুদ্ধার সম্ভব হতে পারে।

গ্রামের মানুষ গাইতে পারেন, গায়করূপে স্বীকৃতিও পান। তাঁদের গানে গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলি স্বতোৎসারিতভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু শহরের শিল্পী বা শিক্ষার্থীদের আত্মস্থ করার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানির্ভর। যে কোনো সংগীত শিক্ষা লাভ করতে তার সূত্র, উৎস, ধারাবাহিকতা, পরম্পরা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সচেতনতা প্রয়োজন, গ্রামীণ গায়কদের গানের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা আশা করা যায় না। তাঁরা শুধু আঞ্চলিক গানের পরিবেশক মাত্র। তারা নিজের সংগীত-পরম্পরা বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন। শুধু গায়করূপে তার পরিচিতি ও পরিপূর্ণতা।

পরোক্ষ অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাঁদের দ্বারা শিল্পটির অবক্ষয় ও ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়, রোধ করা যায় নবায়নের যথেচ্ছাচার। কনভেনশন ভাষার উন্মাদনায় এবং এক্সপেরিমেন্টশনের জন্য লোকশানের অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয় বলে এতো রূঢ় কথার অবতারণা করতে হলো। লোকগীতির খোল নলচে পাল্টে বিদঘুঁটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি সমর্থনযোগ্য? ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব যাঁরা পালন করছেন, তাঁরা নিশ্চিতই বিষয়টির পূর্বাপর ভেবে দেখেন নি। ক্রিয়াত্মক এই শিল্পে কতিপয় গবেষক পণ্ডিত জনের মধ্যে সীমায়িত থাকার ফলে, গ্রন্থ পৃষ্ঠা থেকে সেই অমূল্য রত্নরাজি বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারলো কই?

চার

সম্প্রতি গ্রামীণ গানের শিল্পীদের পরিবেশিত গানে শব্দ উচ্চারণে-প্রেক্ষাপণে গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে হঠাৎ-করেই একটি কৃত্রিম শৈলীর প্রতি নির্ভরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। উচ্চারণজনিত নবধারায় পরিশীলিত বা বিকৃতভাবে শব্দ উচ্চারণের এই অপগুণের পরিচয় আপনারা পেয়ে থাকবেন হয়তো। এইসব মুদ্রাদোষগুলি বেড়ে ওঠে ক্যাসেট-অ্যালবামে সাফল্য লাভের পর। প্রথমাবস্থায় এই দুর্লক্ষণগুলি ততটা প্রকট হয়ে ওঠে না। শিল্পী মনে করেন এটাই তার আইডেনটিটি। শহরে জন্মকর্ম অথচ লোকগানের ধারক সেজে বিশিষ্ট কোনো লোকসংগীত শিল্পীর ভেংচিকাটা ও নিজস্বতায় জন্ম নেয় বকচ্ছপ জাতীয় কিছু অপগুণ। চেষ্টা করলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু যদি সে কারণেই প্রমাদ ঘটে? অতএব ...

অথচ শহরে বসবাসকারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই সংক্রমণ নেই বললেই চলে। এটা তো একটা শিল্প, তাই তার গুণাগুণের প্রতি

লক্ষ রাখার, অবিকৃতভাবে পরিবেশন করার দায়িত্ব তো পরিবেশনকারীর। ধার করা কণ্ঠের পরিবর্তে নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বকীয়তায় সহজ সরল অনায়াসভাবে পরিবেশনে এবং নিজস্ব পরিচিতি প্রদানে প্রকাশে ও রক্ষায় অনেকটা আত্মবিশ্বাসী মনে হয় এঁদের।

অ্যাকাডেমিক হওয়ায় শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘরানা মুছে যাওয়ার মতই গ্রামে গিয়ে লোকগীতির কার্যকারিতা অনুধাবনের দিন ফুরিয়েছে। প্রশ্ন উঠবে ঐতিহ্য সংরক্ষণে কারা হবে নির্ভরযোগ্য? শিল্পগুণ সমন্বিত এই ধারা সাধারণ্যে প্রকাশ করতে গেলে কিছু পূর্ব ধারণা থেকে সরে আসতে হবে। গ্রাম থেকে সংগ্রহযোগ্য গান তুলে এনে অঞ্চল-স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে ছিমছাম পরিবেশনই হবে এই পদ্ধতির অনুকূল প্রয়াস। বিনা কারণে তার মেঠো রূপদানই বরং গ্রাম্যসংগীতকে বিকৃত সামঞ্জস্যহীন করে তুলতে পারে।

এ কাজ পণ্ডিত জনের না, রসিক শ্রোতা এবং পরিবেশকের মেল বন্ধনে গড়ে উঠতে পারে। শ্রোতার হাতেই শিল্পীর গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা নির্ভর করে, তাই শিল্পীকেও তার পেশাকে সম্মানিত করতে গেলে কিছুটা আরও ডায়নামিক হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব সংগ্রহ ভাণ্ডারকে সুসংগঠিত বর্ধিত করতে হবে। তা না হলে 'লীলাবালী' আর 'সোহাগ চাঁদ বদনী' কিম্বা 'কাদা দিলি সাদা কাপড়ে'র মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে।

ম্যানারিজম বা মুদ্রাদোষের কারণে চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠদানেও এঁদের ডাক পড়ে না, সেখানে তথাকথিত আধুনিক গানের শিল্পীদের দক্ষতা বহুবার প্রমাণিত। সমকালীন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে পরিপূর্ণতা আনা শুধু সুরে তালে রয়ে গান করলেই গড়ে ওঠে না। স্পষ্ট বাচনভঙ্গি গানের অন্তর্নিহিত ভাব এবং নির্যাসটুকু তুলে আনার দক্ষতাও এর সঙ্গে ওতপ্রোত। গুণগত, বিষয়গত, মানগত পণ্য সম্পদরূপে, আবার শিল্পশোভন নান্দনিক চেতনায় সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করতে পরিশ্রম এবং ম্যাচিওরিটির ভীষণ প্রয়োজন, তবে গান হৃদয়স্পর্শী হতে পারে। মস্তিষ্ক ও উপলব্ধি যে কোনো সংগীতের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

কথা হচ্ছে, লোকগানের শিল্পী ব্যতিরেকে অন্য স্ট্রিমের শিল্পীরা চলচ্চিত্রের লোকায়ত পরিবেশের গানে এতোটা মানানসই হয়ে পড়েছেন কী করে? উত্তর একটাই। অতীত মানদণ্ডে তখনকার মত বিশ্লেষণ করলে, বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করা হবে, উত্তরণের মসৃণ পথ তৈরি হবে না কোনদিন।

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্বেষ থেকে মৈত্রী : বাংলা নাটকে সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মলগ্নে (১৮৫২) হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তা তীব্র আকারে প্রকাশিত হয়নি। আসলে এইকালে মুসলমান সমাজ নানা কারণে নিজেদের অনেকটাই গুটিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে স্বার্থের সংঘাত তেমন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। নাট্যকাররাও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের আলাদা কোন তাগিদ অনুভব করেননি।

অবস্থাটা খুব দ্রুত পাল্টাতে আরম্ভ করল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্র মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। এই-সময়েই হিন্দু-মেলার জন্ম (১৮৬৭)। এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু জাতিকে একত্র করা। অনেকটা যেন এরই সূত্র ধরে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে এসে একদিকে মাথা চাড়া দিল 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন', অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা। এই জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দুত্বের গাঢ় রঙে রাঙানো। এই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা মুসলমানদের কথা কতখানি ভেবেছিলেন বা আদৌ ভেবেছিলেন কী না, তা ঐতিহাসিকরাই বলতে পারবেন। আমি ঐতিহাসিক নই, সাহিত্যের ছাত্র, অনধিকার চর্চা করার ধৃষ্টতা দেখাবো না। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে করিয়ে দেব—উনিশ শতকের আশির দশক থেকে বাঙালি ভদ্রলোকেরা আর্যগৌরবে মত্ত হয়ে উঠলেন। আর্যসন্তান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পেরে তাঁরা ধন্য হয়ে গেলেন। হিন্দু-আর্য গৌরবের যে আবেগ তাঁদের অভিভূত করল, তাই আবার তাঁদের গৌরবহানির জন্য মুসলমানদের দায়ী ও চিহ্নিত করতে প্রাণিত করল। এর প্রভাব ভীষণভাবে পড়ল বাংলা নাট্যসাহিত্যে।

জাতীয়তাবাদ এবং আর্য গৌরবে মত্ত নাট্যকাররা মুসলমানকে ধরে নিলেন বিদেশি আগ্রাসক হিসেবে। ভারতের পরাধীনতা, দুঃখদৈন্য সবকিছুর জন্য মুসলমানরাই দায়ী এমন একটা ধারণা নাটকে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবো। একালের প্রখ্যাত নাট্যকার হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' (১২৮১, ১৮৭৪) নাটকে লক্ষ্মণ সেন বিধাতার কাছে আক্ষেপ করে বলছেন—

> আর্যজাতিশ্রেষ্ঠ, হিংসা বিদ্বেষশূন্য ধর্মপরায়ণ বাঙালি-জাতিকে পরাধীন, স্বেচ্ছাধীন, স্বেচ্ছপ্রপীড়িত স্বেচ্ছ-পদদলিত হওয়ার জন্য কি সৃজন করেছিলে?

এই বছরই কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ভারতে যবন' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ভারতসন্তান-এর মুখে নাট্যকার এই ধরনের উক্তি বসাতে ইতস্তত করেননি—

> যবনগণের ন্যায় প্রজাপীড়ক অবিশ্বাসী, নৃশংস রাক্ষস আর দ্বিতীয় নাই,
> ... দুরাত্মাগণের ন্যায় অর্থলোভী পিশাচ আর নাই।

মুসলমানরা 'আল্লা হো' ধ্বনি দিতে দিতে লুঠ করছে, নারীর লাঞ্ছনা করছে তাও দেখাতে নাট্যকার ইতস্তত করেননি। মনে প্রশ্ন জাগে এমন একটি বিদ্বেষপূর্ণ নাটক কেন কিরণচন্দ্র রচনা করলেন। উত্তরটা কিরণচন্দ্রের ভাষাতেই শোনা যাক— "যবনগণের উপর আর্যসন্তানদিগের 'বিজাতীয় ক্রোধ' এ নাটক পাঠে কিছুটা প্রশমিত হবে।"

শুধু কিরণচন্দ্র কেন, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। উচ্চশিক্ষিত এই মানুষটি মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৮৭৫-এ মহম্মদ ঘোরির ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় তিনি রচনা করেন 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে'। নাটকটিতে মুসলমানদের নিরীহ অসহায় হিন্দুদের হত্যা করার উল্লাস ও নারী লাঞ্ছনার অলজ্জ বর্ণনা আমাদের ব্যথিত করে। নাটকের একটি গানে এই ধরনের বাসনা প্রকাশিত—

> জনম ভূমির হৃদয়েরি শূল
> তুলিব যবনে করিয়া নির্মূল।

মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশে অনেককে ছাড়িয়ে গেছেন প্রমথনাথ মিত্র। তাঁর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'জয়পান'-এর নায়ক জয়পান—'আমি মুসলমান ধর্মে পদাঘাত করি'—এমন কথা বলতে ইতস্তত করেননি। এই নাটকের করিম এবং মামুদ এই দুটি চরিত্রকে যতখানি সম্ভব হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন প্রমথনাথ।

নাটকে এই ধরনের বিদ্বেষ প্রচার বাংলার মুসলমান সমাজ যে ভালো চোখে দেখেননি তা বলাই বাহুল্য। একদিকে যখন এইসব চলছে, অন্যদিকে মুসলমান সমাজের একাংশ তখন হয়ে উঠছেন সচেতন। ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যেমন পাল্টাচ্ছে, তেমনই পাল্টাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে মনোভাব।

শিক্ষা এবং চাকরিক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। হিন্দুদের আচার আচরণে তাঁরা যে ব্যথিত তাও দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে ইতস্তত করছেন না, কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কংগ্রেসকে (১৮৮৫) হিন্দুর প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে একে বর্জন করতেও শুরু করেছেন। মুসলমানদের এই চেতনার উন্মেষ আবার হিন্দুসমাজের একদল ভালোভাবে নেননি। নানাভাবে তা তাঁরা প্রকাশও করতে শুরু করেছেন। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতেও বাঙালি হিন্দু নাট্যকাররা কিন্তু মুসলমান বিদ্বেষ থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারলেন না। বাংলা নাট্যজগতের অবিসংবাদী নায়ক গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সৎনাম' নাটকটির কথা এই প্রসঙ্গে একটু বলে নিতে চাই।

আওরঙ্গজেবের আমলে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এ নাটক রচিত। বৈষ্ণবী নামে এক রমণী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। এই নাটকে

মুসলমানদের অত্যন্ত হীনবর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে। মুসলমান সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক যে শব্দ এ নাটকে আছে—তা ভদ্র সমাজে উচ্চারণের যোগ্য নয়। আওরঙ্গজেবকে এখানে অতি কুৎসিতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। তিনি যেখানে যত হিন্দু আছে সবাইকে হত্যা করার আদেশ দিচ্ছেন। লক্ষ কাফেরের শিরশ্ছেদ করে তার ওপরে মন্দির বানানোর হুকুম দিচ্ছেন তিনি। নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৯০২ সনে, মুদ্রিত হয় ১৯০৪ সনের ৫ই মে এটি মুদ্রিত হয় এবং সেই মাসেই ক্লাসিক থিয়েটারে নাটকটির অভিনয় শুরু হয়।

কিন্তু তিনদিন অভিনয়ের পর ২১শে মে, ১৯০৪ 'চতুর্থ রজনী'তে মুসলমান সমাজ এই ধরনের নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে ক্লাসিক থিয়েটারে বিক্ষাভ জানান। যার ফলে বাধ্য হয়ে এ নাটকের অভিনয় বন্ধ কারে দিতে হয়। অত্যন্ত বিব্রত আত্মপক্ষ সমর্থনে গিরিশচন্দ্র জানান—

> মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণ ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত,... হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে আমরা এক হিন্দুস্থানবাসী সুখ দুঃখের অংশী। অতএব পূর্বকালে হিন্দু মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোন জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

শুধু এটুকু লিখেই থেমে গেলেন না তিনি, রাতারাতি মত এবং পথ দুই-ই পাল্টে ফেললেন। সে কথায় পরে আমরা আসবো।

উনিশ শতকের নাট্যকাররা সবাই মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মধুসূদন, দীনবন্ধু এঁদের নাটকের মুসলমান চরিত্রগুলি যে অপরিসীম মমতায় চিত্রিত তাও আমরা জানি। এমনকি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকাররাও হিন্দু মুসলমানের মিলনবাণী উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখতেই পারি। হিন্দু মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই মানুষটি বিশ্বাস করতেন হিন্দুই হিন্দুর আশা ভরসা। তাঁর 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' নাটকের ভৈরবাচার্য যে আসলে মুসলমান একথা জানার পর থিয়েটারে উপস্থিত দর্শকদের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া—বিনোদিনীর আত্মজীবনীর কল্যাণে আমাদের সকলের জানা। এর বছর চারেক পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেন 'অশ্রুমতী'। প্রতাপসিংহের (কল্পিত) কন্যা অশ্রুমতীর সঙ্গে সেলিমের প্রেম এই নাটকে বিরাট একটা অংশ অধিকার করে আছে। ভিন্ন ধর্মীর দুই যুবক-যুবতীর সংলাপের কিছুটা উদ্ধার করছি—

> সেলিম—অশ্রু... আমি তোমায় যতদূর ভালবাসি, যতদিন না আমি দেখি তুমি আমাকে ততদূর ভালবাস, ততদিন আমি বিবাহের নাম পর্যন্ত করবো না।
>
> অশ্রুমতী—(সজল নেত্রে) সেলিম, সেলিম, কি বললে সেলিম? তুমি যতদূর ভালবাস আমি ততদূর ভালোবাসিনে! তুমি কতক্ষণে এখানে আসবে, কতক্ষণে তোমাকে দেখব, এই আশায় সমস্ত দিন যে আমি

তোমার পথ চেয়ে থাকি—রাত্রেতে যখন ঘুমুই তখন তোমাকেই যে
স্বপ্নে দেখি—তোমাকে দেখলে বাপ-মার কষ্ট পর্যন্ত ভুলে যাই—
সেলিম—না অশ্রু, তুমি কেঁদোনা—তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ের
রক্ত। আমি এখন বুঝলাম, তুমি আমাকে ভালোবাস। ...

নিজের কাকা শক্তসিংহকে অশ্রুমতী অকপটে নিজের ভালবাসার কথা বলেছে। সেলিমকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছে শুনে শক্তসিংহ যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখনও সে বলেছে—

—মারো কাকা, হৃদয় পেতে দিচ্ছি মারো—আমি সেলিম ভিন্ন আর
কাউকে ভালবাসতে পারব না।

নাটকটি সেকালে অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে আহত করে। প্রতাপসিংহের কন্যা একজন মুসলমানকে ভালবাসেন—এটা ভাবতেও সঙ্কোচ হয়েছিল তাঁদের। নাট্যকারকেও রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। তবু হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্তপ্ত মুহূর্তে রচিত এই ধরনের নাটক যে বাঙালি মানসিকতার পরিবর্তনের আভাস দেয়, একথা আমরা বলতেই পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই নাটকটির সমকালীন প্রতিক্রিয়ার তুলনা করলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের মিল চোখে পড়বেই।

আগেই বলেছি, মুসলমান সমাজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। এখানে ওখানে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত। ১৮৯৭-এর ৩০শে জুন কলকাতার টালা অঞ্চলে একটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমির ওপর স্থানীয় মুসলমানরা একটি চালাঘর নির্মাণ করে তা মসজিদ হিসেবে চালাতে চায়। আদালতের রায়ে তাদের দাবি নাকচ হয়ে যায়। যতীন্দ্রমোহনের লোকজন জমির দখল নিতে গেলে দাঙ্গা শুরু হয়। সরকারি হিসেব মতো এই দাঙ্গায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত ও বহুসংখ্যক আহত হয়। যদিও প্রকৃত সংখ্যা ছিল এর অনেক বেশি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেন 'টালা অভিনয়' নামে একটি (প্রহসন) নাটক। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরীর সৌজন্যে এই নাটকটি দেখার সুযোগ পেয়েছি। চক্রান্তকারীরা কিভাবে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বিনষ্ট করে এবং উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা বাধায় মশাররফ তা দেখিয়েছেন। এই দাঙ্গার জন্য মুসলমান সমাজের দায়িত্বই যে বেশি তা দেখাতেও ইতস্তত করেননি, কুণ্ঠিত হননি তিনি। বিরোধ নয়, মৈত্রীই যে জাতীয় উন্নতির এক এবং একমাত্র উপায় তা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন তিনি।

নাটকটিতে একটি কল্পিত রাজ্যের ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। সেখানে প্রথম দৃশ্য শুরুই হচ্ছে এক মৌলবীর এই স্বগতোক্তি দিয়ে—

এলাহি। হিন্দুমুসলমানে মিলন কর। উভয়ের মনের মলিনতা দূর কর।
... তাহাদের মায়া আমরা বুঝি, আমাদের মায়ামমতা তাহারা বুঝুক।
উভয়ে এক হই—ধর্ম্মে ভিন্ন হোক, কর্ম্মে এক হওয়া চাই।

একইভাবে নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যে কালিঘাটের মন্দির-পাশে এক হিন্দুভক্ত (বিদ্যারত্ন) কালীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন—

> মা! রক্ষা কর।... হিন্দুমুসলমানে মনে মনে মিলন কর। ... উভয় জাতির প্রতি সদয় হও। আরও না হয় স্বদেশীয় বলে একটি সম্বন্ধ হক। ... তোমার উভয় জাতীয় সন্তানের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখিও।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অন্য একটি সাধারণ চরিত্র বলেছে—

> ভাইরে আমরা মুসলমান, এক গ্রামে এক পাড়ায় বাস করি। তাদের সাহায্য আমরা করি, আমাদের সাহায্য তাহারা করে, তাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া বিবাদ করিতে পারি না।

শুধু স্বার্থান্বেষীরাই নয়, রাজশক্তিও এই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভেদনীতি কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। এই সংকটকালে বাঙালি নাট্যকাররা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা নতুন করে অনুভব করলেন। স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে বাঙালিকে উজ্জীবিত করতে নাট্যকাররা তৎপর হয়ে উঠলেন। পথ দেখালেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ১৯০৩-এ প্রকাশিত হলো 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য'। যুগ ও জাতির প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রতাপাদিত্যকে নতুন রূপে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। এই প্রতাপাদিত্য শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনদানে প্রস্তুত তাই নয়, হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী স্থাপনেও কৃত-সংকল্প। নাটকের এক জায়গায় তিনি বলছেন—

> ভাইসব তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর সীমাবৃদ্ধি করো। হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরসসিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবাকার্যে প্রতিযোগিতায়, বার্ধক্যে আত্মীয়তায়— এসো ভাইসব—আমরা এক প্রাণে, এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। ... মাতৃসেবাকার্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই—

শুধু প্রতাপাদিত্য নয়, এই নাটকের আর এক চরিত্র ইসা খাঁও বলেছেন—'বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙালির।'

যে পথ দেখালেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, সে পথেই চলতে শুরু করলেন গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল বসুর মতো প্রখ্যাত নাট্যকাররা। 'সৎনাম'-এর লেখক গিরিশচন্দ্রের হাত দিয়ে বেরোলো 'সিরাজদৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'-র মতো নাটক। বঙ্গভঙ্গের উত্তপ্ত মুহূর্তে প্রকাশিত হয় 'সিরাজদৌলা'। লেখার আগে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বই পড়ে গিরিশচন্দ্র নিজেকে প্রস্তুত করেন এবং বিদেশিদের আয়োজিত সমস্ত অপবাদ খণ্ডন করে প্রজাবৎসল সিরাজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। গিরিশচন্দ্রের সিরাজ শুধু প্রজাদরদিই নন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনেও তৎপর। দুই সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

> ওহে হিন্দু-মুসলমান

এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;
হই বিস্মরণ পূর্ব বিবরণ;
কর সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জন।...
বঙ্গের সন্তান হিন্দু-মুসলমান
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ।
তোমা সবাকার যাতে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।

এর পরের বছর প্রকাশিত 'মীর কাসিম'। মিনার্ভায় সাত মাস ধরে এই নাটকটি চলে, আয় করে লক্ষাধিক টাকা। ইংরেজের অত্যাচারে হিন্দু-মুসলমান যে সমভাবে বিপন্ন তা তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। দেশ ও জাতির স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কতখানি প্রয়োজন তা এই নাটকে 'জহরা'-র মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন—'যদি বাংলার হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র স্নেহ থাকতো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকত, তাহলে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করে।' বাংলার শোচনীয় অবস্থার জন্য যে ইংরেজের ভেদনীতিই দায়ী তা এই নাটকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

এমনকি এইকালে শিবাজীকে নিয়ে যে নাটক তিনি লেখেন তাতেও যুগের প্রয়োজনে শিবাজী চরিত্রকে নতুন রূপ দেন। গিরিশচন্দ্রের 'শিবাজী'-র কাছে মুসলমানরাও সন্তানতুল্য, পুত্রের মতোই আদরণীয়। স্বাধীন মহারাষ্ট্রে যে ধর্মভেদ, হিন্দু মুসলমানে ভেদ থাকবে না তা তিনি তাঁর প্রজাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

একালের নাট্যকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভূমিকা সর্বজনখ্যাত। কালজয়ী এই নাট্যকার শুধু স্বাদেশিকতার বাণীবাহকই নন, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচারেও ক্লান্তিহীন। তাঁর সম্পর্কে বেশি কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরঙ্গজেব যখন দিলির খাঁ-কে জিজ্ঞেস করেছেন, হিন্দু-মুসলমান কি কোনোদিন এক হবে—তখন দিলির বলেছেন—

> কেন হবে না। তারা এতদিন একই আকাশের নিচে, একই বাতাস সেবন করে একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে এসেছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয়নি! তারা একবার ধর্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তিবাষ্প গদগদস্বরে এই শ্যামলা সুফলা ভারতভূমিকে একাবর প্রাণভরে মা বলে ডাকুক দেখি।

এই সময়েই রচিত 'সাজহান' নাটকেও সাজাহান কর্ণ সিংহকে বলছেন—'কর্ণ সিংহ আজ থেকে আমরা দুই ভাই। আর হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।' দ্বিজেন্দ্রলালের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার যে 'মেবার পতন'-এ অন্য এক মাত্রা পেয়েছে তা সকলেরই জানা।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চমদৃশ্যে মহাবৎ খাঁ-র স্ত্রী কল্যাণী তাঁর স্বামীর ছবি, ছবিওয়ালীর কাছ থেকে নিতে সঙ্কোচবোধ করেন—মহাবৎ খাঁ বিধর্মী বলে। সে সময় রানা অমর সিংহের কন্যা মানসী তাঁকে বলেন—

ধৰ্ম্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধৰ্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না! পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

এই নাটকেরই শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে রাণা অমর সিংহ যখন মহাবৎ খাঁর সঙ্গে সামনা সামনি যুদ্ধে লিপ্ত হতে যান তখন আবার সেই মানসীর মুখেই আমরা উচ্চারিত হতে শুনি—

ক্ষান্ত হৌন পিতা! সৰ্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে। সে সৰ্ব্বনাশ আর নিজের ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা আবার মানুষ হওয়া। ... বিদ্বেষ বর্জ্জন করে ... নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে দিয়ে।

নাটকের শেষে 'চারণী' যে গান গায় তাতে ভ্রাতৃত্বের সুর ধ্বনিত—

কিসের শোক করিস ভাই
— আবার তোরা মানুষ হ'।

... ...

ঘুচাতে চাস যদি রে এই
হতাশাময় বৰ্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল
ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচারক হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল যতখানি গুরুত্ব পান, অমৃতলাল বসু তা পান না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা 'সাবাস বাঙ্গালী'র কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে রচিত এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ। আবদুল শোভান নামে এই নাটকের একটি চরিত্র বলছেন—"হিন্দু আমাদের দাদা, আমরা ছোট ভাই। বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখনো হবে না। বন্দে মাতরম।"

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে মৈত্রী—বাঙালি মানসিকতার বিবর্তন আমরা খুব সংক্ষেপে নাটকের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলাম। পরবর্তী কালে সংকট যখন আরও ঘনীভূত হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে বাংলা কলুষিত তখনও কিন্তু নাট্যকাররা তাঁদের কর্তব্য বিস্মৃত হননি। পরবর্তী কালের দুই বিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দুটি নাটক থেকে তার সামান্য পরিচয় দিয়ে আমরা শেষ করব। ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা'। অসাধারণ মঞ্চসফল এই নাটকের 'নিবেদন' অংশে তিনি জানান, সিরাজের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নয়, তাঁর অসহায়তা, সহমর্মিতা এবং অন্তরের দয়াদাক্ষিণ্যই ডেকে এনেছিল শোচনীয় পরিণতি। এই নাটকের সিরাজ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। শচীন্দ্রনাথের সিরাজ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা গিরিশচন্দ্রের নাটকে অনুপস্থিত। শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নয়, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনেও তিনি বদ্ধপরিকর। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অমাত্যদের কাছে কাতরভাবে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন—

বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করিচি তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করিচি—আঘাত যা পেয়েছি, তাও মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েছি।

সিরাজের এই সংলাপ একসময় বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'টিপু সুলতান'। নাটকের ভূমিকায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন, স্বার্থপর ঐতিহাসিকরা তাঁকে ধর্মান্ধ ও পরমত-অসহিষ্ণু বললেও ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার। তাঁর এই ধর্মীয় উদারতা ও অসম্প্রদায়িক মনোভাবই নাট্যকার ফোটাতে চেয়েছেন।

মহিশূরের প্রতি মন্দির এবং মসজিদে হিন্দু-মুসলমান সমবেত করে কিভাবে টিপুর জয় কামনা করেছেন নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। দুর্দৈব নাশের জন্য টিপু একদিকে হিন্দুর মন্দিরে উপাচার পাঠিয়েছেন, অন্যদিকে প্রতি মসজিদে দিন রাত্রি ব্যাপী প্রার্থনার ব্যবস্থাও করেছেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে টিপু বলেছেন—

আমি যাই ভাই, আমার দেশ রইল, হিন্দু-মুসলমান তোমরা রইলে।

নানা তাঁকে প্রশ্ন করেন তোমার মত বীর যাকে বাঁচাতে পারল না, আমরা তাঁকে বাঁচাব কোন মন্ত্রে। উত্তরে টিপু জানান—"সে মন্ত্র—হিন্দু-মুসলমানের মিলন মন্ত্র। একা হিন্দু পারবে না, একা মুসলমান পারবে না—ত্রিংশ কোটি হিন্দু মুসলমানের ধাত্রী জননী এ হিন্দুস্থানকে বাঁচাবে—ত্রিংশ কোটি হিন্দু-মুসলমান।" হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রচারের এর চেয়ে বড় মন্ত্র আর কোনও বাংলা নাটকে উচ্চারিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইরাবান বসুরায়

সিনেমা : কী দেখি, কিভাবে দেখি

অন্য যে-কোনো শিল্পের তুলনায় সিনেমা অনেক বেশি বাস্তবের বিভ্রম তৈরি করতে পারে। সেকেন্ডে চব্বিশটি ফ্রেম এই বিভ্রমকে দেয় এক যাথার্থ্যের মহিমা, অর্থাৎ বানানো সত্যকে করে তুলতে চায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সব শিল্পই বানিয়ে-তোলা, সেই বানানোর কারিগরি সিনেমায় এতটাই দক্ষ যে যাচাই করার প্রবণতাকে তা বেশ কিছুটা সময় দমিয়ে রাখতে পারে, বদলে তৈরি করতে পারে এক বিশ্বাসের আবহ। গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে চরিত্রগুলোকে পাঠকের কল্পনায় তৈরি করে নিতে হয়, লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংঘাত-সমন্বয়ের একটা দ্বন্দ্ব সেখানে চলতেই থাকে। সিনেমায় কল্পনার সেই জায়গাটুকু নেই, চরিত্র, তাদের পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান সবই দর্শকের সামনে পরিচালক হাজির করে দিচ্ছেন, দর্শকের কাজ শুধু দেখে যাওয়া, অন্যরকম কিছু ভাবার সুযোগ তার নেই। তাহলে এই এক শিল্প যেখানে রচয়িতার কাছে উপভোক্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, দর্শকের বিকল্প ভাবনার জায়গাটা আগেই আটকে দেওয়া হচ্ছে; কেননা পর্দায় দর্শক যা দেখছে সেটা তার কাছে পৌঁছেছে এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিভ্রম নিয়ে। এবং এই বিভ্রম এতটাই শক্তিশালী যে অনেক সময় তা বাইরের জগতের চোখে-দেখা বাস্তবতাকেও অতিক্রম করে যায়।

যা যে, তার দায় অবশ্য পুরোটাই সিনেমার রচয়িতাদের নয়। দর্শকও এই বিভ্রমের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য মনে মনে তৈরি থাকেন। কেননা তাঁর একটা পালানোর জায়গা দরকার—অন্যের কাছ থেকে তো বটেই, নিজের কাছ থেকেও। দর্শক যখন সিনেমা দেখতে ঢুকছেন, বাইরের পরিবেশকে সম্পূর্ণ ভুলতে চাইছেন তিনি। আসনে দর্শক, সামনে পর্দা, বাকি সব অন্ধকার। ওই অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দর্শক একইসঙ্গে একা এবং জনতার অংশ। এখন প্রযুক্তিবিদ্যা অবশ্য সিনেমা দেখার ধরনটাকে বদলে দিয়েছে, ডিভিডির সুবাদে দর্শক আর সিনেমাহলে যান না। তাঁর ঘরে বসেই কফিতে চুমুক দিতে দিতে তিনি পছন্দমতো সিনেমা দেখতে পারেন, ছবির ধ্বনি বা ঔজ্জ্বল্য কমাতে বাড়াতে পারেন, মাঝখনে বন্ধ করে দিয়ে নিউজ-চ্যানেলে গিয়ে খবর শুনতে পারেন, ফোন ধরতে পারেন, অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে আড্ডা মেরে নিতে পারেন, এসব কিছু না থাকলেও সিনেমাটিকে ভাগে ভাগে দেখতে পারেন। সিনেমাহলে যে-দর্শক যান, তাঁর এই স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারের অধিকার থাকে না। ঘরে বসে যিনি ডিভিডি দেখছেন, তিনি একেবারেই একা, ঘরও অনেকসময় আলোকোজ্জ্বল থাকে, অর্থাৎ প্রথম থেকেই তিনি যেন কোনো বিভ্রমের শিকার হতে চান না। অর্থাৎ যিনি ঘরে বসে

ডিভিডি-প্লেয়ারে কোনো সিনেমা দেখছেন, তিনি এক অর্থে স্বাধীন, তাঁর দেখাটা তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি কিভাবে দেখবেন এবং কতটা দেখবেন, সেটা তিনি ঠিক করতে পারবেন দেখা শুরু করার পরেও। এই দর্শক যদি সিনেমাকে বিনোদন হিশেবে নিতে চান, তাহলে সে-বিনোদনের কতটুকু তিনি উপভোগ করবেন, কতটা করবেন না, এই বাছাইয়ের স্বাধীনতা তাঁর আছে বলে তিনি এক ভাবে উপেক্ষা করতে পারছেন নির্দেশকের প্রভুত্বকে।

নির্দেশকের নির্মাণকে তিনি বদলে নিতে পারছেন, অংশবিশেষ ছেঁটে দিতে পারছেন, এমনকি বিন্যাসের অদলবদলও ঘটাতে পারছেন। আর দর্শকের কাছে সিনেমা যদি শিল্প হয়, তবে সে-শিল্পকে অনুভব করার, বিচার করার অগাধ সময় তাঁর আয়ত্ত, বইয়ের মতোই তিনি তখন সিনেমাকে উল্টে পাল্টে পড়তে পারবেন। সিনেমা তাঁর ব্যক্তিগত পাঠের বিষয়। টেকনোলজির বিকাশ তাঁকে এই সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু টেকনোলজিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে এই দর্শক ভুলে যান এই দর্শন বা পাঠের প্রক্রিয়ায় তিনি একক, এবং বিচ্ছিন্ন। সিনেমাহলের অন্ধকার 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা' হওয়া নয়, নিজের ঘরে আলোর মধ্যে একা হয়ে যাওয়া। কিন্তু বই পড়ার সঙ্গে সিনেমা দেখার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। বই পাঠককে এক বাস্তব নির্মাণে প্ররোচিত করে, পাঠক তাঁর ভাবনাকে নানাদিকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। সিনেমা সে সুযোগ দেয় না, সে এক নির্মিত বাস্তবকে দর্শকের সামনে তুলে ধরে। সে-বাস্তবকে চ্যালেঞ্জ জানানো যেতে পারে, কিন্তু বইয়ের মতো পাঠকে অবলম্বন করে কোনো বিকল্প বাস্তব তৈরি করা যায় না। ওই যে নির্মিত বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে দর্শককে, তার মোকাবিলা কিভাবে করবেন দর্শক। সিনেমাহলে এই দর্শক অনেকের মধ্যে একজন, তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, তার প্রশংসা-সমালোচনা ব্যক্তিক হলেও তা এক সর্বজনীন অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসে। সিনেমাহল থেকে যখন বেরিয়ে আসেন এই দর্শক, কিংবা তার আগেই পর্দায় 'সমাপ্ত' ফুটে ওঠার পরই যখন হলের আলোগুলো জ্বলে ওঠে তখনই পর্দায় প্রতিফলিত জগতের সঙ্গে তাঁর নিজের, চারপাশের জগতের একটা বিচ্ছেদ তিনি টের পেতে শুরু করেন, রাস্তায় পা দিয়ে প্রবল আলোর নীচে একটু আলোর দেখাটাকে মনে হতে থাকে মায়া, তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁর আত্মবীক্ষণ। যিনি ডিভিডি-প্লেয়ারে সিনেমা দেখছেন তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। ওই মায়ায় মজে যাওয়ার অবকাশটা তিনি পাচ্ছেন না, তাঁর চারপাশে প্রতিমুহূর্তের ঘর গেরস্তালির চলনটা থেকেই যাচ্ছে, কখনোই তিনি তাঁর থেকে সরে থাকছেন না, ফলে তাঁর সিনেমা দেখাও ওই চলনেরই একটা অংশ হয়ে যায়। সিনেমা কোনো মায়া তৈরি করে না, কাজেই সেই মায়া ভেঙে যাওয়ারও কোনো ধাক্কা তৈরি হয় না। ফলে যে-স্বাধীনতার আনন্দ পাচ্ছিলেন দর্শক, সেই স্বাধীনতা একটা যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। সিনেমাহলে শব্দ প্রক্ষেপণের গাম্ভীর্য আর পর্দায় চরিত্রগুলির 'জীবনের চেয়ে মাপে বড়ো' উপস্থিতি দর্শককে প্রতিমুহূর্তে এক ধাঁধায় ফেলে দেয়, সম্ভব অসম্ভবের দ্বন্দ্ব দেখার সময়টাতেই এক গোপন অস্বস্তির জন্ম দেয়। আর এই অস্বস্তি, ওই ধাঁধা শিল্পের পক্ষে এক জরুরি শর্ত, আবেশ এবং আবেশ থেকে বেরিয়ে আসা এই দুই

বিপরীতমুখী সত্যের সংযোগ ও সংঘাত ছাড়া শিল্পকে অনুভব করা যায় না। একলা ঘরে বসে যিনি সিনেমা দেখছেন, তিনি দর্শক কিন্তু দ্রষ্টা নন, তাঁর দেখার পরিবেশ মানসিক সংঘাতের জায়গাটা আটকে দেয়, দিতে পারে। সিনেমা দেখার জন্য তাঁর কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না, দেখা হয়ে যাওয়ার পরও দৈনন্দিনে ফিরে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না তাঁর। হয়ত এও এক মানসিক স্বাধীনতা, যদিও সে-স্বাধীনতা শিল্প বোধের জন্য কোনো জায়গা ছাড়ে না। আসলে সিনেমাহলে সিনেমা দেখতে যাওয়া মানে দেখাটা সেখানে একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, দৈনন্দিনের রুটিনের মাঝখানে সেটা একটা অন্য অভিজ্ঞতা। আর ঘরে বসে ডিভিডি প্লেয়ারে সিনেমা দেখা ওই দৈনন্দিনেরই একটা অংশমাত্র; চায়ে চুমুক দিতে দিতে, বা আধশোয়া হয়ে, যেখানে সেখানে ছবি থামিয়ে পরে আবার শুরু করে আর পাঁচটা ঘরোয়া কাজের মতোই হয়ে ওঠে সিনেমা দেখা। শিল্পকে দৈনন্দিনের অংশ করে নেওয়া কি এক অর্থে জীবনের অংশ করে নেওয়া! তখন কি আর শিল্প জীবনকে আবিষ্কার করতে শেখায়! শিল্পের কাছে কি আর জানা যায় কিভাবে দেখতে হবে জীবনকে!

তাহলে প্রশ্নটা দেখার। সিনেমা দর্শকের দেখার জন্য, দর্শককে দেখানোর জন্য। আর এই দেখা, দেখানোর সঙ্গেই এসে যায় শিল্প ও বিনোদনের দুটি জরুরি প্রসঙ্গ—জীবনদর্শন ও পণ্য। কী ভেবে, কী চেয়ে দর্শক সিনেমা দেখেন? সিনেমাহলে আরও অনেক দর্শকের মাঝখানে বসে অন্ধকারে প্রতিফলিত ছায়ামূর্তিগুলির কাছে কী তাঁর প্রত্যাশা! সিনেমা সম্পর্কে একটা কথা খুব বেশি বলা হয়—এ হলো রূঢ় বাস্তবতার চাপ থেকে একটু পালিয়ে হাঁফ ছাড়ার জায়গা। দর্শক কি সত্যিই তাই চান! সিনেমায় তিনি যা দেখেন অনেকসময়ই তা এক ইচ্ছাপূরণ। যে চরিত্রগুলি সেখানে নড়ে চড়ে বেড়ায়, তারা জীবনের থেকে মাপে বড়ো। শুধু পর্দায় প্রতিফলিত প্রতিমূর্তিই যে স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ো তা নয়; তাদের যাবতীয় কার্যকলাপই বাস্তব জীবনের সম্ভব-অসম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অসম্ভবকে কেন মেনে নেন দর্শক, কেন সিনেমা চলার সময় তাঁর মনে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগে না! বোধহয় তাঁর অবচেতনে এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে যে এই চরিত্রগুলি, এদের কার্যকলাপগুলি বাস্তবের মতো, কিন্তু বাস্তবের থেকে আলাদা, বা তা এক অন্য বাস্তব। বেশ কিছুক্ষণ দর্শক সেই অন্য-বাস্তবের মধ্যে ঢুকে যান, তাঁর চোখে দেখাটাই সেই সময়ের সত্য। দেখার বাইরে এসে যখন অন্য-বাস্তবের আচ্ছন্নতা থেকে খানিকটা মুক্ত করে নেওয়া যায় নিজেকে, তখন দর্শক প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আর যে-দর্শক ঘরে বসে দেখছেন, তাঁর প্রশ্ন শুরু হয় অন্যভাবে। তাঁর দেখার জায়গাটা ছোটো, অন্তত দৃশ্যমান পটটি জীবনের থেকে বড়ো মাপের নয়, সেক্ষেত্রে অন্য-বাস্তবের আচ্ছন্নতাও ততটা কাজ করে না। সেখানে প্রশ্নটা শুরু হয় একেবারে ব্যক্তিগত স্তর থেকে। কিন্তু প্রশ্ন থাকেই—তা তিনি সিনেমাহল থেকে বেরিয়ে-আসা জনতার অংশ বা ঘরে-বসে-থাকা একলা দর্শক, যাই হোন না কেন? প্রশ্নটা এই, তাঁকে কী দেখানো হলো!

কে তাঁকে দেখায়! সিনেমা সম্পূর্ণভাবেই পরিচালকের মাধ্যম। পরিচালকের ভাবনাই সিনেমাকে নির্মাণ করে। কিন্তু সিনেমা তো শুধু আর্ট নয়, তা ইন্ডাস্ট্রিও।

পরিচালকের ভাবনাকে রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন অর্থ ও লোকবলের। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, সংগীত, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা—সবই একজন করতেই পারেন, তবুও নানা লোকজনের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন কোনোমতেই এড়ানো যায় না। সেখানে অন্য ব্যক্তিদের সহায়তা যদিও বা শুধুই নির্মাণের ক্ষেত্রে, কিন্তু অর্থ যোগান যিনি, তাঁর ভূমিকা কিছুটা নিয়ন্ত্রকের। প্রথমত তাঁর কাছে সিনেমা প্রধানত একটি পণ্য, সেই পণ্য বেঁচে তাঁকে মুনাফা করতে হবে। পণ্য বিক্রয়ের যা যা শর্ত, সেগুলোতেই তাঁর আগ্রহ। মনে রাখা দরকার সিনেমার আবিষ্কার পুঁজিবাদী দুনিয়ায়। প্রযুক্তির নানা অগ্রগতিকে কিভাবে পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়, সেটাই পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান লক্ষ্য। পণ্য যখন কিনবেন ক্রেতা, তখনও এসে যায় তাঁর দেখার প্রসঙ্গ, অর্থাৎ কী দেখে তিনি প্রলুব্ধ হবেন। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পণ্যের বাইরের চেহারা আকর্ষক হওয়া প্রয়োজন। বাজারে যে-কোনো বিক্রয়যোগ্য জিনিসের যেমন সাজানো মোড়ক দরকার হয়, সিনেমাকে বেচার জন্যও সেরকম মোড়ক দরকার। কিন্তু অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে বস্তুটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মোড়ক তার গায়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। সিনেমার ক্ষেত্রে এটা শুরু হয় তার নির্মাণ ভাবনা থেকেই। কী বিষয় নিয়ে সিনেমা নির্মিত হবে, তার দায়িত্ব অবশ্যই নির্দেশকের, কিন্তু সেই বিষয়ের পণ্যমূল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দাবি করেন অর্থ-বিনিয়োগকারী, তাঁর কাছে সিনেমার শিল্পগত বাস্তবতার আবেদন কম, বিক্রয়যোগ্যতার পরিমাপ তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি। সিনেমার আদিযুগে একে আদৌ শিল্প বলে মনে করা হয়নি, ভাবা হয়েছিল আরেক ঝকমকে খেলনা, যে-খেলনা দর্শককে টেনে আনবে, আর দর্শক-সমাগম মানেই মুনাফা। সিনেমা যখন সেই ঝকমকে খেলনার গণ্ডি ছাড়িয়ে এগোতে চাইল, তখনি প্রশ্ন এলো কী দেখানো হবে! সেই দেখানোটা দিয়ে কতটা মুনাফা অর্জিত হবে, সে-ভাবনা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল এই দেখার সূত্রে দর্শক কী অর্জন করে নেবে। যা সে পাবে তা নিরাপদ তো, সমাজের পক্ষে, শ্রেণীর পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে! এই প্রশ্ন ওঠে, কেননা শিল্প সমাজকে, শ্রেণীকে অস্বীকার করে রচিত হতে পারে না। সিনেমা আরও প্রভাবশালী, দৃশ্যমান বলেই সেখানে এই নিরাপত্তার প্রশ্নটা আরও বেশি করে ওঠে। সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, সংগীতে সবই ব্যক্তিবিশেষের রচনা, অর্থ লগ্নির পরিমাণ সেখানে কম, তাছাড়া এই শিল্প মাধ্যমগুলির আবেদন বিশেষ দীক্ষিত উপভোক্তার কাছেই। সিনেমা যেহেতু অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারে, তার প্রাথমিক আবেদনে সাড়া দিতে দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ই যথেষ্ট, ফলে সেখানে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। শুধু যে মুনাফা অর্জনের জন্য সস্তা মনোরঞ্জন উপাদান ঢুকিয়ে দেওয়া ছবিতে তা নয়, মুনাফার নিশ্চয়তা দেবে যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুনাফার পক্ষে কথা বলবে যে দর্শন, সিনেমায় ঢুকে যায় সেসবও। আর তাই দেখতে বাধ্য হন দর্শক। এটা অবশ্য শুধু অর্থ লগ্নির ব্যাপার নয়, নির্দেশকের জীবনদর্শনও এখানে কাজ করে। সিনেমা যখন শৈশবদশা কাটিয়ে উঠছে সেই সময় গ্রিফিথ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ চলচ্চিত্র 'বার্থ অব আ নেশন'। সিনেমার ভাষা তৈরির এই প্রয়াস শিক্ষার্থীর কাছে অনুশীলনযোগ্য, কিন্তু একটি পারিবারিক কাহিনীর সূত্রে আমেরিকান জাতি গড়ে ওঠার ইতিহাস

দেখাতে গিয়ে গ্রিফিথ দেখিয়ে দেন তাঁর অনুভূত ইতিহাসের ভাষ্য। 'বার্থ অব আ নেশন' গৃহযুদ্ধ পেরিয়ে আমেরিকান জাতি গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত থাকে না আর, হয়ে ওঠে বর্ণবৈষম্যের পক্ষে এক দলিল, কুখ্যাত 'কু ক্লুক্স ক্ল্যান' হয়ে ওঠে গৌরবান্বিত। এ-ছবি তাহলে দর্শককে দেখায় গ্রিফিথের দেখা অর্থাৎ আমেরিকান ইতিহাসকে গ্রিফিথ যেভাবে দেখেন। গ্রিফিথের এই দেখা ব্যক্তি গ্রিফিথের, কিন্তু তা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির নয়; গ্রিফিথের দেখার চোখ তৈরি করে তাঁর সামাজিক অবস্থান, তাঁর শ্রেণী পরিচয়। মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের উগ্র জাতিচেতনা গ্রিফিথের মানসিকতায় থেকে যায়। তাঁর বাইরের প্রকাশভঙ্গিতে তিনি সচেতনভাবে তাকে চাপা দিতে চাইলেও, তা আত্মপ্রকাশ করে তাঁর শিল্পে। এজন্য তাঁকে ইতিহাস বদলাতে হচ্ছে না, ইতিহাসকে দেখার চোখটাই শুধু অন্যরকম। আর এই দেখাটাই গ্রিফিথ সঞ্চারিত করে দিতে চান দর্শকদের মধ্যে। দর্শক তাহলে কী দেখবেন! সে-দর্শক যদি মার্কিন হন, যদি মার্কিন জাত্যভিমানে মজে থাকেন, যদি কৃষ্ণকায়দের তিনি নিকৃষ্ট বলে মনে করেন, তাহেল 'বার্থ অব আ নেশন' তাঁর কাছে মনে হবে যথার্থ ইতিহাস বোধের নিদর্শন, এবং হয়ত ওই নিরিখেই এ-ছবির শিল্পমূল্যও তিনি মেনে নেবেন, আর যদি দর্শক হন স্বচ্ছ ইতিহাস ও রাজনীতিবোধের অধিকারী, কিংবা অ-মার্কিন, যাঁর দায় নেই মার্কিন জাত্যভিমানের ভার বহনের, তাহলে তিনি এঁর ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করবেন, সেইসঙ্গে অস্বস্তি বোধ করবেন এমন শিল্পগুণান্বিত ছবি কী করে এমন ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক হতে পারে। তাহলে নির্দেশকের দেখা ও দেখানোর মতোই দর্শকের দেখাও নির্ভর করে তাঁর অবস্থানের উপর। দর্শক দেখেন তাঁর জায়গা থেকে। নির্দেশক দেখান তাঁর জায়গা থেকে। মাঝখানে এসে যায় পণ্যবিক্রয়ের নানা পদ্ধতি, যার চাপে দেখা ও দেখানো দুইই কিছুটা বিপর্যস্ত হয়। একমাত্র যদি দেখানোটা মুনাফার নিশ্চয়তা দেয় তাহলে অবশ্য পণ্যবিক্রেতার কোনো আপত্তি নেই, এমনকি তা যদি তার শ্রেণীদৃষ্টির বিপরীত হয়ও। হলিউডে ছবি করেছিলেন গিল্লো পন্টিকার্ভো। একদা ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মী পন্টিকার্ভো যে-ছবিটি বানিয়েছিলেন তার নাম 'কুয়েমাদা', অন্য নাম 'বার্ন'। এ-ছবিতে সময়ের বিস্তারকে গুটিয়ে এনে বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে চিহ্নিত করেছিলেন পন্টিকার্ভো, কৃষকবিদ্রোহের কাহিনীর সূত্রে। কৃষকবিদ্রোহের মহিমার পাশে বুর্জোয়াদের অবমূল্যায়নের এই চিত্রায়ন হলিউড স্টুডিও মালিকদের শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই কথা; তবু কী করে আনুকূল্য পেলেন, কী করে এ-ছবি করতে পারলেন পন্টিকার্ভো, 'সিনেয়াস্ট' পত্রিকার এ-প্রশ্নের জবাবে পন্টিকার্ভো বলেছিলেন, বুর্জোয়ারা যদি মনে করে তার মা-কে বেশ্যা দেখালে পয়সা আসবে তাহলে তারা তাই করবে। অর্থাৎ দেখানোটা শুধু পয়সা রোজগার করার জন্য, মানে মুনাফার জন্য। অবশ্যই পন্টিকার্ভোর এই তিক্ত ব্যঙ্গ সত্যের একটি অংশ মাত্র; বুর্জোয়ারা যে সব রকম মানবিক সম্পর্কের উপরের মায়াবী প্রচ্ছদটি ছিঁড়ে ফেলে, এ-ইঙ্গিত তো মার্ক্স অনেক আগেই দিয়েছিলেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাদের কাছে মুদ্রার ঝনৎকারই হলো মধুরতম সংগীত, তবু মনে রাখতে হবে

শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দেয় না তারা কোনোমতেই। পন্টিকার্ভোর উক্তিটি ব্যক্তি-বুর্জোয়া সম্পর্কে সত্য, শ্রেণী সম্পর্কে নয়। 'বার্ন' ছবিতে যদিও শ্রেণী হিসেবেই বুর্জোয়াদের প্রাথমিক প্রগতিশীল ভূমিকা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ববাদে বদলে যাওয়া দেখানো হয়েছে, তবুও হলিউড-প্রযোজকদের তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি; কেননা ছবিটি সমকালের কাহিনী নিয়ে নয়, অতীত-ইতিহাসের। ইতিহাস তাদের অত বিড়ম্বিত করে না, কেননা তা থেকে আশু কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। ফলে পুঁজিপতি প্রযোজকের স্টুডিওতে তৈরি হতে পারে বিপ্লবী বামপন্থী পরিচালকের তীব্র ইতিহাসসচেতন শ্রেণীসংগ্রামের ছবি, প্রযোজকের মুনাফা-উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে পরিচালক দর্শককে টেনে আনতে পারেন তাঁর দেখার জায়গায়, দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন তাঁর 'দর্শন'। আর এটাই সিনেমা দেখার মূল কথা।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সিনেমার কথা বাদ দিলেও, মনে রাখতে হবে সিনেমা দেখা স্পষ্টতই পরিচালকের দেখানো। 'পথের পাঁচালী' সিনেমাটিতে অপুর রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য আছে। ওই অবিস্মরণীয় সিকোয়েন্সটিতে অপু-দুর্গা বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাশবনে বসে হঠাৎ রেলের শব্দ শুনতে পায়। এর পরের শটগুলিতে দর্শক বারবার অপু ও দুর্গাকে দেখেন, দেখেন দূরে রেলইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। দর্শক অপুকে দেখেন, দুর্গাকে দেখেন, তাদের রেললাইনের দিকে দৌড়ে যাওয়া দেখেন, টেলিগ্রামের থামে কান রেখে দুর্গা ও অপুর বিস্ময়ও দেখেন। অপু রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছায়। অপুর সঙ্গেই দর্শক এতক্ষণ ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখছিলেন, কিন্তু রেললাইনের কাছে পৌঁছতেই কাট করে ক্যামেরা চলে যায় উলটো দিকে, দর্শক ট্রেনটিকে দেখতে পান কিন্তু তা আর অপুর চোখ দিয়ে নয়, এখন তিনি ক্যামেরার পিছনে, তিনি আসলে চলে-যাওয়া রেলগাড়ির কামরার ফাঁক দিয়ে অপুকে দেখছেন, বা বলা ভালো অপুর রেলগাড়ি-দেখাটাকে দেখছেন। অপুর সাবজেক্টিভ দৃষ্টিকোণের বদলে দর্শকের অবজেক্টিভ দৃষ্টিকোণ এসে গেল—দর্শককে এটাই দেখালেন পরিচালক। সাহিত্যের সঙ্গে ফিল্মের এটাও একটা বড়ো তফাত। সাহিত্যে লেখককে ভাষা দিয়ে সবই বর্ণনা করতে হয়, তিনি না বলে দিলে পাঠক কিছুই জানতে পারে না। সিনেমায় নির্দেশক বলেন না, দেখান। দৃশ্য ও দর্শককে মুখোমুখি রেখে দিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন, কী দেখবে দর্শক, সেটা অবশ্য তিনি আগেই ঠিক করে দেন। সাহিত্যে লেখক কোনো চরিত্রের মনের মধ্যে উঁকি মেরে সে কী ভাবছে সেটা পাঠককে জানিয়ে দিতে পারেন, বিভূতিভূষণের উপন্যাস সর্বজয়ার মৃত্যুর খবর জেনে হঠাৎ অপুর মনে একটা মুক্তির স্বাদ জাগে, এই নিষ্ঠুর অপ্রিয় ভাবনাটি বিভূতিভূষণ পাঠককে জানান। চলচ্চিত্রকারের এই সুযোগ নেই, তাই তাঁকে দেখাতে হয় একলা সর্বজয়ার নিষ্ফল প্রতীক্ষা, অন্যদিকে কলকাতায় বসে অপুর অদ্ভুত ঔদাসীন্য, তারপর খবর পেয়ে মনসাপোতায় এসে বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া, এই নির্বাক মুহূর্তই সিকোয়েন্সটির নিষ্ঠুরতা প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। সিনেমা আসলে দৃশ্য–চলচ্চিত্র যেদিন সবাক হলো কেউ কেউ মনে করেছিলেন এবার সিনেমার জাত গেল, সে আর বিশুদ্ধ রইল না। সিনেমায় দর্শক দেখবে, বাড়তি হয়ত

নবেও, কিন্তু সে-দেখাটা চরিত্রের দেখা নয়, চরিত্রকে দেখা। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে সবকটি চরিত্রই দার্জিলিং-বাসের শেষ কয়েক ঘণ্টা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার আশা করেছে, তারা দেখেনি, দর্শকও দেখেনি, তার বদলে দর্শক দেখেছে চরিত্রগুলির টানাপড়েন; শেষ সিকোয়েন্সে মেঘ কেটে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু দর্শক আসলে দেখছে চরিত্রগুলির জীবনে মেঘ কেটে যাওয়া। দর্শককে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারদৃশ্য দেখাতে চাননি নির্দেশক, রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর পারিবারিক স্বৈরতন্ত্রের ভিতর থেকে চাপা-পড়া কণ্ঠস্বরগুলি কিভাবে জেগে উঠছে সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই জেগে ওঠার একটা প্রতীক হয়ে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দর্শক সবটাই দেখেন; সেইসঙ্গে দর্শক এও দেখেন ওই সত্যকে দেখতে চান না রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ, তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যান। দর্শক রেলগাড়ি-দেখতে-পাওয়া অপুর বিস্ময়বোধের শরিক হোন এটা চাননি সত্যজিৎ, অপুর বিস্ময়টাই দর্শক দেখুক, এটাই চেয়েছিলেন তিনি। অন্যভাবে অবশ্য দেখা যায়। সত্যজিৎ মনে রাখেন সিনেমা সম্পূর্ণভাবেই পরিচালকের মাধ্যম, যতই সম্মেলক সৃষ্টি হোক না কেন, সিনেমা আসলে পরিচালকেরই ভাবনার ফসল, ফলে তাঁর দৃষ্টিকোণটাই এখানে মুখ্য। চরিত্র নয়, কাহিনীও নয়, পরিচালক তাদের কিভাবে গড়বেন, ভাঙবেন দর্শক সেটাই দেখবেন। ঋত্বিকের ছবিতে, দর্শকের মনে হতে পারে, যেন এই দেখানোটা ঘটে অন্যভাবে। খুব স্থূলভাবে সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের প্রবণতাকে আলাদা করতে গেলে বলা যায় সত্যজিৎ যেখানে বিশ্লেষণপ্রবণ, ঋত্বিক সেখানে অনেকটাই আবেগের উৎসারণেই মনোযোগী। এটা অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে, যদি না পরিচালক ও দর্শক দুজনেই সচেতন থাকেন। দর্শক এই সিনেমা দেখার পর্বে সচেতন থাকবেন না মায়ায় মজবেন? পরিচালককে থাকতে হয়, কেননা আবেগ তাঁর কাছে দেখানোর একটা পদ্ধতি, দর্শকের ভাবালুতাকে উসকে দিয়ে তাকে মোহগ্রস্ত করে তোলা নয়। ঋত্বিক প্রবল আত্মসচেতন শিল্পী, তিনি কী করতে যাচ্ছেন সে-ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবহিত, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই তিনি চরিত্রদের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে আবেগকে নিংড়ে আনেন। এখানে দুটো ব্যাপার ঘটে। পরিচালক আর চরিত্রকে 'অবজেক্ট' হিশেবে দেখছেন না, তিনি তখন চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, আর দর্শককে একাত্ম হতে ডাকছেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতাকে যেভাবে দেখেন দর্শক, তাতে তিনি কেবলই নীতার মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকেন, নীতার ট্র্যাজেডিকে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হিশেবে ভাবতে শুরু করেন। গোটা ছবিটাই দর্শক নীতা হয়ে দেখেন, নীতাকে দেখেন না। পাহাড়ে, স্যানোটোরিয়ামে নীতার অন্তিম আর্তনাদের সময় ক্যামেরা তাই নীতার কাছ থেকে সরে গিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, আকাশের উপর প্যান করতে থাকে, ক্যামেরা আর নীতার উপর স্থির থাকতে পারে না, কেননা দর্শক এখন নীতাকে দেখছে না, নীতা হয়ে দেখছে। পরিচালক যখন চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের এই আত্মীয়তা তৈরি করে দিতে চান তখন আকাঙ্ক্ষা হতে পারে দর্শক যেন বিচার করার সুযোগ পাবেন না। ঋত্বিকের ছবিতে এ-সমস্যাটা প্রায়ই হয়। দর্শক যা দেখেন তা দেখেন আত্মগতভাবে, ফলে বিচারবোধ কিছুটা চাপা পড়ে যায়। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'

সিনেমার বঙ্গবালার দিকে তাকিয়ে 'কেন চেয়ে আছ গো মা' গানটির চিত্রায়ন এর একটা বড়ো উদাহরণ। ওই সিকোয়েন্সে ক্যামেরা যখন বঙ্গবালার মুখের উপর, তখনও দর্শক আসলে বঙ্গবালাকে দেখছে না, বঙ্গবালার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে অনুভব করতে চাইছে, কেননা পরিচালক তাই চান। যেহেতু এই অনুভব আবেগনির্ভর, তাই তা চোখের দেখাকেও ছাপিয়ে উঠতে চায়। 'কোমল গান্ধার'-এ ভৃগু-অনসূয়াকে যখন পদ্মার পারে রেললাইনের বাফারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন ঋত্বিক, তখন দর্শক ভৃগু-অনসূয়াকে দেখে না, তাদের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকেই খোঁজে। দেখানোর এই পদ্ধতিটা দেখার এই ভঙ্গিটা ভালো কি মন্দ সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, মূল কথা হলো সিনেমা পরিচালকের দেখানো আর দর্শকের দেখার মিলে যাওয়া। 'সুবর্ণরেখা'য় ঋত্বিকই বদলে নেন দেখানোর পদ্ধতি, সীতার সঙ্গে দর্শক আবেগে মিশে যান না, সেই ভয়ংকর আত্মহত্যার সিকোয়েন্সে পর্দায় সীতার স্তম্ভিত মুখাবয়ব, ঈশ্বরের বিস্ফারিত দৃষ্টি, দর্শক এর কোনোটারই মধ্যে নেই, তিনি আলাদা, বাইরে থেকে দেখে যান এই ট্র্যাজেডি, আর বাইরে থেকে দেখা বলেই বার বার 'কেন' এই প্রশ্নটা তাঁকে তাড়া করতে থাকে। ঋত্বিক তাহলে এভাবেও দেখেন। যেমন 'জলসাঘর'-এ সত্যজিৎ দর্শককে বাইরে থেকে দেখার সুযোগ দিতে চান না, গোটা ছবিটাই নির্মিত হয় জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের দেখার ধরনকে অনুসরণ করে। তাই দেখতে হয় দর্শককে, বিশ্বম্ভরের পাশে দাঁড়িয়ে। কেননা পরিচালক সেভাবেই দেখছেন। ছবিটিকে তাই মনে হতে থাকে হৃতগৌরব সামন্ততন্ত্রের দীর্ঘশ্বাস বলে, ঘোড়ার পিঠ থেকে বিশ্বম্ভরের পড়ে যাওয়ায় যেন দর্শকেরও হাহাকার বেজে ওঠে; দর্শক সুযোগ পান না বাবার যে ইতিহাসের নিয়মে বিশ্বম্ভরদের সরে যেতেই হয়, নিষ্ঠুর হলেও তা স্বাভাবিক। সুযোগ পান না কারণ দর্শক আর এখানে ঘটনার সাক্ষী নন, তিনি যেন ওই ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়িরই এক অংশ।

দেখানোর এই ধরন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুরনো কথাটাই—সিনেমা সম্পূর্ণই পরিচালকের মাধ্যম। দর্শককে নিজের অভিপ্রেত পরিমণ্ডলের মধ্যে টেনে আনতে পারাটা পরিচালকেরই মুন্সিয়ানা। হয়ত তা দর্শকের দিক থেকে কিছুটা অসহায়ত্বও। দেখা ও দেখানোর খেলায় এক পক্ষ দর্শক, তাঁর নিজস্ব বোধবুদ্ধি যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে কিছুটা আশঙ্কা থেকেই যায়। ক্ষমতাবান পরিচালক সস্তা বিনোদনের জায়গায় না গিয়েও দর্শককে টেনে আনতে পারেন বিপজ্জনক বৃত্তে—সেটাই সিনেমার রাজনীতি।

পরিচালকের যেমন আছে নিজস্ব শ্রেণী অবস্থান, আছে প্রকাশ্য অথবা গোপন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি দর্শকেরও আছে নিজস্ব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি। দুজনেরই আছে ইতিহাস, তা ততটা ব্যক্তিগত নয়, অনেক বেশি সামাজিক। এই দুই ইতিহাসের সম্পর্কটা মুখোমুখি দাঁড়ায় যে-কোনো শিল্পেই, সিনেমা দৃশ্যমাধ্যম বলে এটা অনেক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' ছবিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে আইজেনস্টাইন দর্শকের সামনে তুলে ধরেছিলেন যেন দর্শককে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান—বেছে নাও, তুমি কোথায়। বিখ্যাত 'ওডেসা স্টেরাস'-এ সিঁড়ির উপর নানা মানুষের ভিড়, কখনো ক্যামেরা সমগ্র ভিড়কে ধরে, কখনো একজন

কজন করে নানা মুখ, দর্শক তাদের যাচাই করতে থাকেন, তার পরই সিঁড়ি দিয়ে
ান্ত্রিক তালে নেমে আসতে থাকে সৈনিকেরা আর তাদের বন্দুকের গুলিতে একের
র এক লুটিয়ে পড়তে থাকে মানুষ, শেষে সেই বাচ্চাসহ
্যারাম্বুলেটরটি—আইজেনস্টাইন যেন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মাত্র, যদিও ক্যামেরার
্যাঙ্গেলে, দৃশ্য প্রতিস্থাপনে, জনতার প্রতিক্রিয়ায়, সৈন্যদের নিষ্ঠুর মুখাবয়বে তাঁর
াক্ষপাত কোনদিকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবু আইজেনস্টাইনের দর্শকদের
এর মোকাবিলায় নামিয়ে দেন, তাঁর নিজের অবস্থান-অনুযায়ী দর্শক বিচার
করবেন, ঠিক করবেন কোন পক্ষে তিনি। এ যেন দর্শককে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া—আমি
এভাবে দেখাচ্ছি, তুমি কিভাবে দেখবে ঠিক করো। স্পষ্টতই দেখানোর এই
ধরনটির আবেদন দর্শকের মুক্তির কাছে। আর অন্য ধরনে দর্শকের আবেগকে
উৎসারিত করে দিতে চাওয়াই পরিচালকের লক্ষ্য। একটিতে চরিত্রকে প্রতি মুহূর্তে
দর্শকের সমালোচনার সামনে ছেড়ে দেন পরিচালক, অন্যটিতে দর্শককে তিনি
জায়গা ছেড়ে দেন চরিত্রকে আত্মস্থ করার জন্য। দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহর বাড়ি
ফিরে এলে, দুর্গার জন্য আনা শাড়িটিকে আঁকড়ে সর্বজয়ার যে-কান্না, সেই দৃশ্য
সমানে দর্শককে ধাক্কা মারতে থাকে, তাকে অস্থির করে তুলতে চায়। এখানে
ক্যামেরার সামনে সর্বজয়া, ক্যামেরার পিছনে পরিচালক ও দর্শক, তারা ওই
বিপর্যয়টাকে ধারাবাহিক দেখ যান, দর্শক দেখতে দেখতে আলোড়িত হতে থাকেন
আর আত্মজিজ্ঞাসায় বিদ্ধ হতে থাকেন। ভেঙে-পড়া গোয়ালঘর, বাড়ির পাঁচিল,
জলকাদার পাশ দিয়ে এগোতে থাকা হরিহরের বিমূঢ় বিস্ময়ে বিপর্যয়ের যে
চিহ্নগুলি ধরা পড়ে, সর্বজয়ার কান্নায় তারই সম্পূর্ণতা। বিপর্যয়ের অন্য চিহ্নগুলির
মতো সর্বজয়াও একটি 'অবজেক্ট', এখানে সিনেমার ন্যারেটিভে দর্শক ঢুকে পড়তে
পারেন না, কেননা ঢুকে পড়লে ওই বিপুল অভিঘাতটি তৈরি হবে না। দর্শক
বাইরে থেকে দেখছেন বলেই ধাক্কাটা এসে তাঁকেও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়,
অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নড়ে যায়। কেননা তিনি মনে মনে এক নিরাপত্তার বলয়ে বসে
থাকেন, সিনেমা সেখানে এগিয়ে এসে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সিনেমা তাঁর তৈরি-
করা বাস্তবতা দিয়ে দর্শকের বাস্তবতায় আঘাত করে বলে দর্শককে একটা নাড়া
পেতে হয়। অন্যদিকে 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার বাস্তবতা, তাও তো
পরিচালকের তৈরি করা, দর্শক সেখানে নিজের বাস্তবতা নিয়ে মিশে যেতে চায়,
ফলে নীতার মতো সেও ভাঙতে থাকে, কষ্টটা তাকে কুরে কুরে খায়। এক্ষেত্রে
একটা বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। সিনেমা শেষ হয়ে গেলে দর্শক তার
বাস্তবতাকে আবার আলাদা করে নেন নীতার বাস্তবতা থেকে, সেটা যেমন তাঁর
পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়, তেমনি তিনি আবার এক ধরনের মুক্তির আস্বাদও পেতে
পারেন। দর্শক হিশেবে অসুবিধা হলো এই যে, তিনি যদি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
বজায় রাখতে না চান, বা পরিচালকের মুন্সিয়ানায় রাখতে না পারেন, তাহলে আর
প্রশ্ন করতে পারেন না। আর এখানেই এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি
হয়। প্রশ্ন বা সংশয়ের জায়গা না থাকা মানে শর্তহীন আনুগত্য—এই শর্তহীন
আনুগত্য ফ্যাসিবাদের রাস্তা খুলে দেয়। সিনেমা যেহেতু দৃশ্যমাধ্যম, যেহেতু তা
বানিয়ে তুলতে পারে এক ছদ্ম-বাস্তব, দর্শক প্রশ্ন করতে ভুলে গেলে, সংশয়হীন

আনুগত্য দেখালে, নির্দেশক মিথ্যাকে বাস্তব করে তুলতে পারেন। পরিচালক যদি প্রতিভাবান হন, তাহলে তাঁর নির্মাণও হবে প্রবল কুশলী, সেই দক্ষ নির্মাণের মাঝখানে বসে দর্শক তখন মেনে নিতে থাকবেন মায়াবী মিথ্যাকে, জেনে নেবেন এটাই বাস্তবতা। আর যদি তাঁর নিজের বাস্তবতায় কোনো অলীক মিথ্যার কুয়াশা জড়ানো থাকে, তখন বিভ্রম সত্য হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদের পক্ষে যা সুবর্ণ সুযোগ। সেই উদ্দেশ্যেই তো রচিত হয়েছিল হিটলার ও নাৎসিবাদের মহিমাকীর্তনের আলেখ্য লেনি রিয়েফেলটালের 'ট্রায়াম্ফ অব উইল', যে-সিনেমা জার্মান জাতিকে মনে করাতে চেয়েছিল হিটলারের নেতৃত্বে তাদের বিপুল অগ্রগতির কথা। সাময়িক মোহগ্রস্ত জার্মান জাতির কাছে এ-ছবি হয়ে উঠতে চেয়েছিল এক সাংস্কৃতিক সমর্থন। অর্থাৎ রিয়েফেলটালের দেখানো তাঁর রাজনীতি। এটা একটা সিনেমার রাজনীতির প্রত্যক্ষ উদাহরণ, মনে রাখা দরকার সিনেমা দেখানোর মধ্য দিয়ে, সবসময়ই কাজ করে রাজনীতি। যেহেতু সিনেমাকে নির্ভর করতে হয় পুঁজিলগ্নিকারীর উপর, যেহেতু সিনেমার উপর রাষ্ট্রের খবরদারি খুব কড়া, আর সে-ব্যাপারে তার হাতে রয়েছে সেন্সরশিপের মতো আইন-অনুমোদিত ব্যবস্থা, তাই সিনেমায় শাসকশ্রেণীর রাজনীতির কথাই বেশি আসবে এটাই প্রত্যাশিত। রাষ্ট্রে ও সমাজে যে মূল্যবোধগুলি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়, সিনেমা চট করে তা থেকে সরে আসতে পারে না। ফলে সিনেমায় দর্শক দেখে সেই সব মূল্যবোধেরই প্রতিফলন, যে-মূল্যবোধ স্থিতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আর এই মূল্যবোধ অনেকসময় বাস্তবতারহিত অতিকথা হয়ে যায়, সংস্কারে পরিণত হয়, ফলে তা থেকে সরে আসা অনেক বিরোধিতার জন্ম দেয়। সত্যজিৎ রায় যখন 'অপরাজিত' ছবিতে মা ও ছেলের সম্পর্কের দূরত্ব দেখিয়েছিলেন, বিশাল সংখ্যক দর্শক মেনে নিতে পারেননি, কেননা তাঁদের সযত্নলালিত সংস্কার মা ও ছেলের সম্পর্ক শুধুই ভালোবাসার। সেখানে এরকম একটি নিষ্ঠুর সত্যকে দেখাবেন পরিচালক, দর্শকের পক্ষে তা বড়ো ধাক্কা হয়ে যায়। কেননা সিনেমাতেও দর্শক আসলে সত্যের মুখোমুখি হতে চান না, বরং সত্য থেকে পালাবার জন্যই সিনেমাকে বেছে নেন তিনি। আর কোনো কোনো সময় এভাবে তাঁর দেখতে চাওয়া আর পরিচালকের দেখাতে চাওয়ার মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। যাকে বলা হয় বাণিজ্যিক ছবি, সেখানে এই সংঘাতের কোনো জায়গা দেওয়া হয় না। আসলে অর্থনৈতিক চাপের ক্ষেত্রে দর্শক পরিবর্তন চাইতেই পারেন, কিন্তু সামাজিক সংস্কার ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে তিনিই চট করে পরিবর্তনের পক্ষ নিতে পারেন না। সিনেমায় যে বারবার পরিবারতন্ত্রের জয়গান করা হয়, নারী-স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয় নারীর মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, এগুলি একদিকে দর্শককে নিরাপত্তা দেয়, অন্যদিকে তা যেমন নির্মাতাদের পক্ষে, তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষেও স্বস্তিদায়ক। কেননা পরিবারকে প্রশ্নহীনভাবে মানতে শিখলে, তা থেকে রাষ্ট্রকে মানতে শেখা হবে, কেননা রাষ্ট্রও তো একটা বড়ো পরিবার, কেননা পরিবারের বড়ো কর্তার মতো রাষ্ট্রও তো ব্যাক্তি ও সমাজের অভিভাবক। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তা শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের দর্শনকে যাথার্থ্য দেওয়ার জন্যও। আর এই ছবিই

দর্শককে দেখতে হয়, কেননা কী ছবি দেখবেন তা দাবি করার কোনো উপায় তাঁর নেই, পরিবেশক বা প্রদর্শকরা যা তাঁর সামনে সাজিয়ে দেবে, তা থেকেই তাঁকে বেছে নিতে হবে তিনি কী দেখবেন। সিনেমা পণ্য, কিন্তু পণ্যেরও রাজনীতি থাকে। এমন পণ্য বেচা যায় না, যা দর্শককে, অর্থাৎ ক্রেতাকে পণ্যবিক্রেতার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেবে।

তাহলে কী করে অন্য ধরনের সিনেমা তৈরি হয়! মনে রাখা দরকার সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগালরা যখন সিনেমা করছেন, তাঁদের ছবিতে যেমন প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা নেই, তেমনি কোনো বড়ো রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গও নেই। তাঁরা যা দেখাতে চান তা আসলে এক ধরনের সামাজিক প্রশ্নের অবতারণা। 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে সত্যজিৎ যখন শ্যামলেন্দুর উপরে ওঠাকে তিক্ত ব্যঙ্গে চিত্রায়িত করেন, তখন তার শ্রেণী-পরিচয় চিহ্নিত হয় ঠিকই, কিন্তু তা কোনো শ্রেণী-সংগ্রামের ডাক দেয় না। তবুও হয়তো এ-ছবিগুলিতে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়, দর্শক যেটুকু দেখেন তা থেকে এগিয়ে গিয়ে ভেবে নিতে পারেন অনেক কিছু। অথচ এ-ছবিগুলিকে আটকানো যায় না নানা কারণেই। সেন্সর আটকায় না, রাষ্ট্র বিরুদ্ধতা করে না, তার বদলে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তাকে আলাদা খোপে পুরে দেওয়া হয়, নাম দেওয়া হয় 'আর্ট-ফিল্ম'। 'আর্ট-ফিল্ম' অর্থাৎ তা সবার জন্য নয়, নির্দিষ্ট সীমিত কিছু দর্শকের জন্য। 'আর্ট-ফিল্ম' শুনলেই সাধারণ দর্শক জেনে যাবেন, ওটা তাঁদের দেখার জন্য নয়। ফলে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে, ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে, মৃণাল সেনের ছবিতে দর্শকের নিজেকে চেনার, নিজের অবস্থানকে জানার যে সুযোগ তৈরি হয়, তা নিতে পারেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনেই। 'খণ্ডহর' ছবিতে মৃণাল পেটি-বুর্জোয়া রোম্যান্টিকতার সঙ্গে মিলে থাকে যে কাপুরুষতা ও পলায়নবাদ তাকে নগ্ন করে দেখিয়েছিলেন, কিন্তু দেখেছিলেন কজন? 'আর্ট-ফিল্ম' তাই বিঘ্নিত করে না অচলায়তনকে। বরং এ-সব ছবি রাষ্ট্রের বেশ শিল্পমনস্ক ভাবমূর্তি রচনা করতে সাহায্য করে।

যেমন করে বাণিজ্যিক সিনেমার সাম্প্রতিক ঝোঁক। মুম্বই-সিনেমায় গত কয়েকবছর ধরে যেমন অপরাধ-রাজনৈতিক নেতা-প্রশাসন-পুলিশ যোগসাজশের বিষয় দেখানো হচ্ছে, তা আপাতভাবে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে; মনে হতে পারে এক ধরনের দুঃসাহসিকতা বলে। এখানে অনেকগুলি ব্যাপার কাজ করে। দর্শক যা দেখেন, তা কিন্তু তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় আগে থেকেই জানেন, ফলে বেশ 'সত্যি ব্যাপার' দেখলাম এরকম একটা উপলব্ধি তাঁর হয়। আর এই 'সত্যি ঘটনা' দেখানো হয়েছে, তাকে বাধা দেওয়া হয়নি, ফলে আমরা কতো সত্যবাদী, কত সৎ—পুঁজিলগ্নিকারীরা এ-রকম একটা ভান করার সুযোগ পেয়ে যান। আর রাষ্ট্র নিজেকে অনেক বেশি উদার ও গণতান্ত্রিক বলে প্রমাণ করার সুযোগ পায়। তাছাড়া এইসব ছবিতে শেষ পর্যন্ত তো রাষ্ট্রের ক্ষমতাই জয়ী হয়, দর্শক দেখে অনেক গলদ সত্ত্বেও আইন, বিচার ব্যবস্থা অন্যায়কে শাস্তি দিচ্ছে, রাষ্ট্র সম্পর্কে তার বিশ্বাস, আস্থা দৃঢ় হয়। সেজন্যই এই সব ছবি দেখানো হয়, দর্শককে দেখতে হয়। আর কী দেখবেন তিনি!

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনার বেলায় ব্যাপারটা বদলে যায়। সিনেমায় কোনো সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা দেখানো যায় না, সেন্সর সেখানে বাধা দেবেই। তখন দর্শক যা 'সত্যি' বলে জানে, তা দেখতে পাবে না। তাই সিনেমায় অনতি-অতীতের কোনো কৃষকবিপ্লব বা শ্রমিক সংগ্রাম কখনো কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আসে না। দূর-অতীত আসে, যেমন আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহকে নিয়ে সিনেমা করা যায়, ব্রিটিশ-ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কিন্তু সহজে করা যায় না। তার কারণ আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহের প্রায় সর্বজনস্বীকৃত জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা আছে, সে-ইতিহাস দর্শকের আবেগকে উদ্‌বেল করতে পারে, কিন্তু তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না। ব্রিটিশ-ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কিন্তু কোনো স্থির, বিবাদহীন ভাষ্য নেই, ফলে যা দর্শককে দেখানো হবে তিনি তাই দেখবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তাহলে দর্শক কী দেখবেন আর তাকে কী দেখানো হবে—এ দুই সব সময়ে মিলতে নাও পারে। প্রথমত যাঁরা দেখবেন তাঁরা অনেক, কিন্তু প্রত্যেকেই একক—আর যাঁরা দেখাবেন তাঁরা অনেক—নির্দেশক, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, কিন্তু এক জায়গায় তারা এক হচ্ছেন। ফলে দেখানো ও দেখায় একটা পদ্ধতিগত ও বিন্যাসগত পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে আবার উঠে আসছে স্বাধীনতার প্রশ্ন। দর্শক যা দেখেন, সে-ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা কতটুকু। তাঁকে যা দেখানো হবে, যেটুক বা যা দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে, তাই তাঁকে দেখতে হবে। তাঁর একমাত্র স্বাধীনতা না দেখার। একমাত্র এভাবেই তিনি 'দেখানো'কে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। অন্যথায় বড়োজোর যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্য থেকে বাছাই করা স্বাধীনতা আছে তাঁর। অর্থাৎ বাজারে যে-পণ্য আসছে কেবল তার ভিতর থেকেই তাঁকে বাছতে হবে, তিনি দাবি করতে পারেন না—আমার এই সিনেমা চাই। আর এখানে প্রত্যেকটি দর্শকই, সিনেমাহলের ভিতরে বা বাইরে সম্পূর্ণ একা। যে-দর্শক বাড়িতে বসে ডিভিডি দেখছেন, তাঁর অবস্থা সামান্য ভালো, কেননা তাঁর সামনে পণ্যের যোগান একটু বেশি, অর্থাৎ বাছাইয়ের একটু বেশি সুবিধা।

কিভাবে তাহলে দর্শক দেখতে পারেন নিজের মতো করে। গত শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ফিল্ম দেখানোর একটা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সেটা অবশ্য শুধু ফিল্ম দেখানো নয়, ফিল্ম নির্মাণেরই এক বিকল্প ব্যবস্থা; সেটাও সম্ভব হয়েছিল বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থায়। লাতিন আমেরিকার নানা দেশে, সামরিক বা অসামরিক নানা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম চলছিল, পাশাপাশি ছিল নানা গেরিলা কার্যকলাপ। সিনেমা তৈরি সেই গেরিলা কার্যকলাপেরই একটা অংশ ছিল। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সিনেমাটোগ্রাফার সবাই মিলে লুকিয়ে কিছুটা শুটিং করতেন, তারপর সেই টুকরো টুকরো অংশগুলো জড়ো করে কোথাও, গ্রামে বা শহরে লুকিয়ে দেখাতেন তাঁরা, তারপর আবার ফিল্মটাকে নানা অংশে ভাগ করে ছড়িয়ে যেতেন নিজেরাও। এর রাজনৈতিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে দর্শক জানতেন তিনি কী দেখতে চান, সিনেমাকর্মীরা জানতেন তাঁরা কী দেখতে চান। এবং যেহেতু গেরিলা

পদ্ধতিতে প্রদর্শন হচ্ছে, ফলে সিনেমাটার সঙ্গে দর্শকরা জড়িয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা আর নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকছেন না। দর্শকের দেখা আর সিনেমাকর্মীদের দেখানো এভাবে মিলে যাচ্ছিল সেখানে।

তবে এটা তো একটা রাজনৈতিক কার্যক্রমের অঙ্গ। অন্য কিভাবে এটা করা সম্ভব! ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোটো আয়োজনে ভিডিও-ক্যামেরায় কেউ কেউ ছবি তুলছেন। তাদের চেনাশোনা জগতেই এই ছবির দর্শকরা আছেন। সেখানেও হয়ত দেখা দেখানোর এই মিলন সম্ভব। যদিও এর সার্থকতা ও সাফল্য খুবই সীমিত। বড়ো হলে বিশাল পর্দার সামনে যে-দর্শকরা বসে থাকেন, ওই বড়োত্বের জন্যই তাদের হতে হয় অন্যের ইচ্ছাধীন, আর যে-দর্শক ঘরে বসে ডিভিডি দেখছেন, তিনি ক্রমশ একলা হয়ে যাচ্ছেন। এর বিকল্প কী! হয়ত বাণিজ্যের সমান্তরালে সিনেমার অন্য কোনো পথ ভাবা যায়, তাহলে সিনেমানির্মাতাদের অভিপ্রায় ও দর্শকের অভিপ্রায় মিলতে পারে, মিলে যেতে পারে দেখা ও দেখানো।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দুটি রচনা

১.* যেখানে মানুষ, সেখানেই দর্শক

এক

আমরা যখনই যাঁকে ভালোবাসি বা তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করি, তৎক্ষণাৎ আর সব কিছুও চাই। সবার কাছ থেকে বেকসুর আলগা করে নিয়ে তাঁকে একটি স্বয়ম্ভূ সংঘটন হিসেবে দেখাতে চাই। বাঙালির সুলভ এই ভালোবাসাবাসির শিকার আমার প্রিয় শিল্পী বাদল সরকার। যখনই একজন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বা রুস্তম ভারুচা তাঁর উৎকেন্দ্রিক কৃতিত্বের পরিমাপ নিতে চান, সঙ্গে-সঙ্গেই এক ঝটকায় ভুলে যেতে চান বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র কিংবা উৎপল দত্তকে। অতঃপর যখনই এসব বিস্মৃত নাম নিজেদের অনুভূত করাতে থাকে, তাঁদের শিল্পস্বজ্ঞা যে কতো অপরিণত ছিল সেই মর্মে গুণী এই সমালোচকেরাও আকারে-ইঙ্গিতে উগ্রপন্থা অবলম্বন করতে ছাড়েন না। অনুশীলিত এই একদেশদর্শিতার ফলে উপাস্য বিষয় ক্ষুণ্ন হতে থাকেন, তাঁর ঘাড়েই অজান্তে কখন গোটা বাংলা নাটকের কোনো-কোনো অকৃতার্থতার দায়ভাগ বর্তে যায়।

বাদল সরকারের প্রতিভা যেহেতু যৌথ উৎস থেকেই নিষ্ক্রান্ত, তাঁর স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে গিয়ে তাঁকে এভাবে বিগ্রহে বিভক্ত করে নিলে একই সঙ্গে অনৈতিহাসিকতা ও অনান্দনিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আরো একজনের প্রসঙ্গও তাঁর সূত্রে একান্ত অনিবার্য বলে বলে গণ্য হওয়া সমীচীন হয়, তাঁর নাম অবশ্যই উৎপল দত্ত। আমরা যেন ভুলে না যাই, নিজের তৈরি জনতার দৃশ্যকেও উৎপল কীরকম নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছেন : 'ভিড়ের দৃশ্য বানাতে গিয়ে আমি এই মূঢ় প্রত্যয়ের শামিল হয়েছিল যে তার দ্বারা ব্যক্তির উত্তরণ হবে এবং মানুষ ও জনপুঞ্জের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারবে। অনেক দেরিতেই আমি বুঝতে পেরেছি, একাকী ফাউস্ট হাউপ্ট মানের হাজার হাজার তাঁতির চেয়েও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ঢের বেশি প্রতিভূ। আমার বানানো গণদৃশ্যগুলিতে অনেক নাটকে চমক জৌলুষ থাকতে পারে, কিন্তু আমার চরিতায়ন বা শ্রেণীসংগ্রামের বিম্বনে তার এতটুকু প্রসার ঘটেনি।'

'একটি বৈপ্লবিক থিয়েটারের অভিমুখে' (Towards A Revolutionary Theatre) নামক ক্রান্তিময় গ্রন্থের তুঙ্গ মুহূর্তে উৎপল দত্তের এই আত্মসমীক্ষণ থেকেই বাদল সরকারের নাট্যচর্যার অব্যর্থ একটি চাবিকাঠি আমরা পেয়ে যাই। একা এবং অনেকজনের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করার মধ্যে উৎপল যেখানে থেমেছেন সেখান থেকেই বাদলের শুরু। এখানে উৎপলের ব্যর্থতা অথবা বাদলের

সাফল্যের হিসেব দিতে গেলে, পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েই বলছি, আমাদের ইতিহাসবোধ এবং শিল্পচৈতন্যের অনটনই প্রমাণিত হবে। ইতিহাস কোনোদিনই একেশ্বরবাদী নয়, তার এষণা সিংহাবলোকনের ধাঁচে এক-একবার পিছন দিকে তাকিয়ে সামনে এগোনো। আর শিল্পের অন্বেষাও একই। ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যসমালোচনা, আমি এখানে উৎপল দত্ত এবং বাদল সরকার দুজনের রচনাকেই সাহিত্যের অন্তর্গত করে দেখতে চাই, কোনো কৃতী কর্মীকে পূর্বসূরি অথবা অপরাপর সতীর্থের আলোড়িত কাজের বলয় থেকে তুলে নিয়ে আলাদা করে নন্দিত করাটা আদৌ কাজের কথা নয়। বাদল সরকারের একাধারে আত্মগত ও সমবায়ী রচনা ও তার মঞ্চানুবাদের স্বকীয়তার কথা বলতে গিয়ে উৎপল দত্তের সক্রিয় উত্তরাধিকারকে খাটো করে দেখতে রাজি নই। এবং প্রবহমান ঐ পুনর্ণব ধারাবাহিকতায় বাদল সরকার নিজস্ব যে মাত্রা যোগ করে দিয়েছেন তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের দায়ভাগ।

দুই

একা বাদল সরকারের কাছে 'সবাই নিয়ে পথ চলার' দায় সব সময়ই একটি সংগ্রামী আনন্দ যোগ হতে পেরেছে। তাঁর মনন ও সৃষ্টি নিয়ে বছর তিনেক আগে একটি ডক্যুমেন্টারি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। 'পাখিরা' শীর্ষক এই তথ্যচিত্রণের পিছনে ছিল অন্তত চারটি সংস্থা : শতাব্দী, পথসেনা, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা ও অগ্নিবীণা। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঠেকেছিল এতগুলি দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে কিভাবে অপরূপ প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছিলেন। অথবা, একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, নিজেকে তিনি আর সকলের মধ্যে সচ্ছল উপায়ে কী-করে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে আবার সেই বিতরিত সত্তাভাব সংকলন করে নিয়ে বাদল সরকারে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলেন আমাকে ক্যালাইডোস্কোপের সেই চাল আবিষ্ট করে দিয়েছিল। এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয় শুরুর সেই একক এবং কোরাসের বিরোধাভাসের স্মৃতি : সূত্রধার পই পই করে জনতাকে ভাদুরিয়া গ্রামের দুর্দশা ও প্রতিকারের কথা বলতে চাইছেন আর বৃত্ত ঘিরে বধির শহুরে লোকজন 'স্টেডিয়াম হবে হবে' 'পাতাল রেল হবে' ধুয়ো তুলে চলেছে। এমন কথা স্পষ্ট করে বলার উপায় নেই, দ্বিতীয়োক্ত ধ্বনিগুচ্ছ সূত্রধারের সম্পূর্ণ অ-কাঙ্ক্ষিত। প্রথম থেকেই তিনি তাঁর আত্মপরিচয় এবং অভীপ্সার এলাকাগুলি আমাদের কাছে যেভাবে বিছিয়ে রেখেছেন, তার বিন্যাস থেকে বুঝবার জো নেই, কোনখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। 'শক্ত দড়ি দিয়ে হাত পা বাঁধা কোমর বাঁধা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কণ্ঠনালীর কাছে উদ্যত ছুরি' যার সেই মানুষটার পর উচ্চারিত চার সিলেব্‌লের সংক্ষিপ্ততম পরিসরের ভিতরেই আর্তনাদও কখন রূপগ্রহ করে 'ট্রাজিক উল্লাসে', দর্শকের (এবং শ্রোতার) মনে হতে থাকে, বাদল সরকারের অভিপ্রেত বুঝি নিরঙ্কুশ বন্দিত্ব। 'আমি বন্দী ... আমি জন্মেছি মুক্ত ... আমার অধিকার মুক্তিতে... আমি এখন বন্দী, নিজে বেছে নিয়েছি এই বন্দিত্ব', তাঁর কাটা-কাটা এই সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তির দোলাচলে, যেহেতু নিজেকে কম করে দুটি চরিত্রে দ্বিধাবিভক্ত করে চলাই তাঁর লক্ষ্য,

একদিকে রুশোর দার্শনিক মুখ অন্যদিকে স্পার্টাকুসের সময়বিবেকী মুখমণ্ডল বিভাসিত হতে থাকে। তাহলে কি তিনি সমগ্র মনুষ্যত্ব ও সমস্ত শিল্পশহিদের হয়েই প্রাক্-ও-উত্তর-ঔপনিবেশিক মানুষের 'ক্রীতদাস্য' থেকে আলগা করে নিচ্ছেন এক ধরনের স্বযাচিত বন্দিদশা যার যাপিত দুর্যোগের অন্তরাত্মা থেকেই অবিক্রীত মানুষ তথা নাট্যশিল্পের মুক্তিমন্ত্র ঠিকরে বেরিয়ে আসতে পারবে? আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে নাট্যকার এর বিশদ কোনো সদুত্তরে না গিয়ে সরে আসেন আরেক জবানবন্দিতে: 'আমি নাগরিক—আমার চেতনার চোখে যত ছবি ভাসে তার পনেরো আনা নাগরিক। আমি বিভক্ত, আমি অনুখণ্ডিত (অণুখণ্ডিত?), গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান।' কেন তিনি 'ঐক্যতান' শব্দের শুদ্ধতাকে আঘাত করে 'ঐক্যতানের' প্রয়োগ ঘটালেন তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে তিনি এখানে 'solidarity'-র একটি দুর্জয় প্রতিশব্দ নির্মাণ করতে চাইছেন। তাঁর সেই উচ্চাশার চরিতার্থতা সম্পর্কে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ও থাকে না। কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে তাঁর স্বাভিমানের স্বরূপ সনাক্ত করা সংগতভাবেই আমাদের কাছে কঠিনসাধ্য হয়ে পড়ে। বাঙালি নাট্যকর্মীদের মধ্যে একমাত্র যিনি গ্রাম মানুষের অন্তঃস্থলে চিরকালের মতন ভিটে গড়ে দিয়েছেন তাঁর আত্মবিশ্লেষণে, মুগ্ধতা সত্ত্বেও, কোথাও কি কোনো ইচ্ছাকৃত বাদ থেকে যায় না? অবশ্যই থাকে, এবং সেটা, অর্থাৎ তার প্রয়োজন এবং অভিঘাত, বাদল সরকারের অভিপ্রেত। এই কূটকথনেরই প্রণোদনায় বাদল, নাগরিকদের মধ্যে নাগরিকতম একজন মানুষ, অনায়াসেই গ্রামীণ হয়ে উঠতে পারেন এবং অনায়াসেই সেই অর্জিত কৌমতা থেকে ফিরে আসতে পারেন, যে কোনো সময়ে নগরজীবনের স্নায়ব অববাহিকায়। এই নিরসন অকাট্য ঠেকলেও আমাদের অস্বস্তি ঘোচে না : তাঁর কৌম নাগরিক (rururban) স্বভাবটা আমরা সত্যি-সত্যি ঠিক ধরতে পেরেছি তো? বাদল সরকার শেষ পর্যন্ত এখানেও নিরুত্তর থাকেন। এবং তাঁর সেই নিরুচ্চার মুদ্রা আমার কাছে বড়োই বিশ্বাসযোগ্য এবং হৃদয়দ্রাবী লাগে। এই ভঙ্গিমা-র নামই হয়তো ambivalence বা প্রতীপায়ন, নিজেকে একপেশে হতে না দেওয়া। অত্যন্ত বিনীত স্পর্ধা নিয়েই বলছি, শতবিচ্ছুরণময় এই মায়াবী ব্যঞ্জনার সৌজন্যেই বাংলা নাটকের তিনি সবচেয়ে আধুনিক ব্যক্তিত্ব। নিজেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবার এই দুঃসাহস বড়ো মাপের নাট্যকারেরই অধিগত। নিজের একদালভ্য ব্যক্তিত্বের ইমেজ ধুয়ে জল খাওয়া আমাদের সমাজে অধুনা একটি উদ্‌যাপিত দুর্লক্ষণ। বাদল সরকার সেই মারাত্মক অথচ জনপ্রিয় উপসর্গ থেকে চিরদিনই মুক্ত। সেই কারণেই তাঁর কলম থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসে নিজেকে বাতিল করে দেবার দৈবতায় দৃপ্ত এরকম সব বীক্ষাবিদ্ধ স্বরক্ষেপ প্রথম-প্রথম আটপৌরে ক্লিশে বলে মনে হলেও যারা অসামান্য :

—আমি অনেক মিছিল দেখেছি— কেউই পথ দেখায় না।

—চলো, আমি তোমার পিছনে আছি। সামনে যাবার কথা ছিল, পারিনি। তাই হারিয়ে গেছি।

—আমি পাইনি।

—একসঙ্গে খুঁজবে?

—চলো, দেখি!

স্বগত ও দ্বৈত/যৌথ এ ধরনের সংলাপের সম্ভাবনায় হঠাৎ কখন তাঁর ভোমার মত একটি চরিত্র জন্ম নিয়ে আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যায়। এই চরিত্রের বৈঠকী বীজাঙ্কুর ছিল ইন্দ্রজিতে এবং নিরন্তর সম্মেলক বাঁচতে চাওয়ার তাড়নায় সে আজ লোকায়িত একটি মহাচরিত্রে বিবর্তিত হয়েছে। যেভাবে হাইনে বা রবীন্দ্রনাথের নির্জন কোনো-কোনো বাক্‌চূর্ণ পরিশেষে জনাকীর্ণ বৈতালিক সংগীত হয়ে উঠেছে, তেমনি। ভোমার এই মহতী পরিণতির রহস্যময়তাও বক্তব্যের উপরে সৌন্দর্যের জয়! 'ভোমা কে?/কে ভোমা?' এই প্রশ্ন আমাদের বেঁচে থাকবার নানা প্রাচীরে-দেয়ালে বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেখানেই হয়তো-বা, শিল্পগত বিচারে, তার মহত্ত্ব। আর তার মতন সরাসরি রাস্তা থেকে উঠে আসা গরঠিকানিয়া যে দোসরজন তার/পূর্বপরিচিতিকে টোকা মেরে তৃতীয় পুরুষে পর্যবসিত করে বলে উঠতে পারে 'ভাত নাই বাবু/ভোমার ক্ষুধা লাগে/তালে ভোমা শুলো' তার কাছে আমরা আজানু ঋণী হয়ে থাকি। কেন না আমাদের ঘরের চাবি ভেঙে সে আমাদের নিয়ে যায় মস্ত বড়ো একটা জায়গায়, সেখানে অস্মিতার স্বেচ্ছাচারিতা, না নিছক রোমান্টিক না ফ্যাসিস্ট, নেই।

তাই বাদল যখন বলেন, 'যেখানে মানুষ, সেখানেই দর্শক', আমার মাথা নুয়ে আসে। চরিত্রের মধ্যে দর্শক এবং দর্শকের মধ্যে চরিত্রকে তিনি কতো সহজেই অন্বিত করে দিয়েছেন! জানি, এরকম মুগ্ধ মূল্যায়নে অনেকের কাছেই 'দর্শক' বলতে voyeur (যে লোকটা বিশেষত লুকিয়ে চুরিয়ে অবৈধ সংক্রাম দেখে উত্তেজিত হয়) অথবা দৃশ্যলোলুপ জনতার মুখচ্ছবি প্রতিভাত হবে। তবু এটাও জানি, বাদল সরকারের সংজ্ঞায়িত চরিত্র দর্শকের অনন্যতা তাঁদের কাছে ক্রমশই একটি প্রতীতি হয়ে উঠতে পারছে। 'আজাদ স্মৃতি ভাষণে মালা'য় তাঁর আপাত সরল বর্গীকরণ এখানে স্মৃতিধার্য : সংযোগ চারভাবে হতে পারে— সংঘটক :: দর্শক/সংঘটক :: সংঘটক/দর্শক :: সংঘটক/দর্শক :: দর্শক। তাঁর এই প্রাণবন্ত চতুরঙ্গের মধ্য থেকেই আমাদের এই বেপথুমান সময়ের উদ্দেশ্যে পথনির্দেশের মতো তাঁর 'অন্তরঙ্গ থিয়েটারের' ঝলক উঠে আসে, দর্শকের মাঝখান থেকেই ফিড-ব্যাকের অভিজ্ঞতা আহরণের পরামর্শ শুভেচ্ছার মতন সঞ্চারিত হয়ে যায় আমাদের জীবনে-জীবনে। তখন আমরা ঠাহর করতে পারি, দর্শকের মতো চরিত্র বুঝিবা আর কোথাও নেই, বিশেষত সেই দর্শকের, যে নাকি ভাতঘুম কাকে বলে জানে না, নিজেরও অন্যান্যদের অপরিমিত জাগরণময় চেয়ে-দ্যাখাকে যে তার চূড়ান্ত মূল্যবোধ বলে বিবেচনা করে। আর, বাদল সরকারের অনবদ্য ভাষায়, 'দেখতে দেখতে তারও (দর্শকের) মোড়ক/মুখোশ' খুলতে থাকে 'একটু একটু করে'! এই অর্থেই অতীন্দ্রিয় রঞ্জনের হাতে/হাত রেখে নিতান্ত পার্থিব ভোমা (নামটাকে উপনিষদ্‌ 'ভূমা'-র অপভ্রংশ বলে মনে হলেও আসলে সে দেহাতি, দেশজ) ভারতনাট্যের সাম্প্রতশাশ্বত অহংকার হয়ে বিরাজ করে।

তিন

স্বরচিত কাজকর্মকে বাদল সরকার 'এক অন্য নাট্যকথন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ বুঝি তাঁর শৈলী নয়, কেন না এর মধ্যে প্রকাশ্য একরকম কাব্যিকতা ভারি উদগ্র। তাছাড়াও প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রেশ্‌ট কিংবা পেটার হাইস/ রিচার্ড শেখনারের 'পরিপার্শ্বনাট্য' অথবা জুলিয়ান বেক-এর 'জীবন্ত থিয়েটার' পার হয়ে অন্যতর পারাভাশায় কি তিনি নোঙর বাঁধতে পেরেছেন? অবোধ সরলীকরণের গরজে বলা যায়, না, এখনো তিনি অমীমাংসিত। যদি ঋজুরেখ এই সদুত্তরে সকলেই সন্তুষ্ট হন, তাহলেও বলব, 'স্বমীমাংসিত' হলেই তো শিল্পীর অবধারিত মৃত্যু। বাদল সরকারের খুব কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি, তবু তাঁর বিষয়ে উষ্ণ দূরত্বের সত্যতা নিয়ে বলতে পারি, নিজেকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত নন। সেজন্যেই তাঁর কাছে আমার প্রত্যাশা অপরিসীম। প্রতিটি মানবিক প্রত্যাশার সঙ্গে মিশে থাকে ভালোবাসার গঞ্জনা। তারই দৌলতে বলতে চাই, তাঁর নাট্যকথন এখনো সংগীতের প্রসাদগুণ ততটা পায়নি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা প্রথম যুগের সলিল চৌধুরীর স্মৃতিসংস্কার ছাপিয়ে এখনো তাঁর সংগীতভাবনা আত্মস্থ হতে পারল না কেন?

কথাসাহিত্যের নিঃসঙ্গ সম্রাট জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জীবনানন্দের কবিতা তাঁকে কতোদূর বিভাবিত করেছে। তিনি আমাকে নিবিড় প্রশ্রয় দিয়ে কবিতার দিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে এগিয়ে আসতে চেয়েও তেমন কিন্তু পেরে ওঠেননি। আমার অবধারিত ধারণা, বাদলবাবুকে আমি যদি এরকমই বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করি, তিনি সহজাত ঔদার্যগুণে, আমাকে দুঃখ দিতে না চেয়েই বলবেন, আধুনিক কবিতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ কত অচ্ছেদ্য। তাঁর সাড়া দেওয়ার ধরনটা আমার বেশ ভালোই লাগবে। আমি তাঁর আতিথেয়তা থেকে অনুমান করে নিতে পারব, তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' বিষ্ণু দে-র 'কাঠ খড় ফুল এবং লখিন্দরের' সঙ্গে একাত্মতায় বর্ণিত, তাঁর 'হাজার বছর ধরে পায়ে হেঁটে চলা' জীবনানন্দ থেকে কোনো দূরবর্তী ঘটনা নয়। এমন-কি তাঁর 'পাখিরা'ও প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই শিল্পসন্ততিই নয় কি?

আমি, তাঁর নাছোড় একজন অনুরাগী, তাঁর কাছ থেকে এক্ষুণি আমার এসব প্রশ্নের সুরম্য মীমাংসা চাই না। কেন না আমি জানি, কবিতার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যই তিনি আপাতত কিছু থমকে থেমে আছেন, উদ্যত ছিলায় সুষুপ্ত শায়কের মতোই।

২. শিকড়টুকুই সলতে

বড়ো জোর চোখের দেখা মেলে বটে বঙ্গসম্মেলনে
তাছাড়া বন্ধুরা থাকে পরিলুপ্ত—কুষাণযুগের
মুদ্রার মতন—কিংবা সাতুই পৌষের খেয়া বেয়ে
বইয়ের মেলায় যদি দুয়ার এবং দেহলির

সন্ধিক্ষণে আচম্বিতে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটে যায়
জানায় নিস্পৃহ স্নেহে 'বারতা পেয়েছি মনে'—
অর্থাৎ বাহিরে সাড়া দিতে নেই (হা অনুশীলিত
ঔদাসীন্য—এই বুঝি অধুনা উত্তর-আধুনিক?)।
আগে ছিল প্রাণের পার্বণ, ছিল বিজয়া দশমী
নেমে এলে—এয়োতিরা মগ্ন যেই সিঁদুর-খেলায়—
এ ওকে বুকে জড়িয়ে হৃদয়ে পত্রাণু গুঁজে দেওয়া,
আর এখন চিঠি লেখা মুমূর্ষু সংস্কৃতি হয়ে গেছে।
অথচ এরাই কিন্তু বিশ্বনগরের আকর্ষণে
ছুটে গিয়েছিল, ব্রেশ্‌ট স্বদেশের মাটি ছেঁড়া-খোঁড়া
জুতোর সুখতলা জুড়ে বয়ে নিয়ে সুদূর মার্কিনে
আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই মতো মাতৃভাষাকেই
বাস্তুভিটা ধরে নিয়ে আমরা তো এখনও ভেসে যাই;
কম্পাস অস্পষ্ট বলে দিগ্‌ভ্রমও হয়েছে, ভেবে দ্যাখো
মার্টিন লুথার কিং কীরকম 'আই হ্যাভ্‌ এ ড্রিম'
বলেই নিজেকে যৌথ উত্তরাধিকারের পরিণত
করে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারে হেঁটে একুশ শতকে
পা রাখলেন! আমাদের চিন্তা আর ব্রতের চর্যায়
অন্ত্যমিল না থাকায় দৌড়ে-যাওয়াটাই শুধু সার;
আমার ও আমাদের স্বপ্নের দ্বৈরথ একবারই
চুকে গিয়েছিল যবে ভাষার শহিদবন্ধু যতো
একই সূত্রে সহস্র জীবন দ্রুত সংকলন করে
মারের সাগর পাড়ি দিল। আজ তাদের স্মরণে
শোকসভায় ঘণ্টা দুই স্বাদেশিকতার হা-হুতাশে
কেঁদেকেটে পরক্ষণে আমরা এ ওকে পাশ কাটিয়ে
নিজ নিজ পরিখায় ঢুকে যাই, একুশের শেষে
বাইশে শ্রাবণ এলে মেতে উঠি, উপলক্ষ যেন
সব-কিছু, সতীর্থের হাতে-হাত রেখে পথ চলা
কিছু নয়, সমবায়ী আত্মপরিচয় কিছু নয়।

শিকড়টুকুই তবু মাটির ভিতরে সলতে, তাকে
উপড়ে ফেলে দিতে গেলে রক্ত ঝরবে, একথা জেনেও
কিছু ভুল করা গেল মিলেনিয়ামের ডামাডোলে,
শুদ্ধি কি পাব না এই বঙ্গাব্দের সৌজন্যে তাহলে?

সুব্রত মজুমদার

কয়েকটি অসামান্য বাঙালি গণিত-প্রতিভা

'What Bengal thinks today will India think tomorrow'—শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ও বাঙালির অগ্রবর্তিতা সম্পর্কে মহামতি গোখলের এই উক্তি সে-যুগে ভারতের গণিতচর্চার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা সূচনার পর ভারতবর্ষে প্রথম গণিত-শিক্ষায় বিশ্বমানের সাফল্য, এবং বিশ্ব-মানের গণিত গবেষণায়র কৃতিত্ব বাঙালির। এই পথিকৃৎ-দের প্রায় অব্যবহিত পরেই অন্তত তিনজন বাঙালী গণিত ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন।

প্রাচীন কালে যে সব দেশ গণিত-চর্চায় অনেক উন্নতি করেছিল, তার মধ্যে অবিভক্ত ভারতবর্ষ অন্যতম। মধ্যযুগেও, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখ, এই উপমহাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এ-যুগের 'শূন্য'-র আবিষ্কার ও ব্যবহার বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয় বৈজ্ঞানিকরা অবগত হন। এবং পরে তাঁদের মাধ্যমে ইউরোপে এই ধারণার প্রসার ঘটে—গণিত ও বিজ্ঞানের জগতে এর ফলে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। এসব সময় অবশ্য কোনো বাঙালীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই গণিতে বাঙালির প্রথম শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব-অর্জনের কৃতিত্ব উল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কয়েকজন মনীসীর। এঁদের কয়েকজন সম্পর্কে এখানে কিছু লিখব।

ভারতবর্ষ এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় এবং ব্রিটিশ আমলেই এখানে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, ফলে বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করে পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করা এবং ইংল্যান্ডের Royal Society-র Fellow (F.R.S) হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলে আমরা স্বীকার করি। আন্তর্জাতিক ভাবে সমস্ত পৃথিবীতেই এই সবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। যে-গণিতবিদদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব, তাঁদের বেলায়ও এই সব মাপকাঠি আমরা ব্যবহার করব।

বিলাতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত পরীক্ষায় (Mathematical Tripos প্রথম দুই Part) First Class পেলে পরীক্ষার্থীকে Wrangler বলা হয়। বিশেষ কৃতিত্ব হিসেবে সর্বত্র এর স্বীকৃতি রয়েছে। এই উপমহাদেশের প্রথম Wrangler বাঙালী আনন্দমোহন বসু। এঁর জন্ম ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৯০৬ সালের ২০ আগস্ট। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার) জয়সিদ্ধি গ্রামে। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আনন্দমোহন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম হন। এর পরে এফ. এ., বি. এ., ও গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রত্যেকটিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি অর্জন করেন এবং বিলাতে যাবার জন্য দশ হাজার টাকা বৃত্তিলাভ করে কেমব্রিজ ক্রাইস্ট-চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭৪ সালে তিনি Wrangler হন। এই পরীক্ষায় তাঁর প্রথম হয়ে Senior Wrangler হওয়ার ইচ্ছা ছিল, এবং সম্ভবত সামর্থ্যও ছিল। কিন্তু সেটি ঘটেনি। তার অন্যতম কারণ এই যে তিনি একই সঙ্গে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দেন, এবং ব্যারিস্টার হন। পরবর্তী জীবনে আনন্দমোহন অবশ্য গণিত-চর্চা বা গণিতে অধ্যাপনা করেননি — তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন।

শিক্ষা-বিস্তারে আনন্দমোহনের বিশেষ উৎসাহ ও অবদান ছিল। তিনি নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি এই উদ্দেশে দান করেন। এটি এখানকার সিটি স্কুল। তাঁর শিক্ষা-বিস্তারের এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তাগাছার মহারাজা শশীকান্ত, রামগোপালপুরের জগাকিশোর রায়চৌধুরী, সন্তোষের জমিদার রানী দিনমণি, মুক্তাগাছার জগতকিশোর আচার্য্য, সন্তোষের প্রমথনাথ চৌধুরী, পুঁটিয়ার হেমন্তকুমারী দেবী এবং ভবানীপুরের জমিদারপত্নী রামসুন্দর দেবী অর্থ-সাহায্য দিয়েছিলেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোনের সঙ্গে আনন্দমোহনের বিয়ে হয়। তিনি কেশব চন্দ্র সেনের কাছে সস্ত্রীক ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭৮ সালে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের জন্য যে সম্মেলন হয়, অসুস্থ অবস্থায় তিনি তার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন, এবং সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব শায়িত অবস্থায় পালন করেন। সেদিন তাঁর রচিত প্রতিষ্ঠা-পত্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ তরে শুনিয়েছিলেন।

বিলাতে বা ইউরোপ, আমেরিকার মত উন্নত কোনো দেশে না গিয়ে এবং সেখানকার পণ্ডিতদের সহায়তা না নিয়ে ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে একান্ত নিজের মেধায় ও শক্তিতে বিশ্ব-গণিতের সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন যে উজ্জ্বল প্রতিভা, তাঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৪ সালে ১৮ জুন কলকাতায় এই মনীষীর জন্ম। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও এফ.এ. তে তৃতীয় হন। এফ. এ. পরীক্ষার সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। এফ. এ. অধ্যয়নকালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (আচার্য্য), হেরম্ব মৈত্র, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় এ. কোর্স ও বি. কোর্স দুভাগ মিলিয়ে প্রথম হন এবং গণিতে এম. এ. পরীক্ষায়ও প্রথম হন। এর পরের বছর আশুতোষ গণিতে প্রেম চাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা ও বিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেন। প্রেম চাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর এবং বিজ্ঞানে শতকরা ছিয়ানব্বই নম্বর পান। এই কৃতিত্বের জন্যে পরের বছরই তাঁকে গণিতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৮৮৮ সালে আশুতোষ ল (Law) পরীক্ষায় পাশ করেন এবং তার ছয় বছর পরে ডক্টর অফ ল ডিগ্রী অর্জন করেন। কিছু কালের জন্য তিনি Tagore Law Professor ছিলেন। আনন্দমোহন বোস তাঁর অন্যতম আইনের শিক্ষক ছিলেন।

তাঁর মাত্র ষোলো বছর বয়সের সময় Cambridge Messenger of Mathematics-এ তাঁর গণিতের প্রবন্ধ ছাপা হয়। এরপর ১০ বছরে এক এক করে তিনি তাঁর কুড়িটা প্রবন্ধ লেখেন—দেশের ও বিদেশের পত্রিকায় এগুলি ছাপা হয়। তখনকার দিনে বিলেতে যাবার ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার ছিল। এর ফলে, মায়ের আপত্তির কারণে আশুতোষের বিলাতে বা অন্যত্র উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার জন্য যাওয়া হয়নি। তাই তাঁর সব গবেষণা আবিষ্কার দেশে বসে নিজে নিজেই করা। ১৮৮৪ সালে কলকাতার Journal of the Asiatic Society তে প্রকাশিত তাঁর একটি গবেষণাপত্র সম্পর্কে Joseph Edwards এর Differential Calculus বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মন্তব্য আছে যে, বিখ্যাত গণিতবিদ Monge জ্যামিতির General Conic এর সমীকরণ থেকে সব কটি সহগ অপসারণের মাধ্যমে একটি Differential Equation পেয়েছিলেন। পৃথিবীবিখ্যাত গণিতবিদ এবং তৎকালীন London Mathematical Society-র সভাপতি George Boole এই Differential Equation-এর কোনো জ্যামিতিক তাৎপর্য খুঁজে পাননি। এবং পাওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন। এই Boole-এর নামে পরিচিত Boolean Algebra প্রায় সবার জ্ঞাত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে এই Differential Equation টি জ্যামিতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এর তাৎপর্য-ও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিলেন।

১৮৮৬ সালে বৃটেনের Quarterly Journal of Mathematics-এ আশুতোষের গবেষণা প্রবন্ধ "A note on Elliptic Functions" সম্বন্ধে বৃটেনের বিখ্যাত গণিতবিদ Cayley মন্তব্য করেন " It is remarkable how in the forgoing investigation a real result is obtained by consideration of an imaginary point."

Enneper-Muller এর জার্মান বই Elliptichen Functionen এবং Broit et Broquet এর ফরাসী বই Functiones Ellipteques থেকে আশুতোষ elliptic funtion সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ফরাসী, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষা ভালোভাবে শিখেছিলেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত আশুতোষ গণিতের গবেষণা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদেশে না গিয়েও এই গবেষণার মাহাত্ম্যে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানসমিতি Cambridge Philosophical Society-র Fellow নির্বাচিত হন। গণিতে গবেষণা ও অধ্যাপনা আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা ছিল। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা Alfred Croft তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপকদের সমান মর্যাদা পাবেন না জেনে তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৬ বছর পরে ১৯০৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। আইনব্যবসা কালে তাঁর আয় মাসে দশ হাজার টাকা ছিল, এখন তাঁর আয় দাঁড়ালো মাসে তিন হাজার। কিন্তু আয় কমলেও অবসর সময়ে দেশের কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারবেন বলে তিনি এই

বিচারপতির কাজটিই বেছে নিলেন। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। উনিশ বছর হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং ১৯২০ সালে কিছু দিনের জন্য প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

১৯০৮ সালে আশুতোষ প্রথমবারের মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। দু বছর করে আট বছর উপাচার্য ছিলেন। একই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দুটি পদ-ই তিনি অলংকৃত করেছিলেন —উপাচার্যের পদটি অবৈতনিক ছিল।

ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী গুণবত্তার জন্য 'নাইট' উপাধি দিয়েছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি এবং ঢাকার পণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 'শাস্ত্র-বাচস্পতি' উপাধি প্রদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে পালি ভাষার প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন তাঁর জন্য সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি দেন।

আশুতোষ গণিত-বিষয়ে আলোচনা, গবেষণা ও তার প্রকাশনার জন্য ১৯০৮ সালে Calcutta Mathematical Society প্রতিষ্ঠা করেন। তখন কলকাতা অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ব্রিটেনে জাতীয় গণিত-সমিতির নাম London Mathematical Society। উনিও জাতীয় গণিত-সমিতি হিসাবে উপরি-উক্ত নামে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। Calcutta Mathematical Society-র সুনাম বিশ্বব্যাপী ছিল ও আছে। প্রফেসর এস. কে. মিত্র. ১৯৯৪ সালে এই সোসাইটির ৮৬-তম বর্ষ-পূর্তি অনুষ্ঠানে Guest of Honour হিসাবে বক্তৃতায় বলেন যে, U.S.A.-তে ত্রিশের দশকে স্থাপিত Institute of Advanced Studies (Princeton)-এ তিনি Bulletin of Calcutta Mathematical Society-র full set দেখেছেন। আবার, Cambridge University-তেও ওই bulletin শুরুর বছর থেকে আছে। এ-দুটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলির অন্যতম।

ছাত্র অবস্থা থেকেই আশুতোষ অনেক বই কিনতেন এবং পড়তেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় James Clerk Maxwell-এর Electricity and Magnetism Vol. 1 ও 11 তে প্রকাশিত Maxwell-এর সদ্য আবিষ্কৃত তত্ত্ব আশুতোষ পড়েছিলেন। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাঁর শিক্ষক Dr. Bruhe-ও এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না। পরে ওই তত্ত্ব-সংক্রান্ত Henri Poincare-র বই পড়ে বিষয়টি আত্মস্থ করেন। এত অল্প বয়সে আধুনিকতম তত্ত্ব জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতার এই পরিচয়ে বিস্মিত হতে হয়।

আশুতোষের প্রায় পঁচাত্তর হাজার বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান বই ছিল। এগুলি তাঁর উত্তরাধিকারীরা কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করেছেন। আশুতোষ সংগ্রহশালা (Ashutosh Collection) নামে ওই লাইব্রেরির একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে এই বইগুলি। পৃথিবী-বিখ্যাত গণিতবিদদের রচিত অনেক বই এর মধ্যে আছে। John Bolyai, Alfred

Clebsh, Edward Dickson, O. L. Coolidge, Rene Descartes, Gespard De Monge, George Salmon, David Hilbert, A. M. Legendre, Isaac Barrow, D. E. Smith, K. F. Gauss, D. M. Sommerville, N. I. Lobacheffsky, F. Klein, I. Newton, Leonard Euler প্রমুখ। তাঁর সংগ্রহে ইউক্লিডের ত্রিশটি জ্যামিতি-বিষয়ক বই ছিল, যার মধ্যে ১৫৭০ সালে Billingsley-কৃত ইউক্লিডের বিখ্যাত বই 'Elements'-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদও ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাপনার ব্যবস্থা শুধু কলেজে ছিল। এম. এ. প্রেসিডেন্সি এবং আর মাত্র দু-একটি কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। আশুতোষ উপলব্ধি করেন, এ-দেশে যথার্থ উচ্চ-শিরা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপণ্ডিত ও অত্যন্ত মেধাবী দেশী শিক্ষকের সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁদের অধ্যাপক নিয়োগ করা প্রয়োজন, এবং তাঁদের পাঠ-দানের উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন। এই গুরুদায়িত্ব তিনি সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হন। শিক্ষা-বিভাগে ইংরেজ কর্মকর্তাদের প্রচণ্ড প্রতিকূলতা-কে তাঁর বাগ্মিতা, দৃঢ় মনোবল ও ওজস্বিতার সাহায্যে প্রতিহত ক'রে, নিজের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ মেধার ঐশ্বর্য ব্যবহার করে, এবং দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছার জোরে প্রত্যেক বিষয়ে যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগদান করেন। এইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের মানচিত্রে অনেক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সমস্ত ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালির কাছে তাঁর ঋণ তাই অপরিশোধ্য। শিক্ষক-নিয়োগে তাঁর অসাধারণ নির্বাচন-দক্ষতার একটি উদাহরণ দিই। গণিতে সবে এম. এ. পাশ করা সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার প্রত্যেককে তিনি এম. এ. ক্লাসে গণিত ও পদার্থবিদ্যা পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা পুরানো সনাতন বিষয়গুলি পড়ানো ছাড়াও সদ্য-সৃষ্ট ও নির্মীয়মান যুগান্তকারী Relativity ও Quantum Theory-র তত্ত্বগুলি পড়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর অঙ্গীকার করলেন ও সেইমত পড়ালেন। কয়েক বছরের মধ্যে এইসব বিষয়ে নিজেরাও গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বখ্যাত হয়ে নিজেদের ও আশুতোষের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন। এইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাতারে শামিল হলো।

আশুতোষ অত্যন্ত নির্ভীক ও তেজী পুরুষ ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করে ওঁর প্রসঙ্গ শেষ করছি। প্রথম ঘটনাটি আমার শ্রদ্ধেয় একজনের মুখে শোনা — এ ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য গণিত-দক্ষতারও দৃষ্টান্ত মেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবে আশুতোষ ঢাকায় গিয়েছিলেন। তখন ঢাকা কলেজে একজন ইংরেজ গণিত-অধ্যাপক দেশী ছাত্রদের হেয় ও তাচ্ছিল্য করতেন এবং রূঢ় আচরণ করতেন। ছাত্ররা আশুতোষের কাছে এই বিষয়ে নালিশ করেছিল। উনি তাঁদের বকে দিলেন, শিক্ষকের মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিয়ে। এরপর একদিন ওই অধ্যাপকের ক্লাস

চলার সময় তিনি ও তাঁর অন্যান্য সদস্যরা ওই ক্লাসে উপস্থিত থাকলেন। অধ্যাপক পড়ানোর সময় কোনো একটি অঙ্কের সমস্যা বোর্ডে সমাধান করলেন। আশুতোষ ক্লাসের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, কত জন বুঝেছ। দেখা গেল, বেশির ভাগ ছাত্রই সমাধানটি বোঝেনি। তখন উনি শিক্ষকটিকে অন্য পদ্ধতিতে অঙ্কটির সমাধান করতে বললেন। শিক্ষক আরেকটি সমাধান দিলে, তারপরও দেখা গেল, অনেকেই বোঝেনি। তখন উনি শিক্ষকটিকে আরো অন্য পদ্ধতি চেষ্টা করতে বল্লেন। শিক্ষকটি না পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। তখন আশুতোষ নিজে বোর্ডে গিয়ে একের পর এক মোট দশ রকম পদ্ধতিতে অঙ্কটি সমাধান করলেন, এবং শেষকালে দেখা গেল, প্রত্যেক ছাত্রই তা বুঝেছে। শিক্ষকটির অবস্থা তখন কাহিল।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আশুতোষ আলীগড় গিয়েছিলেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় কলকাতায় ফিরছেন। ওই কামরায় এক ইংরেজ মিলিটারী অফিসার ছিলেন। এক সময় আশুতোষের তন্দ্রা এসে যায়। জেগে দেখেন, তাঁর চটি-জোড়া নেই। অর্থাৎ, সাহেব ফেলে দিয়েছেন। পরে সাহেব ঘুমিয়ে পড়লে তিনি সাহেবের খুলে-রাখা কোট বাইরে ফেলে দিলেন। সাহেব জেগে উঠে কোট খুঁজছেন। আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বললেন, 'তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে'।

১৯২৩ সালে সরকারের বশংবদ হয়ে থাকার শর্ত মেনে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবার প্রস্তাব করা হয়। উনি শুধু ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করলেন না, খবরের কাগজে সব কিছু প্রকাশ করে জন-সমক্ষে বিষয়টি তুলে ধরলেন।

তাঁর এই অসামান্য তেজের জন্য তাঁকে 'বাংলার বাঘ' বলা হয়।

১৮৬৬ সালে চট্টগ্রামে এক গণিত-প্রতিভার জন্ম হয়। তাঁর নাম অপূর্ব চন্দ্র দত্ত। কারো কারো লেখায় তাঁকে Wrangler বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীতে লেখা আছে 'Senior Optime'। এর অর্থ, সামান্য কিছু নম্বরের জন্য তিনি Wrangler হতে পারেননি। তাঁকে তাই 'প্রায়-Wrangler' বলা যায়। তাঁর বিষয়ে এরকম আরেকটি জনশ্রুতি পরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণভাবে জানা যায় যে তিনি Royal Astronomical Society-র Fellow ছিলেন, আবার Royal Meteorological Society-রও Fellow ছিলেন। কিন্তু তাঁর Royal Meteorological Society-র Fellowship অভ্রান্ত হলেও Royal Meteorological Society-র তিনি Fellow ছিলেন না। Astronomy-তে তাঁর অবশ্য গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, এবং 'জ্যোতিষ-দর্পণ' নামে তিনি একটি বই রচনা করেন। Meteorology বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর গভীর উৎসাহ ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজি, ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষীদের লেখা অনেক বই তাঁর সংগ্রহে ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর অনেক মূল্যবান বই উপহার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে Kepler-এর Astronomia Nova (১৬০৯), Tycho

Brahe-র প্রস্তুতকৃত গ্রহ-তারা সম্পর্কিত table থেকে Kepler-এর রচিত Tabulae Rudolphinae, গ্রেগরি-র The Elements of Physical and Geometrical Astronomy (যার সঙ্গে Halley-র ১৭২৬ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত Synopsis of Astronomy of Comets-ও সংযুক্ত ছিল), U-J.Le Verriere-এর Developments sur plusieurs points dela Theorie des Planets (১৮৪২), Researches sur les movement de les Planet Hershel (১৮৪৬) ও Bessel-এর Tabulea Regtomontanae (১৮৩০) রয়েছে।

অপূর্ব চন্দ্র দত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ও প্রশাসনে নিযুক্ত ছিলেন। সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন।

এবার একজনের কথা লিখব, তিনি Senior Wrangler হয়ে ছিলেন। এ. সি. ব্যানার্জি. ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। এরপর কেমব্রিজে Clare College-এ ১৯১৫–১৯১৯ সময়কালে Senior Wrangler হন এবং দুর্লভ Owst Prize অর্জন করেন। তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী Eddington, Chapman, Lamor ও C. T. R. Wilson-এর কাছে Cavendish Laboratory-তে গবেষণা করেন। তাঁর প্রথম গবেষণা-কমিটির নাম 'The Instability of Radial Oscillations of a Variable Star and Origin of Solar System'। এটি সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব। Sir James Jeans-এর বই এই বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে এটির মিল এবং অমিল দুই-ই আছে। এ. সি. ব্যানার্জির তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক-মহলে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রফেসর ব্যানার্জি পরে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে এলাহাবাদে অনেক যৌথ গবেষণা করেন। এছাড়া Astrophysics-এ নিজামুদ্দীন ও ভাটনগরের সঙ্গে তাঁর ভালো ভালো গবেষণা-প্রবন্ধ আছে।

এ. সি. ব্যানার্জির বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর সমসাময়িক এবং কলেজের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন।

এবার তিন অসাধারণ প্রতিভার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এক সঙ্গে আলোচনা করব। এঁরা প্রায়-সমসাময়িক এবং পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক সঙ্গে কাজ-ও করেছেন। তিনজনেই F. R. S. হয়েছিলেন এবং তিনজনই বিশ্ববিখ্যাত। এঁরা মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)। এর মধ্যে প্রথম দুজনের বাড়ি তৎতালীন ঢাকা জেলায় এবং শেষজনের বাড়ি কলকাতায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা সহপাঠী এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স, এবং ১৯১৫ সালে মিশ্র গণিতে এম. এ.। এ দুটি পরীক্ষাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম এবং মেঘনাদ দ্বিতীয় হন। ওঁদের এম. এ. পরীক্ষার কিছু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী প্রফেসর নিয়োগের কর্মসূচীর আওতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণেশপ্রসাদ নামে একজন মহাপণ্ডিত জ্ঞান-তাপসকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের দায়িত্ব দেন। তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞদের অন্যতম জার্মান গণিতজ্ঞ Felix Klein-এর কাছে গবেষণা

করেছিলেন। তাঁর প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন এবং অনেক নতুন গাণিতিক শব্দ ও বিষয় সমন্বিত থাকায়, এই পরীক্ষায় অনেক ভালো ছাত্রেরও বেশ অসুবিধা হয়েছিল। তবে সত্যেন্দ্রনাথকে, এবং সম্ভবত মেঘনাদকেও, এই প্রশ্নপত্র অসুবিধায় ফেলতে পারেনি। কারণ, এ-সত্ত্বেও, সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় শতকরা ৯২ নম্বর পেয়ে প্রথম হন। এইটি এখনো পর্যন্ত রেকর্ড নম্বর। প্রশান্তচন্দ্র কলকাতা থেকে অনার্স পাশ করে কেমব্রিজে পড়তে যান এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এবং মেঘনাদ পদার্থবিদ হিসাবে এবং প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন। তবে, গণিত এঁদের প্রায় সব গবেষণা-কাজে মূল শক্তি ছিল।

মেঘনাদ সাহা এম. এ. পাশ করার পরপরই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ভালো গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। সেই সময় নির্মীয়মান কোয়ান্টাম তত্ত্ব, বিশেষ করে Max Planck ও Niels Bohr-এর গবেষণা-লব্ধ ফল ব্যবহার করে তারার ঔজ্জ্বল্য ও তাপমাত্রা সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা তাঁকে বিশ্বখ্যাতি দান করে এবং তিনি খুব অল্প বয়সে F. R. S. হন। পরে তিনি দেশে-বিদেশে এই বিষয়ে এবং তাত্ত্বিক পদার্থ-বিদ্যার অন্যান্য বিষয়ে অনেক উচ্চমানের গবেষণা করেন। A Astrophysies-এ মেঘনাদ সাহার তত্ত্ব ওই বিষয়ে প্রথমদিককার মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অন্যতম। গ্রামের দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আর্থিক অসচ্ছলতা ও তৎকালীন সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও কঠোর সাধনার জোরে বিশ্ব-বরেণ্য হয়ে শুধু নিজের নয়, বাংলা, তথা সমগ্র উপমহাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত Saha Institute ভারতের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কেমব্রিজে J. J. Thompson বা ওই মাপের বড় পদার্থবিদের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করার কথা স্থির হয়েছিল। কিন্তু অনার্স পাশ করে দেশে বেড়াতে এসে প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে তখন তাঁর বিলাতে ফেরা হলো না। তাই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ওই অবস্থায় কলকাতার ওই কলেজেই তাঁর পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল, ভারতীয় Geological Survey-র তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়ে তাঁর গবেষণার সূত্রপাত। যেকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গবেষণা মূল পরিসংখ্যান বিষয়ের ভিত্তি, প্রশান্তচন্দ্রের গবেষণা তার অন্যতম। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি — এসব বিষয়েও তাঁর গভীর দখল ছিল এবং এইসব নিয়ে তাঁর ভালো গবেষণা-কাজ আছে। তিনি ১৯৪৫ সালে F. R. S হন। প্রশান্তচন্দ্রর একটি বিশাল কীর্তি Indian Statistical Institute প্রতিষ্ঠা করা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তাঁর প্রভূত গবেষণার মাধ্যমে সেখানেই এই Institute-এর গোড়া-পত্তন হলেও প্রশান্তচন্দ্র কলকাতার বরানগরে নিজের সম্পত্তির একটি বিরাট ভূখণ্ডে এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন — এরই চত্তরের মাঝখানে প্রশান্তচন্দ্রের নিজের বাড়ি (রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত নাম, 'আম্রপালী')। এইটি এখন তাঁর স্মৃতিবাহী সৌধ (museum)। ভারতের আরো কয়েকটি শহরে এই Institute-এর শাখা আছে। পরিসংখ্যানকে

কেন্দ্র করে এই Institute-এ অনেক বিষয়ে খুব উচ্চ-মানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা হয়। এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যান শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। এখানকার প্রাক্তন শিক্ষক, গবেষক, গবেষণা-পরিচালক এবং Institute -এর প্রাক্তন পরিচালক Professor C. R. Rao একজন F. R. S. এবং বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পরিসংখ্যানবিদদের অন্যতম। কলকাতার এই Institute -এ Prof. Rao-এর তত্ত্বাবধানে Ph.D.-করা Professor Vardhan U.S.A-র বিখ্যাত Courant Institute -এর পরিচালক, যিনি গণিতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার (Abel পুরস্কার) অর্জন করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এম. এ. পাশ করার পর প্রথমদিকে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে কিছু ভালো গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Einstein-এর General Relativity তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পরে ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে এই তত্ত্বের সত্যতা নির্ধারিত হয়। এর ফলে, নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বের তুলনায় এই তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় এবং বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী এ তত্ত্ব বুঝতেন। এসময় ১৯২০ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ Special ও General Relativity তত্ত্বের মূল তিনটি জার্মান গবেষণা-প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, এবং প্রশান্তচন্দ্রের অত্যন্ত সুলিখিত একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা সহ এগুলি একটি বই আকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। Einstein ও Minkowski-র ওই গবেষণা প্রবন্ধগুলি এই প্রথম ইংরেজিতে অনূদিত হলো। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ ১৯১৬ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যপনা শুরু করেন—পদার্থবিদ্যা বিভাগেরও এই সূচনা। এঁরা দুজনে নবীন হলেও পুরানো বিষয়গুলির সঙ্গেসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের দুটি স্তম্ভ Relativity ও কোয়ন্টাম তত্ত্বের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এঁরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, নিজেরাও এইসব বিষয়ে গবেষণায় সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতেরও শিক্ষক ছিলেন। ১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন এবং মেঘনাদ কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি গবেষণা-প্রবন্ধ Einstein-এর উদ্যোগে জার্মানির একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু Bose-Einstein Statistics বা Bose-Statistics নামে খ্যাত। এই প্রবন্ধ তাঁর বিশ্বখ্যাতির উৎস। ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি যথা মৌলিক কণিকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান, তাদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; boson (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে) এবং fermion (ইতালীয় বৈজ্ঞানিক Enrico ফের্মি-র নামে)। এই দুই রকম ছাড়া অন্য কোনো ধরনের মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব নেই। এ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের আবিষ্কারের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সত্যেন্দ্রনাথ আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ঢাকা এবং কলকাতায় উনি পদার্থবিদ্যায় একইসঙ্গে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাগার ভিত্তিক কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯২৪-২৫ সময়কালে উনি আর্থি আনুকুল্য সহ ইউরোপে শিক্ষা-সফরের সুযোগ পান। তখন তিনি Einstein, মাদাম ক্যুরি,

.owis de Broglie পমুখ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মিলিত হন, এবং
াদের অনেকের পরীক্ষাগার এবং পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জেনে
দশে কিছু কিছু নতুন প্রয়োজনীয় যন্ত্র নিজে উদ্ভাবন করে ও প্রস্তুত করিয়ে
ারীক্ষাগারে স্থাপন করেন। তাঁর ছাত্রেরা ওই যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণা করেছেন।
সায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান গভীর ছিল এবং এই বিষয়েও তিনি গবেষণা
ারিচালনা করতেন। ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর
াহণের অব্যবহিত আগে Einstcin-এর United Field Theory বিষয়ে তাঁর
ার-পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ U.S.A. ও ফ্রান্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
াবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ F.RS হন। ত্রিশ-
্লিশের দশকে প্রশান্তচন্দ্রের পরিসংখ্যান বিষয়ক তত্ত্বের সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয়ে
াত্যেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ও
ারিসংখ্যানের সত্যেন্দ্রনাথের কাজ তাঁর গভীর গণিত-জ্ঞান ও গণিত-ব্যবহারের
মসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। শেষ বয়েসে তিনি প্রথমে বিশ্বভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। পরে তাঁকে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক পদে
নিয়োগ দেয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ভারত সরকার কলকাতায় তাঁর নামে
একটি উচ্চমানের Research Institute প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তিন জনই
ভালো বাংলা লিখতে পারতেন এবং বাংলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানের অনেক
বিষয় খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁদের রচিত বাংলা বইও আছে।

গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী এই তিন মনীষীর ত্রিবেণী-
সঙ্গম গণিত-ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাকে বিশ্বসভায়
সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এঁদের সহগামী ও অনুগামী আরো গণিত-প্রতিভা
আছেন। তাঁদের কথা আমরা বিস্মৃত হইনি, তবে এখানে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা
করছি না।

গোলাম মুরশিদ

সৎ মানুষের সাক্ষাৎ

আসলে যতোই ছোটো হোক না কেন, বেশির ভাগ মানুষ নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন। আমিও পড়ি এই দলে। কিন্তু কখনো কখনো নিজেকে বড্ডো ছোটো মনে হয়। যেমন, যখন ভালো গান শুনি তখন নিজেকে যথার্থই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। ভাবি, গানের কিছুই জানলাম না! অথবা ভাবি, আহা, যদি অমন গান করতে পারতাম! তেমনি সত্যিকারের একজন সৎ এবং উদার মানুষের কাছে এলে নিজেকে খুব ছোটো মনে হয়। ভাগ্যিস, সংসারের সর্বত্র ঝাঁকে ঝাঁকে সৎ এবং উদার মানুষ দেখা যায় না। নয়তো আত্মধিক্কারে এতো দিন ছোটো হতে হতে মাটিতে মিশে যেতাম হয়তো। যাঁদের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে আমার সব সময় কেবল ছোটো নয়, নিতান্ত ছোটো মানুষ বলে মনে হয়েছে, সেই বিরল লোকদের একজন সনৎ সাহা। তাঁকে যতই দেখেছি, ততোই অনুভব করেছি যে, আমি খুব সংকীর্ণমনা, অনুদার, অসৎ এবং অশিক্ষিত।

সনৎ সাহার সঙ্গে পরিচয় হয়, চল্লিশ বছর আগে, ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। সবে মাত্র চাকরি পেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম পয়লা এপ্রিল। কোথাও থাকার জায়গা না-পেয়ে থাকতে শুরু করেছিলাম বাল্যবন্ধু শিশিরকুমার ভট্টাচার্যের মেসে—এখন যেখানে মতিহার হল—সেখানে। আট-দশ তারিখের দিকে একদিন বিকেলে যখন তীব্র রোদের ঝাঁঝ পড়ে এসেছে, তেমন সময়ে নতুন আলো নিয়ে মেসে এসে সিঁড়িতে বসে পড়লেন রোগা-পাতলা সুদর্শন এক ভদ্রলোক। মেসের সবাই তাঁকে সনৎদা সনৎদা করে খুব খাতির করতে আরম্ভ করলেন। শিশিরও। আমার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার পর আমিও তাঁকে সনৎদা বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলাম। সেই থেকে চল্লিশ বছর ধরে তাঁকে সনৎদা বলেই সম্বোধন করছি। যদিও অল্পকালের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলাম যে, আমি তাঁর কয়েক মাসের বড়ো। কিন্তু লেখাপড়া এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি যে আমার থেকে অনেক বড়ো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই সনৎদা সম্বোধন যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি। যে-মানুষ গৌরব পায়, সেই তো সত্যিকার গুরু!

আস্তে আস্তে সনৎ সাহা সম্পর্কে জানতে পারলাম: অর্থনীতির খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন তিনি। লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স থেকে পিএইচডি শেষ না-করেই ফিরে এসেছেন—পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে। লন্ডনে কেমন লেখাপড়া করেছিলেন, তা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু পরের বছর লন্ডন থেকে পিএইচডি করে আবু হেনা মুস্তাফা কামাল ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, সনৎ নাকি এলএসই-তে ভালো ছাত্র হিশেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। হেনা সাহেব নিজে প্রতিভাবান লোক

ছিলেন। (নিজেই বলতেন, আবু হেনা ডজনে ডজনে জন্মায় না!) তাঁর মুখে বেশি লোকের প্রশংসা শুনিনি। কাজেই সনৎ সাহার প্রশংসা শুনে অনুমান করেছিলাম যে, সনৎ নিশ্চয় খুবই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যদি কেবল অর্থনীতির অধ্যাপক হতেন, তা হলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতো কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করেছিলাম যে, ভদ্রলোক সাহিত্যে কেবল আগ্রহী নন, আমার মতো বাংলার অধ্যাপকদের চেয়ে সাহিত্যের খবর অনেক বেশি রাখেন। তার চেয়েও বড় কথা, সাহিত্য নিয়ে ভাবেন। সাহিত্য বোঝেন। বাংলার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের কথা হলপ করে বলতে পারবো না, কিন্তু আমি যে সাহিত্য পড়েও সাহিত্য বুঝতে পরিনি, এই দীনতার কথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে। আমার এক সহকর্মী এমএ ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গিয়ে নাকি বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ যে কতো বড়ো কবি ছিলেন, কী আর বুইলবো!" আমার সাহিত্যের জ্ঞান প্রায় আমার সহকর্মীরই মতো। একুশ শতকে বাস করলেও, আমরা বেশির ভাগ বাঙালি যে এখনো মধ্যযুগীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং যূথবদ্ধ হয়ে বাস করতে অভ্যস্ত সেটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য পাঁচজন কী করছে, আপনজনেরা কী বলবে, সহকর্মীরা হয়তো ভালো চোখে দেখবেন না—এসব কথা বিবেচনা করে আমরা দিনযাপন করি। অন্যরা কী ভাববে—সেই ভয়ে নিজের রুচির বিরুদ্ধে পোশাক পরি। আত্মীয় অথবা পরিচিতদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে—এ কথা চিন্তা করে আমরা সত্য কথা অবলীলায় গোপন করি, এমনকি, প্রয়োজনবোধে ডাহা মিথ্যে বলি। নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিই। আপোশ করি। সনৎকে দেখলাম, একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। একজন সত্যিকারের আধুনিক মানুষ। পাছে লোকে কিছু বলে—তার থোড়াই পরোয়া করেন। নিজের খুশি মতো চলেন। সবাই মিলে একটা জিনিশ খেতে বললে, সেটা খান না। সবাই ভুরি ভোজে মেতে উঠলে উনি কেবল স্বাদ নিয়ে হাত গোটান। বৃষ্টিতে সবাই ছাদের নিচে আশ্রয় নিলে উনি ভিজতে ভিজতে রাস্তায় চলেন। তখন বেশ শীত পড়তো রাজশাহীতে। সেই শীতের মধ্যে একটা জামা পরে আপন মনে ঘুরে বেড়ান। কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কারও অনুরোধের কিছু করার মতো লোক নন। সনৎ সাহা অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের ভক্তি এবং ভালোবাসায় সিক্ত। কেবল অকাতরে বিদ্যা বিতরণ করেন না, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্নেহ এবং সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেন। যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করেন তাদের। তাঁর এসব গুণের জন্যে অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে। সত্যিকারের সার্থক শিক্ষক যাকে বলে! তাঁর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়, তখনো পর্যন্ত এ রকমের অসাধারণ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তারপরও কমই হয়েছে।

তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে—শিক্ষকদের বসার ঘরে অথবা ক্লাবে অনেক শিক্ষকই একত্রিত হতেন। শিক্ষকরা সবাই সনৎ সাহা, সুব্রত মজুমদার, অরুণ বসাকের মতো উজ্জ্বল তারকা না-হলেও, নবীন-প্রবীণ অনেক শিক্ষকই লেখাপড়া জানতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার মতো যোগ্যতা রাখতেন। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হবার পর দলবাজি করার জন্যে যেমন শত শত অর্ধ-

শিক্ষিত লোক শিক্ষক হিশেবে নিয়োগ পান, তখনো অবস্থাটা ঠিক তেমন ছিলো না। তখন লেখাপড়ার চর্চা ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে লেখাপড়া প্রায়ই বাধা পড়তো এবং পরীক্ষাগুলো অনিয়মিত হতো, রাজশাহীতে তখন পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতো। তাছাড়া, অনেক শিক্ষকের মধ্যেও লেখাপড়ার একটা রীতি ছিলো। 'পূর্বমেঘ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বেশ প্রাণ ছিলো। সেখানে অনেকেই যেতেন গল্প করতে, আড্ডা দিতে, খেলতে। শিক্ষকদের বসার ঘরেও আড্ডা হতো। এখন যেমন এ ধরনের আড্ডায় কেবল দলাদলির সলা পরামর্শ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ষড়যন্ত্র হয়, সেকালে এতো অধঃপাত হয়নি। বলা যায়, সেসব আড্ডায় ভাব বিনিময় হতো। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এসব আড্ডা থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। সাহিত্য সম্পর্কিত আড্ডায় সনৎ সাহা ছিলেন মধ্যমণি। ভাবলে অবাক লাগে একজন অর্থনীতির শিক্ষক কী করে সাহিত্যের এতো খবর রাখতেন এবং সাহিত্য সম্পর্কে এতো মৌলিকভাবে চিন্তা করতেন। বেশির ভাগ বাংলার শিক্ষকের মতো আমিও ইংরেজি সাহিত্যের খবর সামান্যই রাখতাম। বাংলা সাহিত্যও খুব কমই পড়েছিলাম। অথবা পড়লেও তা হজম করতে পারিনি। সনৎ কতোটা জানতেন, তা পরিমাপ করার মতো জ্ঞান আমার ছিলো না। কিন্তু অনেক কাল পরের একটা ঘটনা থেকে তাঁর লেখাপড়া এবং জ্ঞানের পরিধি কতোটা ব্যাপক ছিলো, তার পরোক্ষ প্রমাণ দিতে পারি। মনে হয় ২০০০ সালের দিকে সনৎ সাহা সাদত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার পান। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিই একটা প্রমাণ যে তাঁকে একজন বড়ো সাহিত্যিক বলে গুণীজনেরা বিবেচনা করেন। কিন্তু আমি তা বলতে চাইনি। পুরস্কার বিতরণের পর দর্শকদের মধ্য থেকে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের একজন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি বলেন যে, যখনই বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে সাহিত্য সম্পর্কে নতুন বই আসতো, তখন তিনি চেষ্টা করতেন একে-একে সে বইগুলো পড়তে। কিন্তু নতুন কোনো বই লাইব্রেরি থেকে ধার করতে গিয়ে লক্ষ করতেন যে, তাঁর আগেই অন্য একজন সে বইটা ধার করেছিলেন—তিনি সনৎ সাহা। যে-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিজের বিষয় সম্পর্কিত বই-ই পড়েন না, সে দেশে অর্থনীতির একজন অধ্যাপক ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষার সাহিত্য সম্পর্কিত বইগুলো পড়ে ফেলতেন, ঐ দুই বিষয়ের অধ্যাপকদের আগে—এ দিয়ে তাঁর জ্ঞান এবং কৌতূহলের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র।

সনৎ পড়তেন অনেক। ভাবতেন মৌলিকভাবে। সাহিত্যের আড্ডায় তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যেতো তিনি আমাদের তুলনায় কতো বেশি জানতেন। কিন্তু সে তুলনায় লিখতেন খুব কমই। আড্ডায় তাঁর মন্তব্য শুনে আমি যে কতো নকল করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। নকল করেছি মানে তিনি যে মন্তব্য করতেন, সে কথাটাই কোনো প্রবন্ধে লিখে ফেলেছি। তবে তিনি যেমন সুন্দর করে লিখতে পারতেন, বলা বাহুল্য নকল মাল বলে আমি তেমন উৎকৃষ্টভাবে পরিবেশন করতে পারিনি। আমার বহু লেখাই তাই চোরাই মাল—তার আসল মালিক সনৎ সাহা।

এ প্রসঙ্গে বহু বছর পরের আর-একটা ঘটনা না-বললে কিছুই বলা হয় না। আমি তখন মাইকেল-জীবনী—'আশার ছলনে ভুলি'-র অনেকটা লিখে ফেলেছি। পাণ্ডববর্জিত লন্ডন নগরীতে সে লেখা কাউকে পড়ে শোনানোর জো নেই। তাই পারলে আমি ভাড়া করে লোক ডেকে তাঁদের শোনাতাম। আসলে অন্যকে পড়ে শোনালে আমি খুব শিখতে পারি। এক বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক নাকি তাঁর সব লেখা তাঁর বাড়িউলিকে পড়ে শোনাতেন। যেখানটা শুনে বাড়িউলি হাসতেন না, সাহিত্যিক সেখানটা কেটে ফেলতেন। বুঝতেন যে, তাঁর লেখার সে জায়গাটা সবাই বুঝতে পারবে না। পড়ে শোনালে আমি খানিকটা বুঝতে পারি, আমার লেখাটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, ভাষাটা পড়া যাচ্ছে কিনা। কিন্তু কাকে পড়ে শোনাবো? আমি তাই সিন্দাবাদের মতো লোক খুঁজে বেড়াতাম। তারই মধ্যে হঠাৎ সনৎ এলেন অক্সফোর্ডে এক বৃত্তি নিয়ে। আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। আমার কর্মস্থান বিবিসিতে এলেন একদিন, তারপর সেখান থেকে নিয়ে গেলাম আমাদের বাড়িতে। গপ্পোগুজব আর খাওয়া-দাওয়ার পর রাতের বেলায় তাঁর হাতে দিলাম আমার লেখা তিনটি অধ্যায়। পরের দিন সকালবেলায় সনৎ আমাকে বললেন, ছ্যা, কী ভাষায় লিখেছেন এসব! সনৎ আমার মতো ঠোঁট কাটা নন, কিন্তু উনিও কাউকে কিছু রেখে-ঢেকে বলেন না। বেশ সমালোচনা করলেন, বিশেষ করে আমার ভাষার। আমি বিব্রত মুখে সব শুনলাম। বদল করার তেমন ইচ্ছে আমার ছিলো না। কারণ, আমি তো সনতের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্যে লিখি না! আমি লিখি সাধারণ মানুষের জন্যে। আমার লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তেমন কোনো সমালোচনা করলেন না। বুঝতে পারলাম, তা হলে খুব খারাপ হয়নি। তারপর অনেক সপ্তাহান্তেই অর্থাৎ অনেক শনি-রবিবারই—সনৎ এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে ভাবানোর মতো অনেক কথাই বলেছেন। একদিন রাতে যেমন বললেন, আচ্ছা, বোদলেয়ারের যখন বিচার হয় অশ্লীলতার দায়ে, তার অল্প পরেই তো মাইকেল গিয়েছিলেন ভ্যার্সাইতে। তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়েছিলো বোদলেয়ারের? বোদলেয়ারের ঢাউস জীবনী আমার বাড়িতেই ছিলো। আর-একটা দিকের অনুসন্ধান শুরু করলাম।

আর-একদিন সনৎ বললেন, আচ্ছা, মাইকেল তো তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রথম প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবিদের প্রেরণায়। কিন্তু তিনি যখন ইউরোপে, তখন চলছিলো তৃতীয় প্রজন্মের রোম্যান্টিকদের যুগ। মাইকেল কি সমকালীন রোম্যান্টিক কবিদের খবর রাখতেন? প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের দিয়ে? আবার নতুন পথের অনুসন্ধান চললো আমার।

আর-একদিন বললেন, তা হলে শর্মিষ্ঠা নাটকের শর্মিষ্ঠা আসলে রেবেকা! আমি কিন্তু এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটা ভালো বুঝতে পারিনি। তখন তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, শর্মিষ্ঠা মাইকেলের স্ত্রী। বিবাহিত জীবনেই তিনি গোপনে প্রেমে পড়েছিলেন হেনরিয়েটার সঙ্গে। তারপর হঠাৎ হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর গোপন সম্পর্কের কথা প্রকাশ পাওয়ায় রেবেকার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যায় মাইকেলের। নাটকের গল্পে দুই স্ত্রীকে নিয়ে যযাতি সুখে বাস করলেও, বাস্তবে মাইকেল মাদ্রাস থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। অর্থাৎ এ নাটক আত্মজৈবনিক। আমিও আমার

ভোঁতা বুদ্ধি নিয়ে তখন এই মিলটা দেখতে পারলাম। অতঃপর মাইকেলের সাহিত্য কতোটা আত্মজৈবনিক সে দিকে দৃষ্টি রাখি এবং অনেক আত্মজৈবনিক উপাদানই সেখানে খুঁজে পাই। সে জন্যেই বলেছিলাম, সনৎ যা লেখেননি, কিন্তু লিখতে পারতেন, তার অনেকটাই আমি চুরি করেছিলাম।

লেখাপড়ার প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার আগেই আরও দুটো ঘটনার কথা না-বললেই নয়। আমি তখন 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' বইটা লিখছিলাম। তারই মহড়া হিশেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে একটা বক্তৃতা দিই। বন্ধুরা বক্তৃতা শুনতে না-আসুন, অন্তত বন্ধুকৃত্য হিশেবে সে বক্তৃতায় এসেছিলেন। সনৎও। বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন হাসান আজিজুল হক। আমি বলেছিলাম কিভাবে নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদান এসে মিলিত হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন, হাততালি ইতাদি—সবই হলো। তারপর চায়ের পর্ব। সেখানে সনৎদা মহাবিরক্তি এবং উষ্মার সঙ্গে প্রায় তেড়ে এসে আমাকে বললেন, কী সব আবর্জনা লিখেছেন! এটাকে বলে বাঙালি সংস্কৃতি? আমি যদ্দুর সম্ভব মেজাজ সামলে বললাম, আপনি তাহলে দুটো উদাহরণ দেন বাঙালি সংস্কৃতির! সনৎ কোনো উদাহরণ দিলেন না, নাকি দিতে পারলেন না, ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু তার কিছুক্ষণ আগে হাসান আজিজুল হক সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলেন এবং সনৎদার মুখ খিঁচুনি থেকে মুখ্য যা বুঝতে পারলাম, তা হলো : আমি যা বলেছি, তা হলো বাঙালি সংস্কৃতির নানা উপকরণের কথা। এসব উপকরণ মিলিত হয়ে যে-বাঙালিত্ব ফুটে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতিতে, সে বৈশিষ্ট্যের কথা বলিনি। পরে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, কথাটার মধ্যে সত্যের অভাব নেই। তারপর আমি আমার লেখার দৃষ্টিকোণটাই বদলে ফেললাম। আমার ধারণা, সনৎ আর হাসানের এই তীব্র সমালোচনা না-শুনলে আমার বইটা কিছুই হতো না। কিন্তু পরেও সনৎ বিরক্তি এবং অবজ্ঞার কারণে আমার বইটা পড়তে রাজি হননি।

অন্য ঘটনা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের ১৫০তম জন্মদিনে সনৎদার ঘরে বসে প্রসঙ্গটা নিয়ে আমাদের মাথায় একটা চিন্তা আসে। সে হলো : ঐ সংখ্যা 'পূর্বমেঘে' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে দুটো লেখা দিয়ে সংখ্যাটার নাম বিদ্যাসাগর সংখ্যা দিলে কেমন হয়। পাশেই শহীদুল্লাহ্ কলাভবন। সেখানে সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অফিস। মুহূর্ত দেরি না-করে সেখানে গিয়ে অধ্যাপক সিদ্দিকীর কাছে প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি বয়স্ক লোক। আমাদের মতো হুট করে একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত তো নিতে পারেন না! তাই প্রথমে রাজি হলেও, পরে ভালোমন্দ বিবেচনা করে আপত্তি করলেন। সনৎ আর আমি আবার দ্বিতীয় কলাভবনে সনতের ঘরে গেলাম। সেখানে বসে সম্ভাব্য লেখক-তালিকা তৈরি করে ফেললাম এবং বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়ে বই প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তারপর কী করে সেই বই প্রকাশিত হলো—এমন কি অধ্যাপক সিদ্দিকীর লেখা নিয়েই—এবং বই প্রকাশের কারণে পাকিস্তানি ঘাতকদের তালিকায় আমাদের দুজনেরই নাম উঠলো, সে কাহিনী অন্যত্র লিখেছি।

লেখাপড়ার কথা থাক! লেখাপড়া জেনেও অনেকে দুর্বৃত্ত হয়। আবার লেখাপড়া না-জেনেও অনেকে ভালো মানুষ হতে পারে। মননশীলতার বাইরে মানুষ হিশেবে সনতের যে-পরিচয় পেয়েছি চার দশক ধরে, সে সনৎ অধ্যাপক সনৎ সাহার চেয়েও অনেক উজ্জ্বল, অনেক উদার।

মনে আছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আমরা এক সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম মুরশিদাবাদে। পদ্মার ওপারেই বহরমপুর। কিন্তু আমার নবজাত কন্যা, সুব্রত বাবুর ভাগ্নি ছোট্টো রানু, বেশ কয়েকজন মহিলা আর অতোগুলো বাক্স নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ওপারে যাওয়া খুব সহজ ছিলো না। সেই যাত্রা পথে এবং পরবর্তী নির্বাসিত ন মাসের জীবনে বারবার সনৎ তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। যে-সার্ধশতবর্ষ বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে আমরা ঘাতকদের তালিকায় নাম লেখাই, কলকাতায় গিয়ে সেই বইটি সেখান থেকে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করি। যদ্দুর মনে পড়ে, তার জন্যে বিদ্যোদয় লাইব্রেরি থেকে রয়্যাল্টি বাবদে আড়াই হাজার টাকা পেয়েছিলাম। সেই বিপদের মধ্যে এ টাকাটা ছিলো সোনার খনির মতো মূল্যবান। পনেরোটা অথবা ষোলোটা প্রবন্ধ ছিলো সে বইতে। প্রত্যেকটা প্রবন্ধের জন্যে এক শো টাকা করে দেওয়ার পর বাকি টাকাটা আমি নিয়েছিলাম, সম্পাদক হিশেবে। সনতের দুটি প্রবন্ধ ছিলো। সে বাবদে যে-দু শো টাকা পেয়েছিলেন, পুরোটাই তিনি দিয়েছিলেন বিলেতযাত্রী নিজের ছাত্র অজিত ঘোষকে। ছোটোখাটো ঘটনা দিয়েই মানুষের মহত্ত্ব এবং সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়। সনৎ কতো মহৎ বারবার তার প্রমাণ দিয়েছেন।

কলকাতায় থাকার সময়ে সনৎ কাজ করতেন মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে। পার্ক সার্কাসে আমরা জাস্টিস মাসুদের যে-ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার কাছেই ছিলো এ অফিস। লাঞ্চের সময় সনৎ প্রায়ই আসতেন আমাদের ফ্ল্যাটে। বলতে গেলে তখনই আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলাম। বারবার সনতের উদারতার পরিচয় পাই। আমি তখন 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' আর 'দেশ' পত্রিকায় লিখতাম। এমনকি, অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো একটা উপন্যাসও লিখেছিলাম একটা পূজা-বার্ষিকীতে। এসব লেখার অনেক মালমশলাই পেয়েছিলাম সনতের কাছ থেকে।

আমরা সবাই যুদ্ধশেষে দেশে ফিরেছিলাম অফুরন্ত আশা নিয়ে। ভেবেছিলাম, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। দেশে থাকবে সামাজিক ন্যায়বিচার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে অমুসলমানরা জীবন তো কিছু কম দেননি। বোধ হয়, বেশিই দিয়েছেন। লুটপাট এবং ধর্ষণের শিকারও তাঁরা কম হননি। কিন্তু দেশে ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই আমরা যা ঘটতে দেখলাম, তাতে খুবই হতাশ হলাম। যে-শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিলো, তিনিই তাঁর মোশাহেবদের পরামর্শে তাঁর দলবল নিয়ে যা করতে আরম্ভ করলেন, তাতে আমরা চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমরা কোনোদিন রাজনীতি করিনি। বড়ো জোর সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম। তাই শেখ মুজিবের সম্মতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শগুলো একে-একে ভেঙে পড়তে দেখে এবং রাজনৈতিক চেলাচামুণ্ডাদের অর্থনৈতিক লুটপাট দেখে ব্যথিত হলাম।

এরই মধ্যে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে আমরা তিনদিনের একটি সেমিনার আয়োজন করি "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামে। এই সেমিনারের আয়োজনে সনৎ এবং আলি আনোয়ার সাহেব আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন। দু বছর পরে বাংলা একাডেমি থেকে এই সেমিনারের প্রবন্ধ এবং আলোচনা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে প্রকাশিত হয়। তা পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন, আমরা তখন কী আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু বাস্তব নাকি কল্পনাকে অনেক সময় ছাড়িয়ে যায়। শেখ মুজিবের আমলেই ধর্মনিরপেক্ষতার বারোটা বেজেছিলো। হিন্দু বিতাড়নও শুরু হয়েছিলো তখন থেকে। তবে চরম রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব দেখিয়ে শেখ-মুজিব যেভাবে নিহত হন (অথবা আত্মহত্যা করেন), তার পরে বাংলাদেশের বাকি থাকে কেবল পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীত।

শেখ মুজিবের মতো প্রভাবসম্পন্ন নেতা বাংলায় কোনোদিন জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর মতো কোনো নেতা সম্ভবত এতো জেলও খাটেননি। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্যে যে-নেতা এতো আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করেছিলেন, সে নেতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং শাসনের তেমন ক্ষমতা ছিলো না। একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে-উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন, তা তাঁর অদূরদর্শিতা এবং ক্ষমতালোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

তিনি বাকশাল গঠনের পর আদর্শহীন, ব্যক্তিত্বহীন এবং ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী লোকেরা দলে দলে বাকশালে যোগদান করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-শিক্ষকরা চিরদিন সমাজকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁরা মুক্তকচ্ছ হয়ে বাকশালে যোগ দিতে থাকেন। কে আগে সই করে কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়তে পারেন, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যে পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-পনেরো কি ষোলো জন শিক্ষক বাকশালে যোগদানের আবেদনপত্রে সই করেননি, সনৎ-সহ আমরা কয়েকজন ছিলাম সেই দলে। পরের দিন সকালবেলায় চায়ের টেবিলে যখন শুনতে পেলাম শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন, তখন একই সঙ্গে স্বস্তি এবং হতাশা অনুভব করলাম। স্বস্তি যে, বাকশালে যোগ না-দেওয়ার অপরাধে অন্তত গর্দান রক্ষা পেলো। আর হতাশা যে, দেশে যেটুকু ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, সেটুকুও থাকবে কিনা।

অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাসের গ্রন্থ্ থেকে মনে হয়, জাসদের বাংলাদেশের আদর্শ-বিরোধী আন্দোলন এবং ফৌজি একনায়ক জিয়াউর রহমান ও সঙ্গীদের ষড়যন্ত্রের কারণেই গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত হয় এবং অতিদ্রুত সৌদী আরব আর চীনের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই পরিবেশে সনৎ এবং আমাদের মতো লোকদের কী হতে পারে সহজেই তা অনুমান করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে সনতের থেকে আমাদের অবস্থান একটু ভালো ছিলো। বাপমা আমাদের একটা মুসলমানি নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু সনতের সেটুকু সুবিধেও ছিলো না। যে-সনৎ একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, যে-সনৎ মুক্তিযোদ্ধা, যে-সনৎ সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে একজন উদার মানুষ, সেই সনৎ এই পরিবেশে ইসলামি বাংলাদেশের শত্রু হিশেবে চিহ্নিত

হলেন। তাঁর একমাত্র অপরাধ তাঁর নামটা একটা হিন্দুর নাম—সনৎ সাহা। বোধ হয় এরশাদের আমলে প্রতিরক্ষার লোকেরা একবার তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো! জিজ্ঞাসাবাদ করলো, ভারতীয় দালালদের কাছ থেকে সনৎ যেসব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন। ভুল লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বুঝতে পেরে প্রতিরক্ষার লোকেরা সনৎকে ছেড়ে দিলো। কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা অতো সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলো না। তারা একদিন সনৎ সাহার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে তাঁর হাতপা বেঁধে ফেললো। মারধর করেছিলো কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো স্টিকি টেইপ দিয়ে। পিস্তল তৈরি গুলি করার জন্যে। সেই মুহূর্তে দোতলা থেকে তাঁর কাজের মেয়েটি নিচে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করায় ছাত্র শিবিরের বীরপুঙ্গবরা কাফের মারার সওয়াব অর্জন না-করেই রণে ভঙ্গ দেয়। সনৎ শারীরিকভাবে বেঁচে থাকলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয় জুড়ে কী আশাভঙ্গ, তিক্ততা এবং ক্রোধ নিয়ে বেঁচে থাকলেন, তা কেবল অনুমান করতে পারি। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি তাঁর জন্যে ভালো ছিলো না? কিন্তু অসামান্য উদার তাঁর হৃদয়। এর পরও ছাত্রছাত্রীদের হাসিমুখে অসীম ধৈর্য নিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চা করেছেন। ভালো মানুষ হলেই যে তাঁর কপাল ভালো হয় না, তার চরম এক দৃষ্টান্ত সনৎ সাহা। সনৎ সাহার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দারুণ প্রবল। আমারও। সে জন্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলে সহাস্যমুখে আলিঙ্গন পর্যন্ত হয়। কিন্তু তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়। প্রায়ই একমত হতে পারিনে। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধায় কখনো ঘাটতি দেখা দেয়নি। একটা ঘটনা মনে পড়লো। গত তিরিশ বছর ধরে রাজনীতির নামে ক্ষমতার যে দাপট আর লুটপাট হয়েছে, তা "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া" যাওয়াই স্বাভাবিক। তার মধ্যে কয়েক বছর আগে যখন শেখ হাসিনার আমল অথবা স্বৈরাচার চলছিলো, তেমন সময়ে একদিন আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অন্য কয়েক জনের সঙ্গে সনৎও একটা মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছিলেন। বিএনপি এ সময়ে দেশের গতি রুদ্ধ করার জন্যে যে-হরতাল আর গুণ্ডাবাজির রাজনীতি করছিলো, তার জবাব দেওয়ার জন্যে শেখ হাসিনার দলও গুণ্ডা বাহিনী পোষণ করছিলো। আমরা কথা বলছিলাম, এ বিষয় নিয়ে। আমি বললাম, বিরোধী দল অগণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও সরকারী দল রাজনৈতিক গুণ্ডাদল কেন পুষবে? সনৎ বললেন, এক দলের গুণ্ডা থাকলে অন্য দলেরও গুণ্ডা লাগে। আমি এ কথার সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারিনি। বস্তুত আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। হতাশও। কিন্তু মতান্তর তো হতেই পারে!

আর-একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সনৎ সাহা মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী, এমনকি, মার্কসবাদী রাজনৈতিক পন্থায়ও তাঁর আস্থা আছে। অর্থাৎ তিনি সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমালোচক। বিশেষ করে সমালোচক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। তাই ইরানে শাহের যখন পতন হলো, তখন তিনি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিলেন ইরানের

শাহ। কিন্তু খোমেনি প্রবক্তা ছিলেন ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের। সনৎ ভাবলেন, দুই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টাই কম দোষের। কিন্তু আমরা গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে দেখে এসেছি, তথাকথিত ইসলামি বিপ্লবের নামে ইরান কিভাবে আধুনিকতা বিসর্জন দিয়ে মধ্যযুগে ফিরে গেছে। কিভাবে ইরানের মুক্তবুদ্ধি এবং উদারনৈতিক ব্যক্তিরা অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি, কিভাবে ইরানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা আবার হিজাব এবং বোরকার অন্তরালে ধর্মীয় নির্যাতন এবং বৈষম্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আমিও বসার ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে শৌখিন সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছি। নিজে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে গাড়িবাড়ি নিয়ে বাস করে দরিদ্রের প্রতি সুবিচারের কথা বলা তো শক্ত নয়। বরং তা দিয়ে নিজের ইমেজটাকেই বেশ জোরালো করা যায়। শস্তায় হাত-তালি পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে মানুষই বড়ো। সেই মানুষের কল্যাণ কোন পথে আসতে পারে—সেটা নিয়ে রাজনৈতিক দার্শনিকরা বিচারবিবেচনা করবেন। মার্কস তাঁর সময় এবং তাঁর জানা তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর একটা পন্থার কথা বলেছেন। সেটাকে একটা চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেওয়ার মতো কট্টর মনোভাব আমার নেই। মার্কসের দর্শন আর সে দর্শনকে যাঁরা কাজে লাগিয়ে যাঁরা রক্তনদী বইয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছেন, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য। সত্যি বলতে কি, এ ক্ষেত্রে খোমেনির ইসলামি বিপ্লবের চেয়ে মাওয়ের বিপ্লবকে আমি বেশি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে পারিনে। দুই-ই মানুষের কল্যাণের নামে অমানবিক পন্থা। খোমেনির প্রতি সনৎদার সমর্থন তাই আমি সেদিন সমর্থন করতে পারিনি। বোধহয় তিনি নিজেও এখন আর পারেন না। মোট কথা, সমাজতন্ত্র আর মানবতন্ত্র—এই দুই নিয়ে সনৎ সাহা আর আমার অবস্থান অনেকটাই দূরে সরে গেছে। দীর্ঘদিন আমি পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজে বাস করছি—এ কথা ভেবে সনৎদা হয়তো এর একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু এটা একটা নীতির প্রশ্ন। তাতে দুজনের পথ দুদিকে সরে যেতেই পারে!

আমি খুব সামাজিক জীব নই, তা সত্ত্বেও দীর্ঘ জীবনে কম লোকের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে হয়নি। দুঃখের বিষয়, এঁদের মধ্যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অনেকের প্রতিই রাখতে পারিনি। এক-একটা সময়ে এক-একটা ছোটোখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধার সুগোল পাত্রে টোল খেয়েছে, কিন্তু সনতের মহত্ত্বের প্রতি আমার বিশ্বাস কখনো বিচলিত হয়নি। তাছাড়া, তাঁর কাছে আমার যে-অসীম ঋণ বিশেষ করে আমার বিভিন্ন লেখা সম্পর্কে, তাও তাঁর প্রতি আমার মাথা শ্রদ্ধায় অবনত করে।

আনিসুজ্জামান মানিক

সনৎকুমার সাহা : সমাজ সংসার কলরব

সনৎকুমার সাহা ১৯৪১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলার জামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জামনগর রাজশাহী শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার পুব দিকে। শচীকান্ত সাহা ও শান্তিলতা সাহার আট সন্তানের মধ্যে সনৎকুমার সাহা দ্বিতীয়। তিনি বড় হয়েছেন রাজশাহী শহরের কুমারপাড়ায়। পড়াশুনা করেছেন রাজশাহীতে। শচীকান্ত সাহা রাজশাহী শহরের প্রসিদ্ধ স্কুল বি বি হিন্দু একাডেমীর শিক্ষক ছিলেন। সেকালের স্কুল শিক্ষকদের সমাজে যথেষ্ট সুনাম ছিল। সারা জীবন তিনি শিক্ষকতা করেছেন। সনৎকুমার সাহাও শিক্ষকতা জীবন শেষ করে অবসর নিয়েছেন। পিতার শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সে সময় সমাজে শিক্ষকদের সমাজে যথেষ্ট সম্মান ছিল। আমার বাবা সমাজে যে সম্মান পেয়েছেন আমি কি তা পেয়েছি?'

বি বি হিন্দু একাডেমী থেকে সনৎকুমার সাহা ১৯৫৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন ১৯৫৭ সালে। এই কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি অর্থনীতি বিভাগ থেকে বিএ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ চালু হয় ১৯৫৪ সালে। সনৎকুমার সাহা অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ ব্যাচের ছাত্র। ১৯৬১ সালে অর্থনীতি বিভাগ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়ে দেশের মেধাবী তরুণ শিক্ষকদের আগমন ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে এদের অনেকে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. এনামুল হক, ড. মুশার্‌রফ হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বদরুদ্দীন উমর, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সালাহউদ্দিন আহমদ, ফজলুল হালিম চৌধুরী, এ আর মল্লিক এরা সবাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সনৎকুমার সাহা এসব শিক্ষকদের সংস্পর্শে বেড়ে ওঠেছেন। বি বি হিন্দু একাডেমিতে তিনি মেধাবী শিক্ষকদের সংস্পর্শ পেয়েছেন। রাজশাহী কলেজে যেসব তরুণ বন্ধুর সঙ্গে সনৎ-এর পথচলা তাঁরা অনেকেই জাতীয় পর্যায়ে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছেন ড. মুশার্‌রফ হোসেনের। ড. মুশার্‌রফ হোসেনের সঙ্গে সনৎকুমার

সাহার সম্পর্ক কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেস্লষণ করা যায় না। একে শুধু উপলব্ধি করা যায়। সনৎকুমার সাহা 'ভাবনা অর্থনীতির : বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও অন্যান্য' গ্রন্থটি উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন, 'প্রফেসর মুশাররফ হোসেন আমার স্যার'।

কৃতিত্বের সঙ্গে এমএ পাশ করার পর সনৎকুমার সাহা একই বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং এই বিভাগ থেকে তিনি ২০০৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে সনৎকুমার সাহা লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ইকোনমিক্স এবং ইকোনমেট্রিক্স ব্রাঞ্চে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। স্বাধীনতার পর মুক্তদেশে ১৯৭২ সালে তিনি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা কমিশনে ইকোনোমিস্ট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ওপর নেমে আসে কঠিন খড়্গ। সনৎকুমার সাহাকে দেশে প্রতিবিপ্লব সংগঠনের অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁকে তলব করে। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। ভোলায়, সিরাজগঞ্জে, চট্টগ্রামসহ সারা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্তের দাগ এখনও মুছে যায়নি। সনৎকুমার সাহাকে নির্বাচনের দুই দিন আগে ২৯ সেপ্টেম্বর হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাসায় হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। বাসার গৃহকর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দোতলা থেকে লাফিয়ে নিচে না পড়ে লোকজন জড় করতে না পারলে সে দিন তাঁর জীবনাত্ত ঘটতে পারতো।

১৯৮৬ সালে তিনি ইংল্যান্ডের সাসেক্স-এ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলমেন্ট স্টাডিজে ভিজিটিং ফেলো হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ হাউসে নয় মাসের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সদস্য। জীবনাচরণে চিরব্রতী।

নিরহঙ্কার নির্লোভ সনৎকুমার কুমার সাহা অসীম ভালোবাসার মানুষ সমাজ-সংসার কলরবে জীবনের প্রতি মমতৃশীল ==অংশকে সম্পত্তি সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি ভাবনায় তিনি মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের ভেতরের মানুষ এক বুদ্ধিবৃত্তির পরিধি বিস্তৃত করেন। মানুষকে অসীম দরদ দিয়ে আপন করে নেন বলেই তৃতীয়

প্রজন্মেও তাঁর ভক্তের কমতি নেই। রাজশাহী বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁর বাসায় আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না। নিখুঁত পরিপাটি করে সাজানো বসার ঘরের আসনগুলো যেন ছিল মাতৃত্বের মমত্ব লাগানো। এখনও তাঁর বসার ঘরে এই আসনগুলো একই কায়দায় দ্যুতি ছড়ায়, চিন্তাশীল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করে। জাতীয় পর্যায়ের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের রাজশাহীতে আগমন ঘটলে সনৎ-এর বাসার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ থাকে। প্রয়োজনে তিনি ঢাকা যান, কাজ শেষে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসেন। রাজশাহী তাঁকে টানে। সংসার চলে শিক্ষকতা জীবনের অর্জিত অর্থ দিয়ে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতির যুগে সীমাবদ্ধ আয়ের মানুষের জীবন যে নিয়মে যায়, সনৎ তার ব্যতিক্রম নন। সাধারণ মানুষের মত জীবন-যন্ত্রণা তাঁকেও স্পর্শ করে। তা সে স্পর্শ অন্যের সীমানায় প্রবেশ করে না। নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন। আড়ালেই থাকেন। কিন্তু আড়াল কোথায় পান। তকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার ফসল তাঁর প্রকাশিত ছয়টি গ্রন্থ।

সনৎকুমার সাহার ব্যক্তিজীবন সীমাহীন নীরবতায় কাটলেও সমাজ-রাষ্ট্রের অসঙ্গতির স্থানগুলোতে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৫ সালের পনের আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে শাসকগোষ্ঠী গণ্য করলেও প্রতিবাদী মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের চিৎকার থামেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়েছেন তাঁরা নিজ নিজ উদ্যোগে। সামরিক-স্বৈর-সরকারের বন্দুক-বুটের নির্যাতন এসব মানুষকে নির্লিপ্ত করতে পারেনি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্ধকারে বাতি জ্বেলেছেন। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার পর সনৎকুমার সাহার সময়ের সাহসী গদ্য 'অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু।' এখানে নগদ প্রাপ্তির আশা নেই, জীবনের ঝুঁকি ছিল।

সনৎকুমার সাহার বাসস্থান থেকে আকাশ দেখা যায় না। ক্যাম্পাসের যে বাসায় তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন সেখান থেকেও আকাশ দেখা যায়নি। কিন্তু আকাশের বিশালত্বের মত তার হৃদয়ের পরিধি অন্যকে প্রভাবিত করে। তাঁর চিন্তার সীমানা ঐ নীল আকাশ যে প্রান্তে শেষ ওখানে। বাঙালি সংস্কৃতি, বিশ্বয়ন সবখানেই নতুনত্ব, বিষয়গুলো নতুন করে মানুষকে ভাবিয়ে তুলে। তাঁর ভাবনার বিষয়গুলো অন্ধকার কানা গলিতে পথ হারিয়ে ফেলে না। তারা নতুনত্বকে খুঁজে বার করে আরেক দিগন্তে নিয়ে যায়।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি লিখে চলছেন। গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন। কবিতা লিখেছেন কিনা জানা হয়নি। রবীন্দ্র গবেষক ওয়াহিদুল হকের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা দুই। ওয়াহিদুল হকের অন্যান্য পরিচয়ের নীচে তলিয়ে গেছে কবিসত্তা। গল্পকার হিসাবে সনৎকুমার সাহাকে পরিচয় দেওয়া শক্ত হলেও তাঁর প্রকাশিত গল্প নিয়ে সংকলন করা কঠিন নয়। পূর্বমেঘ-এ তাঁর গল্প প্রকাশিত

হয়েছে। সংবাদের সাহিত্য পাতায় রয়েছে তাঁর একাধিক গল্প। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত 'বনানী' পত্রিকায় সনৎকুমার সাহার প্রবন্ধসাহিত্যের সাথে স্থান পেয়েছে গল্প।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন লিখেছেন সেভাবেই। 'আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ'-এ তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ওয়াহিদুল হককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সনৎকুমার সাহার এই গ্রন্থটি কম বিক্রি হয় কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই বইয়ের গভীরতা বোঝার পাঠক কতজন আছে।' আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ-এর শুরু আলাপ-এ সনৎ লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্যে তাঁর বিপুল রচনা, এবং তাঁর ওপর লেখা অসংখ্য বই আমি পড়েছি, এমন দাবি কিন্তু করি না। আমার পড়াশুনার বৃত্ত খুবই ছোট। তার ওপর ভর করে কিছু বলতে চাওয়া অনেকের কাছে হঠকারী ঔদ্ধত্য মনে হলে তাঁর প্রতিবাদ করবো না। আমার কৈফিয়ত এইটুকুই, পরিসংখ্যানের নমুনা চয়নের মত আমিও বেছে বেছে কিছু লেখা পড়েছি। তবে দৈব-চয়ন নয়। যা খুঁজছি, তা মনে রেখে অন্য কোন রচনার সূত্র ধরে, রবীন্দ্রনাথের, বা অন্য কারো, আর একটি রচনার দিকে এগিয়ে যাওয়া।' সনৎ-এর এ বিনয় কতটুকু সত্য আর কতটুকু বিনয়, আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের দুপাতা পড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাড়ির বাজার নিয়ে তিনি লিখেছেন। যৌতুকের অর্থনীতি, দুর্ভিক্ষ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ এজাতীয় তাঁর লেখার সংখ্যা এবং এর মূল্যমান অনেক। সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সনৎ লেখেননি। সত্যিকারে যেখানে আলো ফেলা দরকার সেখানে তাঁর চেষ্টার শেষ নেই। 'এক এক সময় এক এক তাগিদে এই সব লেখা। কোনটা ভেতরের—হয়ত একটা প্রশ্ন মনে জাগল, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বেরিয়ে আসে একটি লেখা; কোনটা বাইরের-বিশেষ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক বিষয় মনে করে তৈরি করা।' আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো সম্পর্কে সনৎকুমার সাহার এই কৈফিয়ত হলেও তাঁর সব লেখা সম্পর্কে এ-মন্তব্য করা অন্যায় হবে না।

তরুণ সনৎকুমার সাহার লেখা এবং প্রবীণ সনৎকুমার সাহার লেখার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়ের গভীরতায় তিনি একইভাবে প্রবেশ করেছেন। তাঁর প্রতিটি লেখাই নতুন। প্রতিটি লেখার স্বাদ আলাদা। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর যুগে তিনি হাতে লেখেন। কোথাও ঘসামাজা থাকে না। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে যান। লেখার পর নতুন শব্দ বসানোর প্রয়োজন মনে করেন না।

অর্থনীতির জটিলতত্ত্ব নিয়ে যেমন লিখেছেন, তার বাইরে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্ন বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্য ঈর্ষনীয়। অর্থনীতির বাইরে তাঁর আগ্রহের বিষয় সমাজ-রাষ্ট্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি। বৃহৎ-পরিসরে এসবের কোনোটাই অর্থনীতির

বাইরে নয়। সাহিত্যের দুই পুরুষ : শ্রীকৃষ্ণ ও ডন্‌জুয়ান, কোয়েসলারের দর্শন, বাংলা গদ্যের স্বরূপ সন্ধান, নারীর কথা : গল্পে-উপন্যাসে অথবা তাঁর পুস্তক আলোচনা পড়লে সনৎ-এর সৃষ্টিকর্মের ভিন্নমাত্রার স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বসাহিত্যের দুই অসামান্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ও ডন্‌জুয়ান। ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ও শিল্পকলায় সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তারে একক মহিমায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয়, ডন্‌জুয়ানও তেমনি স্প্যানিশ সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।' সনৎ এই দুই মহা-পুরুষকে অসামান্য দরদ দিয়ে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তৃতীয় প্রজন্মের সনৎভক্ত এক পাঠক লেখাটি পড়ে মন্তব্য করেছেন, 'সনৎকুমার সাহা এত রোমান্টিক দেখে তো মনে হয় না।'

'সমাজ সংসার কলরব' (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০) তাঁর প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের বই। সনৎকুমার সাহার অন্যান্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ' (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), 'ভাবনা অর্থনীতির : বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও অন্যান্য' (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), 'কথায় ও কথার পিঠে' (ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৮), 'এই বাংলায়' (ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০১০) এবং 'কবিতা-অকবিতা রবীন্দ্রনাথ' (ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০১১)। সনৎকুমার সাহার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো একত্রিত করলে আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা তাঁর কম নয়। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্যে যেখানে অন্যের পদচারণা সীমিত, সেখানে সনৎ-এর প্রবেশ অনেক গভীরে।

১৯৯৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর আকন্দ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০৭ সালে সনৎকুমার সাহাকে অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এসবের কোনো পুরস্কারই সনৎকুমার সাহাকে মোহিত করে না। তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা সবকিছু ছাপিয়ে নিজস্ব মহিমায় নিজেকে নিজেই প্রকাশিত করে। এখানে অন্যের প্রবেশাধিকার খুব সামান্যই।